অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

সচিত্র

দশম বর্ষ

(ফাল্গুন ১৩১৯ হইতে মাঘ ১৩২০)

সম্পাদক—

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

প্রকাশক

শ্রীকৃষ্ণদাস ধর

অর্চ্চনা-কার্য্যালয়

১৮ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, (অর্চ্চনা পোষ্ট) কলিকাতা

সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্র বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র

কলিকাতা

৫১।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট মণিকা প্রেসে

শ্রীহরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত

অর্চ্চনা সম্বন্ধে মতামত।

"অর্চ্চনা সুপরিচালিত মাসিক পত্রিকা। অর্চ্চনায় সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতেছে। অর্চ্চনা বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত"। —হিতবাদী।

"অর্চ্চনা সর্ব্বাংশে ভাল হইয়াছে। অর্চ্চনা প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে। অর্চ্চনা সুপরিচালিত হইয়া মাসিকের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে। সাহিত্যে অর্চ্চনার উচ্চ স্থান। অর্চ্চনার বার্ষিক মূল্য পাঁচ সিকা। ইহার গুণমূল্যের অনুপাতে পাঁচ সিকা অকিঞ্চিৎকর"।—বঙ্গবাসী।

"অর্চ্চনা পত্রিকাখানি বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ ও সুখপাঠ্য"।—বসুমতী।

* * এই উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা "অর্চ্চনা" আজ কয় বৎসর ধরিয়া যেরূপ নির্ভীকভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাল মন্দ বিচার করিয়া আসিতেছে, যেরূপ অপক্ষপাতে ইহা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, যেরূপ অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়াও সময়ে প্রকাশিত হইতেছে এরূপ পত্রিকা বর্ত্তমানে একখানিও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্চ্চনা বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিবে সন্দেহ নাই। * * ইহা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীরই পাঠ করা উচিত।—সময়।

"অর্চ্চনা কয়েক বৎসরেই প্রভূত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। 'অর্চ্চনা' অনেক মাসিকের আদর্শ হইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যার প্রবন্ধগুলি যে কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন মাসিককে অলঙ্কৃত করিতে পারে। অর্চ্চনা ক্ষুদ্র হইলেও অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। * * এক সংখ্যায় এতগুলি সুখপাঠ্য ও সুলিখিত প্রবন্ধের সমাবেশ ঢক্কা-নিনাদী মাসিক সমূহেও দেখিতে পাই না।"—সাহিত্য।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌-এ,বি-এল্‌ মহাশয় লিখিয়াছেন—

মাসিক-সাহিত্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাগজের নাম করা যাইতে পারে। যতগুলি উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত * * অর্চ্চনা * * প্রভৃতি পুরাতন পত্রিকাগুলি * * প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

অর্চ্চনা—মাসিক পত্রের ভিতর শ্রেষ্ঠতায় ইহা যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। অর্চ্চনার লেখকবর্গের ভিতর কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব? সকলেই সুপরিচিত বিখ্যাত সাহিত্যিক। * * অর্চ্চনা পড়িবার জিনিস পাঁচজনকে পড়াইবার জিনিস। মাসিক প্লাবিত বাঙ্গালায় 'অর্চ্চনা'র আসন যে অনেক উচ্চে সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। —ভারতচিত্র।

ARCHANA—The publication is devoted to philosophical and incidentally Bengali interests. &c. &c.—*The Statesman and Friend of India.*

ARCHANA—This monthly magazine is always interesting reading and has a large circle of readers.—*The Indian Daily News.*

ARCHANA—We are glad to find that the Bengali monthly *Archana* has an assured place among the vernacular periodicals of the country and among the organs of Indian public opinion in Calcutta. It makes its appearance with characteristic punctuality. The articles are thoughtful, well-written, interesting reading and bear ample evidence of judicious editing. (Summary of Opinions)—*The Bengalee.*

ARCHANA—It contains many valuable and interesting articles * * This magazine can be recommended highly to the reading public.—*The Telegraph.*

বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন
উপহারে অভিনব

যদি সর্ব্বশ্রেণীর মানব-চরিত্র দেখিতে চান, অধ্যয়ন করিতে চান, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে

চিত্রাবলী

পাঠ করুন। ভাবে ভাষার বর্ণনায় মুগ্ধ হউন, ঘটনা-তরঙ্গে ভাসিয়া যান। যেমন দেবভোগের জন্ত পাঁচ ফুল হইতে মধুপ মধু আহরণ করে তেমনি কয়জন প্রসিদ্ধ গল্পলেখকের উৎকৃষ্ট গল্প-গুলি চয়ন করিয়া, একত্র গ্রন্থন করিয়া এই সর্ব্বরসাত্মক, নব রসের আধার

চিত্রাবলী

সম্পাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রাদিতে, খ্যাতনামা সাহিত্যরথিগণ কর্ত্তৃক 'চিত্রাবলী'র যেরূপ একবাক্যে প্রশংসালাভ ঘটিয়াছে অন্ত কোন গল্পগ্রন্থ সেরূপ প্রশংসিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ইতিমধ্যেই চিত্রাবলী 'হিন্দী'তে অনুবাদিত হইতেছে।

সুরম্য কভার, উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে পরিপাটী মুদ্রণ এবং উপহার দিবার 'ফরম' সংযোজিত। স্থানাভাববশতঃ নিম্নে কতকগুলি অভিমত উদ্ধৃত হইল মাত্র।

অভিমত

চিত্রাবলী। * * * গল্পগুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। পুস্তকখানি দেখিতে সুদৃশ্য প্রিয়জনকে উপহার দিবার যোগ্য।—হিতবাদী।

চিত্রাবলী। * * * গল্পে উপন্যাসের আভাস আছে। উপন্যাসপ্রিয় পাঠকগণ 'চিত্রাবলী' পাঠে তৃপ্তি পাইবেন। ভাষা ভাল। লেখায় মুন্সিয়ানার পরিচয় পাই।—বঙ্গবাসী।

চিত্রাবলী। * * * আমাদের খুব ভাল লাগিল।—এডুকেশন গেজেট।

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুগ্রহলিপি—

"আমি সমালোচক নহি, তবে আপনার "চিত্রাবলী" আমি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাষা, চিত্রাঙ্কন ও গঠন সকলই আমার সুন্দর বোধ হইতেছে। ইতি"

প্রখ্যাতনামা লেখক ও সমালোচক, সুপ্রসিদ্ধ "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

* * * 'চিত্রাবলী' আমি পড়িয়াছি। মোটের উপর পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে। অধিকাংশ গল্পেরই আখ্যান-বস্তু ভাল, রচনায় নিপুণতা আছে। যে সকল পাঠক গল্প পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহাদের যে এই পুস্তক চিত্তাকর্ষক হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। * *

মূল্য ১৲—ভিঃ পিঃ তে ১।৴০।

ম্যানেজার, অর্চ্চনা।

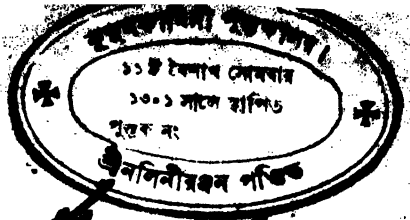
বর্ণানুক্রমিক সূচী

চিত্রসূচী



বেলুড় মঠ ।

The Fine Art Printing Syndicate, —Calcutta.



অর্চ্চনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

দশম বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৯। [প্রথম সংখ্যা

কবি বিহ্লণ।

রবি শশী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুসন্ধিৎসু ভিন্ন ক্ষুদ্র তারকাকে কে অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করে? রবির উদয়ে তারকামালা অদৃশ্য হয়, চন্দ্র থাকিলে লোকের চক্ষু তাহার দিকেই পড়ে। অমাবস্যারজনী ব্যতীত তারকা-মালার দিকে চাহে কে?

সেইরূপ সাহিত্যগগনে যখন শ্রেষ্ঠ লেখক বিদ্যমান, তখন ক্ষুদ্র লেখকগণ সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ লেখকগণের অভাবে সাহিত্যাকাশ যখন অন্ধকারাবৃত, তখনই অল্পশক্তিশালী লেখকগণ নিজে-দের ক্ষীণজ্যোতিঃ বিকীরণ করেন। সাধারণেও তাহাই যথেষ্ট ভাবিয়া তৃপ্ত হন।

কবি বিহ্লণ যে সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, সেও সাহিত্য-মাসের এক অমাবস্যা। সংস্কৃত সাহিত্যের চন্দ্র সূর্য্য—ভবভূতি ও কালিদাস তখন নাই। বিহ্লণের নক্ষত্র জ্যোতিঃই তখন সাহিত্যগগন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল।

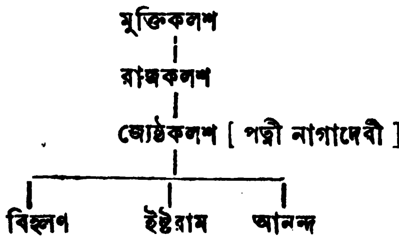
কিন্তু যথার্থই কি তাঁহার ক্ষীণজ্যোতিঃ? নক্ষত্রমালা বহুদূরে অবস্থান করে, তাই আমরা সেগুলিকে ক্ষুদ্র দেখি। তাহাদের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, তাই আমাদের চক্ষে তাহারা অকিঞ্চিৎকর। রবিশশীর সহিত তুলনা করি, তাই তাহাদের জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ। কিন্তু তাহাদের সৃষ্টিও নিরর্থক নহে। তাহারাও সংসারে কাজ করিয়া যায়।

এইরূপ একটি অপেক্ষাকৃত অল্পশক্তিমান্ কবির পরিচয় এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইতেছে।

কাশ্মীরে গোনর্দ্দীয় বংশোদ্ভব গোপাদিত্য নামক নৃপতি ছিলেন। * ইনি ষষ্টিবর্ষ ছয়দিন ধরিয়া রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে কাশ্মীরস্থ ব্রাহ্মণগণের অনাচার দর্শন করিয়া ইনি অতি ক্ষুব্ধ হন ও আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশ হইতে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে সসম্মানে আনয়ন পূর্ব্বক ভূমি দান করিয়া কাশ্মীরে বাস করান। রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে ইঁহার বিষয় বর্ণিত আছে। "ইনি খোল, খাগিকা, হাদিগ্রাম, স্কন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম সকল অগ্রহার প্রদান করেন।" "তৎ কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রমগত সমস্ত সদাচার রক্ষিত হওয়াতে সত্যযুগের উদয় হইয়াছিল।" "এই রাজা গোপ-পর্ব্বতে জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত দেশের অনেক ব্রাহ্মণকে গোপ-অগ্রহার সকল বিতরণ করেন। এবং ভূক্ষীর-বাটিকা নামক স্থান হইতে তথাকার লশুন-ভোজী আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া খাসটা নামক প্রদেশে সংস্থাপন করেন। ইনি আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি দেশ হইতে পরিপূত ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া বশিকাদি স্থান অগ্রহার দান পূর্ব্বক তথায় সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।" † পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ গোপাদিত্যের কাল খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

যে সকল ব্রাহ্মণবংশ গোপাদিত্যের সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কাশ্মীরে যাইয়া বসতি করেন, বিহ্লণের বংশ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহাতেই প্রমাণ, বিহ্লণের পূর্ব্বপুরুষগণ সদাচারসম্পন্ন প্রসিদ্ধ বংশোদ্ভূত ছিলেন। এই পবিত্র কুলেই বিহ্লণের উদ্ভব।

বিহ্লণের পিতামহ হইতে বংশতালিকা এইরূপ ‡ :—



* Date of the original, (Rajtarangini. 1.) 370 B. C. Adjusted date 82 B. C. Asiatic Researches. Vol. XV.

† Stein—Rajtarangini Vol. 1. Pages 50--51 দ্রষ্টব্য।

• লোকনাথ ঘোষ কৃত রাজতরঙ্গিণীর বঙ্গানুবাদ ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্। Aufrecht's catalogus catalogorum. দ্রষ্টব্য।

বিহ্লণের পিতা জ্যেষ্ঠকলশ ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণের যে মহাভাষ্য পতঞ্জলিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ ইনি তাহার ব্যাখ্যা রচনা করেন। সুপণ্ডিত পিতার গৌরব পুত্রগণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইষ্টরাম, আনন্দ ও বিহ্লণ তিনজনেই সুকবি ও বহু রাজসভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন।

বিহ্লণের জন্মস্থান ঘোনমুখ নামক গ্রাম। ইহার বর্ত্তমান নাম ঘুন্‌মোহ্‌।* বিহি পরগণার অন্তর্গত জয়বন নামক স্থল। কাশ্মীরের রাজধানী প্রবরপুর (বর্ত্তমান শ্রীনগর) হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ইহা অবস্থিত। এই জয়বনের নিকটই ঘোনমুখ গ্রাম।

জয়বনে নির্ম্মল সলিলপূর্ণ এক বিশাল দীর্ঘিকা বর্ত্তমান। তক্ষকনাগের এই খানে পূজা হয়। তক্ষক যেন কলির মস্তক ছেদন করিতেছেন। কেন না কলি ধর্ম্ম দেবের বিনাশোদ্যত। এইরূপ বর্ণনা বিহ্লণ নিজেই করিয়াছেন। † কাশ্মীরের প্রথিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিহ্লণের বাল্যজীবন অতীত। চতুর্দ্দিকে মনোরম দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও কুসুমরাশি। কবির হৃদয়ে এ সৌন্দর্য্য গাঢ়-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। নিজ জন্মভূমির প্রশংসায় কবি বলিয়াছেন—

"সহোদরাঃ কুঙ্কুমকেসরাণাং ভবন্তি নূনং কবিতাবিলাসাঃ।
ন শারদাদেশমপাস্য দৃষ্টস্তেষাং যদন্যত্র ময়া প্ররোহঃ॥"

[কর্ণসুন্দরী প্রশস্তি।

"কবিতা নিশ্চয়ই কুঙ্কুমকেসরের সহোদর। কাশ্মীর ভিন্ন অন্য কোন দেশে যেরূপ কুঙ্কুম কেসরের উদ্ভব নাই, সেইরূপ কবিতার বিলাসও অন্য কোন দেশে দৃষ্ট হয় না।"

বাল্যেই বিহ্লণ বেদ, উপনিষদ প্রভৃতিতে পারদর্শী হইয়াছিলেন ‡ উপনয়নের পরই বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই কৃতী হইয়াছিলেন, কবি নিজেই লিখিয়াছেন—

---

* "Situated about 3 miles to the N. N. W of Pampar. Stein Rajtarangini, Vol. I.

† বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্‌।১৮।৭০

‡ ভট্ট শ্রীবিহ্লণোঽস্তাঃ কবির কলুষধীঃ সিদ্ধয়ঃ সাহসানাং
স্রষ্টুঃ শিষ্টোপকারব্রতপরমগুরোঃ সম্মুখা যস্য তাস্তাঃ।
অর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধমৌলের্বিরচিতবসতির্দেবতা সাপি যস্মৈ
শব্দব্রহ্মাভ্যনুজ্ঞাং সমমুপনিষদা বাল্য এবাদিদেশ॥ [কর্ণসুন্দরী প্রশস্তি।

"সাঙ্গৈর্ব্বেদধ্বনিভিরনভিব্যক্তমঞ্জীরনাদা
মৌঞ্জীবন্ধাৎ প্রভৃতি বদনে যস্য বাগ্দেবতাসীৎ॥"
[বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্।১৮।৮১

"উপনয়নের পর হইতে গম্ভীর বেদধ্বনিরূপ অস্ফুট মঞ্জীররবে সরস্বতী যাঁহার মুখে ছিলেন।"

বাল্যকাল অতীত হইলে কবি যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহার মনে নানা দেশ দেখিবার বাসনা জাগিয়া উঠিল। কলশদেব সেই সময়ে কাশ্মীরের রাজা। বিহ্লণ কলশদেবের রাজ্যকালে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়া মথুরা, বৃন্দাবন, কান্যকুব্জ, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, ধারানগর, গুর্জ্জর, সোমনাথপত্তন, সেতুবন্ধ প্রভৃতি প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি যখন গুর্জ্জরদেশে উপস্থিত হন, তখন অনহিলপত্তনে কর্ণরাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। এই রাজাকে নায়ক করিয়া বিহ্লণ "কর্ণসুন্দরী" নাটিকা রচনা করেন। অনহিলপত্তনে এই নাটিকার অভিনয় হয়। ঐ নাটিকার প্রস্তাবনা হইতে ইহা জানা যায়। *

বিহ্লণ গুর্জ্জরভ্রমণ জনিত সন্তাপ সোমনাথ দর্শনে দূরীভূত করেন, তাঁহার নিজরচিত শ্লোক হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়।† এই গুর্জ্জরে অবস্থানকালীন তাঁহার জীবনে আর একটি ঘটনা ঘটে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। "বিহ্লণ-চরিত" নামক গ্রন্থে তাহার বিবরণ আছে। অনেকের মতে বিহ্লণের "চৌরসুরত-পঞ্চাশিকা" কাব্য ঐ ঘটনার ফলে রচিত হয়। এই ঘটনাটির যথার্থতা বিষয়ে সন্দেহ আছে কারণ ইহাতে গুর্জ্জরের অধিপতি বীরসিংহের রাজত্বকালে বিহ্লণ গুর্জ্জরে গমন করেন ইহা লিখিত হইয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু বীরসিংহ ৯২০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।‡ ইহার প্রায় শতবর্ষ পরে কর্ণরাজের রাজত্বকালে বিহ্লণ গুর্জ্জরে উপনীত হন। যাহা হউক উপাখ্যানটি এই ;—

গুর্জ্জরদেশে অনহিলপত্তন নামক নগরে রাজা বীরসিংহ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা, নাম শশিকলা। বীরসিংহ অসাধারণ রূপগুণসম্পন্না

---

* "নব্যস্মিন্নণহিল্ল-পাটনকমুকুটমণৌ শ্রীশাস্ত্যুৎসবদেবগৃহে......"ইত্যাদি। ও
"সাহিত্যোপনিষন্নিষণ্ণহৃদয়ঃ শ্রীবিহ্লণোহস্যাং কবিঃ
কিং চৈতাৎ কিল ভীমদেবতনয়ঃ সাক্ষাৎ কথা-নায়কঃ॥" [কর্ণসুন্দরী।

† "তেষাং মার্গে পরিচয়বশাদর্জ্জিতং গুর্জ্জরাণাং
যঃ সন্তাপং শিথিলমকরোৎ সোমনাথং বিলোক্য॥" [বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্ ১৮।৯৭]

‡ এ, কে, ফোর্ব্স রচিত "রাসমালা" দ্রষ্টব্য। এই বীরসিংহ চাপোৎকট (চাবড়া)—বংশোদ্ভব।

এই কন্যার উপযুক্ত অধ্যাপকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে দৈবক্রমে বিহ্লণকবি দেশভ্রমণ-প্রসঙ্গে গুর্জ্জরদেশে উপনীত হন। রাজা বীরসিংহ বিহ্লণকে বহুসম্মানের সহিত নিজকন্যার অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজকন্যা সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্না হন। কিন্তু ইহার মধ্যে বিহ্লণ ও রাজকন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। বিহ্লণ গোপনে গান্ধর্ব্ববিধানে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা বীরসিংহ ইহা অবগত হইয়া বিহ্লণকে শূলে দিতে আজ্ঞা করেন। বধ্য-ভূমিতে ঘাতক যখন বিহ্লণকে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিতে বলিল, তখন বিহ্লণ পঞ্চাশটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাই "চৌরসুরতপঞ্চাশিকা" "চৌর-পঞ্চাশিকা" বা "চোরপঞ্চাশৎ" নামে প্রথিত। রাজা বীরসিংহ মহিষীর মুখে নিজ কন্যার ঐকান্তিক অনুরাগের কথা শ্রবণ করিয়া ও ব্রাহ্মণবধে ভীত হইয়া বিহ্লণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন ও শশিকলার সহিত বিহ্লণের বিবাহ দেন।

এই উপাখ্যানের সহিত "বিদ্যাসুন্দর" উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে, এমন কি ভারতচন্দ্র এই পঞ্চাশটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গভাষায় তাহার দুইপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। *

পরে বিহ্লণ কর্ণাটপতি আহবমল্লের (অপর নাম ত্রিভুবনমল্ল) রাজধানী কল্যাণ-নগরে গমন করেন। ইনি চালুক্য-বংশোদ্ভব। ইনি বিহ্লণকে মহা-সম্মানের সহিত নিজ সভায় রাখেন ও বিহ্লণকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি দান করেন। বিহ্লণ রচিত বিক্রমাঙ্কদেবচরিত কাব্যের প্রতিসর্গের শেষে বিহ্লণ "ত্রিভুবনমল্ল-বিদ্যাপতি" এই শব্দ নিজনামের বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। "চোল-গণের ভীতি উৎপাদক চালুক্যরাজ এই ভাগ্যবান কবিকে বিদ্যাপতি উপাধি, নীল ছত্র ও হস্তী উপহার দিয়াছিলেন।" [বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্ ১৮।১০১] বিক্রমাঙ্কদেব আহবমল্লের পুত্র। † এইখানেই বিহ্লণ "বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্" রচনা করেন। ‡

---

* ইহার প্রথম শ্লোকটি এই—

"অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজিং।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বল-লালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগলিতামিব চিন্তয়ামি॥"

† দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ সম্পাদিত 'কর্ণসুন্দরী' প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য।

‡ "The Vikramankacharita written by the Kashmir poet Bilhana

আমরা তিনখানি বিহ্লণরচিত গ্রন্থের নাম পাইলাম। 'কর্ণসুন্দরী' (নাটিকা) 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিতম্' ও 'চৌরসুরতপঞ্চাশিকা' (কাব্য)। কিন্তু ইহা ছাড়া তিনি আরও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি" "সুক্তিমুক্তাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা বিহ্লণ রচিত বলিয়া উল্লিখিত। কাজেই আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই শ্লোকগুলি যখন পূর্ব্বোক্ত বিহ্লণ রচিত গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তখন নিশ্চয়ই বিহ্লণ অপর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

এখন বিহ্লণের কালনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। তিনটি ঐতিহাসিক কালের উল্লেখ বিহ্লণের জীবনীতে পাওয়া যায়। প্রথম, তিনি যে সময়ে কাশ্মীর পরিত্যাগ করেন, তখন, কলশদেব কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি যখন গুর্জ্জরে উপনীত হন, তখন ভীমদেবের পুত্র কর্ণরাজ সেখানে রাজত্ব করিতে ছিলেন। তৃতীয়, তিনি কল্যাণ-নগরে ত্রিভুবনমল্লের সভায় আদৃত হইয়াছিলেন। এই তিনজন রাজার সময় নির্দ্ধারণ করিলেই বিহ্লণের সময় অবগত হওয়া যাইবে।

বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল ১০৭৬ হইতে ১১২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কল্যাণে রাজত্ব করেন। কর্ণরাজ ১০৭২ হইতে ১০৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুর্জ্জরে রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যেই বিহ্লণ গুর্জ্জর ও কর্ণাটে উপস্থিত হন। তিনি কাশ্মীর হইতে অনন্ত পুত্র কলশদেবের রাজ্যকালে ভ্রমণে বহির্গত হন। রাজতরঙ্গিণীর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি তাহার প্রমাণ :—

"কাশ্মীরেভ্যো বিনির্যাতং রাজ্যে কলশভূপতেঃ।
বিদ্যাপতিং যং কর্ণাটশ্চক্রে পর্ম্মাড়ি ভূপতিঃ।
প্রসর্পতঃ করিটিভিঃ কর্ণাটকটকান্তরে।
রাজ্ঞোঽগ্রে দদৃশে তুঙ্গং যস্যোবাতপবারণম্।
ত্যাগিনং হর্ষদেবং স শ্রুত্বা সুকবিবান্ধবম্।
বিহ্লণো বঞ্চণাং মেনে বিভূতিং তাবতীমপি।"

[রাজতরঙ্গিণী, সপ্তম তরঙ্গ। ৯৩৫-৯৩৭

"কলশ নৃপতির সময় যে বিহ্লণ কাশ্মীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে কর্ণাটরাজ পর্ম্মাড়ি (ত্রিভুবনমল্ল) বিদ্যাপতি উপাধি দিয়াছিলেন, কর্ণাট ভ্রমণকালে

---

about 1085 in honour of his patron, the Chalukya king Vikramaditya of kalyana regarding the history of whose Dynasty the work supplies much valuable information."

[Encyclopaedia Britannica Vol. 21. page 284.

হস্তিপৃষ্ঠে রাজার সম্মুখে যাঁহার উচ্চ ছত্র শোভা পাইত, সেই বিহ্লণ কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজা হর্ষদেবের অদ্ভুদ্ দানের কথা শ্রবণ করিয়া নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।”

কলশের পিতা অনন্ত জীবিত থাকিতেই কলশ একবার রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। সেই সময়েই বিহ্লণ বিদেশ যাত্রা করেন। * তাহার পর অনন্তদেব পুনর্ব্বার রাজ্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার আত্মহত্যার পর কলশ পুনর্ব্বার রাজা হন। অনন্তের রাজ্যকাল ১০২৮-১০৬৩ খৃষ্টাব্দ। কলশ ১০৬৩ হইতে ১০৮১ পর্য্যন্ত, পিতা জীবিত থাকিতেই রাজ্যভার পান। তাহার পর অনন্ত ও কলশের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে।

সুতরাং বিহ্লণের সময় ১০৪০ হইতে ১১৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ‘এই শতবর্ষের মধ্যেই বিহ্লণের জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

প্রেমপত্রের অভিব্যক্তি।

প্রাণিজগতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে যে উচ্চ-শ্রেণীর জীবের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে এই সিদ্ধান্তটি বৈজ্ঞানিক জগতে সর্ব্ব-বাদীসম্মত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই সিদ্ধান্তের মূল সূত্রটি মনীষিগণ জগতের অন্যান্য বিভাগে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এবং কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বিখ্যাত দার্শনিক হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কি জড়জগতে, কি জীবরাজ্যে, কি মানসিক জগতে সর্ব্বত্রই ক্রমবিকাশ বিদ্যমান। সর্ব্বত্রই এই সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, সরল হইতে জটিল উদ্ভূত হইতেছে। নেবুলা হইতে নভোমণ্ডল, জড় হইতে চৈতন্য, এমিবা হইতে মনুষ্য, সুখদুঃখানুভূতি হইতে বর্ত্তমান মানসিক

---

* Buhler—Introduction to Vikramankadevcharitam দ্রষ্টব্য।

"We must assume that the period between 1063-1081 is meant here, when Kalasa was nominally ruler, not the time of his actual rule after his father's death" Stein—Rajtarangini. Vol. 1

ভাবৈশ্বর্য্য. অসভ্য সমাজ হইতে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমাজ—এই সমস্তই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের হেতু ক্রম বিকসিত হইয়াছে।

এই ক্রমান্বয় ও ধারাবাহিক উন্নতির গতি আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণ দেওয়া এখন অসম্ভব। যে অবিরাম স্রোতের মুখে আমরা দাঁড়াইয়া তাহার আদি ও অন্ত, অতীত ও ভবিষ্যতের তিমিরগর্ভে নিমগ্ন রহিয়াছি, অতীতে যে সমস্ত স্তর বা ক্রমের মধ্য দিয়া এই অভিব্যক্তির স্রোত চলিয়া আসিয়াছে তাহার চিহ্নাদি কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে,কিন্তু নিকটতম কোন দুই স্তরের মধ্যবর্ত্তী বস্তুনিচয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হওয়ায় ক্রমবিকাশের ব্যবধানহীন গতি প্রদর্শন করা অসম্ভব। তথাপি এই অভিব্যক্তির স্তর-নির্দ্দেশ সম্ভব ও শিক্ষাপ্রদ।

অভিব্যক্তির এই মূল সূত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রেমপত্রের আবির্ভাব হইতে বর্ত্তমান পরিণতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দার্শনিক এই ক্ষেত্রে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন নাই। পর্য্যবেক্ষণের দুরূহত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা এই ক্ষেত্রে সমধিক। প্রাণী-রাজ্যে অনেক জীব বিলুপ্ত হইলেও তাহারা কিছুকাল জীবন-সংগ্রামে যুঝিয়াছিল। তাহাদের কঙ্কাল, অস্থি, পদচিহ্ন এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু পত্রগুলি গৃহপালিত পশুর ন্যায় আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না। বঙ্গ ভাষায়-প্রথম প্রেমপত্র লেখিকার ন্যায় চির বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। অসংখ্য প্রেমপত্র অবৈজ্ঞানিক স্বামীর হস্তে পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই দেশে সামাজিক শাসনের মধ্যে প্রেমপত্র অতি সংগোপনে কম্পিত হৃদয়ে অতি ধীরে আপনাকে পরিস্ফুট করিতে পারিয়াছে। আমি বহুকষ্টে যে পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা দ্বারা প্রেমপত্রের ক্রমবিকাশ কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইবে মাত্র। বলা বাহুল্য, এই সংগৃহীত পত্র-সমষ্টি হইতে বালিকা ও কিশোরীর চিঠিগুলি বাদ দিতে হইয়াছে। কেন না বিভিন্ন শ্রেণীর অপরিপুষ্ট নমুনা দ্বারা ক্রমবিকাশ উপলব্ধি হইবে না। পাখীর ডিম্বে ও সর্পের ডিম্বে বিশেষ পার্থক্য নাই। মানব শিশু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বানর বুদ্ধিমান। বিশেষতঃ কবি গাহিয়াছেন—

'না হলে রসিকে, বয়োধিকে
প্রেম জানে না'

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রেমপত্র বোধ হয় প্রাচীর-গাত্রে বা বৃক্ষের ত্বকে, বা বালুকার উপর লিখিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিপথের সম্পূর্ণ

বাহিরে। তাহার উদ্ধার চেষ্টা বৃথা। ভাষার সঙ্গে সঙ্গেও প্রেমপত্রের আবির্ভাব হয় নাই—কেন না, বহু প্রাচীনকালে লিখিত ভাষা পুরুষের মধ্যে অতি অল্প প্রচলিত ছিল। প্রেমপত্রের অব্যবহিত কারণ বিরহ। জায়া যৌবনে পদার্পণ করিলেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া ছাত্রগণ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতেন। বৈষয়িক কারণে বিরহ ঘটিলেও পোষ্ট অফিসহীন দেশে পত্র লেখা স্বাভাবিক হইলেও সাধারণ হইতে পারে নাই। প্রাচীন বিরহকাব্যে হা হুতাশের মধ্যে পত্রসিঞ্চিত প্রেমবারি লক্ষিত হয় না। একান্নবর্ত্তী গৃহে অনেক রমণীর লিপি-অশ্রু দিবসের ম্লান হাসিতে লুকাইত রহিত। সুতরাং আমার সংগৃহীত প্রাচীনতম পত্র অন্য দেশের তুলনায় আধুনিক। সেই পত্রখানি এইরূপ :—

"সেবিকারা প্রণামা নিবেদনঞ্চাগে—

পরে নকড়ি এ বাটীতে আসিয়া আপনার পত্র দিলক তোমাক শরির অসোয়াস্ত শুনিয়া অতিশয় আশ্বাস হইল অত্রস্থ সংবাদ অত্যন্ত মন্দ জানিবা নায়েব পাক দিয়া সমস্ত ধান্য কাটিয়া লইলক বলিল বাবুর হুকুম তামিল করি আমাক মানা শুনিলক না থাতু নন্দ ঠাকুরের কাছে রাখিয়া দশ টঙ্কা কর্জ্জ করি এবং খাজনা আদায় করি আমাক অত্যন্ত ভয় হয় যেহেতু ঘোষবাড়ী সেদিন ডাকাত পড়িল সই কহিলেক তুই একলা কেমন করিয়া থাকিস আমি কহিলাম আমার যেমন অদৃষ্ট গণেশ ভাল আছে। ইতি আপনার শ্রীচরণের দাসি কাত্যায়ণী"

এই পত্রখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও অতি নিম্নস্তরের বলিতে হইবে। অবশ্য অনেক প্রাচীনতর লিপির মধ্য দিয়া ইহার উদ্বর্ত্তন হইয়াছে। অনেক ব্যর্থ চেষ্টা ও লুপ্ত অশ্রু ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, তথাপি আলোচ্য পত্রে কেবলমাত্র শেষভাগে একটু প্রেমের আমেজ দেখা দিয়াছে মাত্র। ডিম্বে যেমন পক্ষ, চঞ্চু অবয়বাদি কিছুমাত্র বিদ্যমান নাই অথচ পূর্ব্বাবস্থা হইতে পীত ও শ্বেতের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তেমনি আলোচ্য পত্রে প্রেমের একটু আভাষ মাত্র পাওয়া যাইতেছে। তখন ডাক বিভাগ হয় নাই—প্রমাণ নকড়ি। লেখিকা বালিকা নহেন, জননী ও গৃহকর্ত্রী। প্রাচীনা নহেন, প্রমাণ সই। একটি নিভৃত পল্লীগৃহে তাহার অখ্যাত জীবনের একটি মুহূর্ত্তের চিন্তা এই পত্রখানির মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

২।

ঐহিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় পদপল্লবাশ্রয়প্রদানেষু—শ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী

মালতীমঞ্জরী দেবী প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদ-সরোরুহ স্মরণমাত্র অত্র শুভবিশেষ। পরং মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চির-কাল কালযাপন করিতেছেন। যে কালে এ দাসীর কালরূপ লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছেন সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় কালের কাল প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ত্বনা করা দুই কালের সুখকর বিবেচনা করিবেন। অতএব জাগ্রত নিদ্রিতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীচরণ যুগলে স্থানং প্রদানং কুরু নিবেদন মিতি।

ক্রমবিকাশের পত্রখানি জটিল হইয়া আসিয়াছে। প্রেম সুস্পষ্টতর হইয়াছে এবং বিরহ দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই পত্রখানিও নিম্নস্তরের। জটিলতা ভাবে নহে, ভাষায়। ভাষার পীড়নে প্রেম ফুটিতে পারে নাই তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্যশাসনের যুগে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর মধ্যে হয়ত এইরূপ চিঠি ভিন্ন অপর কোনও পত্র জীবন-সংগ্রামে টিকিতে পারিত না।

৩।

প্রাণেশ্বর,

এ দাসীকে যে অগ্নি সম্মুখে বিবাহ করিয়াছিলে তাহা কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। সেই বিবাহের দিন আপনাকে দেখিয়া দাসী ধন্যা হইয়াছিল, তাহার পর কি একদিনও দেখিতে পাইব না। সে আজ কত বৎসর হইয়া গেল। মা আমার জন্য কত কাঁদিল। বাবা দরিদ্র বলিয়া আমার অপরাধ কি? দিদিরা সৌভাগ্যবতী তাই আপনার চরণ সেবা করিতে পায় আমি পূর্ব্বজন্মে কত পাতক করিয়াছি। একবার আসিয়া দাসীর প্রাণ বাঁচাও ইতি তারিখ ৩রা ভাদ্র।

এই পত্রে প্রেম ও বিরহ পরিস্ফুট হইয়াছে। স্নেহ প্রভৃতি সমরূপ ভাব হইতে প্রেমের পার্থক্য ঘনীভূত হইয়া তাহা বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে। লেখিকা অবশ্য একটি কুলীন কুমারী—ভাদ্রের অবিরাম বারিধারার মধ্যে এই অনাদৃতার বিরহতাপিত মর্ম্মস্থল হইতে যে দীর্ঘশ্বাসটি উঠিয়াছিল তাহা কেহ শুনিতে পায় নাই। ঐ প্রাণেশ্বর শব্দটি নবযুগের সূচনা—ঐ 'তুমি' ও 'আপনি'র সংমিশ্রণ পাখী ও দ্বিপদ পশুর মধ্যে হংসের ন্যায় দুইটি যুগের মধ্যবর্ত্তী স্তর-নির্দ্দেশ করিতেছে।

৪।

যাও পাখী বল তারে
সে যেন ভোলে না মোরে

হৃদয়েশ্বর!

বড় আশা করিয়াছিলাম যে পূজার সময় তুমি আসিবে। আসিলে না কেন? যদি অধিনী অপরাধ করিয়া থাকে তবে জীবনে ফল কি? যদি তোমায় দেখিতে না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? যদি মরিলাম না ত ভাল বাসিলাম কেন? যদি ভাল বাসিলাম ত পাইলাম না কেন? লোকে বলে পুরুষ পাষাণ, তুমি রমণী হৃদয় কি বুঝিবে? ভাই তুমি কি নিষ্ঠুর! তুমি সুখে আছ তাই থাক আর আমাকে মুখের কথায় ভালবাসা জানাইও না

অদ্য নিশিযোগে নাথ হেরেছি স্বপন
যেন তব সনে করিতেছি কথোপকথন
নিদ্রাভঙ্গে তুমি নাই হেরিনু যখন
দুঃখের সাগরে আমি ভাসিনু তখন!

লেখা খারাপ হইল কিছু মনে করিও না। শীঘ্র চিঠির জবাব দিবে।

তোমারই
রাধারাণী।

এই পত্রখানির স্থান নভেলী যুগে নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পত্র মধ্যে নূতন বৈচিত্র্য অভিমান। 'হৃদয়েশ্বর' 'প্রাণেশ্বরে'র একঘেয়েত্বের উপলব্ধির ফল। "এই হইল ত তা হইল না, তা হইল ত সে হইল না কেন" বঙ্কিম বাবুর এক চেটিয়া। ভাই কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান—জায়ার দাসীত্ব হইতে সখিত্ব ক্রমঃ বিকশিত হইতেছে। তোমারই কথাটি বেশ একটু স্বাধীনতা জ্ঞাপিত করিতেছে। পদ্য কয় ছত্র প্রেমের গদ্যময় পরিচ্ছদে অতৃপ্তি সূচীত করিতেছে। লেখিকার নামটিও প্রাচীন ধর্ম্মপ্রভাবকে অতিক্রম করিয়াছে।

৫।

কলিকাতা
২রা জুলাই, ১৯০০

"প্রিয়তম,

কাল যখন আকাশ ঘনঘোর ক'রে বৃষ্টি নামিয়া আসিল তখন তোমায় মনে পড়ে গেল। মনে হল কতদিন তোমায় দেখি নাই! আজ এই নূতন বর্ষায় তোমার জন্য আমার হৃদয় এই বিশ্বপ্রকৃতির মতই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি তুমি আমারই জন্য প্রবাসী, জানি তুমি আমায় ভালবাস তবু তোমায় দেখিবার জন্য চিত্ত তৃষিত হইয়া থাকে, এবং মনে হয় আকাশের সমস্ত সঙ্গীত

তোমারই সঙ্গীত, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য তোমারই সৌন্দর্য্য। তাই তোমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না।

আজ প্রভাতে মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, একটি স্নিগ্ধ স্বচ্ছ আলোকে নববর্ষাস্নাত কলিকাতা ভরিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই উজ্জ্বল সুন্দর প্রভাতে এক অব্যক্ত মধুর বেদনা অনুভব করিতেছি। প্রিয়তম, সে তোমারই আদরের অতৃপ্ত বাসনা।

তুমি লিখিয়াছ যে বড়দিনের সময় তোমার কাছে লইয়া যাইবে না—কেন না কলিকাতায় রাজা দেখিতে পাইব না। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর ইংলণ্ডেশ্বরের দর্শন মানব-জীবনের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু আমি অধমা নারী —আমার কাছে আমার হৃদয়রাজ্যের রাজার দর্শন অধিক সুখকর।

তোমার চিঠির আশায় রহিলাম।

তোমার

উষা"

এই পত্রখানি প্রেমবৈচিত্র্যে ঝলমল করিতেছে—প্রকৃতির সহিত মানব হৃদয়ের যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা অনুভূত হইয়াছে। বাহিরের আলোকে, সৌরভে, সঙ্গীতে প্রেমপুষ্প বর্ণে গন্ধে সৌন্দর্য্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। প্রাচীনতর পত্রে ও গানে কোকিল, বসন্ত মলয় প্রভৃতি দেখা যায়, কিন্তু তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে নাই। মনে করুন—

"নিশি হল ভোর
ডাকছে ভোঁদড়
প্রাণনাথ কেন এল না,
আমার এত সাধের শুকিয়ে গেল ঘেঁটু ফুলের বিছানা!"

গানটির মূল ভাব "নিশি নিশি কত রচিব শয়ন" প্রভৃতির মধ্য চলিয়া আসিয়াছে—কিন্তু তাহাদের রূপান্তর কি মনোহর! আলোচ্য পত্রের লেখিকা স্থূলাঙ্গী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে একটি সুকুমারী ক্ষীণমধ্যা তন্বী না ভাবিয়া থাকিতে পারা যায় না। ক্রমবিকাশের ফলে আধুনিক প্রেমের এই সূক্ষ্ম বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রাচীন কোন পত্রে দেখি নাই। 'প্রাণেশ্বর', 'প্রাণনাথ', 'হৃদয়সখা', 'হৃদয়ের হার', 'প্রাণের শিশির' প্রভৃতি জীবনসংগ্রামে পরাভূত হইয়া গেল। 'এ বাটীর কুশল', 'পুরুষ পাষাণ' 'লেখা খারাপ হইল' ঝরিয়া পড়িয়াছে। বিরহ হা হুতাশ ছাড়িয়া এখন শুধু একটি অব্যক্ত বেদনার আভাষ দেয় মাত্র।

গহনার নাম মাত্র দেখা যায় না, শুধু মধ্যে মধ্যে একটি শুভ্র জ্যাকেট ও ক্ষুদ্র কোমল চটি জুতার আভাষ পাইয়াছি। কোমতের মতানুসারে প্রাচীন কালী, দুর্গা প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ বিলুপ্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে সরল প্রার্থনা দেখিতে পাই। খোকা খুকির সমস্ত পত্রব্যাপী অত্যাচার দূরীভূত হইয়াছে। স্বাধিকার জ্ঞানের সঙ্গে পূর্ণ আত্মত্যাগ দেখা যাইতেছে। স্বামীর দেবত্ব ও রমণীর মূর্খতার উপর আর প্রেমের ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইতেছে না।

কিন্তু আলোচ্য পত্র ক্রমবিকাশের চরম সীমা নহে—ভবিষ্যতে প্রেমপত্রের বিকাশ কিরূপ হইবে তাহা স্পেন্সারের আদর্শ সমাজের ন্যায় কল্পনা দ্বারা নির্ণয় করা ভিন্ন উপায় নাই। ভবিষ্যত সমাজে বিবাহের অস্তিত্ব বা পদ্ধতি বা কাল, বৈষয়িক কর্ম্মের নূতন গতি বা বন্দোবস্তের ফলে বিরহ মিলনের সম্ভাবিতা, লিখন পদ্ধতি বা সংবাদ প্রেরণের অভিনব প্রণালী, সন্তান পালনের নূতন তথ্য, নারী-জাতির অধিকার প্রাপ্তি প্রভৃতি বহু কারণ প্রেমপত্রের অভিব্যক্তি ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রিত করিবে। বর্ত্তমানকালে নিম্নলিখিত পত্রাপেক্ষা 'উচ্চশ্রেণী'র (?) পত্র আমরা দেখি নাই

Darjeeling.

2. 6. 10.

My own Darling,

কাল আমরা Darjeelingএ পৌঁছিলাম Safely কথাটা লেখা উচিত। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে সামান্য দূরের রেলপথে বিপদের আশঙ্কা অল্প।

Darjeeling কি সুন্দর। বৈকালে তাড়াতাড়ি toilette সেরে যখন Mallএ বেড়াইতে যাইলাম মনে হইল ইহা স্বপ্নরাজ্য আমাদের শোকতাপভরা ধূলিম্লানা ধরণীর সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। কিন্তু এত সৌন্দর্য্যের মধ্যেও একটা hidden want অনুভব করি Don't flatter yourself, but do you think that it is because you are not here?

Babyটা অত্যন্ত ব্যস্ত করিতেছে, নচেৎ আরও দু' একটা তোমার মনোমত ভাবোচ্ছ্বাস বসাইয়া দিতে পারিতাম—আজ এই পর্য্যন্ত

Your own little wife,

Mary Mitter.

শ্রীপান্নালাল বসু।

স্ত্রীকবি জয়ন্তী দেবী।

স্মরণাতীত কাল হইতেই আমাদিগের ভারত, ভারতীর লীলা-নিকেতন। দেশান্তরের অনুপাতে ভারতবর্ষ কমলার তাদৃশ কৃপাপাত্র না হইতে পারে, কিন্তু বাণীর বীণা-নিক্কণে ইহা যে চিরদিন মুখরিত, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের ভারতবর্ষ ব্যাসবাল্মীকির সাধনাস্থল, গৌতম-কণাদ-কপিল-জৈমিনি-পতঞ্জলির বিলাসক্ষেত্র। আমাদের ভারতে কালিদাস জন্মিয়াছেন, ভবভূতি উদ্ভূত হইয়াছেন। মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতিও এই ভারতেই কাব্যদর্শন-রূপ যুগ-যুগান্তর-স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর আমাদের ভারতের গৌরব-রবি, প্রেমের ছবি গৌরাঙ্গদেব আমাদের ভারতমাতারই সুসন্তান। ন্যায়শাস্ত্রের নব প্রবর্ত্তক রঘুনাথ, বিধিব্যবস্থাপক রঘুনন্দন, ভক্ত-কবি জয়দেব আমাদের ভারতের—আমাদের বাঙ্গালার নিজস্ব। প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যের সহিত মানবীয় অপ্রতিহত প্রতিভার এইরূপ অপূর্ব্ব মিশ্রণ, ভারত ব্যতীত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতীয় জল বায়ুর নৈসর্গিক শক্তিটুকু এমনই বিস্ময়াবহ—এমনই অসাধারণ।

আজিও আমরা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলিয়া রাখালদাস ন্যায়রত্নের ন্যায় প্রতিভাবতারের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া গৌরব অনুভব করি, সর্ব্বদর্শন-মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া শিবকুমার শাস্ত্রীর উল্লেখ করিয়া থাকি। প্রাচীন নবীনের সন্ধি-স্থল সর্ব্বতোবিসারি-প্রতিভাসম্পন্ন যাদবেশ্বর, পঞ্চানন, প্রমথনাথের ন্যায় যশস্বী পণ্ডিত আজিও বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

এই ভারতবর্ষে যে অন্তঃপুরচারিণীরা পর্য্যন্ত বিদ্যাবৈভবে স্মরণীয়কীর্ত্তি হইয়াছেন, অপ্রচলিত দেবভাষায় রসভাবমধুর প্রসন্ন গম্ভীর পদ্য রচনা করিয়া জন-বৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন, আজ তাহার দৃষ্টান্তরূপে একটী বঙ্গীয় স্ত্রীকবির বিবরণ "অর্চ্চনা"র পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করিব। অধিক দিনের কথা নহে, শকীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রবন্ধ-প্রতিপাদ্য বিদুষী জয়ন্তী দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

ফরিদপুরের অন্তর্গত ধামুকাগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয়-গোত্রীয় পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জগদানন্দ তর্কবাগীশের ঔরসে জয়ন্তীদেবী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই জয়ন্তীর

বিদ্যাশিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। পিতার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ যখন নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেন, তখন বালিকা জয়ন্তী, খেলা ফেলিয়া সেইখানে বসিয়া থাকিত, এবং তাহাদের উচ্চারিত পাঠের অস্ফুটস্বরে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিত। এইরূপে সে পঞ্চমবর্ষ অতীত হইতে না হইতেই ব্যাকরণ, অভিধানের অনেকাংশ অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিত। পিতা কন্যার এইরূপ নৈসর্গিক বিদ্যানুরক্তি অবলোকন করিয়া তাহাকে স্বয়ং যথারীতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মূর্ত্তিমতী প্রতিভা জয়ন্তী, অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ ও সাহিত্যে আশাতীত ব্যুৎপত্তি লাভ করিল।

বিদ্যানুরাগিনী জয়ন্তী, ইহাতেই পরিতৃপ্তি মনে করিলেন না। তিনি পিতার নিকট কঠোরপরিশ্রম-সাধ্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প দিনেই তিনি ন্যায়শাস্ত্রের রসাস্বাদনে সমর্থ হইলেন এবং তাহাতে অত্যধিক আসক্ত হইয়া পড়িলেন। বর্ত্তমান সময়ের কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি নবীন বাবুরা যে ন্যায়শাস্ত্রকে বৃথা কুতর্কপূর্ণ নীরস মনে করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বতো-ভাবে দূরে অবস্থান করিয়া থাকেন, একজন স্ত্রীলোকের সেই ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি আসক্তির কথা শুনিয়া পাঠক, চমকাইবেন না। সত্যই একদিন এমন সময় ছিল, যেদিন ন্যায়শাস্ত্রের মাদকতা, বঙ্গ, মিথিলা, দাক্ষিণাত্যকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। সেই মাদকতার প্রভাবেই জগদীশ গদাধরের উৎপত্তি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শঙ্কর তর্কবাগীশের আবির্ভাব। যে ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কি ব্যাকরণ, কি অলঙ্কার, কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি অন্যান্য দর্শন—কোনও শাস্ত্রেই প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হওয়া যায় না, আজ সেই ন্যায়শাস্ত্র, বিদ্যার্থি-সমাজে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইল! এমনই কালমাহাত্ম্য!!

যাউক, যথাকালে জয়ন্তী সৎপাত্রে অর্পিত হইলেন। বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের বিলাসভূমি, প্রধান বৈদিক-সমাজ কোটালীপাড়ানিবাসী শুনকগোত্রসম্ভূত কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমের সহিত জয়ন্তীর বিবাহ হইল। কিন্তু জয়ন্তী এতাদৃশ অসাধারণ গুণগরিমার অধিকারিণী হইলেও কৃষ্ণবর্ণা ছিলেন বলিয়া তিনি যৌবনের প্রারম্ভে কিছুদিন স্বামি-প্রেমে বঞ্চিত ছিলেন। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সহিত একত্র বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। উজ্জৃম্ভিত যৌবন লইয়া তাঁহার পিত্রালয়েই কাল কাটাইতে হইল। স্ত্রীলোক কবি হইলেই কি কৃষ্ণবর্ণা হইতে হয়? প্রাচীন স্ত্রীকবি বিজ্জকাও কৃষ্ণাঙ্গী ছিলেন। তিনি দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মামজানতা।
বৃথৈব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।"

যাহা হউক, জয়ন্তী এই সময়ে পিতার নিকটে প্রচলিত ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে সুচারু নৈপুণ্য লাভ করিলেন। তিনি অধ্যয়নব্যসনে আসক্ত হইয়া বাহ্য আনন্দ লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু স্বামীর বিরাগভাজন বলিয়া তাঁহার অন্তরে অণুমাত্র সুখ ছিল না। জয়ন্তী একদিন স্বীয় দুরবস্থাব্যঞ্জক একটী অনুষ্টুপ্ শ্লোক লিখিলেন—

"জিতধূমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে।
মশকায় ময়া কায়ঃ সায়মারভ্য দীয়তে॥"

অর্থাৎ ধূমসমূহ ও ব্যজন বায়ুদ্বারাও দূরীভূত না হইয়া দুষ্ট মশকগণ সায়ংকাল হইতে আমাকে দংশন করিতে আরম্ভ করে। শ্লোকের ব্যঙ্গার্থ এই যে, তোমার বিরহে আমি শয়ন পরিত্যাগ করিয়াছি।

জয়ন্তী এই শ্লোকটী অনেক চেষ্টায় স্বামি-সকাশে প্রেরণ করিলেন। তিনি সুযোগ অনুসারে স্বরচিত আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা স্বামীর নিকটে পাঠাইলেন। সেই সকল কবিতা পাঠ করিয়া কৃষ্ণনাথ, পত্নীর অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও অসামান্য পতিভক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন ঘৃণার পরিবর্ত্তে পত্নীর প্রতি তাঁহার হৃদয়, অনুরাগের পীযূষ-প্রবাহে ভরিয়া উঠিল। গুণের নিকট রূপ সম্পূর্ণ পরাজয় লাভ করিল। তিনি পত্নীকে আদর করিয়া সলজ্জভাবে লিখিলেন,—

"অবিজ্ঞাতুর্নাম ত্বদতুলগুণগ্রামমনঘং
বধূরত্ন জ্যায়ানভবদপরাধস্ত্বয়ি মম।
ইদানীং নৈব স্যান্নন্বু কিমনুতাপার্ত্তহৃদয়ঃ
ক্ষমার্হস্তে ভদ্রে প্রকৃতিকঠিনো মাদৃশজনঃ॥"

"প্রিয়ে, তুমি রমণীরত্ন। আমি তোমার অতুলনীয় গুণগ্রাম জানিতে না পারিয়া তোমার কাছে ঘোর অপরাধী হইয়াছি। আজ আমি অনুতাপে দগ্ধহৃদয়; ভদ্রে, তুমি কি এই কঠোরান্তঃকরণকে ক্ষমা করিবে না?"

জয়ন্তী একদিনও স্বামীর ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা জানে নাই। আজ অনুতপ্ত স্বামীর পত্রে অপরিমিত—আশাতীত ভালবাসার কথা শুনিয়া সে স্বামীর পূর্ব্বকৃত সকল অপরাধের কথা ভুলিয়া গেল;—তাহার হৃদয় সীমা-শূন্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

জয়ন্তীর ইচ্ছা হইল যে, তখনই সে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর চরণে নিপতিত হয়।

কিন্তু রমণীজনসুলভ অভিমান তাহাকে বাধা দিল। সে প্রত্যুত্তরে স্বামীকে একটু ব্যঙ্গ করিয়া লিখিল,—

"পুন্নাগচম্পকলবঙ্গসরোজমল্লিমাকন্দযূথিরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎকুন্দবৃন্দকুটজেষ্বপি পক্ষপাতঃ সদ্বংশজন্য মহতো হি মহত্ত্বমেতৎ ॥"

"হে ভ্রমর, তুমি নাগকেশর, চম্পক, লবঙ্গ, পদ্ম, মাকন্দ, যূথিকা প্রভৃতি বিবিধ সুরভি-সুন্দর কুসুমের মধুপানে অভ্যস্ত হইলেও যে এই সামান্য কুন্দ ও কুটজ পুষ্পের প্রতি আদর দেখাইতেছ, ইহা তোমার আভিজাত্য-গৌরবেরই পরিচয়।

কৃষ্ণনাথ ইহার উত্তরে লিখিলেন,—

"যামিনীবিরহদূনমানসস্ত্যক্তকুড্মলিতভূরিভূরুহঃ।
বিন্দুবিন্দুমকরন্দলোলুপঃ পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে ॥"

"সমস্ত রজনী কমলিনীর বিরহ-দুঃখে ব্যাকুল-হৃদয় ভ্রমর, প্রাতঃকালে অন্য কোনও মুকুলিত কুসুমতরুর প্রতি আসক্ত হয় না; সে তখন বিন্দু বিন্দু মকরন্দ-পানের লালসায় পদ্মিনীর সহবাসই কামনা করিয়া থাকে।"

কৃষ্ণনাথ এইবার শ্বশুরালয় হইতে জয়ন্তীকে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম দর্শনশাস্ত্রে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনুরূপ বিদুষী পত্নীর সাহচর্য্যে পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনাথ এতদিনে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি "অকিঞ্চন রূপলালসায় বহুমূল্য হীরকমালা হইতে বঞ্চিত ছিলেন।

মহাপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ, "আনন্দলতিকা" নামক চম্পূ ও "দেবীশতক" স্তোত্র প্রণয়ন করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, উভয় গ্রন্থেরই অনেক অংশ তাঁহার পত্নী জয়ন্তীর রচিত। কৃষ্ণনাথের পরিচয়-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে,—"আনন্দলতিকা গ্রন্থো যেনাকারি স্ত্রিয়া সহ।"

কিন্তু "আনন্দলতিকা" বা "দেবীশতকে"র কোন্ কোন্ কবিতা জয়ন্তীর রচিত, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে বৃদ্ধপরম্পরা-মুখে জয়ন্তীর রচিত বলিয়া কয়েকটী শ্লোক শ্রুতিগোচর হয়।

কিংবদন্তী এইরূপ, একদিন সায়ংকালে কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম "আনন্দলতিকা"র কবিতা প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিল, তখনও তাঁহার লেখনীর বিরাম নাই দেখিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "আহারাদি কিছুই হইল না, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি লিখিতেছেন?" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আজ নায়িকার বর্ণন প্রায় শেষ করিলাম।" জয়ন্তী হাসিয়া বলিলেন, "একটা

স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে এত সময় লাগে? এই দেখুন, আমি এক শ্লোকে নায়িকার কেমন অঙ্গ বর্ণন করিতেছি।" ইহা বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী লিখিলেন,—

"অহিরয়ং কলধৌতগিরিভ্রমাৎ
স্তনমগাৎ কিল নাভিহ্রদোত্থিতঃ।
ইতি নিবেদয়িতুং নয়নে হি যৎ
শ্রবণসীমনি কিং সমুপস্থিতে ॥"

"(এই রমণীর) নিবিড়-রোমশ্রেণীরূপ ভুজঙ্গ গভীর নাভিহ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া স্বর্ণশৈলভ্রমে স্তনযুগলকে আশ্রয় করিয়াছে। এই কথা জানাইবার জন্যই কি নয়নদ্বয় কর্ণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে ?"

একজন নারীর লেখনী হইতে এইরূপ রসভাবমধুর কবিতার সৃষ্টি, সামান্য প্রশংসার কথা নহে। কবিতাটী যেমন ভাবগম্ভীর, তেমনই প্রসাদসুন্দর। আজকাল অনেক কাব্যতীর্থ সাহিত্যাচার্য্যের আবির্ভাব হইতেছে সত্য, কিন্তু একটী শ্লোক রচনা করিতে হইলে তাঁহারা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়েন। কবিতা লিখিতে হইলে তাঁহারা প্রথমে "ছন্দোমঞ্জরী" বাহির করিয়া কাগজে গুরুলঘুর চিহ্ন অঙ্কিত করেন। পরে তাহার নীচে সাবধানে অঙ্গুলীপর্ব্বে গণনা করিয়া পদযোজনা করেন। এত করিয়াও হয়ত কোথাও ছন্দোভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা ব্যাকরণ-দোষ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের শ্লোকে অলঙ্কারের ত সম্বন্ধই থাকে না। দুই একজনের কবিতায় ব্যাকরণাশুদ্ধি বা ছন্দোদোষ না থাকিলেও তাহা এমন দুর্ব্বোধ যে, তাহার ভাবগ্রহ করা বৃহস্পতিরও অসাধ্য। সরল হইবে, অথচ অলঙ্কারের পারিপাট্য থাকিবে, তবেই ত কবিতা।

"তয়া কবিতয়া কিংবা কিংবা বনিতয়া তয়া।
পদবিন্যাসমাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ ॥"

অস্মদ্দেশীয় বৃদ্ধপরম্পরা-মুখে জয়ন্তীদেবীর রচিত বলিয়া "দেবীশতকে"র একটী শ্লোক প্রচলিত আছে। শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"ত্বদীয়সুষমাসমাশ্রয়বিশালভালস্থলে
বিমুক্তচিকুরাবলীসবিধশোভিসিন্দুরভা।
সমুল্লসতি কালিকে জলদখণ্ডপার্শ্বস্ফুর
ন্মহায়তনভস্তলোদিতনবারুণশ্রীরিব ॥"

"মা, তোমার প্রশস্ত ভালদেশে আলুলিত কুন্তলাবলীর সীমান্তঃস্থিত সিন্দুর-শোভা, বিশাল আকাশ-তলে নবীন মেঘখণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তিনী বালার্কশ্রীর ন্যায় কেমন ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে !"

এই জয়ন্তীদেবীকে একাধিক বঙ্গীয় গ্রন্থকার, "বৈজয়ন্তী" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অনমুসন্ধানের পরিচয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের মাতামহ-বংশে জয়ন্তীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। অদ্যাপি জয়ন্তীর বংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোটালিপাড়া বা ধানুকার প্রাচীন সম্প্রদায়, ইঁহাকে "জয়ন্তী" নামেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভিন্নদেশীয় গ্রন্থকার, সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া বিভিন্নসমাজের ব্যক্তিবিশেষ-সম্বন্ধে কিছু লিখিলে এইরূপ ভ্রম-প্রমাদ হওয়াই স্বাভাবিক। এই বিদুষী মহিলার নাম-সম্বন্ধে অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, "আনন্দলতিকা" চম্পূর শেষে স্বয়ং কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমই তাঁহার গ্রন্থের সহকারিণী পত্নীকে জয়ন্তীনামে উল্লেখ করিয়াছেন।—

"শাকে বেদমুনীষুচন্দ্রগণিতে (১৫৭৪) পক্ষে বলক্ষে মধৌ
শ্রীমদ্‌বন্দ্যাপদারবিন্দযুগলং শ্রীতর্কবাগীশ্বরম্‌।
নত্বা শ্রীযুর্ত কৃষ্ণনাথবটুনা কাব্যং ময়া কল্পিতং
সাহিত্যাদিকলাকলাপকুশলপত্নী জয়ন্ত্যা সমম্‌॥" *

একজন নবীন গ্রন্থকার কেবল নামের গণ্ডগোল করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আবার আরও একটু বাহাদুরী করিয়াছেন। "অত্রতুনোক্তং তত্রাপি নোক্তমিতি ন দ্বিরুক্তম্‌" এই গ্রন্থাংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কুমারিলভট্ট ও তচ্ছাত্র 'গুরু' নামে বিখ্যাত প্রভাকর-সম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে যে গল্প প্রচলিত আছে, উক্ত গ্রন্থকার কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌম ও তৎপত্নীকে সেই গল্পের নায়ক-নায়িকা সাজাইয়াছেন। †

যাঁহারা অনুসন্ধানের ক্লেশ স্বীকার না করিয়া এইরূপ "উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে" চাপাইয়া গ্রন্থকার সাজিয়া নাম জাহির করিতে চান, সত্যই তাঁহারা কৃপার পাত্র।

জয়ন্তীদেবী কোন্‌ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থরূপে জানিবার উপায় নাই। তবে "শাকে বেদমুনীযুচন্দ্রগণিতে" ইত্যাদি শ্লোকে ১৫৭৪ শকাব্দে "আনন্দলতিকা" চম্পূর রচনা-কাল কথিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ জয়ন্তীদেবী এই চম্পূরচনার ২০। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

---

* এই শ্লোকের অংশবিশেষ একটু বিকৃতভাবে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" (ব্রাহ্মণকাণ্ড—দ্বিতীয়ভাগে) উদ্ধৃত হইয়াছে।—

† "ভারতীয় বিদুষী" ২য় সংস্করণ ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আশা।

(১)

"ছিঃ! ছিঃ! কি করেন!"

লোকটা যুবক সুরেশচন্দ্রের কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহার নির্ম্মম করে রোরুদ্যমানা বালিকার কুসুম-কোমল হস্ত প্রতি মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া যাইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছিল। অপরিচিত সুরেশচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও পিশাচটা বালিকার গণ্ডে চপেটাঘাত করিল। বালিকা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র দেহলতাখানি সন্ধ্যাসমীরকম্পিত দোলন চাঁপার মত দুলিতেছিল।

ক্রুদ্ধ সুরেশচন্দ্র এবার সবলে লোকটার হাত ধরিয়া টানিল। বালিকার কোমল হস্ত এবার মুক্ত হইল। ভয়বিহ্বলা আশা দুই হস্তে সুরেশচন্দ্রের কটি-দেশ জড়াইয়া ধরিয়া একটু শান্তি পাইল। সে তাহার অশ্রুধৌত বড় বড় চক্ষু তুলিয়া আগন্তুকের রোষদীপ্ত বদনমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিল। সুরেশচন্দ্র মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—'ভয় নাই খুকি'।

সে মুখের দেবভাব জনমদুঃখিনী আশার হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীর রেখা-সম্পাত করিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া অবাধে ঐ পিশাচটা তাহাকে নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছিল। আজ প্রথম সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেই করুণহৃদয় অপরিচিত যুবক হস্তোত্তোলন করিল। আশার ক্ষুদ্র জীবনে সে দিনটা নূতন যুগ-প্রবর্ত্তক বলিয়া বোধ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

যুবক মতিলালও বিস্মিত হইয়াছিল; ক্রোধে, ক্ষোভে, অবমানে তাহার প্রতি লোমকূপের ভিতর দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। তাহার ছোট ছোট গোলাকার চক্ষু দুইটী তাহাদের গভীর কোটরাবাস ছাড়িয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া যখন মতিলাল দেখিল ছোট খাট ভিড়ের প্রত্যেক লোকের মুখে যেন সুরেশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অঙ্কিত রহিয়াছে, তখন তাহার ক্রোধ বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। লাঞ্ছিত মতিলাল কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"কে হে তুমি! ছাড়।"

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল—"আমি মানুষ। তোমার মত জানোয়ার নই। খুকির গায়ে আবার হাত দাও, দেখ্‌বে আমি কে?"

সুরেশের স্বরে উত্তেজনার ভাব ছিল না। আশা অনিমেষলোচনে তাহার

মুখের দিকে চাহিয়া ফুঁফাইতেছিল। তাহার কথা শুনিয়া জনতার মধ্যে সকল লোক হাসিয়া উঠিল। ক্রোধোন্মত্ত মতিলাল আশাকে মারিবার জন্য পদোত্তোলন করিল। চকিতে কি হইল কেহ বুঝিতে পারিল না। সুরেশচন্দ্র শূন্য হইতে পা নামাইল। মতিলাল দুই হাত দূরে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া বধোদ্যত শূকরের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। বালিকাকে বাম হস্তে কক্ষে তুলিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া সুরেশচন্দ্র বলিল—"ভয় নাই"। আশা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। বালিকার কোমল ওষ্ঠের উপর বৈশাখের চপলার মত সান্ত্বনার ম্লান হাসি ক্ষণিকের জন্য খেলিয়া গেল।

সুরেশ বলিল—"তোমার বাড়ি কোন্‌টা ?"

বালিকা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাস্তার দক্ষিণ দিকের বাটীটি দেখাইয়া দিল। তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সুরেশ সেই দিকে চলিল।

বাটীর দ্বারদেশে পৌঁছিয়া সুরেশ দেখিল, একটা ছোট খাট দল তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসিতেছে। প্রথমেই আলুথালু বেশে একটি চশমাবরিত চক্ষু ভদ্রলোক। তাহার পশ্চাতে একটা বর্ষীয়সী দাসী কর্কশস্বরে তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—'বাবু, এই যে চোর বেটা! ও মাগো কি হ'বে গো! মামা বাবুকে খুন ক'রে আশিকে নিয়ে পালাচ্চে—ও মা গো!'—

ভদ্রলোকটী তাহাকে থামাইতে চেষ্টা করিয়া বিস্মিতনেত্রে সুরেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। ঠিক তাঁহার পার্শ্বে একটা হিন্দুস্থানী চাপরাসী পথের ধূলামাখা মতিলালের দিকে চাহিয়া সম্পূর্ণরূপে হাসি চাপিতে চেষ্টা করিতেছিল। ভদ্রলোকটীকে দেখিয়া আশার আবার ক্রন্দনের স্রোত বহিল। সে বলিল—"বাবা গো কোন দোষ নাই"।

দাসীটা ভ্রুকুটি করিয়া বলিল—"কোনো দোষ নেই। মরণ আর কি!"

এবার আশার পিতা রোষকষায়িতনেত্রে দাসীর দিকে চাহিলেন। সুবিধা পাইয়া চাপরাসীটা বলিল—"আরে চুপ রহ মাগী।"

"কেন চুপ করব্ কেন? আজই চ'লে যাব। কেবল মার জন্যে আছি। আমার কিসের"—

চাপরাসী বলিল—"চুপ্।"

স্ত্রীলোকটা ক্ষান্ত হইল। মতিলাল আসিয়া আশার পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইল। দাসীটা চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাগার গাত্রের ধূলি মুছিতেছিল।

সুরেশচন্দ্র বলিল—"মহাশয় কি খুকির পিতা?"

ভদ্রলোক সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

সুরেশ একটু হাসিয়া বলিল—"বেশ সুখে থাকেন দেখ্‌ছি। এমন সোণার মেয়ের গায়ে ঐ পশুটা হাত তোলে—একটা কর্কশ দাসী আপনার উপর প্রভুত্ব করে, আর"—

ভদ্রলোক সুরেশচন্দ্রের পশ্চাতের জনতার মুখে যদি প্রসন্নতার চিহ্ন না দেখিতেন, তাহা হইলে অপরিচিত যুবকের বিদ্রূপবাণীগুলির কি ফল হইত বলা সুকঠিন। যুবকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব আসিয়া তাহার হৃদয়ের উপর আধিপত্য লাভ করিবার একটুও চেষ্টা করে নাই, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু সেই পাড়াগাঁয়ের সাধারণ লোকগুলার সম্মুখে একটা পঞ্চদশবর্ষীয় আগন্তুকের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার যে মর্য্যাদাহানি হইতেছিল সেই কথাটাই অধিক উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তিনি একটু রূঢ়স্বরে বলিলেন—"কে হে তুমি ছোকরা! কা'র সঙ্গে কথা ক'চ্চ জান?"

সুরেশ একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল—"অনেকটা বুঝেছি।"

আশা এতক্ষণ সুরেশের বক্ষে ছিল। এবার সে নামিয়া পিতার হাত ধরিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিল। পিতা সে মায়া-বালিকার চক্ষের অনির্ব্বচনীয় কটাক্ষের অর্থ বুঝিল। তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল। তাহার উপকারীর উপর পিতার শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন—"ছিঃ, তুমি বালক—অথচ বেশ ভদ্রঘরের ছেলে দেখছি—এস আমার ঘরে এস।"

সুরেশ নমস্কার করিয়া বলিল—"মাপ করবেন। একটা অনুরোধ, অমন সোণার পুতুলের গায়ে কা'কেও হাত দিতে দেবেন না। আমার যদি অমন বোন থাকত"—

আশা পিতার পশ্চাতে পলাইয়া গিয়াছিল। সুরেশ চলিয়া গেল। সে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল—তাহার কর্ণে স্বপ্নশ্রুত বীণার ঝঙ্কারের শেষ তানের প্রতিধ্বনির মত বাজিতে লাগিল—"আমার যদি অমন বোন্ থাকত—বোন থাকত—থাকত—"

(২)

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সুরেশ জানিয়াছিল আশার পিতা জলধর বাবু স্থানীয় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট। আশা তাঁহার প্রথম পক্ষের মৃতা স্ত্রীর কন্যা। মতিলাল তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যারত্নের পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতা। মতিলাল নামমাত্র

স্থানীয় বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। সুরেশচন্দ্র কলিকাতা হইতে বেড়াইবার জন্য সে স্থলে আসিয়াছিল মাত্র। সে কলিকাতায় অধ্যয়ন করিত।

একদিনের, এক মুহূর্ত্তের ঘটনা মনুষ্য-জীবনের কিরূপভাবে স্রোত ফিরাইতে পারে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? এই ঘটনাটি বর্ণনা করিতে যতটা সময় লাগিল তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু সে স্বল্পক্ষণব্যাপী ঘটনার ফল তিন চারিটি জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। সেই দিন অবধি আশার উপর মতিলালের বিদ্বেষ ভাব শত গুণ বর্দ্ধিত হইলেও সে তাহার গাত্রস্পর্শ করে নাই। আশার বিমাতার বাক্য-যাতনায় দুর্ব্বলচিত্ত জলধর অন্তরে অন্তরে তাহার মাতৃহীন কন্যাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতে শিখিয়াছিল। সামান্য কারণে যখন তাহার স্ত্রী কন্যার প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ করিত তখন সে তাহার হৃদয়ে বৃশ্চিকদংশনের যাতনা অনুভব করিত। দুই একবার কন্যার পক্ষ সমর্থন করিয়া সে আপন স্ত্রীকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ভার্য্যার পৌরুষ বাক্যস্রোতের মুখে পড়িয়া বেচারা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল।

আর আশা? পূর্ব্বে যখন সে একাকিনী পুকুর ধারে বসিয়া আকাশপানে তাকাইয়া দেখিত একখানা মেঘ অপর মেঘখণ্ডকে তাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে, প্রভাতে যে দিকে আম গাছে বসিয়া বকগুলা পুকুরের দিকে তাকাইয়া থাকিত, যখন সে সেই দিকের আকাশের সিঁদুরের নদীর ক্রমবর্দ্ধিত প্রশস্ততা লক্ষ্য করিত, সেই দিক হইতে সোণার থালের মত বালারুণকে লাফাইয়া উঠিতে দেখিত, তখন সে মনে মনে ঠিক করিয়া লইত যে সেই আকাশের উপর তাহার জননী বসিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করেন। তাহার বিমাতা বা তদীয় কাপুরুষ ভ্রাতা যখন তাহার উপর অত্যাচার করিত তখন তাহার বড় বিস্ময় বাড়িত— তাহার মাতা উপর হইতে তাহাদের উপর খানিকটা দুপুর বেলার ঝলসানো রৌদ্রতাপ ফেলিয়া দেন না কেন? কিন্তু সেই দিন হইতে আশা একেলা বসিয়া কেবল সেই মাতার স্বপনের মত মুখখানা মনে করিত না। সেই আগন্তুকের নবযৌবনোৎসাহ স্ফুরিত বীরত্বব্যঞ্জক অথচ কোমল মুখখানা অহঃরহ তাহার শিশু কল্পনার মধ্যে বিরাজ করিত। বিমাতা বকিলেই সে অপেক্ষা করিয়া থাকিত কতক্ষণে সেই বীরপুরুষ আসিয়া বিমাতাকে ভৎর্সনা করিবে। তাহার জননীর বাসস্থানের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবার সময় সে লতা পাতার শব্দ

পাইলে পশ্চাতে দেখিত যদি তিনি আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লন। কিন্তু আশা জনমদুঃখিনী, তাহার মাতার মত তিনিও নিষ্ঠুর, তিনি তো তাহাকে ভগ্নী বলিয়া দাবী করিতে আসিলেন না।

প্রায় সে ঘটনার ছয়মাস পরে আশা একদিন কাঁদিতেছিল। বালিসে মুখ লুকাইয়া মাথার এলো চুলগুলা বালিসের উপর দিয়া সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া আশা কাঁদিতেছিল। আশা বালিসের অন্ধকারের ভিতর দেখিতেছিল সেই তাঁহার মুখ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি হাসিমুখে বলিতেছেন—'খুকি ভয় নাই।' আশার কোনও দোষ ছিল না, আশার বিমাতা কেন তাহাকে অমন রূঢ় কথা বলিয়া ভৎর্সনা করিল আশা তাহা বুঝিল না। সেই পিশাচ মতিলালই বা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল কেন? আশা ভাবিল, তিনি যদি কাছে থাকিতেন, আমি যদি তাঁর বোন হ'তাম, আমার মত যদি তাঁর বোন থাকিত—

সহসা কে আশার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। আশায় বালিকা-হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি আশা উঠিল। তাহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ চুলরাশি তাহার ক্রন্দনসিক্ত সোণার কমলসদৃশ মুখমণ্ডলে পড়িয়া তাহাকে দেবশিশুর মত দেখিতে হইয়াছিল। কর্ম্মস্থল হইতে প্রত্যাগত পিতা সে মুখে স্নেহময়ী স্বর্গীয়া পত্নীর পবিত্র আননের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। তিনি কন্যাকে কোলে তুলিয়া বলিলেন—"আশা! মা আমার! কি হ'য়েছে মা?"

হতভাগিনী আশা গলিয়া গেল। বাত্যাহত চম্পকদামের মত আশা কাঁদিতে লাগিল। পিতা বুঝিল। তাঁহার দুর্ব্বলতা ক্ষণিকের জন্য অপসারিত হইল। দেশের হাকিম এতদিনের পর গৃহে বিচার করিলেন। আশার আনন্দের সীমা রহিল না। আশা বারম্বার সেই অপরিচিত যুবককে স্মরণ করিল—"তিনি পিতার গুরু, তাঁহার বীরত্ব হইতে পিতা সাহস পাইয়াছিলেন। তিনি কে? তাঁহার নাম কি? তাঁহার যদি বোন থাকিত—আমি যদি তাঁহার বোন হইতাম!"

একদিন পিতাকে আশা জিজ্ঞাসা করিল—'বাবা তিনি কে?'

"কে মা?"

'বাবা তিনি! যিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন?'

পিতা বলিলেন—'তিনি ভদ্রলোকের ছেলে। কে তা' ত' জানিনি মা!"

আশা এ উত্তরে সুখী হইল না। সে বলিল—"বাবা ভদ্রলোকের ছেলের নাম কি?"

অর্চ্চনা,
১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
ফাল্গুন, ১৩১৯।



স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কোতে হিন্দু-মন্দির

The Fine Art Printing Syndicate, Calcutta.

'দুর পাগল, সে অচেনা। তার নাম কি ক'রে জানব? কেন মা, তার খোঁজ করচ কেন?"

কুহকিনী পিতার গলা জড়াইয়া বলিল—"বাবা, তুমি আমায় আদর করচ ব'লে বড় সুখ হ'চ্চে। তিনি দেখলে তোমার উপর খুব খুসী হ'তেন।"

হা অদৃষ্ট! হাকিম ভাবিলেন—'ঠিক হয়েছে! আজ নিজের কন্যাকে আদর করছি পরে দেখলে খুসী হবে! মোহে প'ড়ে মানুষ বানর হয়। কি মোহে অমন স্ত্রীর স্নেহ ভুলে আবার বিবাহ করেছিলাম!'

আশার জননীর মুখপদ্মটি জলধরের হৃদয়-সরসীতে ফুটিয়া উঠিল। সে পদ্মপত্রে তাহার চক্ষু স্খলিত দুই ফোঁটা অশ্রুবারি বহুমূল্য মুক্তার মত টলমল করিতে লাগিল।

(৩)

আশা এখন ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরী। তাহার মুখের সেই ম্লান ভাবটি বেশ ফুটিয়া উঠিয়া তুলনায় তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্যকে বড়ই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ আশার বিবাহ। কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাটীতে বসিয়া এই আনন্দের দিনে আশা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের সেই দিনের কথা ভাবিতেছিল। এ পাঁচ বৎসর আরও দুইটি দেশে আশা পিতার সহিত ঘুরিয়াছে তবু সে মুখ আশাকে পরিত্যাগ করে নাই। অনেক অন্বেষণ করিয়া জলধর বাবু সম্ভ্রান্ত ঘরের এম্-এ পাশ করা পাত্র ঠিক করিয়াছিলেন। আশা ভাবিতেছিল তিনিও বোধ হয় এম্-এ পাশ করিয়াছেন। আজকের এ শুভদিনেও যদি একবার তিনি আসেন, আশার ভাল পাত্রের সহিত বিবাহ হইতেছে শুনিলে তিনি নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।

বৈকালে আশার একটু তন্দ্রা আসিল। তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল তাহার পিতার স্বর। পিতা বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন—"আর হিংসে ক'রনা। এবার মেয়ে বিদেয় হ'বে।"

তাহার বিমাতা রুক্ষ কর্কশস্বরে বলিল—"আমি হিংসে করলে তোমার মেয়ে আর আজ বেঁচে থাকতো না। আমার নিজের একটা ছেলেমেয়ে নেই যে আমি হিংসা করব। তবে যা' ন্যায্য তা' বলব।"

তাহার পিতা বলিল—কেন শুভদিনে ঝগড়া করছো।

আশার বিমাতার সুর সপ্তমে চড়িল। তাহার সহিত ক্রন্দনের রোল উঠিল। দুই একজন আমন্ত্রিত কুটুম্বিনীও সেস্থলে আসিয়া জুটিল। গৃহিণী

মরণ কামনা করিলেন, কর্ত্তা মরণ কামনা করিলেন। শেষে একটা রফা রফিয়ত হইল।

কিন্তু এ ঘটনায় আশা বড় ব্যথিত হইল। আজ তাহার বিবাহের দিনেও শান্তি নাই। বোধ হয় পিতা তাহাকে আদর করিবার পূর্ব্বে শান্তিতে ছিলেন। তাহার কি দুর্ভাগ্য, তাহার সংশ্রবে যে আসে তাহাকেই অশান্তি ভোগ করিতে হয়! তাই আশা আবার উপাধানে মুখ লুকাইয়া তাহার জীবনের সাথী অশ্রু-স্রোতের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

বিবাহের শুভদৃষ্টির সময় কিন্তু আশার হৃদয় এক নূতন উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিল। কে যেন তাহার কর্ণকুহরে বলিয়া দিল—আজিকার ক্রন্দন তোমার শেষ ক্রন্দন। আর তোমায় কাঁদিতে হইবে না। কিন্তু আশা নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

(৪)

শ্বশুরগৃহের আদর যত্ন আশার জীবনে একটা নূতন ব্যাপার হইলেও আশা দুই দিন বিষম সন্দেহে থাকিয়া সে সকল কিছু উপলব্ধি করিতে পারিল না।

নববধূর রূপলাবণ্যের সুখ্যাতিগুলা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিল না। সে নির্লজ্জার মত ফুলশয্যার রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। আর সে তাহার ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিল—ভগবন্ নারায়ণ এটা যেন ভ্রম না হয়। যদি ভ্রম করিয়া থাকি তা'হলে চরণে আশ্রয় দিও। এ পৃথিবীতে হতভাগিনী আশার স্থান নাই।

ফুলবাসরের ফুলের গন্ধগুলা আশার প্রাণে শান্তি দান করিতে পারিল না। সে স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল কতক্ষণে গৃহে স্বামী প্রবেশ করিবেন।

স্বামী গৃহে প্রবেশ করিল। আশা নির্নিমেষ লোচনে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। যে মুখ সে পাঁচ বৎসর ধ্যান করিয়াছে তাহা চিনিতে কি ভুল হইতে পারে? সে মুখ একটু গুম্ফশোভিত হইয়াছে, আরও উজ্জ্বল হইয়াছে, চোখের তেজস্বিতা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অভাগিনী আশার হৃদয়ে এতটা সুখ হইতে পারে সে তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবিতে পারে নাই। তিনি আবার দেখা দিয়াছেন, তিনি স্বামী হইয়াছেন, চিরদিন তাঁহার আশ্রয়ে শান্তিতে থাকিতে পাইবে? না না, তাহা হইতে পারে না। ফুলবাসরের কুসুমগুলায় এবার আশা পারিজাতের সুরভি পাইল। গৃহের ক্ষীণ দীপালোকে শত সূর্য্যের

আভা কেন্দ্রীভূত হইল। সুরেশচন্দ্রের চক্ষের সহিত তাহার চক্ষু মিলিত হইলে আশার লজ্জা হইল। সে উপাধানে মুখ লুকাইল।

তাহার বিবাহের রাত্রে জলধর বাবুকে দেখিয়া সুরেশচন্দ্র চিনিতে পারিয়াছিল। তাহার সহিত সেই মাতৃহীনা বালিকাটির বিবাহ হইতেছে তাহা সে বুঝিয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময় সে আশাকে চিনিল, আশা তাহাকে চিনিয়া নিজের সৌভাগ্যের কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে শয্যার নিকট গিয়া সস্নেহে সুরেশচন্দ্র আশাকে জিজ্ঞাসা করিল —"আশা! খুকি! চিনিতে পার?"

আশার হৃদয়ে ভাব-সমুদ্র থাকিলেও তাহার মুখে কথা বাহির হইল না।

সে একটি ছোটখাট ঘাড় নাড়িয়া সুরেশচন্দ্রের কথার উত্তর দিল।

সুরেশ তাহার কম্প্র অধরে প্রণয়ের প্রথম চুম্বন রোপণ করিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কোম্পানীর আমলে প্রথম টেলিগ্রাফের কথা।

বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত, টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেহ তাহা কল্পনায় বা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সৌদামিনী ঠাকুরাণী, বিজ্ঞানের প্রবল শক্তির অধীনা হইয়া, নানা উপায়ে তাহার দাসীবৃত্তি করিতেছেন। এখন টেলিগ্রাফ সহায়তায়, সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতের অতি নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। সুদূর মার্কিন মুল্যুক হইতে ৫।৬ ঘণ্টায় সংবাদ আসে যায়। বিলাত হইতে ৩।৪ ঘণ্টায় সংবাদের আদান-প্রদান চলে। যদি "ট্রান্‌জিট্" আফিসের হাঙ্গাম্ বেশী না হয়, তাহা হইলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ৫ মিনিটের মধ্যে সংবাদের আদান-প্রদান চলে। দিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সহিত বিলাতের কর্ত্তাদের বহুবার সংবাদের আদান প্রদান হয়। মৃত্যুর সংবাদ, আনন্দের সংবাদ, ব্যবসার সংবাদ, বিবাহের সংবাদ সবই এই টেলিগ্রাফের সহায়তায় চলিতেছে। সমগ্র ভারতে আজকাল প্রতিদিন লক্ষাধিক টেলিগ্রামের আদান-প্রদান হয়। টেলিগ্রাফ না হইলে রেল চলে না,

ব্যবসা চলে না, তেজীমন্দী চলে না, ডার্বির খবর পাওয়া যায় না। তাহার উপর খরচা কমিয়া যাওয়ায় টেলিগ্রাম দ্বারা জরুরি চিঠির কাজও হইতেছে।

যাহার শুভফল জনসাধারণে অবাধে ভোগ করিতেছেন, যাহা আজকাল-কার সর্ব্বজন-বিদিত ব্যাপার, তাহার আর বেশী পরিচয় কি দিব? কিন্তু কোন্ দিন, কি প্রকারে এদেশে প্রথম টেলিগ্রাফ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়, এক্ষেত্রে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব।

১৮০২ সালের ২৯ এপ্রেলের—অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের ৪৭ বৎসর পরে, আমরা তৎকালীন প্রাচীন কলিকাতা গেজেটে মুদ্রিত একটী বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারি—সেই সময়ে এদেশে, টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ হয়। এই সময়ে বিলাতে তড়িত-শক্তি (Galvanism) সম্বন্ধে পরীক্ষা অনেকটা ব্যবহারিক পথে অগ্রসর হইয়াছিল। তৎকালীন ভারতের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও, বিলাতের পণ্ডিতদের গবেষণাপ্রসূত বৈজ্ঞানিক তথ্যের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে এদেশে ডাক্তার ডিন উইনডি নামক একজন তড়িৎ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। কি করিয়া 'ব্যাটারি' প্রস্তুত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে তিনি এদেশে প্রথম গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। উক্ত সনের কলিকাতা গেজেটে তিনি এক অদ্ভুত উপায়ে তড়িৎ শক্তিবিকাশের পন্থা প্রদর্শন করেন। তিনি লিখিতেছেন—"২০টি সিক্কা টাকা বা আমেরিকান ডলার লও। এই হিসাবে টাকার বা ডলারের আকারে কাটিয়া ২০খানি দস্তার পাত প্রস্তুত কর। এক খণ্ড রৌপ্য মুদ্রা—তাহার উপর এক খণ্ড দস্তা—উপরি উপরি সাজাইয়া যাও। রৌপ্য খণ্ডের উপর, গোল করিয়া কাটিয়া, জলে ভিজাইয়া, এক খণ্ড ফ্লানেল বা বনাত বসাও। যদি সামুদ্রিক লবণের জল, বা স্যাল্ এমোনিয়া দ্বারা বনাত বা ফ্লানেল খণ্ডগুলি ভিজান হয়, তাহা হইলে আরও ভাল ফল হইতে পারে।"

"একদিকে টাকা ও তাহার উপর দস্তার চাকৃতি বসাইয়া, একটী অতি ক্ষুদ্র স্তূপ প্রস্তুত কর। অপর দিকে একটী টাকা, তাহার উপর এক খণ্ড ভিজা বনাত—তার পর দস্তার পাত, ও দস্তার পাতের উপর এক খণ্ড ভিজা বনাত, এই ভাবে সাজাইয়া যাও। এইরূপে দুইটি ক্ষুদ্র স্তূপ প্রস্তুত হইবে। এই দুইটি স্তূপের সহিত দুইটি ধাতুর তার লাগাইয়া দাও। এই স্তূপ সংলগ্ন ধাতুর তারের অপরাংশ মুখের মধ্যে পুরিলে একটা বৈদ্যুতিক কম্পন বা "শক্"

উপলব্ধি হইবে।” ইহাই ডাক্তার ডিন উইনডির প্রথম ব্যাটারি। ইহাই ভারতে বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়া-বিকাশের প্রথম পরীক্ষা।

জেমস ডিন্ উইনডি, এল্, এল, ডি, উপাধিধারী ছিলেন। বিলাতে ডম্‌ফ্রিজ্ নামক স্থানের গণিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। এক সময়ে তৎকালীন চীন সম্রাটকে, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র উপহার দিবার কল্পনা হয়। তৎকালীন বৈদেশিক মন্ত্রী,লর্ড ম্যাকারটিনি এই ডিনউইনডিকে উক্ত যন্ত্রাদির ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য চীনের সম্রাটের নিকট প্রেরিত, দৌত্যাভিযানের দলভুক্ত করিয়া দেন। চীন সম্রাটের সহিত কার্য্য শেষ করিয়া ডিন্‌উইন্‌ডি এদেশে আসেন। তখন মার্ক্‌ইস অব ওয়েলেসলি বাহাদুর, এদেশের গভর্ণর জেনারেল। তিনি ডাক্তার ডিন্‌উইনডির গুণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সেই সময়ে নব প্রতিষ্ঠিত “ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে”র উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপক রূপে নিয়োগ করেন।

ধরিতে গেলে, ডাক্তার ডিন্‌উইনডিই এদেশে টেলিগ্রাফ প্রথার মূল সূত্র প্রচার করেন। তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া বিলাতে চলিয়া গেলে—১৮২৭ খৃঃ অব্দে এ সম্বন্ধে পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ হয়। কাপ্তেন ওয়েষ্টন নামক একজন রাজকর্ম্মচারী, এই সময়ে সেমাফরিক (Semaphoric) ব্যবস্থায়, সংবাদাদি আদান-প্রদানের চেষ্টা করেন। কলিকাতা ও সাগরসঙ্গমে, প্রথম “সেমাফরিক টাউয়ার” বা স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ওয়েষ্টন সাহেবের মৃত্যুর সহিত ঘটনাটা কিছুকাল চাপা পড়ে।

ইহার তিন বৎসর পরে, কলিকাতা ও কেডিগিরির মধ্যে তেরটী ইটের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা হয়। কাউখালি বাতিঘর হইতে আরম্ভ হইয়া, কলিকাতা সহরের এক্‌শ্চেঞ্জ গৃহ পর্য্যন্ত, এই বিস্তৃত বিভাগের মধ্যে অতি দূরে দূরে এই ইষ্টক স্তম্ভগুলি * স্থাপিত হইয়াছিল।

১৮৩১ খৃঃ অব্দের ২১ জুন, ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিবসেই ডায়মণ্ডহারবার হইতে, প্রথম টেলিগ্রাফ সংবাদ আসে।

সেকালে নিশানের দ্বারাই এই টেলিগ্রাফ সঙ্কেত চালাচালি হইত। পাঠক মনে রাখিবেন, তখন এদেশে বর্ত্তমান ইলেক্‌ট্রীক্ টেলিগ্রাফের কোন কিছুই ছিল না। ইলেক্‌ট্রীক্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই সেমাফরিক প্রথা

* আজও ডায়মণ্ডহারবার রোডের নিকটস্থ জলাভূমির পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামে, এই সকল ইষ্টক-স্তম্ভের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ লেখক, ঠাকুরপুকুর হইতে, আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী বাদা ভূমির মধ্যে একস্থানে এইরূপ একটী স্তম্ভ দেখিয়াছিলেন।

উঠিয়া যায়। কিন্তু এখনও এ সেমাফরিক প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ হয় নাই। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহে, সমুদ্রগামী জাহাজগুলির মধ্যে, এই সেমাফরিকের ব্যবস্থা আজও প্রচলিত। স্থলে না থাকিলে—বিশাল সমুদ্র বক্ষে ইহার বড়ই প্রয়োজন।

এই প্রাচীন প্রথা অনুসারে,যখন টেলিগ্রাফ চলিত, তখন সিগ্‌নালারদের বড় সুখের দিন ছিল। দিক্‌বলয় কুজ্ঝটিকা সমাকুল হইলে, এ নিশানের সঙ্কেত দেখা যাইত না, কাজেই কাজ বন্ধ থাকিত। রাত্রে সিগ্‌নালারদের কোন কাজই ছিল না। তাহারা স্বচ্ছন্দে ঘুমাইয়া বাঁচিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সিগ্‌নালার-দের পালাক্রমে সমস্ত রাত্রি কাজ করিতে হয়।

১৮৩২ খৃঃ অব্দে বোধ হয় এই প্রাচীন প্রথার অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়। কারণ ঐ বৎসরের কাগজ পত্র হইতে জানা যায় "আকাশের ও আবহাওয়ার অবস্থা ভাল থাকিলে, এই সময়ে আট মিনিটে চারিশত মাইল পর্য্যন্ত খবর পাঠান যাইতে পারে।" কিন্তু বর্ত্তমান কালে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এখন কলিকাতা আপিস হইতে, যদি লাইন ফাঁক থাকে তাহা হইলে, করাচী, বোম্বে, শিলং, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে পাঁচ মিনিটে সংবাদের আদান-প্রদান হয়, উক্ত বত্রিশ সালে কলিকাতা হইতে, পাঁচশত মাইল দূরবর্ত্তী চুণারে প্রথম তারের সংবাদ যায়।

ইলেকট্রীক্ টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠার প্রথম চেষ্টা ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে দেখা যায়। এই সময়ে ডাক্তার ডব্লু, বি, ওসাগ্‌নসী নামক একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, ইলেকট্রীক্ দ্বারা চালিত টেলিগ্রাফ্ সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত পরীক্ষার ভার এই ওসাগ্‌নসী সাহেবকেই প্রদান করেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে প্রথম টেলি-গ্রাফ স্থাপিত হয়। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে, কাঠের পোষ্ট ও তার খাটান হয়।

১৮৫১ খৃঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর মাসে, সাধারণের জন্য তারের সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা হইতে কেডিগিরি পর্য্যন্ত ৭০ মাইল পথে টেলিগ্রাফের তার খাটান হইয়াছিল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দের পরই, পুরাতন "সেমাফরিক" প্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন হয়। ইহার পর হইতেই, দিন রাত সমান ভাবে কাজ চলিতে থাকে।

ডাক্তার ওসাগ্‌নসীর তদন্ত শেষ হইলে, ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে,

গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিম প্রদেশে টেলিগ্রাফ লাইন খুলিবার চেষ্টা করেন। পাঁচমাসের পর অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে আগরা পর্য্যন্ত প্রথম লাইন খোলা হয়।

ইহা গেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের টেলিগ্রাফের কথা। এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে, টেলিগ্রাফের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। এই ভারতবর্ষে, নানাস্থানে প্রায় তিনহাজার ছোট বড় টেলিগ্রাফ স্থাপিত হইয়াছে। বিলাত, আমেরিকা, জার্ম্মণী, ফ্রান্স, চীন, জাপান, সিংহল, রুষিয়া প্রভৃতি সকল দেশের সহিত ভারতের টেলিগ্রাফিক সম্বন্ধ অতি নিকটবর্ত্তী। কলিকাতার আফিসে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে ঐ সমস্ত সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদের আদান-প্রদান হইতে পারে।

টেলিগ্রাফ দ্বারা মানব সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে এবং ইহাই তড়িৎ বিজ্ঞানের উন্নতির চরম ফল।

কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক, স্বপ্নেও যাহা ভাবেন নাই, যে বন-জঙ্গল সমাচ্ছন্ন বাদাভূমি পূর্ণ সুতানুটী ও গোবিন্দপুরে তিনি কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ যেন ঐন্দ্রজালিকের অপূর্ব্ব মায়াবলে, তাহা সৌদামিনীর লীলাক্ষেত্র রূপে পরিণত হইয়াছে।

সকল ঘটনারই একটা না একটা ইতিহাস আছে, টেলিগ্রাফের থাকিবে না কেন? কাজেই ভারতে প্রথম টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমরা যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা "অর্চ্চনা"র পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

মলিনা।

ব্যারিষ্টার বোস কিছু কর্কশ-স্বরে বলিয়া উঠিল, "সেটার কথা আর আমার কাছে বলিও না! সে অত্যন্ত ষ্টুপিড্। নইলে পরের জন্য আপনাকে চোর প্রমাণ করিয়ে জেল খাট্‌তে যায়! তাকে বাঁচাবার জন্য কি কম চেষ্টা, কম বক্তৃতা করেছি।"

ব্যারিষ্টারের মাতা বলিলেন, "তোর না সে বাল্য-বন্ধু ছিল? তাকে

ভুল্‌তে চাস! আহা সে আমাকে মা বোল্‌ত! তোর মতন তাকেও আমি ভাল-বাস্‌তাম।" বৃদ্ধার চোখ দিয়া জল পড়িল।

বোস বলিল "সে কি মা, তুমি তার জন্য কাঁদছ! সে তো এখন চোর, জেলের কয়েদী। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! তার জন্য আবার দুঃখ কিসের!"

বৃদ্ধা দারুণ বিরক্তির সহিত মুখ ফিরাইলেন। ক্ষণপরে বেশ স্থির অথচ তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "বিলেত গিয়েছিলি—ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছিস্—দুঃখের বিষয়, মানুষ হয়ে আসিস্ নি'। যে কোমলতা, যে মাধুর্য্য তোর প্রাণে ছিল, বিলেত গিয়ে কি সে সকল বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিস্! ছি ছি ছি! সে যে তোকে কি ভাল বাস্‌ত—তাকি তোর মনে পড়ে না! সে তার নিজের ভাল ভাল কবিতাগুলি তোর নামে কাগজে প্রকাশ কোর্‌ত। কিছু বললে—বোল্‌ত, ও ব্যারিষ্টার হয়েছে, ওর নামটা সাহিত্য-জগতেও প্রচার কোর্‌ব! আর তুই কি না তার নাম কোর্‌তে চাস্ না!"

বোস ভ্রুকুটীর সহিত বলিল, "আঃ ভারি স্বার্থত্যাগ! এই যে তিন চারখান নাটক লিখে থিয়েটারে চালালে, কই একখানা আমার নামে দিতে পেরেছিল? অবশ্য আমিও চাই না—তবে, তার ভালবাসার কথা বোলছ তাই! নইলে চেষ্টা কোরলে আমিও অমন লেখা ঢের লিখ্‌তে পারি।"

বৃদ্ধা রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর্! অমন কথা মুখে আনিস্ না। তার কবিত্ব-শক্তি তুই সারা জীবন সাধনা কোরলেও পাবি না।"

মাতার নিকট হইতে এমন কঠিন আঘাত সে অদ্যাবধি কখনও পায় নাই। সে যে সকল বিষয়েই কৃতবিদ্য এই ধারণাটা তাহার বিলক্ষণই ছিল। তাহার গর্ব্বিত বয়সের গর্ব্বভরা প্রাণে এমন আঘাত অন্য কেহ দিলে, সে হয় তো তাহা উপেক্ষার হাসি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত; কিন্তু, সে তাহার মাতার এক মাত্র সন্তান হইয়াও যে মাতার নিকট হইতেই—এমন একটা নির্ম্মম সত্যের কঠিন তাড়নায় একেবারে মূক ও স্তব্ধ হইয়া যাইবে, ইহা সে কোনো দিন কল্পনায়ও করিতে পারে নাই। অভিমানে ও রোষে তাহার কাণ লাল হইয়া উঠিল। মাতার কথার উত্তর দিবার তখন তাহার আর সামর্থ্যও ছিল না। সে বার দুই ইতস্ততঃ করিয়া অধর দংশন করিতে করিতে দ্রুতপদে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল।

(২)

ব্যারিষ্টার বোসের জননী যখন তাঁহার প্রতিবেশিনীর সুনিশ্চয় উক্তির খণ্ডন করিয়া বেশ জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন যে "বড়াল-কবির সহিত আমার

বিশেষ আলাপ আছে; আমি উত্তম রূপেই জানি বড়াল-কবির স্ত্রীর নাম "এষা" নহে—'এষা'র অর্থ 'অন্বেষণ'।" সেই সময় সহসা মলিনা আসিয়া সেথায় উপস্থিত হইল। মলিনার শুষ্ক মুখ ও রুক্ষ কেশ দেখিয়া বোস্-জননীর মুখ কিছু গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিবেশিনীর সহিত কাব্যালোচনা ছাড়িয়া দিয়া মলিনার হাত ধরিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থিত ইজি চেয়ারে বসাইলেন এবং তাহার শারীরিক কুশলাদি প্রশ্ন করিলেন। মলিনা ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল,—কোনও কথার ভাল করিয়া উত্তর দিল না। টেবিলের উপর তদীয় কোমল করপদ্মখানি রাখিয়া শুধু তর্জ্জনী সঞ্চালনে টেবিলের বনাতের উপর অনন্যমনে যেন কত কি লিখিতে লাগিল। ইলেক্‌ট্রিক্ পাখার অসভ্য-বাতাস মাঝে মাঝে তাহার রুক্ষ কেশ পাশ উড়াইয়া তাহার চোখে ও মুখের উপর ফেলিয়া ব্যস্ত করিতেছিল। চুলগুলি যত্নকৃত ঔদাসীন্যের দ্বারা ঠিক করিয়া মলিনা কটী বিলম্বিত রুমাল লইয়া স্বীয় কপাল ও কপোল মুছিয়া এক একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। স্বর্ণ মণ্ডিত চশমা চোখের উপর ঠিক থাকিলেও মধ্যে মধ্যে তাহা খুলিয়া, রুমালের দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া আবার নাসিকার শীর্ষে স্থাপন করিতেছিল। মলিনা সুন্দরী, কুমারী—মাত্র তেইশ বৎসরের বালিকা।

মলিনার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া প্রতিবেশিনী ধীরে ধীরে বোস-জননীর নিকট বিদায় লইতে চাহিলেন। বোস-জননী কিন্তু চা, বিস্কুট প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার সেবা না করাইয়া ছাড়িলেন না। প্রতিবেশিনী যাইবার কালে তাঁহাদের উভয়ের সহিত করমর্দ্দন করিয়া মন্থরগতিতে চলিয়া গেলেন।

বোসের মাতা কহিলেন, "মলিনা, তোমার এমন অবস্থা দেখে আমার বড়ই কষ্ট হয়! যা' হবার হয়ে গিয়েছে, সেজন্য তুমি আর কেন এমন করে আপনার দেহকে পীড়া দাও!"

মলিনা নতমুখে কহিল, "জানি, কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণ নিরপরাধী হয়েও লোকের কাছে ঘৃণ্য হলেন। চুরীর অপবাদ বড়ই লজ্জার কথা! ব্যারিষ্টার বোস যদি আর একটু চেষ্টা কত্তেন তা' হলে, বোধ হয়, রমেশ বাবু মুক্তি পেতেন।"

বোসের মাতা কিছু অন্যমনস্ক ভাবে "এষা" কাব্যের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন এবং পরে বলিলেন "দেখ মলিনা, আমারও কিন্তু, কি জানি, তাই মনে হয়! রমেশ এর বাল্য-বন্ধু বটে, কিন্তু এর এখনকার আচরণে যেন সে বন্ধুত্বের ভাব আমি আর দেখতে পাই না। হলোই বা আমার ছেলে—

কিছু দিন হ'তে কিন্তু রমেশের উপর এর কেমন একটা বিদ্বেষ-ভাব আমি দেখতে পেয়েছি।"

মলিনা সে কথার কোনও উত্তর দিল না। বরং সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিল "হাঁ, আপনার কাছে আমি একটু দরকারে এসেছি। রমেশ বাবু জেলে যাবার পূর্ব্বে আমার কাছে এই বাণ্ডিলটা রেখেছিলেন। এর মধ্যে শুনেছি তাঁর নাটক ও কবিতা প্রভৃতি রচনা আছে। আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন; কিন্তু এই আকস্মিক বিপদে আমি আর এ খুলেও দেখি নি'। আমার ইচ্ছা, আপনি ব্যারিষ্টার বোসকে দিয়ে এটা রমেশ বাবুর এটর্ণির কাছে পাঠিয়ে দেন। এ সব জিনিস আমার দেখলেও কষ্ট হয়—আমার কাছে আর এ রাখব না।"

বোসের মাতা শিলমোহরাঙ্কিত সেই বাণ্ডিলটি টেবিলের উপর রাখিয়া গভীর বিষাদের স্বরে বলিলেন, "আহা, অমন শক্তিশালী পুরুষ—রূপে গুণে কিবা কবিত্ব শক্তিতে! সব গেল! আহা-হা, তিন খান নাটক লিখলে, তিন খানার অভিনয়েই কি থিয়েটারে লোক আর ধরে না! আর কি প্রশংসা! কাগজওয়ালাদের কথা ছেড়ে দি, সে তো পাশের খাতিরে—জন সাধারণের মুখে তার লেখার কি সুখ্যাতি আর ধরে না!"

মলিনা ধীরে ধীরে চশমা খুলিয়া রুমালের দ্বারা জলভারাক্রান্ত চোখ দুটি মুছিল। তার পর অতি সংক্ষেপে বলিল, "তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন —কিন্তু কি যে ঘটনাচক্র! যা'হক আপনি এইটা পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করিবেন—তাঁর জিনিস আমি আপনার কাছে রেখে নিশ্চিন্ত হ'লাম।"

(৩)

বোস নবীন—ছোকরা ব্যারিষ্টার। হাইকোর্টে তাহার নিত্য যাতায়াত আছে। তবে অধিকাংশ সময়ই তাহাকে বক্তৃতার পরিবর্ত্তে দাবা খেলায় কাটাইতে হয়। যেমন করিয়াই হোক্ সে যে একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার এ কথা কে অস্বীকার করিবে? বিলাত যাইবার পূর্ব্বে মলিনার সঙ্গে তাহার বেশ জমাট প্রণয় জন্মিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে সে মলিনার পিতার নিকট হইতে বিলাত অবস্থানের কতক খরচও পাইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া যে মলিনাকে পত্নীরূপে পাইবে, ইহাই এক প্রকার নিশ্চিত। কিন্তু হায়, "রমণী-প্রণয় রীতি বুঝে কোন জন!" বোস ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মলিনা রমেশচন্দ্রের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহ হয়, এমন সময় দৈব চক্রে মলিনার সে মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যেমন করিয়া হোক, বোস তাহাই চাহিতেছিল।

সে হাল ছাড়িবার পাত্র ছিল না। রমেশের জেল হওয়ায় সে মলিনাকে পুনঃপ্রাপ্তির আশায় সচেষ্ট হইল। তবে ইহাও সে বিলক্ষণ রূপে বুঝিয়াছিল যে, মলিনার উপস্থিত আবার নূতন করিয়া প্রণয়-প্রার্থী হইতে চাহিলে তাহাকে একটু আধটু কবি-যশঃ-প্রার্থী হইতেই হইবে। বোস সে বিষয়ে মোটেই উদাসীন ছিল না। এবং তাহার সেই সাহিত্য-সাধনার বিষয় মলিনাকেও যথাসময়ে জ্ঞাপন করিয়াছিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় মলিনা একাকিনী বসিয়া হারমোনিয়মের সঙ্গে যখন গাহিতেছিল,

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে
বন মাঝে কি মন মাঝে !"

সেই সময় ব্যারিষ্টার বোস সহসা সেথায় উপস্থিত হইল। মলিনা তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া গানটি শেষ অবধি গাহিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন গান ?" বোস খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, "কেমন ? রবিবাবুর গান আবার কেমন ? চমৎকার ! কিন্তু মলিনা, তার চেয়ে চমৎকার তোমার কণ্ঠস্বর !"

মলিনা ঈষৎ উপেক্ষার সহিত বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—গানটার বিষয়েই—"

বোস বাধা দিয়া বলিল, "সে কথা ছেড়ে দাও ; কিন্তু অমন গলা না হ'লে কি এ গান জমে !"

মলিনা কোনও উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে হারমোনিয়ম বন্ধ করিয়া সোফায় যাইয়া বসিল এবং রুমালের দ্বারা অতি সন্তর্পণে একবার কপাল, কাণ ও কপোল মুছিয়া স্লীপারপরিহিত দক্ষিণ পদ নাচাইতে নাচাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন হঠাৎ যে আপনি ?"

"কেন, তোমারই তো হুকুম মত মলিনা—" বোস কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না ; দীন নয়নে মলিনার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মলিনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বেশ কোমল আওয়াজে বলিল, "বলি, আপনার নাটক কত দূর ?"

বোস এই প্রশ্নই শুনিতে চাহিতেছিল। সে অমনি আনন্দে এক গাল হাসিয়া বুক-পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল,

"দি ভেনাস্ থিয়েটার,
কলিকাতা।

হাইকোর্টের প্রথিতনামা উদীয়মান ব্যারিষ্টার মিঃ বি, পি, বোসের হৃদয়োন্মাদকারী পঞ্চাঙ্ক নাটক "বাবর সাহ" মহাসমারোহের সহিত শীঘ্রই অভিনীত হইবে। আশাপথ চাহিয়া থাকুন। এমন নাটক হয় নাই, হইবে না। ভাবে, ভাষায়, চরিত্র চিত্রণে ও চমৎকারিত্বে ইহার তুলনা নাই। ঘটনার তরঙ্গ ভঙ্গে, সঙ্গীতের স্রোতে, নৃত্যের ধূলি পরিমাণে ও সাজ সজ্জার চমকপ্রদে সকলেই বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া যাইবেন।"

পাঠ শেষ করিয়া মলিনার হস্তে সেই কাগজখানি দিয়া বোস বলিল, "দেড় বৎসর পরিশ্রম করে এই নাটকখানি লিখেছি। কিন্তু, সে কেবল তোমাকে পাবার আশায়!"

মলিনা ভ্রুকুটী করিয়া বলিল—"বলি, থিয়েটারের এ বিজ্ঞাপনগুলা কোন মূর্খেতে লেখে। তাদের বাল্যকালে কি এমন কোনও অভিভাবক ছিল না যে, একটু লেখাপড়া শেখায়। ছিঃ! এতে যে নাটকের উপরও লোকের ঘৃণা জন্মে যায়! রমেশ বাবু তাঁর নিজের নাটক অভিনীত হবার পূর্ব্বে নিজেই অতি সংক্ষেপে বিজ্ঞাপন লিখে দিতেন। থিয়েটারের ম্যানেজারকে লিখ্‌তে দিতেন না।"

বোস বলিল, "ঠিক বলেছ। আমিও তাই বলব। থিয়েটারওয়ালারা আমাকে খুব সম্মান করে। একে আমি ব্যারিষ্টার তায় আবার নাট্যকার কি না? যাক্, এখন আর তোমার সে বিষয়ে আপত্তি কি! শেষ কথা দাও! মলিনা, তোমায় না পেলে আমি আত্মহত্যা করব।"

মলিনা দন্ত দ্বারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখ কাটিতে কাটিতে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল "ভালই—হোক! আমার আর কোন আপত্তি নেই।"

বোস খুব সুদীর্ঘ একটা হাঁফ ছাড়িয়া অভিভূত আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "মলিনা, তা'হলে শুভস্য শীঘ্রং—কি বল!"

মলিনা উত্তর দিল না—ঈষৎ হাসিল মাত্র।

বোস আনন্দে শিস্ দিতে দিতে পকেট হইতে সিগারেট্ বাহির করিয়া ধরাইয়া ফেলিল। এবং ঘন ঘন এমনি বিরাট দম টানিতে লাগিল যে, তাহার নাক মুখ হইতে ধূম উদ্গীরণের মাত্রায় কক্ষটি অন্ধকার প্রায় হইয়া উঠিল। সে তাহার হারানিধি মলিনাকে রমেশের কবল হইতে ছিনাইয়া লইয়া যে পুনরায় নিজের অঙ্কশায়িনী করিতে পারিবে, এই আনন্দে সে এমনি বেহিসাবি বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে তাহার তখনকার নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখি-

বারও অবসর পায় নাই। বোসের অবস্থা দেখিয়া মলিনা সন্তুষ্ট না হোক, বেশ একটু আমোদ উপভোগ করিতেছিল।

(৪)

আজ শনিবার। "বাবর সাহ" অভিনয় দেখিবার জন্য ব্যারিষ্টার বোস মাতা ও স্ত্রীকে লইয়া থিয়েটারে আসিয়া একটি বক্স অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। রঙ্গালয় দর্শকে পূর্ণ, গ্যালারি হইতে বক্স অবধি তিল রাখিবার স্থান নাই। নবীন নাট্যকারের পক্ষে এমন জনতা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে! অভিনয় আরম্ভ হইল। এক অঙ্ক, দুই অঙ্ক, তিন অঙ্ক অভিনীত হইল—দর্শক-মণ্ডলী স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। তবে গ্যালারী হইতে মাঝে মাঝে "আংকোর" "ক্যাপিটাল" "মরে যাই" প্রভৃতির হরবোলার সুর যে উঠে নাই, তাহা নহে। কিন্তু, রসগ্রাহী দর্শকমাত্রেই চমৎকৃত হইয়া শুনিতেছিলেন। বোস তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং অভিনয়ের যেখানেই একটা আবেগের বক্তৃতা আরম্ভ হইতে-ছিল, সেই সময় সে মলিনার প্রতি অতি সতৃষ্ণ ভাবে চাহিতেছিল। মলিনা কিন্তু একবারও বোসের প্রতি চাহে নাই। কেবল বোসের উপর্য্যুপরি প্রশ্নে অতি সংক্ষেপে "বেশ নাটক—বেশ লেখা" বলিতেছিল।

অভিনয়ের প্রায় শেষ অবধি, যে কবি সকল দর্শকের নিকট হইতে এত প্রশংসা ও বাহবা পাইল, সে যে কেন আজ তাহার স্ত্রী ও মাতার নিকট তেমন সম্মান ও উৎসাহ পাইল না, তাহার কারণ সে নির্ণয় করিতেই পারিল না। মাঝে মাঝে কেবল বলিতেছিল, "সাধনায় সিদ্ধি—অতি সত্য কথা! প্রায় দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফল—বাবর সাহ, যাক্ নিন্দার হয় নাই, কি বল!" মলিনা কোনও উত্তর দিল না, তাহার মাতা বলিলেন, "সে কি! সুন্দর হয়েছে। আমি মনেও করি নাই যে তুমি প্রথম উদ্যমেই এত ভাল লিখ্‌তে পারবে। যেমন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, তেমনি ভাব ও ভাষা!" মলিনা এবার কথা কহিল, বলিল "অনেকটা যেন রমেশ বাবুর অনুকরণে।" বোসের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; একে অনুকরণ তায় আবার রমেশের মত লেখকের! আর সেই রমেশের নাম কি না মলিনার মুখে! মলিনা রমেশকে বিস্মৃত না হোক, সে যে বোসের চেয়ে উচ্চ শ্রেণীর লেখক তার এখনও এই বিষম ধারণা ও উক্তিটাই বোসের হৃদয়ে শেল সম বিঁধিল। মলিনা যদি তাহার নাটকের আজ অপ্রশংসা করিত তাহা হইলেও বোসের তেমন কষ্ট হইত না। আজ সে মলিনার নিকট এমন মর্ম্মা-ন্তিক আঘাত পাইয়া কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার বিদ্যা ও বুদ্ধির নিকট রমেশই আদর্শ লেখক হ'তে পারে—আমার আদর্শ সেক্সপিয়র!"

মলিনা কোনও উত্তর দিল না, বুঝিল কথাটা তাহার স্বামীকে বড়ই পীড়া দিয়াছে।

বোসের মাতা মলিনার হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, আমরা নীচে যাই।" পুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "একখান্ গাড়ী ঠিক করবে চল!"

বোস দ্রুতপদে চলিয়া গেল. মাতা ও স্ত্রী তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। রঙ্গালয়ের গেটের নিকট জনতার এক পার্শ্বে মলিনা যখন তাহার শাশুড়ীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সময় জনতার ভিতর হইতে অতি মলিন বেশে এক যুবক আসিয়া তাহাকে কহিল, "কেমন—ভাল!" মলিনা সহসা সেই করুণমূর্ত্তি যুবককে দেখিয়া বিস্ময়ে ও হর্ষে কহিয়া উঠিল, "তুমি? তুমি কোথা থেকে?" যুবক মলিনার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া অনুচ্চ-স্বরে বলিল, "কেন! জেল থেকে! আমি যে চোর! তোমার বোসের, আমার বাল্যবন্ধুর "বাবর সাহ" নাটক দেখব না!—সুখের বিষয়—সমাজের পক্ষে সুখের বিষয়—সকল চোরের জেল হয় না।" মলিনা শুনিল, তাহার প্রতি-কথা বিষদিগ্ধ বাণ বলিয়া বুঝিল, তাহার প্রতিনিশ্বাস মলিনার অন্তঃস্তলে শেলসম বিদ্ধ করিল। মলিনার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না—সে যেমনি যুবকের করস্পর্শ করিতে যাইবে, যুবক জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

(৫)

বোসের মাতা বলিলেন "তোমার "বাবর সাহ" লেখার পর এই দুই বৎসর তুমি তো প্রায় তিন চারিখানা বই লিখ্‌লে—কই তেমন কিছু জমে নি।"

বোস সংবাদপত্রখানা মলিনার দিকে ফেলিয়া দিয়া বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তাই কি কখন হয়! সবই কি ভাল হয়!"

মলিনা সম্বাদ পত্রের প্রতি চাহিয়া শান্ত নম্র সুরে বলিল, "কেন, সেক্স-পিয়রের তো কতকটা তাই হয়েছিল।"

বোস সে কথাটা কাণেই করিল না। সে আরও উচ্চ সুরে বলিল, "এই তো গিরিশ বাবু প্রায় একশত বই লিখেছেন, প্রকৃত নাটক কয়খানা—দশ কি বার! আমারও এ নাটক দেখো, তার পর আরও দু'চার বৎসর পরে দেখো. আমিও ঐ রকম লিখতে পারব!"

বোসের মাতা মলিনার প্রতি চাহিলেন। মলিনার কিন্তু কথাটা বড়ই

অসহ্য বোধ হইল। সে বোসের প্রতি না চাহিয়াই একটু রুষ্টস্বরে বলিল, "স্পর্দ্ধা প্রকাশেরও একটা সীমা থাকা উচিত। রমেশ বাবুর মত নাট্যকারকেও বলিতে শুনিয়াছি যে, গিরিশ বাবুর শক্তি ও প্রতিভার সিকি পাইলেও তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেন।"

ভর্ৎসনার সঙ্গে আবার সেই রমেশের নাম বোসের কাণে ও প্রাণে যেন বর্শার ন্যায় বিঁধিল। মলিনার সকল কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে দারুণ বিরক্তির সহিত দ্রুতপদে গাড়ীতে উঠিয়া কোর্টে চলিয়া গেল।

মলিনাও আর কোন কথা না কহিয়া সম্বাদপত্রখানি পড়িতে পড়িতে সহসা নীরব হইল। বোসের মাতা তাহাকে চুপ করিতে দেখিয়া পুনরায় পড়িতে বলিলেন। কিন্তু মলিনার মুখ তখন গম্ভীর, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত। কোনও প্রকারে সে আপনাকে কতকটা সংযত করিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইল, "সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রমেশচন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া রেঙ্গুন হইতে আজ দুই বৎসর পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ১০ নং ছকু চন্দ্র ষ্ট্রীটে তিনি তদীয় বন্ধুর আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন।" এই সম্বাদে বোসের মাতা মর্ম্মাহত হইলেন এবং কহিলেন "এ কি সেই বাঙ্গালী পাড়ায় —অনেক দূরে—নইলে দেখা করে আসতাম।" মলিনা কোনও কথা না কহিয়া তদ্দণ্ডেই গাড়ী ডাকাইয়া সেই কাগজখানি লইয়া রমেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ উদ্দেশে যাত্রা করিল।

(৬)

গৃহস্বামী অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, "আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি রমেশকে আপনার আগমন সংবাদ দিয়া আসি। সে আজ প্রাতে আপনার কথাই বহুবার বলিয়াছে। বোধ হয়, সে শুধু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যেন এখনও বাঁচিয়া আছে। এ অবস্থায় সহসা আপনাকে দেখিলে সে হয় তো অজ্ঞান হইয়া যাইতে পারে! একটু বসুন, আমি এখনি আসছি!"

মলিনা বসিয়া অতীতের কত কথাই ভাবিতেছিল। রমেশের সঙ্গে তাহার সেই প্রথম আলাপ, তার কবিত্বে ও রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মানস-মন্দিরে পতিত্বে বরণ—কত প্রণয় সম্ভাষণ, কত প্রেম পত্র, সেই একদিন—তার পর ষড়যন্ত্রে তাহার কারাগার, আজ তাহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ—এই একদিন! মলিনার বুকের ভিতর কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল। ভাবিল, কি

করিয়া আজ সাক্ষাৎ করিব, তাহার কাছে গিয়া কি বলিব! আর আমার বলিবারই বা কি আছে! তাহার যে বাল্যবন্ধু তাহার সহিত শত্রুতা করিয়া তাহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আমি তাহাকেই না বুঝিয়া বিবাহ করিয়াছি! আমি আবার দেখা করিতে আসিলাম কেন? মলিনার তখনই সেই থিয়েটারের গেটের নিকট যে রমেশের সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই কথা মনে পড়িল। ভাবিল, আসিয়া ভালই করিয়াছি। সকল সংশয় মিটাইয়া যাইব। আজ রমেশের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিব।

এমন সময় গৃহস্বামী আসিয়া মলিনাকে ভিতরে লইয়া যাইলেন। মলিনা দেখিল কক্ষটি সুসজ্জিত। তাহারি মধ্যস্থলে রমেশচন্দ্রের কঙ্কালসার দেহ একখানি খাটের উপর শায়িত। রমেশের মুখ যেন একখানি পাতলা ছালে আবৃত সুস্থ অবস্থার চেয়ে এখন তাহার নাসিকা যেন আরও উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল চোখের সে পূর্ব্ব জ্যোতিঃ এখনও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। মলিনা ধীরে ধীরে যাইয়া রোগীর ইঙ্গিত ক্রমে তদীয় পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল। গৃহস্বামী তখন সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মলিনা অতি স্থির ও ধীর ভাবে কহিল, "রমেশ বাবু—"

রমেশচন্দ্র মলিনার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "শোন, আমার কথা শোন। এ পৃথিবীতে বোধ হয় আজ আমার শেষ দিন!—সত্য বলিবে?"

মলিনা পূর্ব্ববৎ স্থিরকণ্ঠে বলিল, "সত্য বলিতেই আসিয়াছি। সংশয় ভঞ্জন করিতেই আসিয়াছি।"

রমেশ নাসিকা ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঈষৎ বিরক্তির স্বরে কহিল, "সংশয়! কিসের সংশয়?"

মলিনা রমেশের হস্তধারণ করিয়া আবেগ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি নির্দ্দোষী —ক্ষমা কর! "বাবর সাহ" নাটক কি তোমার রচিত?"

"কেন, তাহা কি জান না?"

"সত্য বলিতেছি শুন। তুমি যে বাণ্ডিলটি আমার কাছে রাখিয়াছিলে, আমি তাহা খুলি নাই। তখন তোমার মাথার উপর মহা বিপদ। তাহারি দুই দিন পরে, তোমার জেল হইল। আমি যে তোমার জন্য কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে কথা বলিতে চাহি না। আর বলিয়াও কোন ফল নাই। তবে তোমার নূতন রচনা তোমারি পার্শ্বে বসিয়া যে একদিন পড়িত ও শুনিত, তোমার অভাবে ততোধিক তোমার বিপদে তাহার আর সে সকল খুলিয়া

দেখিবারও সাধ ছিল না। আমি সেই ব্যাণ্ডিলটি শিল মোহর করিয়া তোমার এটর্ণির নিকট বোসের দ্বারা পাঠাইবার জন্য বোসের মাতার নিকট দিয়াছিলাম।”

এই কথায়, রমেশ যেন কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল “সত্য! মলিনা, আর একবার বল ইহা সত্য!”

মলিনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “কেমন করিয়া আজ তোমাকে বিশ্বাস করাইব! ধর্ম্ম সাক্ষী—ভগবান সাক্ষী—”

রমেশ ব্যস্তভাবে বাধা দিয়া বলিল “থাক—থাক! ভগবানের নাম আর করিও না মলিন!” রমেশের এই একটি কথায় মলিনার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাওয়ায় রমেশ বলিল, “আমাদের মুখে ভগবানের নাম কি শোভা পায় মলিন! দেহবিলাসী, ভোগবিলাসী আমরা, হিন্দুর সন্তান হইয়া খ্রীষ্টানের দুষ্ট অনুকরণে পুষ্ট আমাদের দেহ মন—আমাদের আর ও সব ভণ্ডামি কেন? মলিন, বলিতে পার, কি আমরা? আমরা কোন্ সমাজের বলিতে পার? আজ আমার অতীতের সকল কথা, কলঙ্কের কথা, প্রাণের কথা একে একে মনে পড়ছে! মনে হ'চ্চে আমরা যদি হিন্দু হ'তাম, তোমার সহিত আমার প্রণয়ের অবসর ঘটিত না! আজ আমার এ দুরবস্থা হতো না! কিন্তু, তা' না হয়ে, আজন্ম আমরা হিন্দুর দেবদেবীকে, আচার ব্যবহারকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছি, ব্রাহ্ম মন্দিরে যাইবার নাম করিয়া বিরলে বসিয়া প্রেমালাপ করিয়াছি—তীর্থস্থান, দেবমন্দির, মসজিদ্ বা গির্জ্জা সবই ছিল আমাদের নির্জ্জন নিকুঞ্জবন। কখনো মনেও করি নাই, এ দেহ অনিত্য, এ সংসার অনিত্য। কখনো শিক্ষাও পাই নাই, সংযমই সুখের মূল,—শান্তির, মনুষ্যত্বের প্রধান উপকরণ! সে সব অতীতের কথা মনে পড়ে কি মলিন?” মলিনা কোনও উত্তর দিল না, নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে রমেশের হস্ত আপন হস্তের উপর রাখিয়া অবনতমস্তকে বসিয়াছিল। রমেশ বলিতে লাগিল, “আমরা হিন্দুর শিক্ষা পাই নাই, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শিক্ষা পাই নাই, মুসলমান বা খ্রীষ্টানের শিক্ষাও পাই নাই। আমরা বিলাতি-বিলাসী-বাঙ্গালী, বাস আমাদের ইংরাজের পল্লীতে, শিক্ষা ইংরাজের কুৎসিত অনুকরণে! দেহ ও অর্থকেই সর্ব্ব সুখের আকর বলিয়া শিক্ষা পাইয়াছি। উঃ কি পরিণাম! পিতৃদত্ত সেই অতুল অর্থ বাল্যবন্ধু—” রমেশ হাঁপাইতে লাগিল। মলিনা তাহার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া কহিল, “আর কথা কহিও না! তোমার কষ্ট হইবে! রমেশ ক্ষণকাল নীরব রহিয়া পুনরায় উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিল,

"কষ্ট কি! অনেক কাল পরে আজ তোমায় পেয়েছি, আমার সকল কথা, প্রাণের জ্বালার কথা বলি শোন। বাল্যবন্ধু বোসের শঠতায় আমার সেই অর্থ গেল, কারাগার হ'ল, মান গেল, বাকী ছিল যে প্রাণ—তাও জেল হ'তে এসে দেখি—না-না, তুমি এখন পর স্ত্রী, আমার বন্ধু-স্ত্রী! কিন্তু, মলিন, তোমায় বড় ভালবেসেছিলাম! মিথ্যা কথা!—এখনো ভালবাসি! তেমনি সবেগে ভালবাসি!" রমেশ আর কহিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইতে লাগিল, নয়নের ধারায় উপাধান সিক্ত হইয়া উঠিল।

মলিনা রুমালে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল, রমেশ নীরব হওয়ায় সে আপনাকে সংযত করিয়া লইল এবং সস্নেহে রমেশের চোখ মুখ মুছাইয়া দিল। রমেশ অতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "মলিন, আজ আবেগে অন্যায় ও অনেক অসঙ্গত কহিলাম। আমি এখন মরণের দ্বারে উপস্থিত—অপরাধ লইও না!" মলিনার তখন উত্তর দিবার সামর্থ্য ছিল না; সে বাষ্পাকুললোচনে রমেশের কথা শুনিল;—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

রমেশ মলিনার অবস্থা বুঝিল, বুঝিয়া সেই মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তাহার আনন্দ হইল। ভাবিল, এ অগ্নিশিখা শুধু আমারি বুকে নয়, এ শিখায় আর এক হৃদয়ও পুড়িতেছে।

সে অতি স্নেহের স্বরে মলিনার হাত ধরিয়া কহিল "মলিন, আমার জন্য দুঃখিতা হইও না। এ হতভাগাকে স্মরণ করিয়া আপন সুখের বিঘ্ন ঘটাইও না! আশা করি, তোমার জীবন যেন সুখময় হয়!"

মলিনা কোনও উত্তর করিল না, মনে মনে ভাবিল "তোমার এ হত্যার কারণ আমিই। আমার জন্যই তোমার এই দুর্দ্দশা, আমায় জন্য আজ তোমার বন্ধুগৃহে জীবনের শেষ!"

(৭)

বোসের আজ মহা আনন্দ! সন্ধ্যার সময় আসিয়া মলিনাকে সংবাদ দিল যে, তাহার 'রণজিৎ সিংহ' নাটকের আজ প্রথম অভিনয় রজনী—বোসের সঙ্গে তাহাকে অভিনয় দেখিতে যাইতেই হইবে।'

মলিনা ইহার উত্তরে কি একটা বলিবার জন্য উদ্যত হইয়া নিজেকে সাম্লাইয়া লইল। বলিল,—"তোমার সঙ্গেই যাইব। কিন্তু তা'র পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার একটা অনুরোধ রাখিবে।" মলিনার কথার সুরে ও মুখের ভাব দেখিয়া বোসের প্রাণে ঈষৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। অভিভূত আর্দ্রকণ্ঠে

কহিল,—"অনুরোধ কি মলিনা! বল—আদেশ!" মলিনা পূর্ব্ববৎ স্থিরকণ্ঠে কহিল,—"প্রতিজ্ঞা কর—আজ রাত্রে দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ঘোষণা করিবে যে 'রণজিৎ সিংহ' নাটকের প্রণেতা স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র!" এই অভাবনীয় কথাটা শুনিবামাত্র বোসের মুখখানা ছায়ের মত সাদা হইয়া গেল। চোখের সম্মুখে যেন কালো কালো ছায়া নাচিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে নিজেকে সংবরণ করিয়া কহিল.—"এতকাল পরে এ কি কথা? এ কথার অর্থ কি?"

মলিনা ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল—"কেন মিথ্যা বকিতেছ? বল,—আজ ইহা পারিবে কি না!"

বোস এবারে আগুনের মত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কথাটার কি সঙ্গত উত্তর হইবে, ঠিক করিতে না পারিয়া একটু ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,—"তোমার রমেশচন্দ্র মরিয়াও নাটক লেখে নাকি?—অদ্ভুত Geniusই বটে!"

প্রচণ্ড ধিক্কারের সহিত মলিনা বলিয়া উঠিল, "তাহার নাম মুখে উচ্চারণ করিও না! সে মরিয়া লেখে কি না জানি না। কিন্তু নাটকখানার প্রণেতা কে, সে কথা তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর! রমেশ প্রতিভাশালী লেখক না হইতে পারেন, কিন্তু তিনি চোর ছিলেন না।" বোসের দুইচক্ষে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। কঠোর স্বরে বলিল,—"মলিনা সাবধানে কহিও। ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে।" রোষে মলিনার কণ্ঠ যেন রোধ হইয়া আসিতে ছিল।—"আচ্ছা, তুমি না দাও আমিই তাহার জিনিষ তাহাকে ফিরাইয়া দিব।" এই কয়টা কথা অস্ফুটস্বরে বলিয়া মলিনা ঘর ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(৮)

অভিনয়ের গুণে "রণজিৎ সিংহ" নাটকের ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। শ্রোতৃবর্গ সকলেই একবাক্যে নাটকের প্রশংসা করিতে লাগিল। বোস ইহা লক্ষ্য করিয়া ভাবিতেছিল, সত্যই তো রমেশের অপহরণ করিয়াছি; আজ এই প্রশংসা, এই খ্যাতি অপরের প্রাপ্য—কেবল অপহরণের দ্বারা ইহা আমার ভাগ্যে হইল। কাজ নাই—মলিনার কথাই রক্ষা করি! তাহার জিনিষ তাহাকে ফিরাইয়া দিই! যাহার জন্য কবিযশঃপ্রার্থী হইয়াছিলাম, তাহা তো হইয়াছে; তবে আর কেন! ভুল করিয়াছি, মলিনার কথা যদি তখনই রাখিতাম, তাহা হইলে, সে কতই সন্তুষ্ট হইত! কিন্তু, রমেশের প্রতি এখনও মলিনার কি টান! না যাক্, আর ভাবিব না—আজই তাহার নাম ঘোষণা

করিব, সংবাদপত্রে সে সমাচার প্রচারিত করিব, মলিনাকে দেখাইব, তাহার রমেশের চেয়ে আমার হৃদয়ের বল, ত্যাগ ও মহত্ত্ব কত বেশী!

* * * * *

অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই বোস স্বয়ং ষ্টেজে দাঁড়াইয়া দর্শকমণ্ডলীর নিকটে এই নাটকের যে প্রকৃত রচয়িতা রমেশচন্দ্র তাহাই প্রচার করিল। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা কহিল বোস আদর্শ বন্ধু-বৎসল।

বোস তাহার সেই উদারতার সংবাদ দিয়া অভিমানিনী মলিনাকে কেমন করিয়া চুম্বন করিবে, তাহার রাগ-রোষ দূর করিবে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে মহাহৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

* * * * *

রাত্রি দুইটার সময় গৃহে ফিরিয়া বোস দেখিল, তাহার টেবিলের উপর একখণ্ড কাগজে লিখিত রহিয়াছে—

'যাহার এ ছিল প্রাণ
তাহারে করিনু দান!'

বোস দ্রুতপদে শয়নকক্ষে যাইয়া দেখিল, মলিনা আত্মহত্যা করিয়াছে।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

প্রেম।

প্রাণভরে ভালবাস যারে, হেরি' যারে পূর্ণ তব প্রেম,
সেই মুখ নির্ণিমেষ হের—তুচ্ছ সেথা নিকষিত হেম!
প্রাণভরা সেই মুখখানি হৃদি-পটে করিয়া অঙ্কিত,
কহ দেখি নাই, আত্মা নাই—পরমাত্মা মানব কল্পিত!

দেহে দেহে নাই সুখবোধ, ব্যবধান রেখা যেন দেহ—
ছু'য়ে মিলে হ'য়ে যাই একা—মিশে যাক্ প্রাণ, প্রীতি স্নেহ!
হৃদি ভরা এ বাসনা লয়ে আকুলিত তীব্র আকাঙ্ক্ষিত
কহ দেখি নাই পরকাল, আত্মা সেতো মানব কল্পিত!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।



অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর

The Fine Art Printing Syndicate, JORASANKO, CALCUTTA.

জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি।

প্রাণহীন পদার্থ হইতে প্রাণের সৃষ্টি হইতে পারে কি না, এ কূট তর্ক লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক সময় অনেক মসী-যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধিও রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা জড় হইতে প্রাণের সৃষ্টি করিবার জন্য পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতমণ্ডলী অশেষ প্রকার আয়োজন করিতেছেন। মানুষে স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে। অম্লজান, যবক্ষারজান,এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থের সংযোগে কিন্তু অদ্যাবধি তাহারা কোন পদার্থে প্রাণদান করিতে পারে না। এমন কি মৃত শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাও মানুষের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার, তাহাও বোধ হয় এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অনেক লেখক তর্কের দ্বারা বুঝাইতে পারেন যে প্রাণী সৃষ্টি করা বিজ্ঞানের পক্ষে দুরাশা নহে। কিন্তু তাঁহাদের থিওরি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস তাহা হইবেও না। জগদীশ্বর মানবজাতিকে সকল শক্তি দিয়া জীবন-সৃষ্টির রহস্যটি আপনার নিয়মাধীন করিয়া রাখিয়াছেন।

অপ্রাণী হইতে প্রাণীর উদ্ভব হয় কি না, জগতে 'স্বয়ম্ভূ' জীবের অস্তিত্ব আছে কি না, স্বতঃ-উৎপত্তি (Spontaneous generation) সম্ভবপর কি না, এ প্রশ্ন লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে এক সময় বড় একটা যুদ্ধ বাধিয়াছিল। প্রথমে ধারণা ছিল স্বতঃ-উৎপত্তি সম্ভবপর। শেষে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে প্রাণী ব্যতীত প্রাণীর জন্ম হইতে পারে না, জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমরা এ প্রবন্ধে সে যুদ্ধের কতকটা পরিচয় দিব।

উচ্চ শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অবশ্য মানব-সমাজে কোনও সন্দেহের কারণ হয় নাই। মানুষ, গরু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, টিকটিকি, গিরগিটি, টিয়া, শালিক, শকুনি, গৃধিনী সকলে একই উপায়ে জন্মগ্রহণ করে। পূর্ব্বে ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীরের উপর কিম্বা নির্জ্জন দ্বীপের একপ্রান্তে অশ্বত্থ বা বট পাদপের আবির্ভাব দেখিয়া অনেকের মনে স্বতঃ-উৎপত্তির সন্দেহ হইত। পরে বুঝিতে পারা গেল, পাখীরা ফল খাইয়া অনেক বীজ পরিপাক করিতে পারে না। তাহাদের

পুরীষের সহিত বীজ বাহির হইয়া নিরস্ত পাদপ প্রদেশে সুবৃহৎ মহীরুহের সৃষ্টি করে। কতকগুলা অতি নিম্নশ্রেণীর পোকার জন্মের কোনও বিশেষ কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কতকগুলি পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন যে অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভিদ বা মাংস পচিলে তাহাদের ভিতর হইতে প্রাণের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ অপ্রাণী জড়ের ভিতর হইতে চৈতন্যময় প্রাণের সৃষ্টি হয়।

এক টুকরা মাংস রৌদ্রতাপে ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে অসংখ্য কীটের সৃষ্টি হয় ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। দুই চারিদিন অপরিস্কৃত ভাবে রাখিয়া দিলে কলসীর জলে পোকা জন্মাইয়া উঠে। জলের মধ্যে এক টুকরা খড় ফেলিয়া রাখিতে পারিলে তো কথাই নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা ভাবি, পচা মাংস হইতে প্রাণী জন্মিতে পারে, অপরিস্কার জলে কীটের স্বতঃ-প্রভাব সম্ভবপর। প্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিত .হার্ভি (Harvey) রক্ত-প্রবাহের গতি (Circulation of blood) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত পণ্ডিতও কিন্তু সাধারণ ভ্রমে পড়িয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, গলিত মাংস হইতে কীটের জন্ম হইতে পারে।

রেডি (Redi) নামক একজন ইতালীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে মনঃ-সংযোগ করিলেন। তিনি খুব সূক্ষ্ম বস্ত্রে ঢাকিয়া একখণ্ড মাংসকে রৌদ্র দগ্ধ করিয়া দেখিলেন তাহাতে পোকা জন্মে না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট আসিয়া মাংসের উপর ডিম পাড়িয়া যায়, সূর্য্যতাপ ডিমে তা দিয়া ডিমগুলি ফুটাইয়া দেয় মাত্র। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রাণী হইতেই স্বাভাবিক ভাবে প্রাণীর উৎপত্তি হয়।

এ গবেষণার কিন্তু এ স্থলে নিবৃত্তি হইল না। জলে খড় পচাইলে লক্ষ লক্ষ কীটাণুর সৃষ্টি হয়। অনুবীক্ষণ-সাহায্যে তাহাদের সন্তরণ দেখিয়া ইংরাজ বৈজ্ঞানিক নিডহাম্ (Needham) এবং ফরাসী পণ্ডিত বাফোঁ (Buffon) এ রহস্যে তাঁহাদের মেধাশক্তি নিয়োজিত করিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, একেবারে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইতে পারে না বটে, তবে এক প্রকারের প্রাণীর অংশ-বিশেষ হইতে অপর শ্রেণীর প্রাণী জন্মিতে পারে। খড় প্রাণহীন বোধ হইলেও তাহার শরীরের অংশে অংশে প্রাণ বর্ত্তমান থাকে। জলে পড়িয়া থাকিলে সেই সকল অংশ সজীব হয় এবং তাহা ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু প্রাণে পরিণত হয়। মৃতপ্রায় উদ্ভিদের সেই লুক্কায়িত সজীবতা হইতে জলের পোকার সৃষ্টি হয়।

ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী এরূপ উৎকট থিওরি গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না। স্পালানজনী (Spallanzoni) নামক একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক দেখাইয়া দিলেন যে, খড়-মজ্জিত জল ফুটাইয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে আর তাহাতে কীটের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং খড় হইতে জীব জন্মাইতে পারে না। তাঁহার বিপক্ষ দল মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'উহুঁ! তাই বা কেমন করিয়া স্বীকার করি? জল ফুটাইয়া তুমি পাত্রের মুখের বায়ুর, জীবের আহার জুটাইবার ক্ষমতা নষ্ট করিলে।' লোকে কিন্তু স্পালানজনির মতে আস্থা স্থাপন করিতে লাগিল এবং তাঁহার মতের সপক্ষে পরীক্ষা চলিতে লাগিল।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল, যে খড়-পচানো জলে কীটাণু জন্মায় তাহা ২১২ ডিগ্রি অবধি উষ্ণ করিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে তাহাতে আর কীটাণু জন্মিতে পারে না। অথচ কিছুদিন পরে সেই পাত্রেরই মুখ খুলিয়া দিয়া সেই জলে বাহিরের বাতাস লাগিতে দিলে অমনি তাহাতেই কীটাণুর উৎপত্তি হইতে থাকে। আরও দেখা গেল ঐরূপ জলপূর্ণ পাত্রের মুখে একটা তপ্ত নল লাগাইয়া রাখিলে সে জলে আর পোকা জন্মায় না। এমন কি দুইটি পাত্রে একই জল ভরিয়া একটির মুখ অনাবৃত রাখিয়া অপরটির মুখে এসিড-সিক্ত তুলার (Gun cotton) গুলি রাখিলে প্রথম পাত্রে কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কার্পাসাবৃত পাত্রে কোনও প্রাণী চিহ্ন পাওয়া যায় না।

তখন এ সকল পরীক্ষা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, বায়ুর সহিত ঐ প্রকারের কীটাণু-সৃষ্টির একটা খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দরজা বন্ধ করিয়া একটু ফাঁক রাখিয়া দিলে, সূর্য্যালোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বায়ুর সহিত অম্লজান, যবক্ষারজান, কার্বন ডাইঅক্সাইড্ ব্যতীত নানা প্রকার ধূলিকণা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। সেই ধূলিকণার মত পদার্থে অপরাপর পদার্থের সহিত কীটাণুর ডিম্ব ঘুরিয়া বেড়ায়। ময়লা জল পাইলেই সেই ডিম্বগুলি তাহাতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ফুটিয়া কীটাণুতে পরিণত হয়। বায়ু গরম করিলে ডিম্বগুলি নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের আর ফুটিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং জড় হইতে জীবের সৃষ্টি হয়, এ কথাটা অলীক। জীব হইতেই জীব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

—বৈজ্ঞানিক জগত সহজে একটা পরীক্ষা ফলকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে চাহে না। আজ যে থিওরি সপ্রমাণ হইল, অপর এক বৈজ্ঞানিকের হস্তে পড়িয়া পরদিন তাহাতে ভ্রম প্রতিপন্ন হওয়া বৈজ্ঞানিক জগতে অতি সাধারণ ব্যাপার। ঐ সিদ্ধান্ত লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে মুসো স্বন (Schwan)

নামক একজন বৈজ্ঞানিক এক নূতন সমস্যায় পড়িলেন। তখন ঐ সিদ্ধান্তটি আবার প্রায় ভ্রমমূলাত্মক বলিয়া বোধ হইল।

তিনি একটি পাত্রে ঐরূপ খড়-পচানো জল লইয়া তাহা উত্তমরূপে উষ্ণ করিয়া পাত্রটি একটি পারদের পাত্রের উপর উল্টাইয়া ধরিলেন। কতকটা পারদ সেই পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের বায়ুর সহিত সেই পাত্রস্থ জলের একেবারে সম্পর্ক রহিত করিয়া দিল। তখন তিনি ছুইটি নল দিয়া সেই পাত্রে অম্লজান ও যবক্ষারজান প্রবেশ করাইলেন। বায়ু প্রধানতঃ অম্লজান ও যবক্ষারজানের মিশ্রণ মাত্র। সুতরাং সেই পাত্রের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হইল। সে বায়ুতে কীটাণুর ডিম থাকা অসম্ভব। ফলে দেখা গেল, সেই পাত্রে কীটাণু জন্মিয়াছে, তাহারা অবলীলাক্রমে তথায় সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

বলা বাহুল্য, এ পরীক্ষা-ফল আবার প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে তুমুল ঝড় তুলিল। আবার মসীযুদ্ধ চলিল, পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জলে খড় পচাইয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়া লইয়া কার্পাসের গুলি দ্বারা পাত্রের মুখ বন্ধ করিলে সে জলে কীটাণুর আবির্ভাব হয় না। কিন্তু দেখা গেল, দুধে খড় পচাইয়া তাহা ফুটাইয়া লইয়া পাত্রের মুখে কার্পাসের গুলি রাখিয়া দিলে সে দুগ্ধে কীটাণুর সৃষ্টি হয়। অথচ জলে হয় না। বৈজ্ঞানিক জগতে আবার সৃষ্টিরহস্য গভীর হইয়া উঠিল। পণ্ডিতের দল যুগপৎ বিস্মিত হইয়া গেলেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞানলিপ্সা অতীব প্রশংসনীয়। সুতরাং জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি-সম্বন্ধে আবার পরীক্ষা চলিতে লাগিল। এবার যুদ্ধটা ফরাসী দেশেই অধিক সমারোহের সহিত আরম্ভ হইল। মুসো পুসে (M. Pouchet) নামক একজন কৃতবিদ্য অধ্যাপক অনেক নূতন নূতন পরীক্ষা দ্বারা স্বতঃ-উৎপত্তি মতের পোষকতা করিলেন। কিন্তু মুসো পাষ্টুর (M. Pasteur) নামক একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার হস্তে স্বতঃ-উৎপত্তি মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইল এবং ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ হাক্‌স্‌লে (Huxley) সাহেব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন।

তিনি দুগ্ধ লইয়া পরীক্ষাটি নিজে করিয়া দেখিলেন যে, ২১২ ডিগ্রি অবধি উত্তপ্ত করিয়া লইলেও দুগ্ধে পোকা জন্মে; কিন্তু ঐরূপ উত্তাপে বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া বায়ুর সহিত সম্পর্ক বন্ধ করিয়া দিলে জলে পোকা দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন তিনি বুঝিলেন যে, টাট্‌কা দুধে একটু ক্ষার (Alkali) থাকে।

তবে কি সেই ক্ষারের সাহায্যেকীটাণুর ডিমগুলা বাঁচিয়া থাকে? তিনি ২১২ ডিগ্রি অপেক্ষা অধিক উষ্ণ অগ্নিতে দুগ্ধ ফুটাইয়া লইলেন। এ অগ্নি-পরীক্ষায় দুগ্ধ আর ডিমগুলিকে বাঁচাইতে পারিল না। ২২২ ডিগ্রি উত্তাপের পর আর দুগ্ধে কীটাণু জন্মিল না। তখন পাষ্টুর মহামতি বিজয়গর্ব্বে বলিলেন—স্বতঃ-উৎপত্তি অলীক কথা। জলে কিম্বা দুগ্ধে বায়ু হইতে কীটাণুর ডিমগুলি পতিত হইয়া ফুটিয়া উঠে।

দুগ্ধ-পরীক্ষার ভ্রম দেখাইয়া তিনি তখন উপরোক্ত পারদ-পরীক্ষার সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইতে ব্রতী হইলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল, যে পারদ দিয়া উলটানো পাত্রের মুখ বন্ধ করা হয়, সেই পারদই কীটাণু-ডিম্বের একটা বিশ্রাম স্থল। বায়ু হইতে রাশি রাশি ডিম পারায় পড়িতেছে। পারদে তাহারা ফুটিতে না পারিলেও নষ্ট হয় না। সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষায় পচানো জলে যে ডিম ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেগুলি পারদে অবস্থান করিতেছিল। অণুবীক্ষণ-সাহায্যে পারার মধ্যে ভাসমান ভূরি ভূরি যন্ত্রীকৃত পদার্থ (Organic matter) দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং Schwann সাহেবের পরীক্ষা-ফল ভাসিয়া গেল। তাঁহার স্বতঃ-উৎপত্তি সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত করা হইল।

কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইয়া পাষ্টুর সাহেব ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারি বাসনা হইল প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দিবেন যে বায়ুর মধ্যে রাশি রাশি কীটাণুর ডিম্ব বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল ডিম্বরেণু ধরিবার জন্য তিনি এক বিশিষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি একটা কাচের নলের মধ্যে কতকটা এসিড-সিক্ত তূলা বা cotton wool রক্ষা করিলেন। একটী জানালার ভিতর দিয়া সেই নলের এক মুখ বাহিরে রক্ষা করিলেন। অপর মুখে এক প্রকার যন্ত্র বসাইয়া বায়ু টানিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যদি বায়ুর মধ্যে, ভাসমান ধূলিকণার মধ্যে কীটাণুর ডিম থাকে তাহা হইলে সেগুলি নিশ্চয় ঐ তূলায় লাগিয়া থাকিবে। কয়েক ঘণ্টা কাল সেই নলটির ভিতর দিয়া ঐরূপে বাহিরের বাতাস টানিয়া শেষে তিনি সেই তূলা বাহির করিলেন। এলকহল (Alcohol) বা ইথারে (Ether) এ ফেলিলে সেই তূলা দ্রবীভূত হইয়া যায়। তিনি ভাবিলেন ঐরূপে তূলাকে গলাইলে বায়ু হইতে সংগৃহীত পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে। তখন সে পদার্থ পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে তাহার মধ্যে কোনও প্রাণীর ডিম্ব আছে কি না।

সেই তুলা লইয়া ইথারের মধ্যে ফেলিলে তুলা গলিয়া গেল। তখন সেই ইথারের পাত্রের নিম্নে একটা ধূলার পলি পড়িল। পাষ্টুর সাহেব সেই গুঁড়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন তাহার অধিকাংশ starch, কিন্তু ষ্টার্চ্চ ব্যতীত অপর পদার্থও অণুবীক্ষণে দেখা গেল। পরীক্ষার দ্বারা বুঝা গেল তাহা ডিম, তাহা হইতে প্রাণী উৎপন্ন হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক জগতকে এ পরীক্ষা ফল দেখাইয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন, অণুবীক্ষণ-সাহায্যে পদার্থ-পরীক্ষা অভ্রান্ত নহে। যদি ঐ তুলায় বাস্তবিকই ডিম্বরেণু দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই তুলা হইতে কীট উৎপন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খুব উষ্ণ করিয়া বাহিরের বায়ুর সহিত সম্পর্ক রহিত করিতে পারিলে জলে পোকা জন্মিতে পারে না। সেইরূপ জলে তিনি ঐ তুলা ফেলিয়া দেখিলেন যে তাহাতে কীটাণু জন্মিয়া থাকে। তখন তিনি খুব জোর করিয়া জগতে ঘোষণা করিলেন যে জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি বা অপ্রাণী হইতে প্রাণের সম্ভাবনা অলীক।

এবার মুসোঁ পাষ্টুর আরও সরল উপায়ে তাঁহার সিদ্ধান্তটি সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি একটা শিশিতে প্রস্রাব ভরিয়া দেখিলেন তাহা অতি শীঘ্র পচিয়া যায় এবং তাহাতে অসংখ্য কীটাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকে। তিনি তখন সেই প্রস্রাব-পূর্ণ শিশিটি খুব গরম করিয়া তাহার মুখে একটা ইংরাজি S অক্ষরের মত বক্র নল সংযোগ করিয়া দিলেন। দেখা গেল শিশির ভিতর প্রস্রাব পচিল বটে, কিন্তু তাহাতে কীটাণুর জন্ম হইল না। শিশিতে বায়ু ঢুকিবার সময় ডিম্ব-রেণুগুলা সমস্ত সেই বক্র নলের তলদেশে পড়িয়া রহিল তাহারা পাত্রমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। সুতরাং তাহার ভিতর তিনি কোনও প্রকারের কীটাণু দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি সেই বক্র নলটী কাটিয়া লইলেন। তাহাতে দেখা গেল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বহু জীব সেই শিশির মধ্যে সন্তরণ করিতেছে।

কাজেই সপ্রমাণ হইল, জীব হইতে জীবের উদ্ভব। অপ্রাণী হইতে প্রাণী সৃষ্ট হয় না। বাতাসের সঙ্গে কীটের ডিম উড়িয়া বেড়ায়। স্বতঃ-উৎপত্তি অলীক। ইংলণ্ডের বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ এ মতের পোষকতা করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গয়নার বাক্স।

(ক)

সুশীলাসুন্দরী মনে করেন, পৃথিবীতে নির্ব্বোধ নামে যতগুলি মানবজাতীয় জীবের অস্তিত্ব আছে, তন্মধ্যে তাঁহার স্বামীই সকলের অগ্রগণ্য। কিন্তু ভৈরব বাবু একান্ত উৎসাহের সহিত তাহা অস্বীকার করেন। তোমরা বলিবে বোধ হয় ইহা স্বাভাবিক। কারণ নিজের বুদ্ধি আর পরের ধন কম দেখে, এমন লোক ক'টা আছে?

ভৈরব বাবু, হীরা-জহরতের দালাল। অনেক প্রসিদ্ধ রাজা মহারাজার সঙ্গে তাঁহার কারবার। এমন লোকের বুদ্ধিটি যে সূচাতিসূক্ষ্ম হওয়া দরকার, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু ভৈরব-অর্দ্ধাঙ্গিনী বলেন, তাঁহার বুদ্ধিটি জাহাজ বাঁধিবার কাছির মত মোটা।

সেদিন, কতকগুলি রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার লইয়া, ভৈরব বাবুকে কুচবিহার যাইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট, বুকপোষ্টের মত যদি একটা 'ম্যান্-পোষ্টে'র সৃষ্টি করিতেন তাহা হইলে ভৈরব বাবুকে সযত্নে প্যাক্ করিয়া, যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত। কিন্তু সে উপায় নাই। তাই সুশীলা-সুন্দরী ভাবনায় পড়িয়াছেন, তাঁহার বোকা স্বামীর উপায় কি হইবে?

ট্রেণের সময় হইয়া আসিল।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, "দেখো, গয়নার বাক্সটী, কেউ যেন তোমার গালে ঠাস্ করে এক চড় মেরে কেড়ে না নেয়!"

ভৈরব বাবু বলিলেন, "হুঁ।"

"রেলে কারুকে বিশ্বাস কোরো না। বাক্সটা খবর্দ্দার কাছ্ছাড়া কোরোনা। বুঝেছ? কথা কওনা যে? ওগো—" সুশীলা তাঁহার স্বামীর গোঁফে একটী টান দিলেন।

"উঃ—লাগে যে!"

"যার বুদ্ধি নেই একটু, তা'র আবার অতবড় গোঁফ কেন? এখন ওঠ!"

ভৈরব বাবু তাঁহার বিরাট দেহ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একটী বিদায় চুম্বনের জন্য তাঁহার স্ত্রীর দিকে অবনত হইলেন।

"আর চুমো খেতে হবে না, যাও! যে একমুখ পান চিবোচ্ছ!" বলিয়া সুশীলাসুন্দরী তাঁহার নথশোভিত মুখখানি সরাইয়া লইলেন।

(খ)

ট্রেণ ছাড়ে ছাড়ে, এমনি সময়ে হঠাৎ একটা লোক কাম্‌রার ভিতরে উঠিয়া পড়িল।

ভৈরববাবু সন্দেহাকুলনেত্রে এই অবাঞ্ছিত আগন্তুকটীর দিকে আপাদমস্তক-সঞ্চারী দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। লোকটা জোয়ান,—বয়সও বেশী হইবে না। সে কামরার ভিতরে আসিয়াই একটা বেঞ্চের উপরে বসিয়া পড়িল এবং ভৈরব বাবুর দিকে দিব্য সপ্রতিভ ভাবে চাহিয়া বলিল, "আর একটু হলেই ট্রেণ ফেল হয়েছিলাম মশাই! আর আপনার সঙ্গে আস্‌তে পেতাম না।"

"আমার সঙ্গে? বটে!" বলিয়া ভৈরব বাবু গহনার বাক্সটী আরো কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

লোকটা একটা সিগারেট বাহির করিল। তাহার পর বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার সঙ্গে থাকবার জন্যেই আমি আদিষ্ট হয়েছি।"

"আবার আদিষ্ট হয়েছেন—বটে!"

"আমি একজন ডিটেকটীভ্।"

"বটে!"

"কুচবিহারের মহারাজ আমাকে নিযুক্ত করেছেন।"

"বটে!"

"আমার নাম ঘনশ্যাম।"

"বটে! শুনে সুখী হলুম। কিন্তু আমার সঙ্গে কেন?"

ঘনশ্যাম, সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিল, "আপনি দামী গহনা নিয়ে মহারাজের কাছে যাচ্ছেন। আজকাল এ লাইনে চুরীর বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে কি না. তাই আপনার সঙ্গে থাক্‌বার জন্যে আমি আদেশ পেয়েছি।"

"বটে—বাঃ! আপনার অভিপ্রায় খুব ভাল ত!"

ঘনশ্যাম আপন মনে সিগারেট টানিতে লাগিল। ভৈরব বাবু, ধাবমান গাড়ীর জানালা দিয়া নৈশ আকাশের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

(গ)

সিগারেটের দগ্ধাবশিষ্টটা ফেলিয়া দিয়া ঘনশ্যাম বলিল, "ভালো কথা—শুনুন ভৈরব বাবু!"

"নাম পর্য্যন্ত আদায় করেছেন যে—বাঃ!" বলিয়া ভৈরব বাবু মুখ ফিরাইলেন।

"আমাদের এই কাজ মশাই !"

"খুব ভালো কাজ ত'—বাঃ ! তা' কি বলবেন—বলুন।"

"বলচি কি,—আপনি গয়নার বাক্সটা আমার কাছে রাখুন।"

"খুব ভালো পরামর্শ ত'—বাঃ !"

"আপনি আমাকে বিশ্বেস করছেন না বুঝি ? এই দেখুন,—আমি যে ডিটেকটিভ্,—তার পাশ।" ঘনশ্যাম পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিল।

ভৈরব বাবু নীরবে তাহা পাঠ করিলেন।

ঘনশ্যাম বলিল, "কেমন—দেখলেন ত' ? এখন কথা হচ্ছে এই—আমরা ডিটেকটীভ্। ও সব জিনিস আমাদের কাছে যেমন নিরাপদে থাকবে—তেমন আপনাদের কাছে নয়।"

"সে কথা আমি মানি।"

"আমিও তাই বলচি যে বাক্সটা আপনি আমার কাছে রেখে দিন। তারপর আপনার যা' ইচ্ছে করুন,—ঘুমোন আর ব'সে থাকুন,—কোনও ভাবনা নেই।"

"ঘুম থেকে উঠে যদি আপনাকে দেখতে না পাই ! বাঃ !"

"সেই ভয় করছেন ? আচ্ছা, এই নিন আমার ঘড়ি আর সোণার চেন, আর মণিব্যাগ। ব্যাগে দু'খানা দশ টাকার নোট আর ছয়খানা গিণি আছে। সব জিনিসগুলর দাম অন্ততঃ তিনশো টাকা হবে। এই হীরের আংটিটাও রেখে দিন—কেমন, এখন বিশ্বাস হবে ত ?"

"একটু একটু বিশ্বাস হচ্ছে এখন। তা' মশাই ! আপনার এত মাথাব্যথা কেন ?"

"বলেন কি মশাই ! আমি এই জন্যেই যে নিযুক্ত হয়েছি ! আপনার যদি চুরি যায়, তা'হলে আমাকেই ত' তার জন্যে জবাবদিহি কর্ত্তে হবে ?"

"বেশ, আপনি আপনার জিনিসগুলো দিন।"

ঘনশ্যাম, মণিব্যাগ, আংটি, ঘড়ি ও সোণার চেন ভৈরব বাবুর হাতে দিল। ভৈরব বাবুও গহনার বাক্সটা তাহাকে প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখবেন মশাই ! হারায় না যেন ! বাক্সের চাবিটা আমার কাছে রইল কিন্তু !"

"তা থাক্। ট্রেণ থেকে নামবার সময়ে আপনার বাক্স যখন আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব, তখন আর চাবির দরকার কি ? আমিত' আর বাক্স খুল্‌ছি না !"

ট্রেণ তখন পূর্ণ বেগে ছুটিতেছিল। বাহিরে জমাট অন্ধকার,—সমস্ত প্রকৃতি

তিমিরতুলিকালিপ্ত। ভৈরব বাবুর চোখে তন্দ্রা ঘনাইয়া আসিল, এবং অনতি-বিলম্বে তাঁহার নাসিকায় 'শ্যামের বাঁশী' বাজিয়া উঠিল!

(ঘ)

অকস্মাৎ কামরার ভিতরে গোলমাল হওয়াতে, ভৈরব বাবুর সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

তিনি বিরক্তির সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটী 'আকণ্ঠবিস্তারি' হাই তুলিলেন। ট্রেণ তখন একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল। কামরার ভিতরে তিন-চারিজন লোক—পোষাক দেখিলেই বুঝা যায়, তাহারা পুলিশ। ভৈরববাবু তাহাদের দিকে তন্দ্রাজড়িত নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "এটা কি কোম্পানির বাগান মশাই, যে আপনারা এত চীৎকার সুরু ক'রে দিয়েছেন?"

একজন লোক অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি ইনস্পেক্টর। একজন প্রসিদ্ধ রেলওয়ে চোর এই কামরায় উঠেছে শুনে এসেছি।"

"বটে! তাইত! আমার ডিটেকটিভ বন্ধুবরকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা কেন?"

"ডিটেকটিভ? কে সে?"

"কে সে? আপনারা খোঁজ করুন। তিনি আমার গয়নার বাক্সটীও দয়া ক'রে নিয়ে গেছেন দেখ্‌ছি!"

"সর্ব্বনাশ! তিনি যে আর ফিরবেন না—সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। গয়নার বাক্স নিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?"

"কুচবিহারের মহারাজের কাছে।"

"কেন?"

"আমি দালাল। এই গয়নাগুলি মহারাজকে দেবার কথা।"

"কিসের গয়না?"

"হীরে জহরতের।"

"কত দাম?"

"প্রায় একলক্ষ টাকা হবে।"

"আপনি আমাদের আশ্চর্য্য করলেন মশাই! লাকটাকার জিনিষ চুরি গেল আপনার কাছথেকে,—আর আপনি দিব্যি খুসি হয়ে কথা কচ্ছেন? তা' আপনার ছাগলের ল্যাজের দিকে আপনি কাটতে পারেন, সে জন্য আমরা কিছু বল্‌তে পারি না; কিন্তু এখন আপনি মহারাজকে কি জবাব দিবেন গিয়ে?"

ভৈরব বাবু পরিক্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, "জবাব আর কি দিব? মহারাজ যখন জিজ্ঞেস কর্ব্বেন, গয়না কোথায়? আমি বল্‌বো, এইখানে।" ভৈরব বাবু আপনার বক্ষে প্রথমে হস্তস্থাপন করিয়া দেখাইলেন। তাহার পর ওভারকোট্‌টা খুলিয়া ফেলিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, তিনি কোটের ভিতরকার পকেট হইতে কতকগুলি রত্নখচিত অলঙ্কার বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিলেন।

ইনস্পেক্টর বলিল "একি ব্যাপার?"

"অতি সামান্য। পাছে কোন চোরের দৃষ্টি আমার উপরে পড়ে, তাই আমি আগে থাকৃতেই সাবধান হয়েছিলাম। গয়নাগুলো বার করে পকেটে রেখে, গয়নার খালি বাক্সটা হাতে করে ট্রেণে উঠেছিলাম। সুতরাং বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন, চোর মহাশয় সুধু খালি বাক্সটা নিয়েই অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। তা আমি আমার বাক্সের দামটাও আদায় কর্ত্তে ভুলে যাইনি। তিনিও আমার কাছে কতকগুলি জিনিষ জিম্মে রেখে গিয়েছেন,তার দাম খালি বাক্সোটার চেয়ে অনেক বেশী। চোর মশাই যখন বাক্স ভেঙে দেখ্‌বেন, তখন খুব ভালো করেই বুঝ্‌তে পার্ব্বেন যে, তিনি "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ" করেছেন। তা' এইরকম যাত্রাভঙ্গের অভিনয় যদি আর দু' চারবার হয়, তা' হলে সহজেই আমি বড়মানুষ হয়ে পড়্‌ব।" তৎপরে ভৈরব বাবু স্বগত বলিলেন, আর সেই সঙ্গে আমার মুখরা স্ত্রীটীকেও বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পার্ব্ব, যে তাঁর স্বামী-রত্নটিকে বাজারে যাচাই কর্‌লে কেউ ঝুটো বলে ফিরিয়ে দেবে না। পাঠকেরা কি বলেন?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

নাটক-প্রসঙ্গ।

(বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত।)

দৃশ্য-কাব্য সচরাচর কথোপকথনে রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এইজন্য নিত্য দেখা যায় যে কথোপকথনে গ্রন্থিত

অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে একখানিও নাটক নহে। বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক নাই। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রথিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus" "Manfred" "Faust" ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা, ও উত্তররামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। একথা কতকদূর সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত নাটকের পক্ষে, কথোপকথনে গ্রন্থন, বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammermoor" কে নাটক বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদয়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয় তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। অনেক নাটক-কর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক-নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বর-বিশিষ্ট হইয়া উঠে। যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য তাহাতে গীতি-কাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। সীতাবিসর্জ্জনকালে ও তৎপরে রামের ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়,তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনিমুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: বাক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটক মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতি-কাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্য গুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎকার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাব-ব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতি-কৃত ঐ রামবিলাপের সঙ্গে ডেস্‌ডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেই একথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ, বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান

নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটী ভাব টানিয়া আনিয়া, একে একে গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্রগুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন ?

সহজেই অনুমেয় যে যাহা ব্যক্তব্য তাহা পরসম্বন্ধীয়, বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য তাহা আত্মচিত্ত-সম্বন্ধীয় ; উক্তিমাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না, এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। নাটকের যাহা উদ্দেশ্য, তাহার আনুসঙ্গিকতা বশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই। যে যে গুণ থাকাতে হাম্‌লেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের অসামান্য কার্য্যরূপে পরিগণিত হইতেছে, সে গুণ বাঙ্গালা কোন নাটকেই নাই। একটী গুণের কথা বলি। মানসিক পরিবর্ত্তন। একজন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি অপর এক বা বহু ব্যক্তি দ্বারা ভাল পথে বা মন্দ পথে কিরূপে যায় তাহা ভাল নাটকে সুন্দর রূপে চিত্রিত থাকে। ওথেলো—সদাশয় ওথেলো—যে অতি অল্পকালমধ্যে স্ত্রী-ঘাতক হইবেন ; অনন্ত চিন্তাশীল হাম্‌লেট যে স্বীয় জীবনের জীবন ওফিলিয়াকে বিসর্জ্জন করিবেন ; সেই প্রণয়িনীর পিতাকে স্বহস্তে বধ করিবেন ; কার্য্যকুশল রাজসম্মান-ধারী ম্যাকবেথ যে নিদ্রিত, গৃহাগত, অন্নদাতা রাজাকে স্বগৃহে হত্যা করিবেন, তাহা পূর্ব্বে জানা যায় না। কি কৌশলে, কিরূপে, মানব-চিত্তের এরূপ পরিবর্ত্তন হয়, নাটকে তাহাই চিত্রিত থাকে। বাঙ্গালা কোন নাটকেই তাহা নাই।

নীলদর্পণকার প্রভৃতি যাঁহারা সামাজিক কু-প্রথার সংশোধনার্থ নাটক প্রণয়ন করেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহারা নাটকের অবমাননা করেন। নাটকের উদ্দেশ্য গুরুতর—যে সকল নাটক এইরূপ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়, সে সকলকে আমরা নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি—সমাজ সংস্করণ নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিত্যক্ত হইয়া, সমাজ সংস্করণাভিপ্রায়ে নাটক প্রণীত হইলে, নাটকের নাটকত্ব থাকে না। কাজে কাজেই সে সকল নাটকের তাদৃশ উৎকর্ষ জন্মিতে পারে না, এবং জন্মেও নাই। তবে এসকল লেখকদিগের উদ্দেশ্য উত্তম, তাঁহাদিগের নাটক-প্রণয়নের ফলও হিতকর ; অতএব সে সকল নাটকে আমাদিগের আপত্তি নাই। বরং তাহা

দিগকে সাধুবাদ প্রদান করি। নীলদর্পণ প্রভৃতি সময়োপযোগী এবং সুফলোৎপাদক এবং কবিত্ব গুণ-বিশিষ্টও বটে, বলিয়া আমরা সে সকলের আদর করি। কিন্তু যখন নাটককারেরা আরও একটু নামিয়া, ফৌজদারী আদালতের মোকদ্দমার ফয়শালার সঙ্গে সঙ্গে এক একখানি নাটক যুড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন নাটক নাম কলঙ্কিত হইয়াছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

আধুনিক প্রকৃত নাটক সমালোচন করা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল না; বোধ হয় শীঘ্র ঘটিবে না। অন্তঃপ্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত চিত্র করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। ধারাবাহিক কথোপকথন দ্বারা সুন্দর গল্প রচনা নাটকের অবয়ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা নাটকের জীবন নহে। অন্তঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, এবং কিরূপে চালিত হয়, তাহা প্রদর্শনই নাটক-কারের প্রধান কার্য্য। সেইরূপ বহিঃপ্রকৃতি দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয় তাহা প্রদর্শন করাই নবেল-রচয়িতার প্রধান কার্য্য।

উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্কে এই দুই বিভিন্ন ভাবের আমরা সুন্দর উদাহরণ পাইতে পারি। ছায়া রূপিণী-সীতা জনস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন; পূর্ব্ব সুখানুস্মৃতিক্রমে অন্তর্বিচলিতা হইয়াছেন; কিন্তু এরূপ মানস্ চালন নাটক নহে; ইহা নবেল। যখন মত্তহস্তী আসিয়া সীতার পঞ্চবটী বাস সময় পালিত করিশাবকের প্রতি আক্রমণ করিল, বাসন্তী দেখিতে পাইয়া, "সর্ব্বনাশ হইল, সীতার পালিত করি-করভকে মারিয়া ফেলিল" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, সীতা মোহবশতঃ যখন "আর্য্য-পুত্র, আমার পুত্রকে রক্ষা কর" বলিয়া রামকে সম্বোধন করিলেন, তখনও উত্তরচরিত নবেল, নাটক নহে। বাসন্তী মুখ-নির্গত শব্দশ্রবণে সীতা মানসচালিতা হইয়াছিলেন, বাসন্তীর বাক্যঘাতে নহে। ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে নাটক হয় না। আবার যখন রাম বিমান রাখিতে বলিলে সীতা তাঁহার গম্ভীর স্বর শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি; কে এ জলভরা মেঘের মত স্তনিত গম্ভীর শব্দ করিল? আমার শ্রবণ-বিবর ভরিয়া গেল! আজি এ মন্দভাগিনীকে কে সহসা আহ্লাদিত করিল?" তখনও সীতা নবেলের নায়িকা। এদিকে পঞ্চবটী-দর্শনে রামের শোকপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; রাম "সীতে, সীতে" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন; এ শোক নবেলের শোক, এ উচ্ছ্বাস নবেলের উচ্ছ্বাস। কিন্তু বাসন্তী যখন রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?" তখনই প্রকৃত নাটক আরম্ভ হইল। দুই অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল। প্রশ্ন শুনিয়া রাম

ভাবিতে লাগিলেন "বাসন্তী 'মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? আর প্রথমেই কুমার লক্ষ্মণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?"—এইরূপ অন্তঃচালন নাটকের জীবন।

বাসন্তী আঘাত করিতেছেন,—"আপনি কেমন করিয়া এ কাজ করিলেন?" আঘাতের ফল,—"লোকে বুঝে না বলিয়া!" পুনরায় আঘাত,—"কেন বুঝে না?" আঘাতে অবসন্ন অন্তঃপ্রকৃতি উত্তর দিল, "তাহারাই জানে।" পুনর্ব্বার কঠোর আঘাত:—

"নিষ্ঠুর! দেখিতেছি কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়।" রাম প্রকৃতি ছিন্ন হইয়া গেল। ইহার কিছু পরেই আবার বাসন্তী হৃদয়ে প্রতিঘাত হইল। রাম শোকপ্রবাহের উল্টা বান বাসন্তী হৃদয়ে আঘাত করিল; বাসন্তী-রামকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন; কিয়ৎপরে, রামকে অন্যত্র উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতই নাটকের জীবন; দুরদৃষ্টক্রমে বাঙ্গালা ভাষায় কোন নাটকেই এইরূপ চাঞ্চল্যের চিত্র দেখিতে পাই না।

মানবপ্রকৃতিসম্বন্ধে কতকগুলি গূঢ়তত্ত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের অপ্রাপ্য, বিজ্ঞানের অপ্রাপ্য। তাহা কেবল কবিই দেখিতে পান। তাহার প্রকটনই নাটকের উদ্দেশ্য—সেইজন্য নাটকের সৃষ্টি। বঙ্গদেশে নাটকের সে উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—মোহন্তের মোকদ্দমা, নাপিতের মোকদ্দমা, কুলীনের বহুবিবাহ—কি মজার শনিবার ইত্যাদি বিষয়ের প্রকটনার্থ বঙ্গীয় নাটক লিখিত হয়। কতকগুলি নাটককারের উদ্দেশ্য "সসিয়েল রিফরমেশ্যন।" এ 'সসিয়েল রিফরমেশ্যন' অর্থে সমাজ সংস্করণ নহে—ইহার অর্থ বিলাতি রেওয়াজ। যদি দেশে এমত কোন প্রথা থাকে যে ইংরেজে তাহার বিপরীতাচরণ করে, তবে নাটকের দ্বারা তাহার নিন্দা করিতে হইবে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

চার্লী বাবা।

রক্তের আস্বাদন পাইলে কেবল শার্দ্দূল উন্মত্ত হয় না, শোণিতাস্বাদনে মনুষ্যেরও ঘুমন্ত পাশববৃত্তি জাগিয়া উঠিয়া একটু উল্লম্ফন করিয়া উঠে। শিব-

রাত্রিতে দেবালয়ে লোকসমাগম হয় বটে, কিন্তু চড়কের সময় শিবমন্দিরের আশে পাশে অনেক বেশী ভিড় হয়। চড়কে বাণ ফোঁড়া আছে, কাঁটা ঝাপ, বঁটি ঝাপ আছে, চড়কগাছে সন্ন্যাসীর দল ঘোরপাক খায়—সুতরাং একটা বিপদের সম্ভাবনা চড়কতলায় অধিক। যদি একটু রক্তপাত হয়—কে বলিতে পারে? আমার প্রতিবেশী সে দৃশ্য দেখিয়া আসিবে আমি দেখিতে পাইব না। আমাদের শার্দ্দূল-বৃত্তি জাগিয়া উঠে। আমরা আর ঘরে থাকিতে পারি না। শ্যামা পূজার পাঁটা বলি দেখিতে আমাদের যতদূর আগ্রহ হয়, আরতি দেখিতে ততদূর হয় না।

আজ কানপুরের জজকোর্টে এত ভিড় হইয়াছিল ঐরূপ একটা কারণে। মরে সাহেবের খানসামা মাতাবদল মরে সাহেবকে হত্যা করিয়াছে এই অপরাধে সেসন জজ ফরেষ্ট সাহেবের এজলাসে তাহার বিচার হইতেছিল। এরূপ গুরুতর অপরাধে ফাঁসি হওয়াই সম্ভব। ফরেষ্ট সাহেব খুব কড়া হাকিম বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। একে মরে সাহেবের রক্ত, তাহার উপর মাতাবদলের রক্তপাতের সম্ভাবনা। এ প্রলোভন সম্বরণ করা লোকের সাধ্যাতীত।

কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে দুইটি পলকহীন চক্ষু প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠায় সন্দেহে আশঙ্কায় এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। বক্তৃতার একটা বর্ণও না বুঝিলেও সরকারী ব্যারিষ্টারের প্রত্যেক কথায় আসামীর পত্নী লয়লীর গাত্রে শেল বিঁধিতেছিল। যাহাতে তাহার বাক্‌রোধ হইয়া যায় সরকারী ব্যারিষ্টার সম্বন্ধে এইরূপ একটা শুভ সংকল্প প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সমুত্থিত হইতেছিল। সে নিজের কাঁকনী ও করবানী বিক্রয় করিয়া অর্থ দ্বারা নামজাদা বৃদ্ধ উকীল নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহার কণ্ঠস্বর যুবতী লয়লীর কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল এরূপ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা নিশ্চয়ই জজের ও জুরীদিগের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতেছে। কিন্তু জজের মুখের দিকে চাহিয়া আবার তাহার হৃৎকম্প হইতেছিল। জজ যেন পাথরের প্রতি-মূর্ত্তি। সাক্ষির কথাগুলা তিনি গিলিতেছিলেন। লয়লী সে মুখে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ভাব বড় একটা দেখিতে পাইল না। অথচ সে মুখ তাহার নিকট পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার পর যখন একবার জজ তাহার অমৃতভাষী উকীলকে ধমক দিয়া বসিতে বলিলেন তখন তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। একটা গভীর বেদনার অর্দ্ধস্ফুট শব্দে সে কাছারি গৃহের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জজ তাহার দিকে চাহিলেন।

তাহাদের চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল। লয়লী চমকিয়া উঠিল—এ যে চার্ল বাবা! হা গৌরীশঙ্কর!

জজেরও মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। তিনি বিচারাসনে বসিয়া বার বার সেই ক্ষিপ্তপ্রায় শোকবিহ্বলা ললনার প্রতি চাহিলেন। তাঁহার মনে বাল্যকালের অনেকগুলা সুখচিত্র ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার মনোমধ্যে প্রশ্ন হইল—"এ কি লয়লী না কি?" তাহার কোলের শিশু কন্যাটীর মুখে তিনি তাঁহার শৈশবের লয়লীর ষোল আনা নিদর্শন দেখিলেন। সাহেব ভাবিলেন—আসামী লয়লীর কে?

(২)

প্রথম দিনের বিচারের পর ক্লান্ত জজ সাহেব বাঙ্গালার সম্মুখে আরাম-কেদারায় বসিয়া চুরুট পান করিতেছিলেন এবং বসন্তের সান্ধ্য সমীরণে তাঁহার বদন-নিঃসৃত ধূমস্রোত কিরূপে শতধা চূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল ফরেষ্ট সাহেব চক্ষে তাহাই দেখিতেছিলেন। তাঁহার মানস-চক্ষু কিন্তু অপর সুখময় চিত্র দেখিতেছিল। কৃষ্ণনগরের জজের বাঙ্গালায় তিনি তাঁহার আয়ার নিরীহ কন্যাকে মারিতেছেন, বুধিয়া আয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতেছে—'ছিঃ চার্লী বাবা আওরাৎকো নেহি মারনে হোতা।' লয়লী তাহার অভিমানভরা বড় বড় চক্ষে একবার বালক চার্লীর দিকে, একবার মাতার দিকে চাহিয়া ফরেষ্টকে বিব্রত করিতেছে। ফরেষ্ট হাসিয়া বলিতেছে—'গোসা কিয়া লয়লী?' লয়লীর কি আনন্দ! সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—'নেহি চার্লী বাবা। আও হাম্ ঘোড়া হোগা তুম সোয়ার হও।' জজ ফরেষ্ট শিহরিয়া উঠিল। অবস্থার পার্থক্যে জীবনের কি পার্থক্য হয়। সেই লয়লী! কোমল-হৃদয়া সরলা সুন্দরী লয়লী কি আজিকার সেই উৎকণ্ঠিতা রমণী? কথাটা সাহেব বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। সে কত গর্ব্বিতা ইংরাজ মহিলাকে লয়লীর আদর্শে ফেলিয়া মাপিয়া তাহাদের বিলাসপ্রিয়তার নিন্দা করিয়াছে। আজ সেই উদারহৃদয় বাল্যসখী লয়লা দরিদ্রকন্যা বলিয়া একটা নরঘাতকের অভাগিনী স্ত্রী—আর তিনি চার্লস্ ফরেষ্ট সিবিলিয়ানের পুত্র সুশিক্ষা পাইয়াছেন বলিয়া একটা জেলার প্রধান বিচারক হইয়া সহস্র সহস্র লোকের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা হইয়া বসিয়াছেন।

কিন্তু সাহেবের সন্দেহ হইল। এ রমণীই কি তাঁহার ধাত্রী বুধিয়ার কন্যা লয়লী? আর লোকটা কি তাহারই স্বামী? সাহেবের মনে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল না। তবু সাহেব তাঁহার চাপরাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

যে খুনী মোকদ্দমার বিচারের সময় যে স্ত্রীলোকটী উকীলের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, সে আসামীর কে ?

ফজলু বলিল—'হুজুর ! আসামী মাতাবদলকা জেনানা !'

'কেয়া নাম ?'

ফজলু তাহা বলিতে পারিল না। মাতাবদল পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইবার পর স্ত্রীলোকটী আরা জেলা হইতে আসিয়াছিল। সাহেবের আর সন্দেহ রহিল না। বুধিয়ার বাড়ী আরা জেলায়।

(৩)

লয়লী সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় নাই। প্রভাতে উঠিয়াই সে উকীল-গৃহে ছুটিয়াছিল। সে তাঁহাকে বিধিমতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, তাহার স্বামী নিরপরাধ। দুই একবার সে চার্লী-বাবার বাঙ্গালার ফটক অবধি গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কে জানে যদি জজ সাহেব তাহাকে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন ? সে তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রায় প্রত্যেকের পূজা মানিয়াছে, সারা রাত্রি কাঁদিয়াছে, শৈশবকাল স্মরণ করিয়াছে। ভ্রাতৃসদৃশ চার্লীর প্রতি বাল্যের স্নেহের কি সে কোন প্রতিদান পাইবে না ? তাহার মাতা বুধিয়া বাঁচিয়া থাকিলে সে তাহাকে একবার চার্লী বাবার নিকট পাঠাইত। চার্লী বাবার মাতা এবং বৃদ্ধ ফরেষ্ট সাহেবও বিলাতে ছিলেন। সে সংবাদ লয়লী সংগ্রহ করিল। তাঁহারা কানপুরে থাকিলেও লয়লী একবার তাঁহাদের পদতলে পড়িয়া কাঁদিত—মাতাবদলের শিশু কন্যাটাকে তাঁহাদের পদতলে ফেলিয়া দিত। তাহার প্রতি বিধি বিরূপ। সে কি করিবে ?

দ্বিতীয় দিনের বিচার আরম্ভ হইলে লয়লী দেখিল জজের মূর্ত্তি আরও গম্ভীর। তাহার হৃৎকম্প হইল। সেই করুণহৃদয় চার্লী বাবা কিরূপে এরূপ নিষ্ঠুর জজে পরিণত হইল, যুবতী তাহা বুঝিতে পারিল না। সাক্ষীর এজাহার শেষ হইল। জজ আসামীর উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার কোনও সাক্ষী আছে ?

তাঁহার সাক্ষী কেহ ছিল না। তবু তিনি একবার লয়লীর সহিত পরামর্শ করিলেন। জজ সাহেবের মনে ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইতেছিল। সমস্ত সাক্ষ্য বিচার করিয়াও তিনি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এবার লয়লীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি নিঃসন্দেহে বলিতে পারিলেন না যে আসামীই ময়ে সাহেবকে হত্যা করিয়াছেন। তিনি তাহাকে অব্যাহতি দিতে চেষ্টা করিবেন—জুরিদিগকে বুঝাইয়া বলিবেন।

আসামী সাক্ষ্য দিল না। দুই পক্ষের বক্তৃতা হইল। আসামীর তরফে বিশেষ কিছু প্রমাণ হয় নাই। দর্শকমণ্ডলীর মনের ভারটা কমিল। আসামীর ফাঁসির আজ্ঞা হইবে তাহাতে সন্দেহ রহিল না। কেবল লয়লীর প্রাণের ভিতর কে বারম্বার বলিল যে তাহার স্বামী অব্যাহতি পাইবে।

জজ জুরিদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। বিচারগৃহ নিস্তব্ধ। মরে সাহেবের মৃতদেহ একটা স্নান করিবার টবের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার গাত্রে কোনও ক্ষত চিহ্ন ছিল না। শ্বাসরোধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গৃহে তিনি ও আসামী ব্যতীত কেহ ছিল না। একটি খানসামা বাহির হইতে আসিয়া সেই লাস দেখিতে পায় ও স্নানের গৃহ হইতে মাতাবদলকে বাহির হইতে দেখে। সে মাতাবদলকে জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে প্রথমে স্থির হইয়া থাকে। তাহার পর পুলিস আসিবামাত্র পলাইয়া যায়। পুলিস তাহাকে কানপুর ষ্টেসন হইতে ধরিয়া আনে।

জজ সাহেব বলিলেন—'প্রথমে ঠিক্ এই কথাগুলা শুনিলে আসামীর উপর খুবই সন্দেহ হয়। কিন্তু কতকগুলা কথা তাহার বড়ই স্বপক্ষে।'

দর্শকমণ্ডলী একটু বিচলিত হইল। জজ সাহেব একবার লয়লীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—আসামীর পক্ষে এরূপ একটা গুরুতর অপরাধ করিবার কোনও কারণ পাওয়া যায় না। মরে সাহেব তাহাকে খুব বিশ্বাস করিত। তাহার কোনও দ্রব্য চুরি যায় নাই। মরে সাহেবের সহিত কাহারও শত্রুতা ছিল না। সুতরাং আসামীকে এ কার্য্য করিতে কেহ উত্তেজিত করিয়াছে সে সন্দেহ ভিত্তিহীন। কোনও কারণ ব্যতীত লোকে অপরাধ করে না। সে কেন এরূপ ভাবে তাহার প্রভুকে হত্যা করিল তাহার কোনও কারণ আমরা পাই নাই।

সরকারী ব্যারিষ্টার বড় বিচলিত হইল। লয়লীর উকিল একটু হাসিল। চার্লী বাবা লয়লীর চক্ষে একটা গভীর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের ভাব দেখিলেন।

এবার তিনি এক ভীষণ কথা বলিলেন। সরকারী উকিল ও পুলিস সাহেব তাঁহার মানসিক নিরাময়তা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। ফরেষ্ট সাহেব বলিলেন—"এ মোকদ্দমার প্রধান বিবেচ্য এই যে মরে সাহেবকে আদৌ হত্যা করা হইয়াছে কি না। সাক্ষ্য শুনিয়া বোধ হয় স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।'

এবার গৃহের নিস্তব্ধতা একটু ভঙ্গ হইল। সকলে সন্দিগ্ধচিত্তে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। জজ সাহেবের মুখে গম্ভীর ভাব। সত্য আবিষ্কার

করিয়া একটা বিজয়গর্ব্ব তাঁহার মুখে শোভা পাইতেছিল। বোধ হয় লয়লীকে না দেখিলে তিনি আসামী পক্ষ হইতে সাক্ষ্যকথা এত অধিক বিশ্লেষণ করিতেন না। তিনি যাহা বলিতেছিলেন তাহাতে তাঁহার আদৌ সন্দেহ ছিল না। তিনি উত্তমরূপে ব্যাপারটার মনে মনে আলোচনা করিয়া তবে বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে স্বাভাবিক উপায়ে মরের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি জুরিগণকে বলিলেন—"যদি গলা টিপিয়া কেহ মরেকে হত্যা করিত তাহা হইলে তাহার গাত্রে দাগ থাকিত। মরে জলে স্নান করিবার জন্য ডুবিলে যদি কেহ তাহাকে চাপিয়া ধরিত তাহা হইলে মরে আত্মরক্ষার্থ ছটফট্ করিত। টবটি পাঁচ ফুট উঁচু। যখন প্রথম তাহাতে লাস দৃষ্ট হয় তখন তাহা প্রায় জলপূর্ণ ছিল কেবল উপর হইতে তিন ইঞ্চি খালি ছিল। যদি আসামী এত অধিক ক্ষমতাশালী হইত যে উপর হইতে বজ্রমুষ্টিতে মরেকে টিপিয়া ধরিতে পারিত তাহা হইলে তাহাকে দোষী বলা যাইত। মরে সাহেবকে আপনারা অনেকেই দেখিয়াছেন। একবার আসামীর দিকে তাকাইয়া দেখুন।

মার্কনি সাহেবের জন্মিবার লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানুষ চক্ষের তাড়িত-প্রবাহে নিঃশব্দে অপরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে শিখিয়াছে। জজ সাহেবের বক্তৃতার ফল মাতাবদল বা লয়লী কিছুই বুঝিতেছিল না। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়াছিল। সে ভাবপূর্ণ কটাক্ষের অর্থ-বোধ কে করিতে পারে? উভয়েরই চক্ষু দিয়া বারিধারা পড়িতেছিল। এ জনমে আর তাহাদের মিলন সম্ভাবনা ছিল না তাহা তাহাদের কটাক্ষ-ভঙ্গিতে বেশ বুঝা যাইতেছিল। তাহাদের শিশুটি একবার পিতার মুখের দিকে চাহিতেছিল আর এক একবার মাতার চক্ষের জল দেখিয়া বিস্মিত হইতেছিল।

দায়রাগৃহের সকলে মাতাবদলের দিকে চাহিলে প্রণয়ি-যুগলের চমক ভাঙ্গিল। বাস্তবিক তাহাকে নরঘাতক বলিয়া বোধ হইতেছিল না। তাহার মুখে বেশ নির্দ্দোষিতার প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। জুরিদিগের মুখ প্রসন্ন ভাব দেখিয়া ফরেষ্ট সাহেব বুকে বল পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন যে আসামী দ্বারা এ কার্য্য সম্ভবপর নহে। মরে সাহেব জলে ডুব দিয়াই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়াই সম্ভবপর।

জুরিগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। জজ বলিলেন—একটা কথা আসামীর বিপক্ষে বলা যাইতে পারে তাহা তাহার আচরণ। ঠিক মৃতদেহ

আবিষ্কার হইবার পরই সে বড় বিচিত্র ভাবে ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার জবাব কি আপনারা উপযুক্ত বিবেচনা করেন না। সে বলিয়াছে যে সাহেবের মৃতদেহ দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে এ দোষ তাহার স্কন্ধে পড়িবে। সে তাই তাড়াতাড়ি পলাইয়া রেলে চড়িয়া আপনার স্ত্রী ও শিশুর নিকট শেষ বিদায় লইতে গিয়াছিল। কথাটায় অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। সত্য হইলে বুঝা যায় লোকটার হৃদয় আছে—লোকটা প্রণয়ী।

জজ সাহেব আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল কাছারির বাহিরে মুক্ত মাতাবদল আপনার শিশুটীকে বক্ষে লইয়া বারম্বার তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে এবং আলু থালু বেশে হর্ষোৎফুল্লা লয়লী অঞ্চল হইতে শেষ কপর্দ্দকটি লইয়া চাপরাসী বেয়ারা পাহারা-ওয়ালা প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন করিতেছে। একদল লোক একটু নিরাশা-অলস চক্ষে তাহাদের তিনজনকে দেখিতেছিল। এবং সামলা হাতে করিয়া মহোল্লাসে তাহার উকীল বিজয়ী বীরের মত জনতার দিকে চাহিয়াছিল।

(৪)

সন্ধ্যার পর ফরেষ্ট সাহেব বাঙ্গলার সম্মুখে চক্ষু মুদিয়া লণ্ডনস্থিতা প্রণয়িণীর মুখপদ্মের ধ্যান করিতেছিলেন। তাঁহার মুখে একটা বেশ শান্ত ভাব বিরাজ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। লয়লী তাঁহার পদতলে কন্যাটিকে রাখিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল—চার্লী বাবা! হুজুর! ভগবান আপ্‌কো সলামত—

চার্লী বাবা সে মুখ দেখিয়া কাতর হইলেন। লয়লীর সেই মলিন বাস পরি-হিত শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া চুম্বন করিয়া লয়লীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া সাহেব বলিলেন—লয়লী! বহিন্! খুসি হুয়া!

খুসী হইবে না? লয়লী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে তাহার নির্দ্দোষ স্বামীকে অপর কোন জজ ছাড়িত না। চার্লী বাবা যে শীঘ্রই লাট সাহেব হইবেন সে সে আশা ব্যক্ত করিল।

শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে দুই মাস পরে চার্লী বাবার বিবাহটা হইয়া গেলে লয়লী তাঁহার মেমের নিকট কার্য্য করিবে। কৃতজ্ঞ লয়লী ফরেষ্ট সাহেবের পদচুম্বন করিতে গেলে সাহেব উঠিয়া পলাইলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

অক্ষয়চন্দ্রের "প্রায়শ্চিত্ত"।

গত ফাল্গুন মাসের 'মানসী' পত্রিকায় সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"আজি কয়েক বৎসর হইল স্বদেশীর খুব ধুমধামের দিনে, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তু ভবনে বঙ্কিমোৎসবে সুরেন্দ্র বাবু আর একটি মহাত্মা (নাম ভুলিয়া গেলাম) আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন।...কলিকাতার ও নিকটের বহুতর ভদ্র সন্তান এবং ভট্টপল্লীর ঠাকুর মহাশয়গণ প্রভৃতি অনেক লোক একত্র হইয়াছিলেন। তখনকার দিনের একজন চাঁই ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—তিনি এই বঙ্গমাতার নাম লইয়া বাহ্বাস্ফোটের একজন সর্দ্দার। আমার পান্সী কাঁটালপাড়ার ঘাটে লাগিল, আমার পাশে একগলা গঙ্গাজলে উপাধ্যায় স্নান করিতেছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রথমেই প্রশ্ন করিলাম—'আপনারা বঙ্গমাতা বঙ্গমাতা করিয়া এত বাড়াবাড়ি করিয়া জগজ্জননী ভারত-মাতাকে ভুলিতে বসিয়াছেন কেন? আমরা কি কাশী, কাঞ্চী, মথুরার মায়া ভুলিয়া যাইব? বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি সমস্তই ভুলিব? রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দ্রোণের কথা মনেই আনিব না? সে কিরূপ Patriotism (দেশভক্তি) হইবে?" ব্রহ্মবান্ধব আমার প্রশ্নে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, ধীরে ধীরে ঘাটে উঠিলেন, আমিও উঠিতে লাগিলাম। উপাধ্যায় মাথা পুঁছিতে পুঁছিতে বলিলেন, "আপনি বঙ্কিমোৎসবে আসিতেছেন, তিনি যে সপ্ত কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে বলিয়া গিয়াছেন, তবেই ত বাঙ্গালী হইল।" আমি বলিলাম, "সন্ন্যাসীরা বুঝিয়াছিল ভারতমাতার (Fighting force) তরবারি ধরিবার উপযুক্ত ব্যক্তি সপ্তকোটি।" ব্রহ্মবান্ধব আবার বলিলেন, 'আনন্দমঠ জিনিষটা বাঙ্গালা লইয়া।' আমি বলিলাম, 'কে বলিল! একজন হিমালয় দেশবাসী মহাপুরুষ পরিচালক, আর বন্দে মাতরং সঙ্গীত সমগ্র ভারতের সুবোধ্য সহজ সংস্কৃতে; ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, সেই সঙ্গীত ভারত-মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত?' ব্রহ্মবান্ধব নিরুত্তর হইলেন, আমিও স্বস্তি লাভ করিলাম। বাস্তবিক ভারতমাতার স্থলে বঙ্গমাতার স্থাপন-চেষ্টা দেখিয়া আমার বড়ই অশান্তি হইয়াছিল।"

"ভারত-মাতার স্থলে বঙ্গমাতার স্থাপন চেষ্টা", বাঙ্গালীর পক্ষে ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে উপস্থিত আমরা বিশেষ কিছু বলিব না। আমাদের প্রশ্ন,—

অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে বঙ্কিমের দেশ-মাতা ও বঙ্কিমের আনন্দমঠ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সে মন্তব্য কি ঠিক ?

"বাহ্বাস্ফোটের সর্দ্দার" (?) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এখন জীবিত নাই। অতএব, এখন আমাদিগকে অক্ষয়চন্দ্রেরই নজীরের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার জেরার চোট হটিয়া গিয়া 'স্তব্ধ' ও 'নিরুত্তর' হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব 'নিরুত্তর' হইয়াছিলেন বলিয়া যে অক্ষয়চন্দ্রের ভ্রমপূর্ণ উক্তিকেও বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে,এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না। বঙ্কিমের রচনাদি পাঠ করিয়া আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, অক্ষয় বাবু বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অবশ্য প্রমাণ ব্যতীত একথা কাহাকেও স্বীকার করিতে বলি না। কিন্তু প্রমাণও এ বিষয়ে যথেষ্টই আছে। প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাই এইবারে দেখাইয়া দিব যে, বঙ্কিমবাবুর 'দেশমাতা'র লক্ষ্য বঙ্গভূমি,—ভারত-ভূমি নহে। দেখাইয়া দিব যে, বঙ্কিম বাবু বঙ্গদেশের উদ্দেশে যত 'মা' 'মা' করিয়াছেন, আর কোন সাহিত্যসেবী আজ পর্য্যন্ত তেমন করেন নাই।

অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালীর বাঙ্গালা গানের সংগ্রহ হইল—নাম হইল, "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী।" তাহাতে উদ্দীপনা, শোচনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা নামে প্রায় শত সংখ্যক জাতীয় সঙ্গীত প্রকাশিত হইল—সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। তাহার পর প্রায় বিংশতি বৎসর কাল ঐ ভাবেই চলিতেছিল। বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত ওরই মধ্যে একবার বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার জন্য শোক করিয়াছিল মাত্র।"

কিন্তু এ কথা কি ঠিক ? কমলাকান্ত কি বাঙ্গালার জন্য কেবল একবার মাত্রই শোক করিয়াছিল ? বলিতে পারি না, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র কমলাকান্তকে কি ভাবে বুঝিয়াছেন ! আমাদের কিন্তু ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে এই মনে হয় যে, কমলাকান্তের দপ্তরের ভিতর প্রায় সর্ব্বত্রই 'বঙ্গমাতা'র জন্য বঙ্গসুত বঙ্কিমের শোকাশ্রু-চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে।

শুধু 'কমলাকান্তের দপ্তরে' নহে ; বঙ্কিমের লেখনী নানা স্থানে নানারকমেই বঙ্গপ্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহার মাসিক পত্রের নামকরণেই তাঁহার বঙ্গপ্রীতির পরিচয় পাইয়া থাকি। তিনি যে মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'ভারতদর্শন' বা অন্য কোন 'দর্শন' রাখেন নাই। নাম রাখিয়াছিলেন,—বঙ্গদর্শন !

তাহার পর, এই বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষেই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গদেশের জন্ত শোক করিতে দেখি,—বঙ্গদেশকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে শুনি। কোন এক গ্রন্থ সমালোচনার উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে? এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। জন্মভূমি-সম্বন্ধে আমরা যে "স্বর্গাদপি গরিয়সী" বলিবার অধিকারী নই, আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। সেই কথা মনে পড়ায়, আমরা এ আক্ষেপ করিলাম। যে মনুষ্য জননীকে "স্বর্গাদপি গরিয়সী" মনে করিতে না পারে, সে জাতি, জাতি মধ্যে হতভাগ্য। আমরা সেই হতভাগ্য জাতি বলিয়া এ রোদন করিলাম।"

এই কয় ছত্রের ভিতরে আপনারা কি দেখিতেছেন? ভবিষ্যৎ 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারামে'র বীজ কি উহার মধ্যে নিহিত, দেখিতে পাইতেছেন না? যদি দেখিতে না পাইয়া থাকেন, তবে আসুন, আবার দেখাইতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তরূপে কি বলিতেছেন, আবার শুনুন;—

"আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না? তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকা, মিসরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।"

"চাহিবার এক শ্মশান-ভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ-যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমির প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌত-বাহিনী গঙ্গা তর তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি—তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাহার পা ধুয়াইতে, সে মাতা কোথায়?······বুঝি, তোমারই অতল গর্ভমধ্যে যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন! বুঝি, কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্ব-পদ-শব্দ মাত্রে নৈশ নীরব বিস্মিত করিয়া, যবন সেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী

অন্তর্হিত হইতেছেন।.......।...যদি গঙ্গার অতল জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?—

যখন রন্ধনশালাতে যাই,
তুয়া মাতা গুণ গাই,
কাব্যের ছলনা করি কাঁদি।"

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশকেই যে দেশমাতৃকারূপে বরণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে এখনও কি কাহারও সন্দেহ আছে? অক্ষয়চন্দ্র লিখিতেছেন যে, "বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্ত ওরই মধ্যে (অর্থাৎ বিংশতি বৎসর কাল মধ্যে) একবার বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার জন্য শোক করিয়াছিল মাত্র।"—কিন্তু এ কথা একটুও ঠিক নহে। 'বঙ্গজননী'র জন্য কমলাকান্ত পুনরায় কিরূপ 'শোক করিয়াছিল', তাহা দেখুন,—

"আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃ-সন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা! কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতোরুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূর প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা! হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রু-মর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা বিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ! আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ দুঃখ দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি

গ্রহণ কর! এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্ত জলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর! এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববল-ধারিণি. নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি,—এসো মা, গৃহে এসো—ছয়কোটি সন্তানে একত্রে, এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয়কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎ সুন্দরি চারু পূর্ণচন্দ্র ভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধুসেবিতে সিন্ধুপূজিতে সিন্ধুমথনকারিণি, শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও, সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা! ... ... মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা!- এবার সুসন্তান হইব—সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়-ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ, উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী!"

উপরি-উদ্ধৃত কমলাকান্তের উক্তিতে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, বঙ্গজননীর জন্য বঙ্কিমের বিশাল হৃদয়ের গভীর শোক উহার ছত্রে ছত্রে স্পন্দিত হইতেছে। উহা যে শুধু শোকেরই অভিব্যক্তি, তাহা নহে। বঙ্গ-জননীর উহা এক অপূর্ব্ব স্তবও বটে! পাঠক সকলকে এই স্তবের সহিত 'বন্দেমাতরং' সঙ্গীতের স্তব একবার মিলাইয়া পড়িতে আমরা অনুরোধ করি। তাহা হইলে, তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঐ উভয় স্তবে একই মায়ের ছবি প্রকট হইয়াছে। উভয় স্থলেই ছবি এক; শুধু আঁকিবার প্রণালী বিভিন্ন। একটি বঙ্গভাষায় গদ্যে রচিত এবং অপরটি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে মিশাইয়া ছন্দে গ্রথিত। সন্তান সম্প্রদায় গায়িতেছেন,—

> "সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
> দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
> অবলা কেন মা এত বলে।"

আর কমলাকান্ত বলিতেছে,—"এই ছয়কোটিকণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,—এই ছয়কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব।......যাঁহার ছয়কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি?"

ইহার উপর কি আর কোন টীকার দরকার করে? অক্ষয়চন্দ্র কি এখনও বলিতে চাহেন যে, কমলাকান্তকথিত ঐ ছয়কোটি সন্তান, ভারতেরই fighting force কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে? তিনি বলিতেছেন,—"বন্দেমাতরং সঙ্গীত সমগ্র ভারতের সুবোধ্য সহজ সংস্কৃতে।" কিন্তু, "অবলা কেন মা এত বলে,"—কি সংস্কৃত ভাষা?

আনন্দমঠের ব্রহ্মচারী-সত্যানন্দ সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভূজা প্রতিমা দেখাইয়া মহেন্দ্রকে বলিতেছেন—"এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্তা। দিগভুজা"—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণীবিদ্যা বিজ্ঞান-দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপে গণেশ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

আর কমলাকান্ত কি বলিতেছে, শুনুন;—"কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণীবিদ্যা বিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

সত্যানন্দের 'মা' এবং কমলাকান্তের ঐ 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা', এই দুয়ের মধ্যে কেহ কিছু প্রভেদ দেখিতেছেন কি? যদি কোন পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলে আমরা কোন্ সাহসে বলি যে, 'সত্যানন্দ ভারতবর্ষের উদ্দেশে 'মা' 'মা' করিয়াছেন?

'আনন্দমঠ জিনিষটা যে বাঙ্গালা লইয়া'—ব্রহ্মবান্ধবের এ কথায় আচার্য্যের খুব আপত্তি দেখিতে পাই। আচার্য্য আপত্তি করিয়াছেন বটে; কিন্তু সে আপত্তির অনুকূলে বিশেষ কিছু প্রমাণ দেন নাই। প্রমাণ দেন নাই বলিয়া তাঁহাকে দোষ দেওয়াও চলে না! কারণ, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব! তবে তাঁহার আপত্তির প্রতিকূলে প্রমাণের যে কোনও অভাব নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার আপত্তি-খণ্ডন প্রয়োজন-বোধে এস্থলে 'আনন্দমঠ' হইতে এক আধটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলিল,—"তোমার কি কিছুতেই ধৈর্য্য নষ্ট হয় না?

দেখ, যতদেশ আছে—মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন দুর্দ্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়?………এ নেশাখোর দেড়েদের না তাড়াইলে আর হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে?" মহেন্দ্র বলিল,—"তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?"

দস্যু গাহিল :—

"সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।"

* * * * *

মহে। 'না হয় দশবিশ হাজার হ'ল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। 'পলাশীতে ইংরেজের ক-জন ফৌজ ছিল?'

মহে। 'ইংরেজ আর বাঙ্গালীতে?'

'আনন্দমঠ জিনিষটা যে বাঙ্গালা লইয়া' এবং আনন্দমঠের সহিত 'কাশী-কাঞ্চী'র যে কোনও সম্পর্ক নাই, একথা এখন বোধ করি, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এত প্রমাণ-প্রয়োগ সত্ত্বেও যদি কাহারও সন্দেহ-ভঞ্জন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আচার্য্যের ফাঁকা ফয়তার বাহাদুরী আছে, বলিতে হইবে!

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বঙ্গদর্শনে বঙ্গমাতা ও বঙ্গসুতের জন্য যেমন প্রাণ ভরিয়া রোদন করিয়াছেন, তেমন অকৃত্রিম রোদন করিতে আজ পর্য্যন্ত আর কোনও সাহিত্য-সেবীকে দেখি নাই। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'বঙ্গদেশের কৃষক' এবং 'বঙ্গভূমি শস্যশালিনী' বলিয়া কি আমাদিগের দুর্ভাগ্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁহার চোখের জল জড়ানো-মাখানো রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন,—"যে বলে, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।"—আমাদের বিশ্বাস যে, ঐ ভাবের প্রেরণায় বঙ্কিমের সীতারাম, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। মনে হয়, ঐ ভাব প্রভাবে বঙ্গদর্শনেরও বিকাশ ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমের ঐ আশ্বাসবাণী তাঁহার অধিকাংশ রচনাতেই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত দেখিতে পাই।

অক্ষয়চন্দ্র 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—"এই যে কলিকাতা

হইতে রাজধানী চলিয়া গিয়াছে, এটা তোমাদের সেই কিম্ভূতকিমাকার স্বদেশীর অবশ্যম্ভাবী ফল।.........বাজারের স্বদেশীর মত বোকামির ব্যাপার বোধ করি জগতে আর কখনও হয় নাই।"

এই কয়ছত্র পাঠ করিবামাত্র রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা আমাদের মনে পড়িল। সে লেখাটার সহিত এই কয়ছত্রের এক মজার যোগ আছে দেখিয়া, তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—"যে কাজকে আমরা আমাদের কাজ বলিয়া বরণ করি, তাহাকে আমরা কেহই আমার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে এখনো শিখি নাই। সেইজন্য আমরা সকলেই পরামর্শ দিতে অগ্রসর হই, কেহই সাহায্য করিতে প্রস্তুত হই না; ত্রুটি দেখিলে কর্ম্মকর্ত্তার নিন্দা করি, অকর্ম্মকর্ত্তার অপবাদ নিজের উপর আরোপ করি না,—ব্যর্থতা ঘটিলে এমন ভাবে আস্ফালন করি, যেন কাজ নিষ্ফল হইবে পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সেই জন্যই অত্যন্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক নির্ব্বোধের উদ্যোগে যোগ দিই নাই।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি যে আজ অক্ষয়চন্দ্রের দ্বারাই অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণিত হইবে, সে কথা কখনও মনে করি নাই। যাউক, এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে চাহি না। ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি অক্ষয়চন্দ্র যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এইবারে দুই একটা কথা বলিয়া এ আলোচনা শেষ করিব।

আমাদের বক্তব্য এই যে, কোন এক মৃতমনীষীর প্রতি 'বাহ্বাস্ফোটের সর্দ্দার' কথাটা ব্যবহার করা কি ভদ্রজনোচিত? ইহা কি আচার্য্যের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে? মনে পড়ে, স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার কোন এক মৃত ব্যক্তির প্রতি অসংযত ভাষা ব্যবহার করায় স্পষ্টবাদী সুরেশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,—"যিনি এককালে বঙ্কিমের, 'বঙ্গদর্শনে' লিখিবার একটু স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে, মৃতের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, অন্ততঃ তাহা জানা উচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতত্ব ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর আমাদের ভাল লাগে নাই।"—আজ কি অক্ষয়চন্দ্রের প্রতি আমাদিগকে ঐ উক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে? আমরা কি কেবল ভাষার অনুপ্রাস ও মিষ্টতার প্রতিই লক্ষ্য রাখিব? ভাষার শিথিলতা পরিহার করা কি একেবারেই অনাবশ্যক?

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

কবিতা-কুঞ্জ।

মান অবসানে।

একি ভ্রম একি ভ্রান্তি আত্ম প্রবঞ্চনা!
অনুদিন হৃদিপটে মূরতি আঁকিয়া—
সে কম চরণতলে পড়েছি লুটিয়া—
একান্ত অধীনা রব এ মোর সাধনা—
কৃপা করি এলে তুমি হে মোর বাঞ্ছিত!
অবারিত প্রীতি স্নেহ দিলে গো যতনে
ভুঞ্জিনু অনন্ত সুখ হিয়া তিরপিত—
কি গুণে পাইনু আমি এ হেন রতনে!
তারপর কি কুক্ষণে তুচ্ছ অনাদরে,
কোন বৃত্তি হৃদিতলে ছিল সঙ্গোপনে—
আপনা বিস্মরি দাসী অভিমান ভরে—
মিলন তৃষিত আঁখি ঝাঁপিল বসনে,—
এস তুমি এস নাথ এস একবার—
নাহি গর্ব্ব নাহি মান একান্ত তোমার!

শ্রীউমাচরণ ধর।

পল্লীর প্রতি।

হে স্নেহশালিনী মাতা তোর কোলে যবে—
ছিনু আমি ক্রীড়ারত অমল শৈশবে,
তখন বুঝিনি দেবী কি যে আকর্ষণ,
ভরি' আছে তোর ওই শ্যামল আনন!
তোর সেই নদীনীর, রসালের ছায়া—
বুঝিনি মা তার প্রাণে আছে এত মায়া,
শ্যামল প্রান্তরে সেই বকুলের গাছে
কে জানিত বল, মাগো এত মধু আছে!
আজি হায় প্রাণ মোর নিয়াছে কাড়িয়া
তব নদী-কলনাদ মর্ম্মর পাতার।
তব পরিচিত পথে আমার এ হিয়া
উদাসে ছুটিয়া চলে হায় অনিবার!
শুধু দেহখানি লয়ে নীরস প্রবাসে
একাকী কাটাই দিন, নীরে আঁখি ভাসে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

স্মৃতি।

(১)

শুকাইলে ফুল শাখে,
রূপ যায়, গন্ধ থাকে;
নদী-বুকে পলিরেখা বর্ষা রেখে যায়।
গানশেষে শ্রুতিমূলে,
সুর মৃদু মধু দুলে;
বর্ষ-অন্তে বর্ষফল থাকে এ ধরায়।

(২)

গেছ, সখে, স্বর্গপুরে,—
জরা মৃত্যু হ'তে দূরে;
মিশে গেছে দেহ তব পঞ্চভূতে হায়!
কোথা তুমি, কোথা আমি
তুমি মুক্ত, আমি কামী!
কত দূর, কত ভেদ, আজ দু'জনায়!

(৩)

জানি না—কেমন ক'রে
ভুলে, সখে, আছ মোরে,
আমা চেয়ে ভালবাসে কেহ কি সেথায়?
এযে স্বরগের ভূমি,
নহে কেহ মর ভূমি;
দেবতা হইলে বুঝি দয়া মায়া যায়!

(৪)

ছেড়ে যদি যাবে শেষে,
কেন মিছে ভালবেসে
পুড়িতে রাখিয়া গেলে শোক-সাহারায়?
যতক্ষণ রহে দেহ,
ততক্ষণ প্রেম স্নেহ!
মরণের সঙ্গে কিগো প্রেম মরে যায়!

(৫)

হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা,
পর দুখে নিজে কাঁদা,
বুক-ভরা প্রেম যদি কিছু নহে হায়!

তবে কেন প্রেম-খেলা
বিশ্বে দেখি ছুটী বেলা ?
আকাশ-সাগরে মেলা কিবা গরিমায় ?
(৬)
সেথাকার উৎসবে
দেবতারা মিলে যবে,
পড়ে কিগো অশ্রু, সখে, না দেখি আমায় ?
কভু কিগো মনে পড়ে
বাল্য খেলা ক্ষুদ্র ঘরে ?
ধরণীর স্মৃতি কিগো হৃদে চমকায় ?
(৭)
পিতামাতা শোকাতুর,
জ্বলে ধূ ধূ হৃদিপুর,
চাপিয়া বিদীর্ণ বুক কাঁদে উভরায়।
কাতর করুণ স্বরে
মরণে মিনতি করে ;
এস কি গো মর্ত্তে, সখে, প্রবোধিতে তায় ?
(৮)
পুনঃ সে বসন্ত আসে,
ছায় দিক ফুলবাসে ;
গাহে পিক, তীব্র ঠেকে, হৃদি না জুড়ায়।
গেছ, সখে, বহুদূরে ;
স্মৃতি আছে বুক জুড়ে ;
সেই গেছ তুমি ছেড়ে, স্মৃতি কই যায়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

কালের আহ্বান।

মহাকালের আহ্বানে এই বৎসর ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে আমাদের দেশের কয়েকজন কৃতী সন্তান ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ মিত্র

ডাক্তার গণেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন না, দয়া দাক্ষিণ্যে এবং নানা সদ্‌গুণে মণ্ডিত ছিলেন। গত ২৭শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় ৩৫ বৎসর বয়সে হৃদ্‌রোগে অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই অল্পবয়সে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যায় যথেষ্ট যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় একজন প্রধান চিকিৎসকের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কলিকাতাবাসী একজন সুচিকিৎসক হারাইলেন—দরিদ্র একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইল। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তিবারি প্রদান করুন।

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে ১৯শে চৈত্র মঙ্গলবার কলুটোলার প্রসিদ্ধ কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেন মহোদয় নশ্বর ধরাধাম ত্যাগ

করিয়া সাধনোচিত দিব্যধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। পুণ্যবান কবিরাজ মহাশয় ব্যাধিকবলে পতিত হইয়া কোনরূপ যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। সান্ধ্য বায়ু-সেবনে নির্গত হইয়া, তিনি ইডেন-উদ্যানে বসিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন, হঠাৎ হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার শ্বাসবন্ধ হইল—জীবন্ত দেহের পরিবর্ত্তে শবদেহ তাঁহার ভবনে আনীত হইল! এই আকস্মিক বিপদে, এই অশনি-সম্পাতে পরিবারবর্গের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা অপেক্ষা অনুমেয়। পুত্র পরিবার আত্মীয়স্বজন কেহ তাঁহার রোগশয্যায় পরিচর্য্যা করিতে পাইলেন না, ইহা কি কম দুঃখের কথা, কম আপশোষের কথা! এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দিবার কথা নাই, পরম কল্যাণময় ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইল, তুমি আমি কি বলিব!

দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমরা একজন পৃষ্ঠপোষক হারাইলাম। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন; অনেক সাময়িক পত্র তাঁহার সাহায্যে পরিপুষ্ট।

ভগবান দেবেন্দ্রনাথের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই দারুণ শোক-বজ্র সহ্য করিবার বলদান করুন, ইহা আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর

দেখিতেছি মহাকালের বটবৃক্ষে অনেকগুলি ফল পাকিয়া উঠিয়াছে, তাই নীরবে টুপ্ টুপ্ করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। ২২শে চৈত্র শুক্রবার বেলা সাড়ে নয়টার সময়ে অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় বাজার করিয়া বাড়িতে আসেন। আসিয়াই বলেন, আমার বেজায় গরম লাগিয়াছে, আমি একটু শুইব। অমনি একখানা মাদুর পাতিয়া তিনি শয়ন করেন; ছেলেরা তাঁহার মুখচোখের ভঙ্গী দেখিয়া বলে যে, ডাক্তার ডাকিব কি? উত্তরে তিনি বলেন যে, না, ডাক্তার ডাকিতে হইবে না, শীঘ্রই আমি সামলাইয়া উঠিব। এই বলিয়া তিনি নয়ন মুদিত করেন—সেই চোখ বোজাই তাঁহার শেষ চোখ বোজা হইল, আর নয়ন মেলিলেন না। ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। বি-এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যে অধ্যাপনার কার্য্যে ব্রতী হন, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর কাল একটানে, একভাবে ঐ জেনারেল এসেম্ব্লির বা আধুনিক স্কটিশ চর্চ্চ কলেজে কাজ করিয়াছিলেন। আর কোন কলেজে যান নাই, কোন কাজ করিতে চাহেন নাই। স্যর এল্‌ফ্রেড ক্রফট তাঁহাকে সরকারী চাকুরী লইবার জন্য এক সময়ে খুব জেদ করিয়াছিলেন। সরকারী আয়ব্যয় বিভাগেও তাঁহার উচ্চচাকুরী হইবার কথা হয়। তিনি সকল

লোভ বর্জ্জন করিয়া, একনিষ্ঠভাবে ঐ এক কলেজে থাকিয়া অধ্যাপনা কার্য্য করিয়াছিলেন। আজ সহসা কাল তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় আমাদের শিক্ষক-শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শান্ত ও সংযত, নিরীহ সাধুপুরুষ আমরা আজকাল খুব কমই দেখিতে পাই। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় ও অপরাজেয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তিনি অজাতশত্রু ছিলেন, তাঁহার নিন্দা ত কখনই কাহারও মুখে শুনিতে পাই নাই। এ বড় সোজা কথা নহে, সাতচল্লিশ বৎসর কাল যে লোকটা শত শত, সহস্র সহস্র ছাত্রদের লেখাপড়া শিখাইলেন, কত বহি লিখিলেন, কত কাজ করিলেন—অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার নিন্দুক মিলিল না, তাঁহার চরিত্রে দোষ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলিতে কি দেবতার ভাগ্যেও এমন একটানা অনাবিল যশের ধারা ঘটে না। 'গৌরীশঙ্কর দে মহাশয় 'কর্ত্তাভজা" দলভুক্ত ছিলেন—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বারোমাস ছাতাটি বগলে করিয়া প্রতি সপ্তায় তিনি সাধন-আগারে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। যখনই দেখা হইত, তখনই তিনি একগাল হাসি হাসিয়া বলিতেন—কেমন আছ বাবা! সে স্নেহের ডাক আর শুনিব না। যে দোকানে তামাকু লইতেন, সেই একই দোকানে চিরকাল তামাকু খাইতেন ও বসিতেন। একটানা গঙ্গার স্রোতের মতন তাঁহার জীবনতটিনী সমভাবে কুল্ কুল্ করিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে দুরাশার উত্তালতরঙ্গ দেখি নাই, প্রতিযোগিতার তরঙ্গ ভঙ্গ দেখি নাই, ঈর্ষ্যার আবিল বর্ষাপ্রবাহ দেখি নাই। যেমন জীবন, তেমনই মরণ; কাহাকেও কষ্ট না দিয়া কাহাকেও ব্যথিত না করিয়া ধীরে বিনাবাক্যব্যয়ে সিদ্ধ সাধকের মতন গৌরী-শঙ্কর স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় এক সহস্র ছাত্র বৃদ্ধের সেই কনককান্ত শবদেহ কাঁধে করিয়া, শোভাযাত্রার পরাকাষ্ঠা করিয়া নিমতলার ঘাটে গিয়াছিল। এক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর শোভাযাত্রা ছাড়া আর কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে এমন বিরাট শব শোভাযাত্রা ঘটে নাই। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, খৃষ্টান সবাই এ শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিল। এমন বাঙ্গালী ত ইদানীং এমন ভাবে মরে নাই, তাই এমন শোভাযাত্রাও হয় নাই। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অতুল্য, চরিত্রে ও সংযমে অপরাজেয়, মনুষ্যত্বে ও প্রতিভায় অদ্বিতীয় গৌরীশঙ্করের মরণটাও যে দেবতাবাঞ্ছিত হইয়াছিল। তাই কলিকাতার ছাত্রসম্প্রদায় তাঁহার শবদেহের প্রতি দেবতাযোগ্য সম্মান দেখাইয়াছিল।

সত্যই এমন মরণে কাঁদিতে ইচ্ছা করে না। যখন মানুষটাকে মনে পড়ে,

তাঁহার শান্ত, স্নিগ্ধ পবিত্র জীবনের কথা মনে পড়ে—আর হেলায় নীরোগে, সর্ব্বযন্ত্রণাবর্জ্জিত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা মনে পড়ে, তাঁহার নিরীহ নিরাকাঙ্ক্ষ সংসারযাত্রার কথা মনে পড়ে—তখন সত্যই কাঁদিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু যাহা গেল, তাহা ত আর পাইব না; বাঙ্গালায় একটি গৌরীশঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জোড়া ত আর নাই। সে আদর্শ জীবন, সে অজাতশত্রু চরিত্র, সে নিষ্কলঙ্ক নিরাবিল সংসারযাত্রা,সে বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্যের ভারে যূথিকা-স্তবকের ন্যায় নিজ গৌরবে সৌরভে সদা অবনমিত কুসুমগুচ্ছ আর ত পাইব না। তাই দুঃখ হয়, তাই অজ্ঞাতে দুই চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়ে, তাই এক একবার নিরাশার তপ্তশ্বাসে পাঁজর যেন এক একখানি করিয়া ধ্বসিয়া যায়। উচ্চশিক্ষা বিস্তার ত করিতেছ, কিন্তু গৌরীশঙ্করের মতন আর একটি দেবোপম অধ্যাপক গড়িতে পারিবে কি? গুরুর গুরু তিনি, বিদ্বান, জ্ঞানবান, চরিত্রবান্ তিনি, ভারত খুঁজিয়া তাঁহার জোড়া আর একজন অধ্যাপক বাহির কর দেখি? তেমন হইবার নহে, তেমন আর নাই, তাই অধ্যাপক ষ্টিফেন, অধ্যক্ষ ওয়াট প্রমুখ বিদেশী খৃষ্টান অধ্যাপকগণ কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। যাও দেব! পারিজাত কুসুমের মত তুমি আসিয়াছিলে, সেইভাবে—তুমি আপনার ভাবে আপনি মজিয়া,—কালপূর্ণ হইলে চলিয়া গেলে! স্মৃতি তোমাকে সোহাগের কুসুম কিঞ্জল্কে আবৃত করিয়া রাখুক—ইহাই প্রার্থনা, ইহাই কামনা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য-সমাচার।

মানসী।—৫ম বর্ষ, ফাল্গুন। গত ফাল্গুন মাসে 'মানসী' পাঁচ বৎসরে পড়িয়াছে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'নূতন খাতা' লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে 'মানসীর গত বৎসরের সাহিত্য-সাধনের একটা হিসাব-নিকাশে' লেখকের 'মানসী' প্রীতি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। উপসংহারে লেখক 'বঙ্গভাষার পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা' করিয়াছেন। লেখক আমাদের শ্রদ্ধাভাজন হইলেও, সত্যের অনুরোধে আমরা বলিব, ইহা একদেশদর্শিতার পূর্ণ—আলোচনা নহে, বিজ্ঞাপন-রচনা। তিনি নাটকের প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"এ বিভাগের ৫৭ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৩ খানি উল্লেখযোগ্য" তন্মধ্যে তিনি পাঁচখানি উৎকৃষ্ট নাটকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাঁচখানির মধ্যে "পরপারে" একখানি অর্থাৎ যেখানি, ইতিমধ্যে যথেষ্ট অখ্যাতি অর্জ্জন

করিয়াছে। তথাপি আমাদের লেখক এই নাটকখানির উচ্চস্থান নির্দ্দেশ করিয়া অবিচার ও অবিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ছোট গল্প পুস্তকের মধ্যে 'নবান্ন' ও 'নীলাম্বরী' পাঠে তিনি প্রীতিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের ৭খানি গ্রন্থই লেখকের মতে সুন্দর হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ ও সুপণ্ডিত লেখককে এত সুলভে প্রশংসাপত্র প্রদান করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। সাহিত্য-সংসারে এমন দোকানদারী, এমন দূতীগিরির দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 'শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী' সম্বন্ধে একটী কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতা-হিসাবে ইহার মূল্য কিছু না থাকিলেও, ইহাতে তাঁহার 'দাদা'-প্রীতি ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন—

"নিজ বক্ষ-রক্ত দিয়া করেছ গঠন
বিপুল সাহিত্য-কেন্দ্র, মায়ের মন্দির;
ছেঁড়া-পুথি. ইট-কাঠ নানা উপচার—
অপূর্ব্ব পূজার অর্ঘ্য এনেছ সুধীর!"

কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য—আমরা ইহার পূর্ণ অনুমোদন করি। 'দীর্ঘায়ুরহস্য'—পাঠে তৃপ্তি হয়। মার্জ্জনা—কবিতা, অন্ধ অনুকরণ-দুষ্ট। 'রাণী'—সুকবি শ্রীমতী মানকুমারীর লেখনী প্রসূত। ভাব, ভাষা, ছন্দ খুব সাধারণ, লেখিকার অনুপযুক্ত। 'ছিন্নপত্র'—উপভোগ্য। ইহাতে উদ্ধৃত অংশই বেশী, লেখকের কৃতিত্ব অল্প। 'মথুরার দ্বারে'—কবিতা, মন্দ হয় নাই,—একটু যত্ন করিয়া লিখিলে, ইহা ভক্তের প্রাণে সুধাবর্ষণ করিত। 'প্রায়শ্চিত্ত'—সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনা। স্থানান্তরে ইহা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। 'রত্নদীপ'—উপন্যাস, খুব ভাল হইতেছে, তবে 'হোমিওপ্যাথি ডোজে' প্রকাশ বলিয়া পাঠে কেমন অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। 'কোজাগর লক্ষ্মী'—কবিতা, বেশ হইয়াছে। 'মা ও ছেলে'—লেখক মাতৃস্নেহের মহিমা দেখাইয়াছেন। গল্পটী আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

রাণী দময়ন্তী—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ছয় আনা। উৎকৃষ্ট বাঁধাই দশ আনা।

একে রাণী দময়ন্তীর গল্প তাহাতে আবার শ্রীমান সুধীরচন্দ্রের সরল বাঙ্গালায় শিশুদিগের মনোরঞ্জন জন্য লিখিত—কাজেই মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। অধিকন্তু এ পুস্তকে কয়েক খানি উত্তম চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিশুপাঠ্য পুস্তকে আজকাল দেশ ছাইয়াছে এবং এক্ষেত্রে যেমন স্বল্পবুদ্ধির মেকি চলে তাহাতে ভবিষ্যতে এ শ্রেণীর বস্তা বস্তা পুস্তক রচিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অভিভাবকগণ যদি নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া ছেলে

মেয়েদের হাতে "চীনের লণ্ঠন" 'চুষিকাঠী' 'তুর্কীর টুপি' 'পিসিমার কাঁথা' প্রভৃতি চটকদার আবর্জ্জনা তুলিয়া না দিয়া "রাণী দময়ন্তী"র মত পুস্তক প্রদান করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে দেশের নীতিজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। শ্রীমান সুধীরচন্দ্র সুলেখক। তাঁহার এই পুস্তক খানি অমূল্য হইয়াছে। এ পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া উচিত। আশা করি লেখক তাঁহার মনোরম ভাষায় এই শ্রেণীর আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবেন। আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম। 'রাণী দময়ন্তী' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সরল ও মধুর।

প্রবন্ধ মুকুল—শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা।

'আদর্শ গৃহিণী' ও 'নীতিকবিতা' লিখিয়া পূর্ব্বেই রচয়িত্রী বঙ্গসাহিত্যে নাম কিনিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ মুকুলের সুচিন্তিত প্রবন্ধরাশি তাঁহাকে অধিকতর যশস্বিনী করিবে। লেখিকা ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্রী, মধ্যবিত্ত হিন্দুসংসারের দেবী। সুতরাং তাঁহার এই প্রবন্ধগুলি হিন্দুজীবনের আদর্শে পূর্ণ। 'বঙ্গসংসারে হিন্দুরমণীর স্থান' ও 'আধুনিক বঙ্গীয় স্ত্রী সমাজ' নামক প্রবন্ধ দুইটি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মাত্রকে পাঠ করিতে দিলে অল্পবিদ্যা বায়ুরোগ-গ্রস্থা আধুনিক কুলনায়িকাদিগের একটু মতিস্থির হইতে পারে। অপরাপর প্রবন্ধগুলি লেখিকার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচায়ক। এ পুস্তকখানির ঘরে ঘরে আদর হউক, বাঙ্গালী রমণীদিগের দ্বারা পঠিত হউক, ইহাই আমাদের বাসনা।

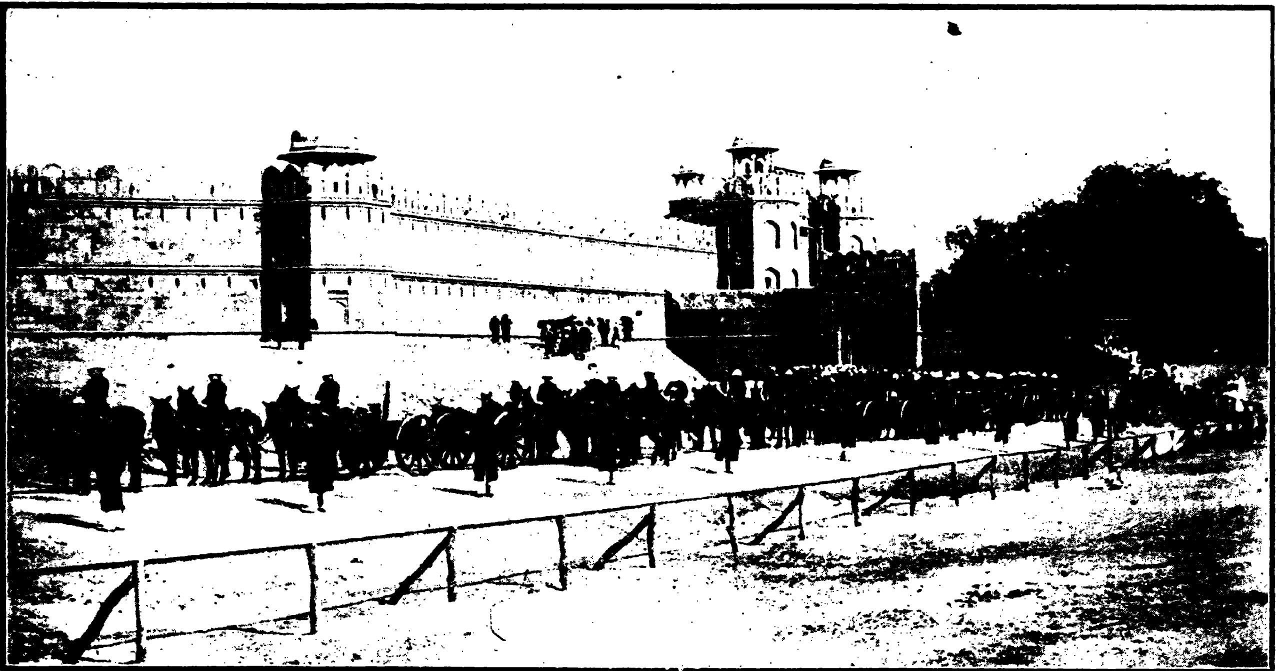
করঙ্ক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

এই পুস্তকে শ্রদ্ধেয় সুধীন্দ্রনাথ বাবুর আটটি ছোট গল্প আছে। তাঁহার অল্প কথায় সুখ দুঃখের চিত্র আঁকিবার ক্ষমতা অতুলনীয়। ইতঃপূর্ব্বে তিনি সে ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। করঙ্ক তাঁহার সে যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ইহার প্রত্যেক গল্পটি মর্ম্মস্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ। কাহিনীগুলির গল্পাংশও মৌলিক। ইহাতে বাঙ্গালার গল্পের সেই চিরপরিচিত ওসমান, জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেতমূর্ত্তির কঙ্কাল নাই—নভেল ম্যাগাজিনের বিলাতী নায়ক নায়িকার বিকৃত চিত্রের বিভীষিকা নাই। সাধারণ উপাদান লইয়া তিনি এক একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন। সে চিত্র একেবারে পাঠকের মর্ম্মে প্রবেশ করে। ইহার ভাব ও ভাষা এত বিশুদ্ধ যে ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হইতে পারে। এ গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিশেষরূপে আদৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাবিত্রী—নাটক। ২৪৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গদ্য আছে, পদ্য আছে, ভাব আছে, ভাষা আছে,—নাই কেবল বিশেষত্ব।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'হিন্দু পেট্রিয়ট্' পত্রের স্বত্বাধিকারী প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ, বিদ্যোৎসাহী ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার 'ফটো ব্লকগুলি' 'অর্চ্চনা'র ব্যবহার করিতে দিতেছেন। আমরা এজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।—অর্চ্চনা-সম্পাদক।



The Fine Art Printing Syndicate, পুরাতন দিল্লীদুর্গ। 147, Baranasi Ghose Street, Jorasanko, Calcutta.

দিল্লী-প্রবেশের পর রাজকীয় অশ্বারোহী কামানবাহী সৈন্যদল দিল্লী-দুর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে।

অর্চ্চনা, ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

ভারতে প্রথম রেলওয়ে।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট একটী স্মরণীয় দিন। এই দিনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, প্রথম খোলা হয়। এটী সমগ্র ভারতের পক্ষে একটী স্মরণীয় দিন। জব চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতা-প্রতিষ্ঠার দিনটী যেমন স্মরণীয়, এটিও সেইরূপ।

অতীত ১৮৫৪ আর বর্ত্তমান ১৯১৩ এর মধ্যে ষাট বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই ষাট বৎসরের মধ্যে কর্ম্মবীর ইংরাজ, সমগ্র ভারতবর্ষকে রেলপথে ছাইয়া ফেলিয়াছেন। ঊর্ণনাভজালের অসংখ্য তন্তুরাশির ন্যায়, সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া নানা কোম্পানী, নানা দিকে রেল খুলিয়াছেন। প্রধান লাইন ছাড়া, শাখাপথও অনেক হইয়াছে। ই, আই, রেলের পর, জি, আই, পি, বি, বি, সি, আই, সাউথ, ইণ্ডিয়ান, মান্দ্রাজ, বি, এন্, রেলওয়ে প্রভৃতি অসংখ্য রেলওয়ে লাইন, ভারতমাতার বক্ষে লৌহালঙ্কাররূপে বর্ত্তমান। ছেলে বেলা পদ্যপাঠে পড়িয়াছিলাম, "ছয় দণ্ডে চলে যায় ছ'দিনের পথ"। ঠিক তাহা না হইলেও আজ কাল যে ১২ ঘণ্টায় কাশী যাওয়া যায়, ২৪ ঘণ্টায় জুব্বলপুর যাওয়া যায়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আগে কাশী ও জগন্নাথ যাইবার সময়, যাত্রীর গৃহে কান্না-গোল উঠিত। কর্ত্তারা উইল করিয়া তীর্থযাত্রা করিতেন। পদব্রজে গো-শকটে দীর্ঘপথ যাইতে হইত, পথে অনেক বিপদ। পদব্রজে চটীর পর চটী, অতিক্রম করিতে হইবে। রাস্তায় চোর, ডাকাত ও ফাঁসুড়ে ঠগের ভয়। কাজেই গৃহত্যাগকালে একটা হুলস্থূল বাধিয়া যাইত। তখন বড় লোকেরা নৌকা করিয়া নদী পথেই প্রায় কাশী যাইতেন। পুরীর পথে, খড়্গাপুরের চটী তখনকার বিখ্যাত চটী ছিল। যাত্রীরা সমস্ত দিন শক্তি সামর্থ্য মতে, পথ চলিয়া চটীতে রান্না-খাওয়া করিত, তারপর প্রভাতে "জয় জগন্নাথ" বলিয়া পুনরায় পথচলা আরম্ভ করিত। এইরূপে দিনের পর দিন, রাত্রের পর রাত্রি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে যাপন করিয়া, সেকালের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, কাশী বা জগন্নাথ যাইতেন। আর এখন—একবার হাবড়ায় গিয়া টিকিট কিনিতে পারিলেই, আপদ চুকিয়া গেল। যেমন পয়সা খরচ করিবে, তেমনি সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাইবে। পয়সার জোর থাকে, থার্ড-কেলাসের গাড়ির মধ্যে প্যাক-করা মালের মত না গিয়া, ফাষ্টক্লাস কম্পার্টমেণ্টে, ইলেক্ট্রিক আলো ও পাখার

সুখ অনুভব করিয়া, রাত্রিটা গদী-মোড়া বিছানায় অঙ্গ ঢালিয়া, নিদ্রা সুখে কাটাইয়া, প্রভাতেই বিশ্বেশ্বরের পুরীর দ্বারদেশে পৌছান যায়।

এখনকার হাবড়া ষ্টেসন যেন এক জনসংঘপূর্ণ রাজধানীর মত। শোনপুরের মেলা যেন এখানে নিত্য লাগিয়া আছে। অৰ্দ্ধোদয় যোগের যাত্রী, যেন প্রতিদিনই হাবড়ায় জড় হয়। দপ্ দপ্ করিয়া বৈদ্যুতিক আলোক জ্বলিতেছে, ঘস্ ঘস্ করিয়া ট্রেণ ছুটাছুটি করিতেছে, লোকে চেঁচাইতেছে, দৌড়াইতেছে, হাঁফাইতেছে, সঙ্গী হারাইয়া চীৎকার করিতেছে, দ্বারপালের ধাক্কা খাইয়া দশ হাত দূরে গিয়া ঠিকরিয়া পড়িতেছে, কুলীর সহিত মোটবহনীর ভাড়া লইয়া বচসা করিতেছে, নিত্য যেন একটা মহা কোলাহলময় বিরাট ভাব। যাহা আপনারা নিত্য দেখেন, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ১৮৫৪ সালে অর্থাৎ অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই হাবড়ার অবস্থাটা কি ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্যই এই প্রবন্ধ।

যে দিন হাবড়া হইতে প্রথম রেল ছাড়িল—সে দিনের কথাটা বলিব। পুরাতন হাবড়া-ষ্টেসনের তখন নাম গন্ধ ছিল না। নদীতীর হইতে—পাঁচ মিনিটের পথে, একখানি ক্ষুদ্র কুটীর—তাহাই প্রথম হাবড়া ষ্টেসন। স্যর ব্র্যাড ফোর্ড লেস্‌লির কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, বর্ত্তমান বিরাটকায় ফ্লোটিং-ব্রিজ বা ভাসমান সেতুও তখন ছিল না। রেল কোম্পানীর সুবৃহৎ "বক্‌লাণ্ড" জাহাজও তখন ছিল না। তখন ডিঙ্গীতে গঙ্গা পার হইয়া, কাদা ঘাঁটিয়া, এই ষ্টেসনে যাইতে হইত। হাবড়ার দিকে—লোকের নামিবার উঠিবার জন্য কোনরূপ বাঁধাঘাট ছিল না। নদীতীর হইতে ষ্টেসনে যাইবার জন্য গাড়ী বা পালকীরও কোন বন্দোবস্ত ছিল না। সাহেব বাঙ্গালী, ছোট বড়—সবারই একদশা। সবারই পক্ষে "পদব্রজের" বন্দোবস্ত। আজকালকার হাবড়া নগরও তখন ছিল না। কত কল, কত কারখানা, কত বড় বড় বাড়ী, এখন হাবড়ার অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধন করিতেছে। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, তখন হাবড়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। তবে নূতন রেল-ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থানটা যেন অপেক্ষাকৃত জমকালো ছিল। ইহার আশে পাশেই, স্তূপাকার রেল, রেলের কারখানা, লোকোমোটিভ্ শেড, এঞ্জিন ও গাড়ী নির্ম্মাণ করিবার কারখানা। যে কয়খানি গাড়ী সেই সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এই খানেই থাকিত। হাবড়া সে সময়ে কলিকাতা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। নদীপার না হইয়া, হাবড়ায় যাইবার অন্য কোন উপায় ছিল না।

তার পর বুকিং-আপিস, বা টিকিট বিক্রয়ের ঘরের কথা। তখনকার বুকিং-আপিস একটী ক্ষুদ্র চালা ঘর। এই চালাঘরের সম্মুখে মহা জনতা। ঠেলাঠেলি, পেশাপেশির খুব প্রাবল্য। দুইজন বাঙ্গালী বাবু, টিকিট-বিক্রেতা। তাঁহারাও মহা-ব্যতিব্যস্ত। একে তাঁহারা নূতন ব্রতে ব্রতী, তাহার উপর প্যাসেঞ্জারের ভিড়। কাজেকাজেই টিকিট বিক্রয়ের সময় একটা মহা হুলস্থূল বাধিয়া যাইত।

সে কালের একজন ইংরাজ-যাত্রী, তখনকার কোন ইংরাজী সংবাদপত্রে হাবড়ার টিকিট বিক্রয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ইংরাজী টুকু এস্থানে তুলিয়া দিলাম। তিনি লিখিতেছেন :—

"To get a ticket is a work of time and most trying to the temper of the impatient traveller. The whistle was screaming but hardly louder than the Bengali writers were vituperating each other instead of attending to our wants."

আর একবর্গের অভিযোগ আবার অন্য রকমের। ইনি লিখিতেছেন :—

"Even if you secured a ticket you were by no means certain of a seat in the train, which by the way was made up of the total coaching stock the line possessed. Three First class,two Second class,and three Trucks for Third class passengers and a brakevan for the Guard. All these vehecles had been built in India, without a model of any kind, under the supervision of Mr. Hodgeson the first Locomotive Superintendent of E. I. Ry, the carriages sent out from England having been most unfortunately lost a few weaks before, the shipwreck of the *Goodwin* at the Sandheads.

টিকিট কিনিলেই যে গাড়ীতে স্থান পাওয়া যাইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। মোটে তিন খানি ফাষ্ট ক্লাস, দুই খানি সেকেণ্ড ক্লাস, আর তৃতীয় শ্রেণীর জন্য তিন খানি Truck বা মালগাড়ী। এই গাড়ীগুলি এদেশেই নির্ম্মিত। একটা কোন নির্দ্দিষ্ট প্ল্যানমতে এ গাড়ীগুলি তৈয়ারি হয় নাই। ই, আই, রেলের প্রথম লোকো-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হজসনের তদারকে এই গাড়ীগুলি তৈয়ারি হইয়াছিল। বিলাত হইতে "গুডউইন" জাহাজে করিয়া যে গাড়ীগুলি আসিতেছিল, তাহাও পৌঁছিল না। এই রেল খুলিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে, "স্যাণ্ডহেডে" গুড্উইন জাহাজ মাল সমেত জলমগ্ন হয়।

যে দিন প্রথম রেল ছাড়ে—সে দিন এক হাজার লোক টিকিট কিনিবার জন্য দরখাস্ত করেন। ইহাদের মধ্যে ইংরাজের দল বেশী। কিন্তু গাড়ীতে

ইহার এক দশমাংশ লোকের স্থান হওয়া অসম্ভব। কাজেই অনেককে নিরাশ-চিত্তে ফিরিতে হয়। সাধারণ সংবাদ পত্রে, এই রেল-খোলার প্রথম দিনে, সরকারী আফিসগুলি বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তাহা হইলে, ষ্টেসনে একটা বিরাট জনতা হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া, সরকার পক্ষ, এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন নাই।

এই সময়ে সপ্তাহে ছয় দিন রেল চলিত, রবিবার রেল-চলা বন্ধ থাকিত। সে দিন সকলের সঙ্গে রেলেরও ছুটী। কিন্তু এই সময়ে "প্রিন্টারস্-ডেভিল" নাম দিয়া, একজন সে কালের 'হরকরা" নামক ইংরাজী পত্রে লেখেন :—

"Attracted by the novelty of the Railway, thousands are daily gathering to witness the running of train, and to take trips to the places on the line, but by the arrangements restricting the running to week days, we who cannot be absent on these days, are deprived of obtaining a peep at the iron-horse May I therefore take upon myself to suggest the propriety (impropriety rather) of running the locomotive on Sundays also to enable us *poor devils* to satisfy the curiosity which now dévours us."

ইহার মর্ম্মার্থ এই "এদেশে রেল ছিল না, নূতন খুলিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক এই রেল চলা দেখিবার জন্য ষ্টেসনে যাইতেছে। কিন্তু আমাদের রবি-বার ব্যতীত ছুটী নাই। যদি রবিবারে রেল চালান হয়, তাহা হইলে আমরা এই "লোহার ঘোড়াটীকে" একবার দেখিতে পাই। আমাদের প্রার্থনা এই যেন রবিবারে রেল চালাইবার বন্দোবস্ত করা হয়।"

বলা বাহুল্য Printer's Devilএর এ করুণ প্রার্থনা, রেলের কর্ত্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। তখন ২৯ নং থিয়েটার রোডে, ই, আই, রেলের হেড্-আফিস ছিল। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড্ ষ্টিফেন্সন, এই রেলের প্রথম এজেন্ট। ষ্টিফেনসন সাহেব—এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—"সাধারণের প্রার্থনা মতে আমরা রবিবারেও ট্রেণ চালাইব। দুইখানি ট্রেণ প্রত্যেক রবি-বারে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত যাইবে।"

বলা বাহুল্য; এই সময় হইতে রবিবারে ট্রেণ চলা আরম্ভ হয়। তখন দিনের বেলাই ট্রেণ চলিত। রাত্রে বন্ধ থাকিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

শ্রুতির ইতিহাস।

(২)

এই বিবাহ পদার্থটী মানব জীবনের মত অনাদি অনন্ত। ঘটনার পূর্ব্বে যেমন ছিল না, পরেও তেমনি থাকিবে না; মাঝে থেকে এমন এক কার্য্য-পরম্পরা সঙ্ঘটন করিয়া যায়, যাহা চিরজীবনে ভুলিবার নয়। রক্তমাংসের দেহ না থাকিলেও নরনারী পর্য্যায়ে দুইটী পৃথক জাতিকে একত্র করিতে বিবাহই প্রধান ঘটক। শরীরী না হইলে যে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সহধর্ম্মিণী থাকিবে না, এমন কিছু শাস্ত্রে লেখা নাই। এই ঘটক ঠাকুরের দুই পত্নী, আর দুই সতীনে ভারি ভাব। মানুষে পারে না'বলিয়া, দুই সতানে সদ্ভাব রাখিয়া, অশরীরীও যে সংসার করিতে পারিবে না, ইতিহাস এমন কথা বলে না। স্বামীর আরব্ধ কার্য্য সযত্নে সম্পাদন করিতে, ইহাদের সখিত্বে কখন আঘাত লাগে নাই। সূচনায় একখানি পারিজাত সুরভি কমনীয় রমণী মুখে আকৃষ্ট করিয়া, যুবা পুরুষের মন চঞ্চল করিতে এবং নবাভ্যুদিত উন্নতিশীল অন্তঃকরণের অধ্যবসায় ক্ষীণ করিতে, এমন আর কাহাকেও দেখা যায় না। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াবিনীরা কেমন করিয়া, ঘটক ঠাকুরের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে, পাশে থাকিয়া পাঠকের তাহা প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

বি-এ ক্লাসের কালেজের ছাত্র যখন অনবরত দর্শন-বিজ্ঞানের জটিল চিন্তায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, চিন্তান্তরব্যপদেশে ইজি চেয়ারে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে আকাশ পাতাল, ভাবিতে থাকে, বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ সম্মুখের উদ্যানে পুষ্পগন্ধ মাখিয়া, যখন জানালার ফাঁক দিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে, ঘটক ঠাকুরের লোলুপ দৃষ্টি তখন অকস্মাৎ এই তরুণ যুবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগী হয়, আর ইঙ্গিত বুঝিয়া, কামনা ও কল্পনা দুই সতীনে টিপি টিপি পা ফেলিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করে, এবং তিরস্করিণী বিদ্যাপ্রভাবে আত্মগোপন করিয়া, ছলিক নাটকের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কামনা একটী উপন্যাসের নায়িকাকে যুবকের মানস নয়নে প্রতিফলিত করিয়া, অবশিষ্ট টুকু পূরণ করিতে, কল্পনাকে সম্মুখে রাখিয়া নিজে সরিয়া গেল। প্রস্তাবনা এইখানে শেষ হইল, প্রথমাঙ্কের প্রথম যবনিকা তুলিয়া ধরিল এখন কল্পনা।

যুবকের মানস নয়নে ফুটিয়া উঠিল মৃণালিনী! আ মরি মরি! কি সুন্দর! কি মধুর! যেমন দৃষ্টি, তেম্‌নি কটাক্ষ! ফুটন্ত সৌন্দর্য্যে অস্ফুট প্রেম! ব্যক্ত যৌবনে অব্যক্ত ভাবুকতা! এ রমণী দৃষ্টিমাত্রে চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, তবে যেন বড় লজ্জাশীলা। যুবক তখন নিপুণ চিত্রকরের তুলিটী ধরিয়া, মনের মত করিতে যেমন রেখাপাত করিবে, অমনি ব্যক্তযৌবনা, পূর্ণ পুষ্টাঙ্গী, ছোট খাটো গিরিজায়া অপাঙ্গে হাসি ফুটাইয়া, অধরে আলোক জ্বালিয়া, কণ্ঠস্বরে সুধাবর্ষণ করিয়া সশরীরে সম্মুখে দাঁড়াইল। সে প্রগল্‌ভতা কেমন আত্মনির্ভরতার অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়াছে, লজ্জা ভয় যেন সেদিকে চাহিতেও সাহস করে না, অথচ বেহায়া বলিতেও ভরসা হয় না। কেবল বর্ণ দেখিয়া মনে হয়, ঐ টুকু বুঝি বিষ্ণু ঠাকুরের কাছে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে, আহা! এ রমণী যদি গৌরাঙ্গী হইত (?) সমালোচনা এইখানে প্রতিহত হইল। আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে, যুবকের যখন শ্বাসরোধের উপক্রম হইতেছে, সময় বুঝিয়া কামনা তখন মানস নয়নে মনোরমাকে প্রতিষ্ঠিত করিল। কল্পনা, পাশে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। এর পর কি হইবে, তা' যেন ঠিক বুঝিয়া, সে একখানি চিত্র আঁকিতে মনোনিবেশ করিল। এদিকে কামনার ভাব-চক্ষু ইঙ্গিতে বলিতেছে, কোন্‌টী চাও? এই শৈশব-যৌবনের, চাপল্য-গাম্ভীর্য্যের আর্জ্জব-কৌটিল্যের মর্ম্মস্পর্শী মধুর মিলনে মনোরমা কি মনে ধরে না? অথবা বিষাদ-মথিত, চিরদুঃখলাঞ্ছিত ভাবগম্ভীর ঐ মুখখানি লইয়া বুঝি একেবারে আত্মহারা হওয়া যায় না? কিম্বা প্রেমিকার পূর্ণ প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠে নাই? তবে মৃণালিনী কি করিল? লজ্জানম্রমুখী যদি সুন্দরী না হয়, তবে গিরিজায়াই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। কিন্তু সেও ত কালী! করালবদনা না হোক্‌, নম্রতা নাই, নগ্নতা আছে। প্রগল্‌ভা বটে, ধরা দেয় না (?) এ হেন জটিল সমস্যার ভিতর দিয়া এতক্ষণে কল্পনার চিত্রাঙ্কন সমাধা হইয়া গেল, সে এখন কামনাকে পশ্চাৎ করিয়া, আলেখ্যখানি যুবকের চোখের উপর স্থির করিয়া ধরিল।

একাধারে মৃণালিনী মনোরমা-গিরিজায়া! রূপে গুণে-ভাবে-রসে কি মধুর মিলন! কল্পনার করধৃত বরবর্ণিনীর বরণীয়রূপে বিদ্যুতের বর্ণও মলিন হইয়াছে সেই উজ্জ্বল-কটাক্ষে চঞ্চল দৃষ্টি। সে তরল অপাঙ্গে অনল-উন্মেষ! কিশোরীর কমনীয়তা আর যুবতীর রমণীয়তা, প্রৌঢ়ার ভাবগাম্ভীর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছে। এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রতিকৃতিখানি বুকে করিয়া যুবক যখন কল্পনার হাতে কলের পুতুল হইল, ঘটক ঠাকুরের তখন জয় জয়কার।

এহেন ঘটক চূড়ামণির সহিত যাঁর পরিচয় নাই, তিনি পরিচয়ের জন্য লালায়িত, আর যিনি পরিচিত, তিনি পদে পদে লাঞ্ছিত। ভোগের স্বাদ যে পায় নাই, সে আকুল হইয়া, আকাশ-পাতাল ভাবে, যে পাইয়াছে, সে ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ফট্ করে। পিপাসা দুই দিনে মিটিয়া যায়,—দুই দিনের আলাপে শ্রুতির শ্রান্তি আসে, একদিনের স্পর্শেই সৌন্দর্য্য মলিন হয়—কল্পনা প্রতিঘাতে পরুষ হইয়া যায়,—যুবকের সাধের সংসারে শোকের ঝড় বহিতে থাকে। ভোগ-লালসা ভোগ্য বস্তুর অভাবে অসুখী করে, সদ্ভাবে অসুখ বাড়িয়া যায়। যে ভালবাসা পাত্রভেদে নানারূপ ধরিয়া, পরিবর্ত্তনসুখে পরম সুখী করিতেছিল, সে এখন এককেন্দ্রে সঙ্কুচিত হইয়া, প্রলয়কালীন সূর্য্যের মত সংসারদগ্ধ করিতে থাকে। ভালবাসা, দিন কতক ভ্রমরগুঞ্জন, মলয় সমীরণ, বিহঙ্গ-কূজন, প্রমোদ উপবনের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। তার পর যে একদণ্ড ঘরে থাকিত না, সে এখন বাহির হইতে চায় না। অকারণ অসুখ করে, অবসাদ আসিয়া, আলস্যকে ডাকিয়া আনে, সাক্ষাৎ না পাইয়া, বন্ধুবৎসল সমবয়স্কেরা ফিরিয়া যায়।

শিবেরও তাই ঘটিল। অন্যের পক্ষে কল্পনার চিত্র দেখিতে দেখিতে, মলিন হইতে থাকে, রূপ ঝরিয়া পড়ে, গুণের স্বাদুতা থাকে না, যৌবনের জোয়ার নামিয়া গেলে তরঙ্গও স্থির হয়। শিবের কিন্তু কল্পনার চিত্র দিন দিন সত্য হইয়া উঠিতেছে, সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতেছে, নিত্য নব বৈচিত্র্যে তন্ময়তার উন্মেষ করিতেছে। বিষ্ণু দেখিলেন, একরকম যোগ ভাঙ্গিতে আর একরকম উপসর্গ আসিল। সে বরং ভাল ছিল, কথা ছিল না, চুপ চাপ বসিয়া থাকিত। এখন কথা ফুটিল ত' সতীর সঙ্গে কথা কহিতে, রাত্রি ফুরাইয়া যায়, কথা ফুরায় না। তখনকার দৃষ্টি শূন্যে বদ্ধ ছিল, কিছু না পাইয়া একদিন ফিরিয়া আসিত, এখন সে ভাবরসে প্রেম-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়াছে, আর ত' ফিরিবে না! সতীর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া চন্দ্র ডুবিয়া যায়, জ্বলিয়া জ্বলিয়া সূর্য্য নিবিয়া যায়, নৈশ অন্ধকার ক্রমে ক্রমে আলোকে মিশিয়া যায়, দেখার শেষ হয় না। তখন নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া, আশার আলোকের একটুখানি ক্ষীণরশ্মি দেখা যাইত, এখন সেটুকুও নিবিয়া গেল। অনুগত-ভক্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া যায়, ব্রহ্মা শত ডাকেও উত্তর পান না, বিষ্ণু আর আমল পাইলেন না।

এখন উপায়? বিষ্ণু ভাবিলেন, এমন উৎপাতে ত' কখন পড়ি নাই! আপনার কৌশলজালে আপনি বদ্ধ হইলাম, সে তেমনই রহিল। তখনও যা'

ছিল, এখনও তাই আছে, সেই ধ্যানস্তৈমিত্য, সেই বহির্জ্ঞান শূন্যতা! লাভের মধ্যে এমন এক সামগ্রী যুটাইয়া দিলাম, যার জন্য সে যোগ কোন কালে ভাঙ্গিবে না।

বিষ্ণু অনেক ভাবিলেন, অনেক যুক্তিতর্কের পর স্থির করিলেন, শিব যেমন একরোখা, তাতে যদি কোন রকমে সতীর সঙ্গে মনান্তর ঘটাইতে পারি, তবে অবলম্বন অভাবে আমাদের দিকেই ফিরিবে। বিষ্ণু যদি তলাইয়া বুঝিতেন, তবে দাম্পত্যকলহ "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" আর "লঘ্বারম্ভে বহুক্রিয়া" এই দুইটী স্থির যুক্তির অন্তরালে থাকতে, তাঁর সিদ্ধান্ত যে কতদূর সঙ্গত, তার একটা মীমাংসা হইয়া যাইত। কিন্তু ভবিতব্য সেরূপ ছিল না, তলে তলে প্রজাপতি যে আঁচড়টী টানিয়াছিলেন, তাহা ফলিবার উপক্রম হইল।

সে সময় দক্ষ প্রজাপতি এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। বিষ্ণু নারদ ঋষিকে ডাকিয়া, গোপনে অনেক পরামর্শ করিলেন। এতক্ষণ ধরিয়া যে গুপ্তপরামর্শ চলিতেছিল, তাহা যে শিবনিন্দাকে দক্ষের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবার প্রস্তাব, সে কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। কারণ শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত সে শিবনিন্দার লতাটীকে মুকুলিত করিয়া নারদ ঋষি অবিলম্বে দক্ষকে উপহার দিলেন। দক্ষরাজা ভয়ানক রাগিয়া, শিবকে বাদ দিয়া, তেত্রিশ কোটি দেবতার নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন।

এখানে দার্শনিক ভাবিতে পারেন "দক্ষ প্রজাপতি এত বড় রাজা, আর রাজবুদ্ধি সেই বা কতখানি! তা' এত বড় লোকটা একটা নিন্দুকের কথায়, সহসা এমনতর অপকর্ম্ম করিবেন, যা' সমাজের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘটাইতে পারে, তাও কি সম্ভব? এখানে কিন্তু দার্শনিকের ভাবনাটা খাটিল না, কোন কালে খাটেও না। দর্শন যত আড়ম্বর করে ফলিতার্থে তত নয়; সে বহুদূরে দৌড়াইয়া যায়, শেষ হাঁপাইয়া উঠে, কিছুই দেখিতে পায় না। আর বিশ্বাস, স্থির থাকিয়া বলিয়া দেয়, এই খানে! এই স্তম্ভমধ্যে আমার পরম প্রেয় পুরুষটী আছেন, কেন না তিনি সর্ব্বত্র। দার্শনিক জোর করিয়া বলে, কখনই না; এ জড়তার ভিতর, কি করিয়া রক্তমাংসের সঞ্চার হইবে? একজাতীয় পরমাণু আশ্রয়ভেদে ভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু বিশ্বাস এখানে জয়ী হইল;—সে দেখাইল অদ্ভূত মূর্ত্তি, নরপশুর অপূর্ব্ব সম্মিলন, সে-ই স্তম্ভমধ্যে। দার্শনিক তখনও ভাবিতেছে, কেমন করিয়া, এমন হইল? ভাবিতে ভাবিতে, কখন কোন্ ছিদ্র ধরিয়া ভাবিবার শক্তিটুকু সরিয়া গেল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অতঃপরও যদি দার্শনিক টিঁকিয়া থাকে, তবে ইতিহাস লেখাই ঝকমারি!

ইতিপূর্ব্বে দক্ষরাজার সহিত শিবের বনিবনাও ভাল যাইতেছিল না। অবশ্য সেটা সতীকে লইয়া; শিব সতীকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে নারাজ; তিনি জানিতেন, দান করা কন্যায় পিতামাতার অধিকার কি? পিতামাতা কিন্তু তাহা বুঝিতেন না। কন্যার সঙ্গে কেমন করিয়া, মমতাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া পাইতেন না, কোনও মা বাপে পারেও না।

এই ক্ষোভ জন্য মনস্তাপ যে একদিন দক্ষরাজার গুপ্তক্রোধকে ব্যক্ত করিয়া দিবে, বিষ্ণু ঠাকুরের ইহা স্থির বিশ্বাস ছিল। সে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, একটু বাতাস পাইলে, সে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। তাই তিনি নারদের মারফৎ যে জিনিসটী পাঠাইয়া দিলেন, সে নড়িয়া চড়িয়া, বাতাস করিয়া, আগুন জ্বালাইয়া দিল।

আগুন ত' জ্বলিল, তাহাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি বিষ্ণু ঠাকুর এইখানেই বিশ্রাম করিতেন। তিনি ভাবিলেন, এ ত' শিবের সঙ্গে দক্ষের কলহ, ইহাতে কি হইল? এ কথা সতীর কর্ণগোচর করিতে হইবে। যাও নারদ! সতীকে এ সংবাদ জানাও! সতী যদি জোর করিয়া বাপের বাড়ী যায়, তবেই;—

কিন্তু, তাহাতে যে দাবানল জ্বলিয়া উঠিবে, বিষ্ণু তাহা বিবেচনা করিতে পারিলেন না; পারিলেও কিছু ব্যতিক্রম ঘটিত না। নীরস ব্রহ্মা, অনেকখানি গাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়া, যে একটুখানি রেখা টানিয়াছিলেন, সে বড় সাঙ্ঘাতিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরস্পর মতের মিল ছিল না।

নারদ, চাতুরী দিয়া, মন ঢাকিয়া বীণায় সুর চড়াইলেন। মন, সুরে মিলিয়া গেল, গান করিতে করিতে, শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নারদের প্রতি সতীর পুত্রস্নেহ ছিল, যাহা পতির প্রেম শিথিল করিতে পারে। নারদ, মাতৃচরণে প্রণত হইলেন, সতী পুত্রস্নেহে পরম পুলকিত হইয়া, সুরলোকের সুখ-দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ, এ কথা সে কথার পর চুপি চুপি দক্ষরাজার যজ্ঞের কথা শুনাইয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সতী, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিষাদে সে সহাস্য বদন মলিন হইয়াছে, অপাঙ্গে অশ্রু জড় হইয়াছে। পতিপ্রাণা সে বিষাদের নিদর্শন অতি যত্নে সংগোপন করিয়া, করযোড়ে শিবকে কহিলেন, দেবাদিদেব! আরাধ্য দেবতা! একদিনের জন্য আমাকে বিদায় দাও! কোন দিন তোমাকে এমন কথা বলি নাই, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেও মন সরে না, তবুও একদিন! এই একদিন মাত্র তোমাকে ছাড়িয়া মাতৃচরণ দর্শন করিব। তার পর, আর কখন এমন প্রস্তাব করিব না। হতাশ করিও না! অনুমতি দাও!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ।

মুঙ্গেরে রামলীলা।

সে আজ ষোল বৎসরের কথা।

মুঙ্গেরের তখনকার বাঙ্গালীর অবস্থা খুব হীন না হলেও সচ্ছল ছিল না; এখনও অবস্থা সেই প্রকার। তবে দু' একজন কিছু অর্থবান হইলেও তাঁহাদের অর্থবান্ বলিয়া বুঝিবার একটুও যো ছিল না। কারণ, দান ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল এবং ভোগসুখকে তাঁহারা বিলাস ও অসংযমের নিদর্শন বুঝিয়া একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। খোট্টার দেশে খোট্টাভাবাপন্ন অমন উদ্দেশ্যপরায়ণ বাঙ্গালী অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল কলিযুগের সন্ন্যাস ধর্ম্মের দিকে—অর্থ সঞ্চয়, পঞ্জিকা সেবন, অর্দ্ধাশন ও শেষের শেষ দিনে জাহ্নবী-তটে নশ্বর দেহ বিসর্জ্জন। তাঁহাদের দুর্গাপূজা করিবার অনুরোধ করিলে বলিতেন, "আমাদের সহ্য হয় না!" কিন্তু সংসারের কি বিচিত্র গতি! এক নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না। তাঁহাদের পোড়া কপালে প্রথমা পত্নী 'সহ্য' না হইলেও দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক খোস মেজাজ বাহাল রাখিতে কিন্তু তাঁহাদের কোনও আপত্তি বা 'অসহ্য' হয় না! ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন, ইহা হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম, মাননীয় মনুর বিধি, লঙ্ঘন করিতে আছে কি? হবেও বা! যাহা হোক, সেখানে বাঙ্গালীর কোনও প্রতিমা পূজার চেষ্টাও নাই।

দুর্গাপূজার সময় সেখানে বালকবালিকাদের যা' কিছু আনন্দ তা' সেই রামলীলা দর্শনে। সেই রামলীলার কথাই এইবার বলিব।

মীর কাসিমের আমলের পুরাতন দুর্গের পূর্ব্বদ্বারের বাহিরে এক অনতিবৃহৎ ময়দান, সেইখানেই পূজার আনন্দোৎসবের আয়োজন। ময়দানের উত্তর সীমায় পরিখার সন্নিকটে উচ্চ মঞ্চোপরি রাম লক্ষ্মণের বসিবার আসন প্রস্তুত হয়। এবং দক্ষিণ সীমায় প্রকাণ্ড এক বটবৃক্ষের নিকট রাবণ রাজার সুউচ্চ মঞ্চ।

রামচন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে, এমন বালকের অন্বেষণ পূজার বহু পূর্ব্ব হইতেই করিতে হয়। কারণ, কে নাকি একবার রাম সাজিবার অব্যবহিত পরেই মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন; এজন্য সে দেশের সাধারণের ধারণা যে, যে রাম সাজিবে সে নিশ্চয়ই মরিবে—তা শীঘ্রই হোক্ আর বিশ্ পঞ্চাশ বছর পরেই হোক—একদিন মরিবেই! কাজেই সেখানে রামের আমদানী কাশী হইতে হইয়া

থাকে। যে রাম সাজিবে তাহাকে ব্রাহ্মণের সন্তান ও দেখিতে সুন্দর হইতে হইবে। লক্ষ্মণ ও সীতার পক্ষেও সেই এক নিয়ম। সীতা বালকেই সাজিয়া থাকে। রাম ও লক্ষ্মণকে ষষ্ঠী হইতে দশমী অবধি হবিষ্য গ্রহণ করিতে হয়। সীতাদেবী মাত্র আট নয় বৎসরের বালক—এজন্য তাহার পক্ষে বিশেষ কোনও নিয়ম করা হয় না।

বীর হনুমান ও বানরের জন্য মুঙ্গেরবাসীকে অন্যস্থান হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য কোনও কষ্ট পাইতে হয় না। স্থানীয় লোকের দ্বারাই সে কাজ মিটিয়া থাকে। খোট্টা ভায়ারা এখন Behar for Beharis বলিয়া সেখানকার বাঙ্গালী বাসিন্দাদের যতই কোন্‌ঠাসা করিবার চেষ্টা করুন না কেন, হনুমান, বানর ও রাক্ষস সাজিবার মত উপযুক্ত লোক এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সেখানে বিদ্যমান। হনুমান ও বানরদের হস্তে এক একটা কাষ্ঠ নির্ম্মিত গদা, পৃষ্ঠদেশে রক্তবস্ত্রে আবৃত সুদীর্ঘ ইক্ষু পুচ্ছরূপে লম্বমান, তাহাই লইয়া আবার তাহাদের ভীষণ আস্ফালন, হস্তদ্বারা ধারণ ও সঞ্চালন কখনো বা নিরীহ 'দেহাতির' সন্দর্শন মিলিলে তাহারই দ্বারা ভীম আক্রমণ, তাড়ন ও মারণ! হনুমান ও বানরদিগের মুখে এক একটা মুখোস্ বাঁধা থাকে, তাহারই ভিতর হইতে তাহারা হুপ্ হাপ্ প্রভৃতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া দর্শক ও রাক্ষসবৃন্দকে ভীতি প্রদর্শন করে। বানরগুলার মুখোস্ সবই এক ছাঁচের—বানরের মুখেরই মত। রাক্ষসগুলার মধ্যে প্রভেদ আছে, কাহারও গোমুখ কাহারো বা ঘোটক মুখ। বানরগুলা সপুচ্ছ, রাক্ষস পুচ্ছহীন। বানরের পাজামা ও কোর্ত্তা লাল রঙের—রাক্ষসের কৃষ্ণবর্ণের। কারণ রাক্ষসের যে শেষ পরাজয়!

এ দিকে মঞ্চোপরি সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া রাবণ-রাজা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকেন। তাঁহার মুখোস্ দেখিবার মত! বস্ত্র নির্ম্মিত কালবর্ণের দশমুণ্ড ও অষ্টাদশ হস্ত তাঁহার দুই স্কন্ধের উপর বিরাজিত। পরিধানে কাল মখমলের এক চাপকান ও জাহাজের খালাসীর মত এক পাজামা। চরণদ্বয় কোনও বাবু বাঙ্গালীর ব্যবহৃত ও পরে পুরস্কৃত জুতায় মণ্ডিত। হস্তে ঢাল ও কটীদেশে বিলম্বিত দীর্ঘ তরবারি।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে আমাদের দেশের মত 'কনে চন্দন' পরাইয়া দেওয়া হয়। রাম ও লক্ষ্মণের মাথায় মুকুট থাকিলেও বাঙ্গালার যাত্রাদলের রাখাল বালকের মত তাহাদিগকে ধড়া পরিতে হয়। উড়িয়াদের মত তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত। এই জন্যই বোধ হয় সদাশয় গভর্ণমেন্ট Bihar and

Orissa Govt. করিলেন। "দুয়ে দুয়ে মিল্‌লো ভাল!" যাহা হোক, তাহাদের উভয়েরই পৃষ্ঠে তূণ ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ বিরাজিত। রাম লক্ষ্মণের হস্তে সুবর্ণ বলয় ও গলদেশে বেলফুলের গোড়ে মালা—নয়ন যুগল কজ্জলে শোভিত। কর্ণে সুবৃহৎ মাকড়ী ও নাসিকায় নোলক দোদুল্যমান।

পূজার ষষ্ঠীর দিন সীতাহরণ ব্যাপার ময়দানেই শেষ করা হয়। সপ্তমীর দিন রাবণের পার্শ্বে সীতাকে বসিতে দেখা যায়। রাম রাবণের যুদ্ধাদি সকল কাণ্ডই প্রত্যহ বৈকালে পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা অবধি হইয়া থাকে। বলিতে ভুলিয়াছি, ষষ্ঠীর দিনই সীতাহরণের পূর্ব্বে মুখোস পরিহিত সূর্পনখার নাসিকা ছেদন হয়। লক্ষ্মণ তরবারি হস্তে সূর্পনখার গলা টিপিয়া ধরেন, সেই সময় সূর্পনখা বেচারী দ্রুতহস্তে মুখোস খুলিয়া এক নাককাটা মুখোস পরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণের সমীপে উপস্থিত হয়। আর কি রক্ষা আছে! রাবণের সে সময় কি তর্জ্জন গর্জ্জন! প্রায় ত্রিশ জন রাক্ষস সেই সময় "জয় রাবণ কি জয়—রাম কি ছয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। ওদিকে বানরের দল সেই কথায় উদ্দীপ্ত হইয়া "জয় রামচন্দ্র কি জয়—রাবণ শালা কি ছয়" বলিতে থাকে। ফলে মধ্যে মধ্যে রাক্ষস ও বানরে বিলক্ষণ মারামারি আরম্ভ হয়। অধিকাংশ রাক্ষস ও বানর পনের ষোল বৎসরের বালকেই সাজিয়া থাকে। মারামারির সময় ২৫।৩০ বৎসর বয়স্ক রাক্ষস ও বানর আসিয়া মধ্যস্থ করিয়া থামাইয়া দেয়।

সপ্তমীর দিন হইতে দর্শকের ভিড় জমে। মাঠের মধ্যে বাঁশ দিয়া ঘিরিয়া রণক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। তাহার দুই দিকে দুইটি গেট্—উত্তর দ্বার দিয়া রামের প্রবেশের পথ, দক্ষিণ দ্বারে রাবণ ও রাক্ষসকুল প্রবেশ করেন। সপ্তমীর দিন হনুমান চন্দ্র ইক্ষু-পুচ্ছ ধারণ না করিয়া খড় নির্ম্মিত এক সুবৃহৎ পুচ্ছ দুলাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন। ইতিমধ্যে কতিপয় রাক্ষস আসিয়া সন্ধ্যার সময় তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়। হনুমান অনলের তেজ বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে পুচ্ছটি পৃষ্ঠ হইতে খুলিয়া হস্তে ধারণ করিয়া হুপ্ হুপ শব্দে ইতস্ততঃ 'লম্ফ ত্যাগ' করিতে থাকেন। খোট্টা দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তখন মহা আনন্দ—সে 'বড়ি ভারি তামাসা!'

অষ্টমীর দিন কুম্ভকর্ণ বধ। বেলা ১১টা ১২টা হইতেই দোকান বসিতে আরম্ভ হয়। পান, সিগারেট ও খাবারের দোকান শতাধিক—আর 'কেতারির' (ইক্ষুর) দোকান অগণিত। পাঁচ ছয় শত ইক্ষুদণ্ড আটি বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া

রাখিয়া বিক্রেতা ও তাহার স্ত্রী নাদনা হস্তে ছাগল, ষাঁড় তাড়াইয়া থাকে। মণিহারির, কাঁসা পিত্তলের, মাটীর খেলেনার দোকান তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে। এই সকলের মধ্যেই আবার বক্তৃতারও রঙ্গ আছে! এই দিন হইতে স্থানীয় পাদরি সাহেব এক পাল খাটাইয়া চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চি সাজাইয়া তদীয় অনুচরবৃন্দ (খোট্টা ও বাঙ্গালী খ্রীষ্টান) লইয়া প্রভু যীশুর গান আরম্ভ করিয়া দেন। শ্রোতার অভাব নাই। বিকাল চারিটার সময়েই মাঠ এক প্রকার পূর্ণ হইয়া যায়—সহস্রাধিক লোক জমায়েত্ হয়। খোট্টা বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সকলেই দেখিতে আসে। যাহারা সস্ত্রীক আসে তাহারা স্ত্রী পুরুষে তিন চারিটার সময় আসিয়াই দুই বা ততোধিক কেতারি খরিদ-পূর্ব্বক মাঠের মধ্যে বসিয়াই দন্তশ্রেণীর রীতিমত ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া দেয়। কেহ বা কেতারি চর্ব্বণ করিতে করিতে দয়াপরবশ হইয়া খ্রীষ্টানদের বক্তৃতা শ্রবণ করে ও মধ্যে মধ্যে আপনার দলস্থ লোককে বলে, "আরে ভেইয়া, ই শশুরা কেয়া বোলেগা—শালা লোগ খ্রীষ্টান ম্লেচ্ছ হ্যায়!—বোলো ভাই রামচন্দ্র কি জয়!" মুঙ্গেরের নিকটস্থ গ্রাম সমূহ অর্থাৎ দেহাৎ হইতে বিস্তর লোকের আমদানি হয়। খোট্টারা পূজার কয়দিন সকলেই নব বস্ত্র পরিধান করিয়া রামলীলা দেখিতে আসে। সহরে ও 'দেহাতী' যে সধবা মহিলারা আসে তাহাদের কপালখানি তেল ও সিন্দূরে রঞ্জিত, মধ্যস্থলে টিপ। পরিধানে লাল শালুর পনর হাত কাপড়। হাত দুইখানি রূপার অলঙ্কারে আবৃত ততোধিক পীড়িত। গলায় রূপার হাঁসুলী, নাকে সুবৃহৎ নথ, করে বিরাজিত সুবৃহৎ কেতারি! তাহাদের স্বামী মহাশয়দের পায়ে নাগরা, মাথায় পাগড়ী, গায়ে কোর্ত্তা ও উড়াণী। এক হাতে তেল চকচকে সুবৃহৎ বংশদণ্ড, কটী ও স্কন্ধদেশে বিরাজিত শিশুসন্তান—পশ্চাতে উড়াণী ধরিয়া চলিয়াছেন তদীয় ঘরণী। রামলীলার ময়দানে জনতা ভেদ করিয়া রামলীলা দর্শন অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। অধিকাংশ লোকেই ইতস্ততঃ এক একটা দল পাকাইয়া স্ত্রী ও পুত্রসহ ইক্ষু চর্ব্বণ ও গল্প করিয়া থাকে। খোট্টা রমণীরা ইক্ষু চর্ব্বণ করিতে করিতে যদি কোনও পরিচিত রমণীর অনেক কালের পর দর্শন পায়, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই ইক্ষু চর্ব্বণ বন্ধ করিয়া অমনি তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে! সে কান্নারই বা কি সুর—যেন কে মরিয়াছে, একটা মহা সর্ব্বনাশ হইয়াছে! পশ্চাতে পুরুষ দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে সান্ত্বনা দিয়া বলেন "চুপ রহ; চুপ রহ!" সে ক্রন্দন প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা ব্যাপী চলিয়া থাকে,

উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে এ কার্য্যের সমাধা করে। ইহারই নাম বোধ হয় খোট্টা ভায়াদের 'আনন্দাশ্রু'! বহুৎ আচ্ছা!

এদিকে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বহুৎ রকম কসরৎ করিয়া নাচিতে নাচিতে তীর ধনুক লইয়া কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। রাম লক্ষ্মণের সে পা ফেলিবারই বা ঢং কি! সেই বেড়া ঘেরার মধ্যে এক ঘণ্টা যাবৎ রাম ও কুম্ভকর্ণ একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া ছুটাছুটী করেন। বানর ও রাক্ষসের দল তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া থাকে। খোট্টা দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ ও মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছে ও মধ্যে মধ্যে "জয় রামচন্দ্র কি জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, দেবী সূর্পনখার অন্তঃপুর নাই, বিরাম বা বিশ্রাম নাই, সম্মার্জ্জনী হস্তে খোট্টা স্ত্রী পুরুষ দর্শকের প্রতি অবাধে সেই সম্মার্জ্জনী চালাইতেছে। খোট্টারা সূর্পনখার ঝাঁটা খাইয়া আনন্দেই আটখানা। সূর্পনখা, বানর ও রাক্ষস প্রভৃতির আব্দারও যথেষ্ট পরিমাণে চলিয়া থাকে। খোট্টারা তখন আর তাহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করে না। তাহারা ইচ্ছা করিলেই পান বা সিগারেট্ দোকান হইতে বিনামূল্যে গ্রহণ করিয়া সেবা করিয়া থাকে ও রাবণ ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতিকে দিয়া থাকে।

সন্ধ্যার সময় কুম্ভকর্ণ বধ হয়—অর্থাৎ সে অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একবার শুইয়া পড়ে, রাম লক্ষ্মণ কঞ্চি নির্ম্মিত তীরের দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিয়া ফেলেন। ক্ষণপরেই কুম্ভকর্ণ লাফাইতে লাফাইতে গিয়া রাবণের মঞ্চে আসিয়া বসে ও মুখোস্ খুলিয়া ফেলে; কারণ, সে যে তখন মৃত! দর্শকমণ্ডলীও তখন দূরে দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়ায়! কারণ, এইবারে মৃত কুম্ভকর্ণকে দাহ করা হইবে। কাগজ নির্ম্মিত বিশ হস্ত পরিমিত এক কুম্ভকর্ণ রণক্ষেত্রের নিকট যুদ্ধের পূর্ব্বেই স্থাপন করা হইয়া থাকে। কুম্ভকর্ণের দুই হস্তে শতাধিক হাউই, ছুঁচোবাজি দন্তশ্রেণীরূপে বিরাজ করে, উদরে ও মস্তকে গোটাকয়েক বোমা রাখা হয়। এই কুম্ভকর্ণ অগ্নি-সংযোগে নিঃশেষিত হইতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগে; এইরূপে নবমী ও দশমীর দিন ইন্দ্রজিত ও রাবণ বধ ও দাহ হইয়া থাকে। দশমীর দিনে প্রায় পাঁচ সহস্র লোকের ভিড় হয়। রাত্রি বারটার কমে রামলীলার ময়দান জনতাশূন্য হয় না। সে দেশবাসীদের রামলীলা দর্শনের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা আর কিছু খরিদ করুক বা না করুক ফিরিবার সময় দুই একটা ইক্ষুদণ্ড না লইয়া ফিরিবে না!

একাদশীর দিন সীতার উদ্ধার হয়, ময়দানে কিছুমাত্র ভিড় হয় না। দ্বাদশী

হইতে একমাস কাল ব্যাপী সেখানকার কষ্টহারিণীর ঘাটে রামলীলার শেষাংশ অভিনীত হইয়া থাকে। মুঙ্গেরে রামলীলা অথবা কেতারির মেলা না থাকিলে স্থানীয় বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্গোৎসব বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় নাই।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

উপন্যাস-প্রসঙ্গ।

(বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত।)

উপন্যাসে মনুষ্যচরিত্র :—গদ্যোপন্যাসকে সচরাচর, আমরা কাব্যই বলিয়া থাকি। কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র। মনুষ্য চরিত্র ঘোরতর বৈচিত্র্যবিশিষ্ট। মনুষ্য, স্বভাবতঃ স্বার্থপর, এবং মনুষ্য স্বভাবতঃ পরদুঃখে দুঃখী এবং পরোপকারী। মনুষ্য পশুবৃত্ত, এবং মনুষ্য দেবতুল্য। সকল মনুষ্যের চরিত্রই এইরূপ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট; এমন কেহ নাই, যে সে একান্ত স্বার্থপর, এবং এমন কেহ নাই যে সে একান্ত স্বার্থ-বিস্মৃত পরহিতানুরক্ত; কেহই নিতান্ত পশু নহে, কেহই নিতান্ত দেবতা নহে। এই পশুত্ব ও দেবত্ব, একত্রে, একাধারে, সকল মনুষ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে আছে; তবে সর্ব্বত্র উভয়ের মাত্রা সমান নহে। কাহারও সদগুণের ভাগই অধিক, অসদ্গুণের ভাগ অল্প; সে ব্যক্তিকে আমরা ভাল লোক বলি; যাহার সদ্গুণের ভাগ অল্প, অসদ্গুণের ভাগ অধিক তাহাকে মন্দ বলি। কিন্তু এইরূপ দ্বিপ্রকৃতিত্ব সকল মনুষ্যেরই আছে; মনুষ্যচরিত্রই দ্বিপ্রাকৃতিক; দুইটি বিসদৃশ ভাগে মনুষ্য-হৃদয় বিভক্ত।

কাব্যের বিষয় মনুষ্যচরিত্র; যে কাব্য সম্পূর্ণ, তাহাতে এই দুই ভাগই প্রতিবিম্বিত হইবে। কি গদ্য, কি পদ্য, প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থমাত্রেই এইরূপ সম্পূর্ণতাযুক্ত। কিন্তু কোন কোন কবি, এক একভাগ মাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা যে মনুষ্যের দ্বিপ্রকৃতিত্ব অবগত নহেন, এমত নহে; তবে তাঁহারা বিবেচনা করেন, যে, যেমন একত্রে সমাবিষ্ট মনুষ্যচরিত্রের ভাল মন্দ অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করা আবশ্যক, তেমনি উহা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া অধীত এবং পর্য্যবেক্ষিত করাও আবশ্যক। যেমন একটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণ শিখিবার পূর্ব্বে যে বর্ণদ্বয়ের যোগে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তত্তৎ উচ্চারণ অগ্রে পৃথক্ পৃথক্

করিয়া শিখা কর্ত্তব্য, তেমনি মনুষ্যচরিত্রের অংশদ্বয়কে বিযুক্ত করিয়া পৃথক পৃথক অধ্যয়ন করা বিধেয়। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি কবি মনুষ্যচরিত্রের অংশমাত্র গ্রহণ করেন। যাঁহারা মহদংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থের এক বিশিষ্ট উদাহরণ বিক্টর হ্যুগোর গদ্যকাব্যাবলী। যাঁহারা অসদ্ভাগ গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রায় রহস্যলেখক। ইহাদিগের চূড়ামণি সর বণ্টিস্। ইহাদিগের গ্রন্থ সকল অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, অসম্পূর্ণ কাব্য।

বঙ্গসাহিত্যে রহস্যলেখক ঃ—এই সম্প্রদায়ের কেবল দুইজন লেখক বাঙ্গালা ভাষায় সুপরিচিত ; প্রথম টেকচাঁদ ঠাকুর ; দ্বিতীয় হুতোমপেঁচা লেখক। সেই সম্প্রদায়ের তৃতীয় লেখকের পরিচয় দিতেছি।

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া, বাঙ্গালায় প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রহস্যপটুতায়, মনুষ্যচরিত্রের বহুদর্শিতায়, লিপিচাতুর্য্যে, ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোমের সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী, পরনিন্দক, সুনীতির শত্রু এবং বিশুদ্ধ রুচির সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত। ইন্দ্রনাথ বাবু পরদুঃখে কাতর, সুনীতির প্রতিপোষক, এবং তাঁহার গ্রন্থ সুরুচির বিরোধী নহে। তাঁহার যে লিপিকৌশল, যে রচনাচাতুর্য্য, তাহা আলালের ঘরের দুলালে নাই—সে বাক্‌শক্তি নাই। তাঁহার গ্রন্থে রঙ্গদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি, ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে, অপাঙ্গে যে চতুরের বক্র দৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয়, তাহা না হুতোমে, না টেকচাঁদে, দুইয়ের একেও নাই। তাঁহার গ্রন্থ রত্নময়, সর্ব্বস্থানেই মুক্তা প্রবালাদি জ্বলিতেছে। দীনবন্ধু বাবুর মত, তিনি উচ্চ হাসি হাসেন না, হুতোমের মত "বেলেল্লাগিরিতে" প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্দ্ধ রসের বিশ্রাম নাই। সে রসও উগ্র নহে, মধুর, সর্ব্বদা সহনীয়। 'কল্পতরু' বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

যাহাকে সম্পূর্ণ কাব্য বলিয়াছি, এ গ্রন্থ তাহার মধ্যে গণ্য নহে। যিনি মনুষ্যের শক্তি, মনুষ্যের মহত্ত্ব,—সুখের উচ্ছ্বাস, দুঃখের অন্ধকার দেখিতে চাহেন, তিনি এ গ্রন্থে পাইবেন না। যিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়, স্বার্থপরতা, এবং বুদ্ধির বৈপরীত্য দেখিতে চাহেন, তিনি ইহাতে যথেষ্ট পাইবেন।

এই সকল চিত্র প্রকৃতিমূলক—কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট। যে যাহাতে উপহাসের বিষয়, রহস্যলেখক তাহার সেই প্রবৃত্তিঘটিত কার্য্যকে আত্যন্তিক বৃদ্ধি দিয়া চিত্রিত করেন। এ আত্যন্তিকতা দোষ নহে—এটি

লেখকের কৌশল। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল কার্য্যই আত্যন্তিকতা বিশিষ্ট। গ্রন্থে এমন কিছু নাই যে আত্যন্তিকতাবিশিষ্ট নহে।

গল্পটি অতি সামান্য; সহজ বলিতে ছত্র দুই লাগে। আলালের ঘরের দুলাল ইহা অপেক্ষা বৈচিত্র্যবিশিষ্ট। আর আলালের ঘরের দুলাল উচ্চনীতির আধার—ইহা সেরূপ নহে। আলালের ঘরের দুলালের উদ্দেশ্য নীতি; কল্পতরুর উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ। আলালের ঘরের দুলালের লেখক মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া কাতর, ইনি মনুষ্যচরিত্র দেখিয়া ঘৃণাযুক্ত। 'কল্পতরু'র অপেক্ষা আলালের ঘরের দুলালের সম্পূর্ণতা এবং উচ্চাশয়তা আছে।

উপন্যাসে ঘরের কথা ঃ—তিনিই (প্যারীচাঁদ মিত্রই) প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে;—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গালাদেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি—'আলালের ঘরের দুলাল'।

উপন্যাসে পৃথক্ উপাখ্যান ঃ—অনেক উৎকৃষ্ট কাব্যোপন্যাসে দুইটি পৃথক্ উপাখ্যান, একত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে। লিয়রে, এইরূপ দুইটি উপাখ্যান, একটির নায়ক স্বয়ং লিয়র, আর একটির নায়ক এড্‌মণ্ড ও এড্‌গার। "নিদাঘ নিশীথের স্বপ্নে" ঐরূপ, দুইটি নায়ক এবং দুই নায়িকা, দুইটি স্বতন্ত্র উপাখ্যানের বিষয়ীভূত। ঐবান্‌হোর, এক উপাখ্যানের নায়ক ঐবান্‌হো, অপরের নায়ক রাজা রিচার্ড। কেনিল্‌বর্থে, একটি উপাখ্যানের নায়ক, লেষ্টর, নায়িকা রাজ্ঞী; অপরের নায়ক ট্রেসিলিয়ন, নায়িকা এমি। এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট কাব্য, নাটক, উপন্যাসে আছে, কিন্তু এই সকলেই, স্বতন্ত্র উপাখ্যানগুলি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত, একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, দুই স্রোতঃ এক খাদে প্রবাহিত হইয়াছে। প্রতিভাশূন্য লেখকের হস্তে তাহা হয় না—উদাহরণ "মিষ্টরিস"।

সংস্থান ঃ—যে সকল অবস্থাবিশেষে নায়ক নায়িকাগণকে সংস্থাপিত করিলে, রসবিশেষের অবতারণা সহজ হয়, তাহাকে সংস্থান বলিতেছি। ইহাতে নৈপুণ্য ব্যতীত উপন্যাসকার, বা নাটককার, কোনমতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সংস্থানই রসের আকর।

উপন্যাস ও ইতিহাস ঃ—ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক, সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত, অভীষ্ট সিদ্ধি জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

সৃষ্টি-বৈচিত্র্য।

দৈত্য, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, অপ্সর, কিন্নর প্রভৃতি কাল্পনিক জীব ছাড়িয়া দিয়া একবার আমাদের এই ইন্দ্রিয়গম্য জগতের দিকে তাকাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, ভগবান কত শ্রেণীর কত প্রকারের জীবই সৃষ্টি করিয়াছেন। পথে চলিয়া যাইবার সময় যে রাশি রাশি সৃষ্ট জীবের উপর দিয়া আমাদের সাধু সন্ন্যাসীরাও বিনা ক্লেশে চলিয়া যান,—তাহারাও আমাদেরই মত সৃষ্ট জীব, এ কথাটা আমাদের আত্মমর্য্যাদার পক্ষে হানিকর হইলেও ইহাতে ভাবিবার ও বুঝিবার কথা অনেক আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য লইয়া নানারূপ গবেষণা করিয়াছে ও করিতেছে। সে গবেষণার ফলে নানারূপ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

জীব-সৃষ্টি যে বিশাল, ইহা যে বৈচিত্র্যময় তাহা কে অস্বীকার করিবে? পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় জীবের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল এক একটা জীব-শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই এক একটা শ্রেণীও বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। এমন কি একই প্রকারের জীবের মধ্যেও পার্থক্য দেখিতে পাই। এই পার্থক্য আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে না—ইহা নিত্য সাধিত হইতেছে। মানুষের কার্য্যের দ্বারা এবং স্বভাবের প্রতিবন্ধকতার জন্য প্রত্যহ নূতন নূতন আকারের জীব জন্মিতেছে। এক জাতীয় জীব কিরূপে বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেছে, কিরূপে এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বাড়িয়া যাইতেছে আমরা এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিব।

একটা সাধারণ উদাহরণ দিলে এ কথাটা সহজে বোধগম্য হইবে। ঘুঘু এবং পারাবত যে একজাতীয় বিহঙ্গম তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কিন্তু এখন ঘুঘু ও পারাবতের মধ্যে একটা বেশ গণ্ডী পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং ঘুঘু পায়রা নহে বা কপোত ঘুঘুর মত প্রেমিক হইলেও সে ঘুঘু নহে। আবার ঘুঘুর মধ্যে কত রকমের ঘুঘু আছে তাহা পল্লীগ্রামের বালকমাত্রেই অবগত; আর পারাবতের কত রকম জাতি আছে, তাহা শান্ত শিষ্ট সকল বালকই জানে। সিরাজু, মুখ্‌খী, পর্পোন্, গলাফুলা, লোটন, গেরোবাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার শাখায় পারাবত-জগত বিভক্ত। কেবল তাহাই নহে, সিরাজুর মধ্যে আবার শ্রেণীভেদ আছে, আগ্রাই মুখ্‌খী ও কালো মুখ্‌খীতে পার্থক্য আছে; গেরোবাজের মধ্যে কাগ্‌জী, ভুরা, প্লেন প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য আছে। আবার এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর পারাবত মিশ্রিত হইয়া কত যে নামহীন জাতি সৃষ্টি করে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিলাতী কুকুরে ও দেশী কুকুরে মিশিয়া ঐরূপে নূতন শ্রেণীর কুকুর উৎপন্ন করিতেছে।

ডারবিন (Darwin) সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, কেলে গোলা (Rock pigeon) হইতে সকল শ্রেণীর পারাবত উদ্ভূত হইয়াছে। বিলাতী প্রাণতত্ত্ব-বিদ্‌দিগের মতে নেকড়ে বাঘ হইতেই সেণ্ট বার্ণার্ড, স্পানিয়েল, পয়েণ্টার কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া ফক্সটেরিয়ার, জাপানী পুডুল, নেড়িকুত্তো প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর শারমেয় উৎপন্ন হইয়াছে। পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডের উপর কালো দাগওয়ালা গাঢ় বা ডান্ রঙ্গের মধ্য আসিয়ার বুনো ঘোড়া হইতে নীলা, সবজা, সাদা, আবলক, সমন, কুমেদ প্রভৃতি সকল বর্ণের এবং ওয়েলার, আরবী, সেটলাণ্ড পণী, ফকিরের টাট্টু প্রভৃতি যাবতীয় শ্রেণীর অশ্বের জন্ম হইয়াছে। কিরূপ ভাবে এই বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে, কোন্ নিয়মের বশে এরূপ এক হইতে বহু শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, ডারবিন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ-ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথমে মনে হয় যে, বিভিন্ন জাতীয় বা বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের পরস্পর সংমিশ্রণ দ্বারা নূতন জাতীয় জীবের সৃষ্টি হইতেছে। অশ্ব এবং গর্দ্দভের মিশ্রণে অশ্বতর জন্মিতেছে। সাদা গোলা ও কালো গোলা পায়রার মিশ্রণে এক রকম নূতন শ্রেণীর আবলক পায়রা জন্মিতেছে। শেষে এই অশ্বতর এবং আবলক জাতির বংশ বৃদ্ধি হইলে জগতে দুই প্রকারের জীব-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। সাধারণ লোকের মনে হয় এই রকম করিয়াই জগতে জীবের শ্রেণী বাড়িয়াছে এবং ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিন্তু এরূপ ধারণার ভ্রম প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন।

পায়রা ও ঘুঘু এক জাতীয় হইলেও উহারা বিভিন্ন শ্রেণীর (Species) জীব। এই species কথার আমরা ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ পাই না। 'স্পিসিস্' কাহাকে বলে সে কূট তর্কের মধ্যে না ঢুকিয়া ঘুঘু ও পায়রায়,বা গাধায় ঘোড়ায়, মোরগায় এবং কোয়াগায় এক জাতীয় হইলেও বিভিন্ন 'স্পিসিসে'র জীব। এই উদাহরণ দ্বারা 'স্পিসিস্' কাহাকে বলে বুঝিয়া লইলেই হইবে। টিয়া, চন্দনা, কাকাতুয়া প্রভৃতি এক জাতীয় (genus) কিন্তু বিভিন্ন species-ভুক্ত জীব। কেলে গোলা ও সাদা গোলা পায়রা কিন্তু এক speciesএর অন্তর্গত বিভিন্ন শাখার (variety) জীব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অশ্ব ও গর্দ্দভের দাম্পত্য-বন্ধন হইতে অশ্বতর উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্বভাবের নিয়মানুসারে অশ্বতর এবং অশ্বতরীর সংমিশ্রণে সন্তান হয় না। কেলে গোলা ও সাদা গোলায় আবলক্ জন্মিতে পারে এবং দুইটি আবলকের আবার সন্তান-সন্ততি হইতে পারে, কিন্তু অশ্বতরী একেবারে বন্ধ্যা। ফক্সটেরিয়ার এবং নেড়ি কুত্তার সংযোগে দোঁ-আশ্‌লা শাবক জন্মিতে পারে এবং দোঁ-আশলায় দোঁ-আশলায় বাচ্ছা হইতে পারে। শৃগালে ও কুকুরে যুক্ত হইলে বাচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু সেই উৎপন্ন জীবের আর শাবক জন্মিতে পারে না। পারাবত ও ঘুঘুর মিশ্রণে শাবক জন্মিতে পারে কিন্তু সে শাবক বংশবৃদ্ধি করিতে অক্ষম। সুতরাং আমরা দেখি সমশ্রেণীর বা speciesএর বিভিন্ন প্রকারের (variety) স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন শাবকের সন্তান-সন্ততি জন্মিতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণী বা 'স্পিসিসে'র জীবের সংযোগে শাবক জন্মিলে সে শাবক হইতে আর সন্তান উৎপন্ন হয় না। অশ্বতরীর বাচ্ছা হয় না। প্রত্যেক অশ্বতরটি অশ্ব ও গর্দ্দভের সংযোজনের দ্বারা উৎপন্ন। অনেকে এই সত্যের দ্বারা জীবের species বর্ণনা করেন। এক জাতীয় যে দুই শ্রেণীর জীবের শাবক সন্তান উৎপাদনে অক্ষম সেই বিভিন্ন শ্রেণীকে 'স্পিসিস্' বলে।

এক্ষণে আমরা বুঝিলাম যে বিভিন্ন শ্রেণীর মিশ্রণে জীবের নূতন শ্রেণী উৎপন্ন হয় না। সুতরাং সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

দেখি, জগতে দুই প্রকারে জীব উৎপন্ন হয়—দাম্পত্য ক্রিয়া এবং অদাম্পত্য ক্রিয়া দ্বারা। ইংরাজিতে ইহাদিগকে যথাক্রমে Sexual এবং Asexual reproduction বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। অবশ্য দাম্পত্য ক্রিয়ার দ্বারা জীবের উদ্ভবই অধিক। উদ্ভিদ-জগতে দাম্পত্য কার্য্য ব্যতিরেকে উদ্ভিদের উৎপত্তি প্রাণীজগত অপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাপ ফুলের গাছের

একটা ডাল কাটিয়া পুঁতিয়া দিলে নূতন গোলাপ গাছের সৃষ্টি হয় এবং তাহাতে যে ফুল ফোটে তাহা গৌরবে ও সৌরভে অপর গোলাপ অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় না। পুরাতন আমগাছের ফলের অপেক্ষা কলমের গাছের ফল ভাল হয়। আবার দাম্পত্য-ক্রিয়ার উৎপন্ন আমের আঁটি হইতেও রসাল পাদপ উৎপন্ন হয়। ইক্ষুর গাঁট পুঁতিয়া দিলে আবার মধুর-বপু ইক্ষুদণ্ডের উৎপত্তি হয়। প্রাণি-জগতেও অনেক প্রকার কীট ঐরূপে উৎপন্ন হয়। আমি পুরুভুজ দেখি নাই। শুনিয়াছি পুরুভুজকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে প্রত্যেক খণ্ড আবার এক একটি পূর্ণাবয়ব পুরুভুজে পরিণত হয়। পুরাণের রক্তবীজগুলাও ঐ শ্রেণীর জীব ছিল। তাহাদের রক্তের বিন্দু হইতে না কি এক একটি জীব উৎপন্ন হইত।

দাম্পত্য-ক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের প্রসারের উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু দাম্পত্য বা অদাম্পত্য যে. প্রক্রিয়া দ্বারাই নূতন জীব উদ্ভূত হউক না—সে নূতন জীবকে পিতামাতার আকার ও স্বভাব গ্রহণ করিতেই হইবে। বোম্বাই আমগাছের কলম করিলে কলমের গাছে যে ফল ফলিবে তাহা বোম্বাই আমের গুণযুক্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রেসের ঘোড়ার বাচ্ছা ক্ষিপ্রই হইয়া থাকে এবং প্রসিদ্ধ বাজীর বংশজাত বাজীই ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাজিমাৎ করিয়া থাকে। এইরূপ 'বাপ্‌কা বেটা' হইবার প্রবৃত্তি বা সন্তানে পিতৃগুণ থাকিবার সম্ভাবনাকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ Atavism বলিয়া থাকেন। এই 'আতাভিজম' বা 'বাপকা বেটা'-প্রবৃত্তি নিম্নশ্রেণীর জীবে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আবার অদাম্পত্য বংশবৃদ্ধিতে এ প্রবৃত্তি অধিক প্রবল।

কিন্তু এ প্রবৃত্তি যতই প্রবল হউক ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জীবেই পিতা-মাতা হইতে আকারে ও গুণে বিভিন্ন হইবার প্রবৃত্তিও স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। পিতামাতার সহিত খুব বেশী সাদৃশ্য থাকিলেও সন্তানের স্বাতন্ত্র্য অবশ্যম্ভাবী। পিতা হয় ত সাহসী, মাতা ভীরু। সুতরাং সন্তানের মনের গতিক মাঝামাঝি হইতে পারে। সে আর সে ক্ষেত্রে বাপকা বেটা হইয়া বিপদের মুখে যাইতে পারিবে না। পিতামাতার গুণের বা আকারের পার্থক্য থাকে বলিয়া আতাভিজম পূর্ণমাত্রায় কার্য্য করিতে পারে না; সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ঘটিতে আরম্ভ করে। অনেক সময় পুত্র পিতার মত না হইয়া পিতামহের মত হইয়া উঠে। কোথাও বা 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' দেখিতে পাওয়া যায়। পিতার ভিতর পিতামহ ও পিতামহী উভয়ের গুণ থাকে। পুত্র যদি ঠিক পিতৃগুণ পায় এবং পিতৃগুণের আবার এক অংশ অর্থাৎ ঠিক পিতামহের গুণটুকু লাভ করে, আমার

বোধ হয় তাহা হইলে জীব পিতার মত না হইয়া পিতামহের মত হইয়া থাকে। 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' নিয়মেরও ঐরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মাতা এবং মাতুল উভয়েই মাতামহ ও মাতামহীর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হয় ত মাতার ভিতর মাতামহীর গুণ প্রবল, মাতুলে মাতামহের গুণ অত্যধিক। সে ক্ষেত্রে পুত্র মাতার নিকট হইতে মাতামহের গুণ পাইলে সে মাতুল-গুণেই ভূষিত হইবে মাতার গুণ পাইবে না। অশ্ব ও গর্দ্দভে অশ্বতর উৎপন্ন হয়। কিন্তু অশ্ব-পিতার অশ্বতর-শাবকের গুণে এবং গর্দ্দভতনয় অশ্বতরের গুণে অনেক পার্থক্য।

সুতরাং সৃষ্টি বৈচিত্র্যের আমরা প্রথম কারণ দেখি পিতামাতার গুণের অসমঞ্জসতা। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের দ্বিতীয় কারণ বাহ্য জগতের প্রভাব। যদি মোক্ষ-মুলার প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে বিলাতের প্রসিদ্ধ সুন্দরী গায়িকা এবং ভারতবর্ষের কৃষ্ণবর্ণা 'গদাধরের পিসি' একই শ্বেতবর্ণের আর্য্যবংশ-সম্ভূতা। কিন্তু প্রাচ্যের প্রখর সূর্য্যতাপ এবং নিরামিষ খাদ্য প্রভৃতি গদাধরের পিসির ত্বকের যে কৃষ্ণবর্ণ সম্পাদন করিয়াছে তাহা দেখিলে তাহাকে আর্য্যবংশসম্ভূতা বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ভোজ-পুরী কনষ্টেবল বিল্লাদহের ম্যালেরিয়ার কবল হইতে বাঁচিয়া যখন গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করে তখন নিশ্চয়ই তাহাকে বাপপিতামহের পরিচয় দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। আমাদের দেশে পিঞ্জরাবদ্ধ ইয়র্কসায়ারের ক্যানারী পক্ষীর যে শাবক উৎপন্ন হয়, সে বেচারাকে ইয়র্কসায়ারের ক্যানারীর ঝাঁকে ছাড়িয়া দিলে, বোধ হয় সে পলাইয়া চড়াইয়ের ঝাঁকে মিশিবার চেষ্টা করে। বাহ্য জগতের উপর জীবের আকার-প্রকার অনেক নির্ভর করে, বাহ্য জগতের প্রভাবের সহিত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে।

উপরি-উক্ত কারণ ব্যতীত হাক্সলে-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের দল সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের অপর একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবেরই একই শ্রেণীর অপর জীব হইতে বিভিন্ন হইবার একটা স্বতঃজাত প্রবৃত্তি লক্ষিত হয়। ইহাকে তাঁহারা Spontaneous variation বলিয়াছেন। কেন যে এরূপ হয় তাহা কেহ বলিতে পারে না। রাক্ষস রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এক অদ্ভুত রাক্ষস ছিল। এক একটা গরুর পৃষ্ঠে একটা পদ থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এইরূপ পঞ্চপাদবিশিষ্ট গরুর পিতামাতা যে চতুষ্পদ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রুমার (Reaumur) নামক একটী ফরাসী বৈজ্ঞানিক এইরূপ একটী বিশেষ জীবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মাণ্টায় গ্রেসীয়ো কেলিয়া (Gratio Kelleia) নামক

একটী লোক জন্মিয়াছিল। তাহার হস্তে ও পদে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি ছিল। কেন যে তাহার ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই গ্রেসীয়ো দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে একটী পঞ্চাঙ্গুলিবিশিষ্টা সাধারণ স্ত্রীলোককে বিবাহ করে। তাহাদের তিনটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই সন্তান-দিগের মধ্যে বড়টীর পিতার ন্যায় হাতে ও পায়ে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি হইয়াছিল। দুইটী পুত্রের এবং কন্যাটীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঈষৎ বিকৃত হইয়াছিল অর্থাৎ তাহারা পিতৃ-আকার পায় নাই, অথচ পিতৃ-আকার পাইবার প্রবৃত্তির একটী নিদর্শন তাহাদের শরীরে বর্ত্তমান ছিল। গ্রেসীয়োর ছয়অঙ্গুলিবিশিষ্ট পুত্র সেলভেটরের বিবাহের পর তাহার দুইটী পুত্র এবং একটী কন্যার তাহাদের পিতামহের মত ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি হইয়াছিল; কেবল একটী পুত্র তাহার মাতার মত পঞ্চাঙ্গুলি-বিশিষ্ট হইয়াছিল। গ্রেসীয়োর দ্বিতীয় পুত্রের দুইটী কন্যার হাতে পায়ে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি হইয়াছিল এবং অপর দুইটী পুত্রের কাহারও হস্তে ছয়টী করিয়া এবং কাহারও পায়ে ছয়টী করিয়া অঙ্গুলি হইয়াছিল। এই গ্রেসীয়োর ইতিহাস হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে কোন জীবের একটী বৈচিত্র্য ঘটিলে সেটী কিরূপে বংশানুক্রমে থাকিবার চেষ্টা করে। সুতরাং ঐ পার্থক্যের স্বতঃজাত প্রবৃত্তি প্রথম দুইটী কারণের সহিত মিলিত হইয়া সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ঘটাইতেছে এবং জীবের শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতেছে।

অনেক সময় মানুষে একশ্রেণীর জীবের মধ্য হইতে ঐরূপে বিচিত্র জীব বাছিয়া লইয়া নূতন নূতন জীবশ্রেণীর সৃষ্টি করে। আবার অনেক সময় প্রাণি-গণ আপনাদিগের স্বতঃজাত বৈচিত্র্য লইয়া সেই বৈচিত্র্যের সাহায্যে স্বভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া সেই স্বতঃজাত পার্থক্যটাকে ফুটাইয়া তুলে এবং নূতন শ্রেণীর জীব উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াকে প্রাণতত্ত্ববিদ্‌গণ selection বা নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা পরে এই নির্ব্বাচনতত্ত্বের অধিক পরিচয় দিব।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমরা উপরে দেখাইয়াছি যে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বিভিন্ন জাতীয় (species) জীবের সংমিশ্রণে হয় না। জীবের নূতন নূতন শ্রেণী বা 'স্পিসিস্' নিম্নলিখিত কারণে বাড়িয়া যায়—

(১) পিতৃগুণ সন্তানে বর্ত্তিলেও পিতা ও মাতার গুণের অসমঞ্জসতা ও অন্যান্য কারণ জন্য সন্তানের স্বাতন্ত্র্যের প্রবৃত্তি।

(২) বাহ্য প্রকৃতি অর্থাৎ দেশ, আহার, উষ্ণতা প্রভৃতি কারণে জীবের আকার প্রকারের বিভিন্নতা।

(৩) কোন কোন জীবের একটা স্বতঃ-প্রবৃত্ত বিচিত্রতা ঘটে। সেই বিচিত্রতাটুকু বংশানুক্রমে থাকিয়া গেলে ক্রমে সেই বিচিত্র জীবের বংশধরগণ একটা নূতন শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়।

*এইরূপে একজাতীয় জীব বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, সেই শ্রেণী আবার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়। শেষে যখন বিভিন্ন শাখার পার্থক্যের গণ্ডী গভীর হয় তখন সেগুলি বিভিন্ন 'স্পিসিস্' ভুক্ত হয়—যেমন গাধা, ঘোড়া। শৃগাল, কুকুর। টার্কি ও মোরগ। নোনা, আতা। আশফল ও লিচু। ইত্যাদি।

উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মোটামুটি কারণ বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

যন্ত্র-মন্দির।

দিনকতক হইল দিল্লীতে আসিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন কলিকাতা-নিবাসী এক বন্ধু আসিয়া আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনাদির পর দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের বিষয় কথোপকথন হইতে লাগিল। দিল্লী সহরবাসী আর একজন বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় বলিলাম— "আগে হিন্দুকীর্ত্তিগুলি দেখিবেন চলুন।"

কলিকাতা হইতে আগত হরিশবাবু বলিলেন "দিল্লীতে আর হিন্দুকীর্ত্তি কি আছে? ইন্দ্রপ্রস্থের কোনও চিহ্ন এখনও আছে না কি? আমার বিশ্বাস ছিল, তাহা অনেকদিন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।"

দিল্লীবাসী বন্ধু সরোজনাথ বলিলেন "কেন, পৃথ্বীরাজের প্রাসাদের কিয়দংশ বর্ত্তমান। কুতবমিনারের কাছেই তাহা দেখিতে পাইবেন, আর ফিরোজশাহ কোটলার নিকট অশোকের স্তম্ভও দেখিতে পাইবেন।"

আমি বলিলাম—"আর যন্তর্ মন্তর্? হিন্দুদের সেও ত এক বিরাট কীর্ত্তি। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার নিমিত্ত এমন মন্দির আর কোথায় দেখিয়াছেন?"

সরোজবাবু বলিলেন "কাশীতে এই রকম একটি মানমন্দির আছে। জয়পুরেও এইরূপ আর একটি আছে।"

হরিশবাবু বলিলেন "চলুন না যন্ত্র-মন্ত্র দেখিয়া আসি।"

সরোজবাবু বলিলেন "যন্ত্র-মন্ত্র আবার কোথায়? যন্ত্র-মন্দির বলুন।"

হরিশবাবু বলিলেন "আমি বাঙ্গলা মাসিকপত্রে দেখিয়াছি যন্ত্র-মন্ত্র। যন্ত্র মন্ত্র ভুলই বা কিসে? ইট পাথরের গাঁথুনিগুলিকে যন্ত্র বলুন আর জ্যোতিষের শ্লোক-গুলিকে মন্ত্র বলুন। আমার বেশ মনে আছে গতবর্ষের 'ভারতী'তে একখানি ছবির নীচে 'যন্ত্র-মন্ত্র' লেখা ছিল।"

সরোজবাবু বলিলেন "আজ্ঞে না। তা হ'তে পারে না। মন্ত্র ব'লে কোনও কথা এখানে হতে পারে না। আসল নাম যন্ত্র-মন্দির। হিন্দীতে যন্তর্ মন্দর্। ক্রমশঃ যন্তর্ মন্তর্ হইয়াছে। তারপর সাহেবরা Janter Manter করিয়া লইয়াছেন। চলুন না, পথে যাইবার সময় ছবির দোকান থেকে যন্ত্রমন্দিরের ফটো কিনে নোব এখন।"

দিল্লীর চাঁদনীচকের প্রশস্ত রাস্তার একধারে স্থিত একখানি ছোট বাড়ীর দ্বিতলের কক্ষে বসিয়া এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল। শীঘ্রই কাপড়চোপড় পরিয়া আমরা বাহির হইলাম।

প্রথমে একটি দোকান হইতে চার পয়সার পান ক্রয় করা গেল। হরিশ বাবু বলিলেন "এ কি? এখানে এক পয়সায় মোটে একটি পান! আমাদের কলিকাতা ত ভাল।" সরোজবাবু বলিলেন "এ ত খুব সাধারণ পান। আবার ভাল করিয়া সাজিয়া দিলে, একটি পান চার পয়সা হইতে দু' আনা পর্য্যন্ত দাম লইতে পারে। এ হচ্ছে বাদশাহী বিলাসের দেশ। বঙ্কিমবাবুর 'রাজসিংহে' পানওয়ালীর বিবরণ পড়িয়াছেন ত? দিল্লীতে পান সাজিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখে না। কিনিতে গেলে দাঁড় করাইয়া সাজিয়া দেয়।" হরিশবাবু বলি-লেন "এ একটা নূতন দেখা গেল বটে।"

পূর্ব্ব কথামত আমরা ছবির দোকানের নিকট পৌছিতেই সরোজবাবু আমাদের লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দোকানখানি খুব ছোট। দুইপাশে কম্পোজিটারদের অক্ষর রাখিবার কাষ্ঠমঞ্চের ন্যায় বড় বড় গহ্বরবিশিষ্ট কাষ্ঠ-মঞ্চ বিদ্যমান। এই সকল গহ্বরগুলি সচিত্র কার্ডে পূর্ণ। একপাশে কতক-গুলি সুবৃহৎ 'এল্‌বাম্' রহিয়াছে। সেগুলির মধ্যে দিল্লীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানসমূহের ফটোচিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। আমরা অনেকগুলি ছবি কিনিলাম। যন্ত্রমন্দিরের একখানি বড় ফটো ও ক্ষুদ্র কার্ড চিত্রও কেনা হইল। তাহার পর দোকান হইতে বাহির হইলাম।

তখন বেলা প্রায় এগারটা। শীতকাল তাই রক্ষা। নহিলে সূর্য্যতাপে ও ধূলিতে হাঁটা অসম্ভব হইত। তাই বলিয়া ধূলি যে কিছু কম ছিল তাহা নয়। এক একবার জোরে হাওয়া আসিলেই ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যাইতেছিল।

হরিশবাবু চারিদিক মনোযোগ সহকারে দেখিতেছিলেন। দিল্লীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাজপথেও কলিকাতার মত জনতা নাই। বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ ও পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পথিকগণ চলিয়াছে। রমণীগণও পাদুকা পরিধান করিয়া চলিতেছে। সাহেবী পরিচ্ছদের আদর এ দেশে খুব। কলার, টাই, গলা খোলা কোট, পেণ্টুলন প্রভৃতি সবই পরিধৃত হয়, প্রভেদ কেবল মস্তকের আবরণে। সমস্তই সাহেবীধরণ, মাথায় কেবল ক্যাপ্।

চলিতে চলিতে দিল্লীর প্রাচীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম ও ফটক দিয়া বাহির হইয়া সহরের বাহিরে পড়িলাম। যখন আমরা সহরের বাহিরে উপস্থিত হইয়াছি, তখন দেখিলাম এক সার উষ্ট্র পৃষ্ঠে বহু ভার লইয়া ফটক দিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিল। হরিশবাবুর পক্ষে এ উষ্ট্রশ্রেণীও নূতন। কলিকাতার ভারবাহী পশুর তালিকায় উষ্ট্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সহরতলীতে পৌছিলাম। একটি সুপ্রশস্ত পথ অবলম্বনে চলিতে লাগিলাম। এই পথ দিয়া কুতবমিনার-দর্শনার্থী ভ্রমণকারিগণ কেহ একায়, কেহ টঙ্গায়, কেহ মোটরে চড়িয়া চলিয়াছেন। রাস্তাটি প্রশস্ত বটে কিন্তু এত ধূলি যে আমাদের জুতার অধিকাংশ ধূলিতে অদৃশ্য হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে দ্রুতগামী মোটরের ধূলিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া যাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ এইরূপে চলিলাম। পথের দুইপার্শ্বে কোথাও কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির উদ্যান, কোথাও কৃষকের ক্ষুদ্র কুটীর। কোথাও গোপপল্লী। পথের উপর ছোট ছেলেরা খেলা করিতেছে। দুই একটি গাভী বৃক্ষতলে ছায়ায় শয়ন করিয়া আছে।

অবশেষে আমরা আমাদের বামপার্শ্বে একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরের গম্বুজ বা চূড়া কিছুই নাই। একতলা ঘর। সরোজবাবু বলিলেন "এই চিত্রগুপ্তের মন্দির।"

হরিশবাবু বলিলেন "এঁ্যা? চিত্রগুপ্তের মন্দির? যমালয়ে চিত্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ হয় শুনিয়াছি। তিনি কি দেবরূপে এখানে প্রতিষ্ঠিত না কি?"

আমি বলিলাম "তাহা আর আশ্চর্য্য কি? চিত্রগুপ্ত যমরাজের কেরাণী। হিসাব-নিকাশ, লিখন প্রভৃতি সবই তাঁর হাতে। আমাদের দেশে প্রাচীন

কাল হইতে কায়স্থগণ হিসাব ও লিখনকার্য্যে পটু ছিলেন। মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্য কায়স্থ দ্বারা চিঠি লিখাইতেছেন বলিয়া বর্ণনা আছে। চিত্রগুপ্ত এই কায়স্থগণ দ্বারা পূজিত। কায়স্থগণ এখানে আসিয়া পূজা দেয়।"

হরিশবাবু বলিলেন "চলুন, ভিতরে যাই।"

আমরা ভিতরে গিয়া দেখিলাম, বাজনা বাজিতেছে। শুনিলাম, সেইদিন অপরাহ্নে সেখানে এক মেলা হইবে। দিল্লী ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে কায়স্থ-গণ পূজা দিতে আসিবেন। যে কক্ষে চিত্রগুপ্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা অতি ক্ষুদ্র। প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তি। বর্ণ কৃষ্ণ। পরিচ্ছদাদি দ্বারা আবৃতদেহ।

আমরা সেখান হইতে ফিরিয়া বাহির হইতেই সম্মুখে চূড়া সমন্বিত আর একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। সরোজবাবু বলিলেন "ইহা হনুমানজীর মন্দির।" সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। মন্দিরদ্বার বন্ধ ছিল। আমাদের দেখিয়া মন্দিরের জনৈক কর্ম্মচারী তাহা খুলিয়া দিল। মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্যতল সম্মুখে মার্ব্বল প্রস্তরের জালি। তাহার পশ্চাতে উপাস্য মূর্ত্তি। দেওয়ালের কতক অংশও মর্ম্মরমণ্ডিত। মন্দিরের ছাদ কারু-কার্য্যখচিত। কিছুক্ষণ সেখানে থাকিয়া আমরা পুনরায় বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় সরোজবাবু বলিলেন "এদিকে আসুন।" তিনি প্রাঙ্গণ পার্শ্ববর্ত্তী এক বারান্দায় লইয়া গিয়া দূরস্থিত কোন দ্রব্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন "ঐ যন্ত্র-মন্দির।"

চারিদিকে মাঠ। মাঝখানে কতকগুলি গাঁথুনি দেখা গেল। তাহা বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। মনে হইল যেন এক বৃহৎ প্রাসাদ ছিল তাহার ভগ্নাবশেষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরে বুঝিয়াছিলাম যে যন্ত্র-মন্দিরের বিভিন্ন আকারের গাঁথুনিগুলি দূর হইতে যেন ভাঙ্গাচোরা বলিয়া মনে হয়।

আমরা হনুমানজীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে যন্ত্র-মন্দিরের নিকটস্থ হইলাম। আগে ইহার চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টন ছিল। ফটকের কিয়দংশ এখনও বর্ত্তমান।

হরিশবাবু তাঁহার গাইড্‌বুক খুলিয়া বলিলেন "রাজা জয়সিংহ ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাঠগণ কর্ত্তৃক ইহার কিয়দংশ ধ্বংসিত হয়।"

সরোজবাবু বলিলেন "থাক্, থাক্। ওসব প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় আর কাজ নাই। এই দেখুন, এই যন্ত্রের দ্বারা সময় কত বলা যাইতে পারে। সূর্য্য

উদিত থাকিলে ছায়া কোথায় পড়ে তাহা দেখিয়াই বেলা কত বলা যায়। এখন কত বেলা বলুন দেখি ?"

আমরা দেখিলাম বক্রাকার এক গাঁথুনি রহিয়াছে তাহার উপর দেব নাগরী অক্ষরে ১, ২ প্রভৃতি লিখিত আছে। ছায়ার রেখা দুই ও তিনের ঠিক মধ্যস্থলে পড়িয়াছে। বেলা তখন আড়াইটা। ঘড়ি খুলিয়া দেখাতে জানিলাম উহাই ঠিক সময়। কয়েক মিনিটের তফাৎ হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য নানা তর্ক চলিতে লাগিল। শেষে হরিশবাবু হাসিয়া বলিলেন "আমার ঘড়িটা ঠিক্ সময়ের সহিত মিলান নাই।"

বহুদিন পূর্ব্বে এই যন্ত্র-মন্দির গঠিত হয়। মধ্যে সংস্কার অভাবে জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার সংস্কার করা হইয়াছে। জয়পুরের মহারাজের জ্যোতিষী গোকুলচন্দ্র ভাবনের তত্ত্বাবধানে এই সংস্কার ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সংসাধিত হইয়াছে। তাঁহার নাম ও সংস্কারের তারিখ প্রতি যন্ত্রের গাত্রে ইংরাজী ও দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে।

আমরা যে যন্ত্রটি দেখিতেছিলাম তাহার গাত্রে এক ফলকে নিম্নলিখিত লিপি আছে—

Niyat Chakra Yantra
Repaired A. D. 1910
Tested by Jotshi Gokul Chand Bhawan.

	h. m.
Represents sun's Declination	a......6-52
at these hours by observing	b 7-24
sun's shadow on circles	c......16-36
a, b, c, d respectively.	d......17-8

Morning hours denote
noon at Not-ke, Japan.

নিয়তচক্রযন্ত্রম্।

জীর্ণোদ্ধার সম্বৎ ১৯৬৬

পরিশোধনকর্ত্তা জ্যোতিষী গোকুলচন্দ্র ভাবন

ইস্ যন্ত্রসে সূর্য্যকী ক্রান্তিকা জ্ঞান নিয়তচক্রসে ইন্ ঘণ্টোপর হোতা হৈ। মধ্যাহ্নসে পহলে ঘণ্টোসে নাটকে (জাপান) ঔর জ্যুরিচ (পিক) কে মধ্যাহ্নকা জ্ঞান ঔর মধ্যাহ্নকে পিছলে ঘণ্টেসে জ্যুরিচ যন্ত্রালয় (ইটলী) ঔর গ্রীণবিচ যন্ত্রালয় (ব্রিটেন) কে মধ্যাহ্নকা জ্ঞান হোতা হৈ।

এই হিন্দী অংশের পাশে ইংরাজী অংশের পার্শ্ববর্ত্তী ঘণ্টা ও মিনিট লিখিত আছে।

আমরা এই যন্ত্রের দক্ষিণদিকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানেও আর একটি পর্য্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। একটি অর্দ্ধবৃত্তাকার গাঁথুনি, তাহা বিবিধ ভাগে বিভক্ত। তাহার নিম্নে বসিবার মত একটি স্থল। সেখানে এই ফলক বিদ্যমান।

দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্রম্।

ইস্ যন্ত্রসে গ্রহনক্ষত্রাদিকো কোটীকা * মধ্যাহ্নবৃত্তপর জানেকে সময় উন্‌কে উন্নতাংশকা জ্ঞান হোতা হৈ।

For finding Altitude when Planets or other Heavenly bodies pass over the Plane of Meridian.

আমরা তাহার পর ঘুরিয়া পশ্চাদ্দিকে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আর একটি যন্ত্র। ইহার নাম—কর্কটরাশিবলয়যন্ত্রম্।

For finding Longitude of the Sun when the Point 90 in the Ecliptic comes over the Plane of Meridian. (ইস যন্ত্রসে সূর্য্য স্পষ্ট জানা যাতা হৈ, কিন্তু ইস্ যন্ত্রসে তব্ হী কাম লিয়া জাতা হৈ জব্ কর্কটরাশিকা প্রারম্ভিক চিহ্ন দক্ষিণোত্তর বৃত্তপর হো।)

একটি গাঁথুনির তিনদিকে এইরূপে তিনটি যন্ত্র দেখিলাম। শুনিয়াছিলাম, সেখানে একজন পণ্ডিত বাস করেন। খোঁজ করিয়া জানিলাম, তিনি জয়পুরেই থাকেন, কখন কখন আসেন। গাইড্‌রূপী অনেকগুলি রক্ষক সেইখানে বাস করে। ঐ সকল যন্ত্রের মধ্যে ছোট ছোট গহ্বরের ন্যায় ঘর আছে। গাইড্‌রা এ সকল যন্ত্র দেখাইয়া দেয় মাত্র। বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রভৃতি তাহাদের বুদ্ধির অগোচর।

তাহার পর আমরা সূর্য্য-ঘড়ী (Sun-Dial) দেখিতে গেলাম। উচ্চ স্তম্ভের উপর উহা স্থাপিত। অনেকগুলি সোপান বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরের স্তম্ভের উপর গোলাকার বৃত্ত। তাহাতে ১,২ প্রভৃতি লিখিত। মধ্যে কিয়দংশ উন্নত। তাহার ছায়া ১,২ প্রভৃতি নম্বরের স্থানে পড়িয়া থাকে।

সূর্য্য-ঘড়ী দেখিয়া জয়-প্রকাশযন্ত্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। মহারাজ জয়সিংহ ইহা আবিষ্কার করেন। দুইটি পৃথক্ অংশে ইহা নির্ম্মিত। পৃথক্

* অধোরেখাঙ্কিত অক্ষরগুলি অস্পষ্ট। অনুমানে লিখিত হইল।

অংশ দুটিকে যদি একটির উপর আর একটি রাখা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে একটি গোলক হইত। এখন এক একটি অংশ অর্দ্ধগোলাকার। ইহার উপর বহু রেখা অঙ্কিত। বিষুবরেখা, মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি বিভিন্ন রাশির নাম ইত্যাদি দেবনাগরী অক্ষরে বিভিন্নস্থলে খোদিত রহিয়াছে। ইহা—

Representation of half celestial sphere ; rim represents horizon. For finding all the positions of the heavenly bodies. [কিনারে কো ক্ষিতিজ মানকর আধে খগোলকা পরিদর্শন। গোলীয় প্রত্যেক পদার্থকে জ্ঞান কে লিয়ে]

পৃথক্ দুইটি অংশ ক, খ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি অপরটির পূরক (Supplementary).

এইরূপ দুইটি অংশযুক্ত আর একটি যন্ত্র দেখিলাম। তাহার নাম রাম-যন্ত্র। ইহার মধ্যস্থলে একটি স্তম্ভ। স্তম্ভগাত্রে রক্তবর্ণের পর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার পর আবার রক্তবর্ণ এইরূপ ভাবে স্থূলরেখা অঙ্কিত। তাহার পাদদেশ হইতে প্রস্তরের টালি নির্গত হইয়া দূরস্থিত গোলাকার প্রাচীরের তলদেশে গিয়া মিশিয়াছে। এই টালি স্তম্ভনিম্ন হইতে সূক্ষ্মভাবে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীরের গাত্রে গবাক্ষের ন্যায় খোলা স্থল। প্রাচীরটি বহু উচ্চ। এই যন্ত্রের কার্য্য ফলকে লিপিবদ্ধ। [This gives the altitude and azimuth of the Sun and of the heavenly bodies.] (ইস্ যন্ত্রসে উন্নতাংশ দিগাংশ আদি জানে জাতে হৈ।) মধ্যস্থ স্তম্ভটি ৩৬০ ডিগ্রি কোণ ধারণ করিতেছে।

এই যন্ত্রেরও ক, খ দুইটি অংশ পৃথক্ বর্ত্তমান। একটি অপরটির পূরক।

শেষে আমরা সম্রাট-যন্ত্র দেখিতে গেলাম। ইহা সূর্য্যঘড়ির নিকট। ইহা একটি বৃত্তাকার গাঁথুনি। কিয়দংশ মৃত্তিকা নিম্নে রহিয়াছে, কিয়দংশ জলে ডুবিয়া গিয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিয়া ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল। কিন্তু সেই খনিত গহ্বরে জল সঞ্চিত হইয়া ইহার কতক অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য For finding time and declination and hour angle of the heavenly bodies (গ্রহনক্ষত্রকি ক্রান্তি বিষুবাংশ ঔর সময় জ্ঞান কো লিয়ে।)

এই কয়টি যন্ত্র লইয়াই যন্ত্র-মন্দির। যন্ত্রমন্দির দেখিতে অনেকেই যান, কিন্তু ইহা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত তাহা অল্পলোকেই অভিনিবেশ সহকারে দর্শন

করেন। আবার কিরূপে কোন্ কোন্ নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণে এই সকল পর্য্যবেক্ষণ হইত তাহাও অনেকের অজ্ঞাত।

আমরা তাহার পর ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। হরিশবাবু বলিলেন "কাশী, দিল্লী ও জয়পুরের তিনটি মানমন্দির দেখিয়া, তাহাদের চিত্র সহিত, প্রসিদ্ধ হিন্দু জ্যোতিষীগণের দ্বারা হিন্দুদের প্রাচীন কালের পর্য্যবেক্ষণ প্রণালী লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত।"

সরোজবাবু বলিলেন "ইহা হইতে আমাদের হিন্দু পঞ্জিকা সংস্কারও হইতে পারে। কিন্তু কে একথায় কাণ দেয় বলুন।"

আশা করি শীঘ্রই কোন মনীষী এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের গৌরবরক্ষা করিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

যক্ষের ধন।

বাল্যকালে যখন আমাদের গ্রামের নিদাঘ-তাপ-শুষ্ক পুষ্করিণীর পঙ্কের ভিতর হইতে ছুটিয়া পাহাড়ে উঠিতাম তখন মনে মনে ভাবিতাম, যে দিন সত্য সত্য পাহাড় পর্ব্বতের উপর উঠিতে পাইব সে দিন জীবনটা ধন্য হইবে। কিন্তু যে দিন সে বাল্যস্বপ্ন প্রথম ফলিল সে দিন প্রাণের ভিতর এক বিষম যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলাম। হাঃ অদৃষ্ট! যদি ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিয়া একটা বড় রকম কিছু হইতে পারিতাম তাহা হইলে আর এই পোড়া পেটের জন্য গৃহে নবমুকুলিত গোলাপ ফুলের মত স্ত্রীরত্নটিকে ফেলিয়া রাখিয়া দেড় হাজার মাইল দূরে সিমলা পাহাড়ে আসিতে হইত না।

ভোরের বেলায় স্বপ্ন-বিজড়িত চক্ষে কাল্কার ষ্টেসনের উপর দাঁড়াইয়া ঠিক উপরোক্ত রকমে আপনাকে ধিক্কার দিতেছিলাম সে কথাটা বলিলে অসত্য বলা হয়। ষ্টেসনের পিছনেই খুব মস্ত বড় একটা পাহাড় আমার দৃষ্টি ও বাল-রুণের পথ রোধ করিতেছিল। সিমলার ছোট রেলের ট্রেণখানিও আরোহী

পূর্ণ হইতেছিল। আমি প্ল্যাটফরমের উপর পদচারণা করিতেছিলাম আর দেশে ফিরিবার দিন সেই স্থলে আসিলে মনে যেরূপ অপার আনন্দ লাভ করিব তাহা কল্পনা করিতেছিলাম। ষ্টেসনের উপর নানা রকম পরিচ্ছদে বিভূষিত নানা জাতীয় নরনারী আমাকে দেখিতেছিল এবং আমিও তাহাদিগকে দেখিতেছিলাম। কিন্তু একটা পাহাড়ী যুবতী আমাকে একটু অধিক মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে আমার মুখখানা বেশ সুন্দর বলিয়া পার্ব্বত্য যুবতী আমাকে অতটা সম্মানিত করিতেছে। কিন্তু যখন দেখিলাম প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তাহার সফরী নেত্রে আমার মুখকমলমধু পান করিয়াও সে পরিতৃপ্ত হইল না তখন বুঝিয়া ফেলিলাম যে বোমার হাঙ্গামায় আগন্তুক বাঙ্গালী যুবকদিগকে লক্ষ্য করিবার জন্য সুরসিক পুলিস এইরূপ সুন্দরী গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছে। বুঝিলাম এদেশে পুলিসের প্রাণে বেশ কবিতা আছে।

কাল্‌কা ছাড়িয়া যখন সিমলার ট্রেণ পাহাড়ের গা বহিয়া মরাল সাপের মত এঁকিতে বেঁকিতে ছুটিতে লাগিল তখন গৃহস্মৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! গাড়ির এক দিকে গবাক্ষের দুই হাত দূর হইতেই তুঙ্গগিরি, অপর দিক দিয়া উপত্যকার কি লাবণ্য! ছোট ছোট গিরিস্রোত মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হইতেছে, আমরা বেগবান ট্রেণের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলাম। এক একটা শৈল সমষ্টি ছাড়িয়া আমরা যেমন এক এক নূতন পাহাড়ের গায়ে উঠিতেছিলাম অমনি এক অভিনব দৃশ্য আসিয়া প্রাণ মন মাতাইতেছিল। নিচে পাহাড়ীদের গ্রামের ছেলেগুলা উপরে গাড়ি দেখিয়া কোলাহল করিতেছিল। গ্রাম্য কুকুরগুলা মুখ তুলিয়া তারস্বরে চিৎকার করিতেছিল—সে শব্দ বায়ুবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া ট্রেণের গম্ভীর নিনাদের সহিত মিলিত হইতেছিল। আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। দেখিলাম নিম্নের শৈলগাত্রে স্তরে স্তরে মকাই, গোধূম প্রভৃতি জন্মিয়াছে। কিন্তু যতবার গাড়ির গবাক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া নূতন নূতন দৃশ্য দেখিলাম ততবার সেই পার্ব্বত্য যুবতী-গোয়েন্দার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ আমায় বিরক্ত করিতে লাগিল। কি বেয়াদব! এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল যে ষ্টেসনে গাড়ি থামিলে স্ত্রীলোকটার সঙ্গে একটু কলহ করিয়া আসি। কিন্তু বিদেশে পুলিস-পুষ্ট লোকের সহিত কলহ করা অবিবেচকের কার্য্য, ইহা ভাবিয়া বিরত হইলাম। আমার রাজভক্তি সম্বন্ধে অদ্যাবধি কেহ সন্দেহ করে নাই। সুতরাং আমি পুলিসের ভয়ে ভীত হইলাম না।

(২)

সিমলার কেরাণীদের 'ব্যারা'কে বড় সুখে ছিলাম। ছোট বড় সকলে এক সঙ্গে মিশিয়া প্রবাসবাসের কঠোরতাটুকুর কতকাংশ নিবারণ করিবার জন্য সিমলার বাঙ্গালীবৃন্দ বিধিমতে চেষ্টা করেন। সিমলার কালীবাড়ী বাঙ্গালীদের পার্লামেণ্ট সভা। কোনওরূপ অশিষ্টতাচরণ করিলে মুরুব্বি পক্ষের অপ্রিয়-ভাজন হইতে হইবে এই ভয়ে আমরা ভদ্রতার গণ্ডীর মধ্যে থাকিতাম। বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত একত্র পানাহার করিতাম, গল্পগুজব করিতাম, সখের থিয়েটারে মহল্লা দিতাম অথচ তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে বিরত হইতাম না। আমাদের বাঙ্গালী সমাজে কেহ পীড়িত হইলে তাহাকে সকলে মিলিয়া শুশ্রূষা করিতাম। আমাদের সিমলাশৈলের বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক সমাজ আদর্শ না হইলেও তাহা আমাদের গৃহের বাঙ্গালী সমাজ অপেক্ষা প্রভূত উন্নত, তাহা প্রত্যেক আগন্তুককেই স্বীকার করিতে হইত।

কিন্তু এত সুখের ভিতর দুইটি ভীষণ যন্ত্রণা মাঝে মাঝে প্রাণকে আলোড়িত করিত। প্রথমটি প্রবাসবাসের কষ্ট। আত্মীয় স্বজনের অদর্শন এবং জন্মভূমির ইট কাট গাছপালা এমন কি দেওয়ালের ফাটাফুটাগুলার স্মৃতিতেও হৃদয়ে এক অভাব বোধ করিতাম। গৃহের সেই গোলমাল, মান অভিমান, পুরাতন ছোটখাট ঘটনাগুলা দূর হইতে কেমন মধুর বলিয়া মনে হইত। দ্বিতীয় যন্ত্রণা মাঝে মাঝে সেই পাহাড়ী গোয়েন্দা-ললনার সতৃষ্ণ চাহনী। সে চাহনী ক্রমশঃ আমার হাড়ের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া ধমনীর রক্তকে জমাট বাঁধিয়া দিত। 'ব্যারা-কে'র বারান্দায় দাঁড়াইয়া নিচে পাহাড়ের গায়ে ইঞ্জিনের চলাফেরা দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ যখন দেখিতাম পৃষ্ঠে এক 'কিল্‌টা' আলু লইয়া সেই যুবতীটা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া আছে তখন সহসা যেন সর্ব্বশরীরের ভিতর দিয়া দামিনী-প্রবাহ ছুটিয়া যাইত। যখন বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত ইলিসিয়ম পাহাড়ের নিবিড় বনে বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়া দাশুবাবুর 'সেলিনা' নাটিকা হইতে গুণ গুণ স্বরে—

'কি তান লহরী চালিছে বাঁশরী
ঝিরি ঝিরি নির্ঝর কি গান গায়'

গানটি গাহিতে গাহিতে বেড়াইতাম তখন নিচে পাহাড়ের গায়ে বরাস ফুলের গাছে ঠেস্ দিয়া হাতে এক রাশ বড় বড় রক্তবর্ণ বরাস ফুল লইয়া দাঁড়া-

ইয়া সে যখন আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত তখন হটাৎ আমার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিত, অথচ তাহার কথা কাহাকেও বলিতে পারি নাই।

(৩)

আজ ভাবিলাম রমণীটাকে ধরিব। যেমন করিয়া পারি সাহসে বুক্ বাঁধিয়া তাহার নিকট হইতে জানিয়া লইব কেন সে ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করিতেছে। সে স্থানটি বেশ নির্জ্জন, উপরে বড় লাট সাহেবের বাড়ির প্রাচীরের অংশ মাত্র দেখা যাইতেছিল। রাস্তার নিচে জঙ্গলের ভিতর হইতে অলস ভাবে 'বউ কথা কও' পাখী ডাকিতেছিল। খড়ের ভিতর বড় বড় ফুলের গাছে রাশি রাশি বরাস ফুল ফুটিয়া সেই হরিতবর্ণ শৈল-গাত্রকে এক অপূর্ব্ব শোভায় ভূষিত করিয়াছিল। আমি অগ্র পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিলাম আমার ঈষৎ দুরে কাঠের রেলিঙের উপর উপবিষ্টা সেই পার্ব্বত্য রমণী ব্যতীত পথে কেহ নাই। আমি হাত নাড়িয়া তাহাকে ডাকিলাম। রমণীর গণ্ডস্থল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল। সে রেলিঙ ছাড়িয়া উঠিয়া দুই এক পদ আমার দিকে অগ্রসর হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আমিও তাহার দিকে একটু অগ্রসর হইলাম। আমাদের মধ্যে মাত্র দুই হস্তের ব্যবধান রহিল।

আমি ঈষৎ কম্পিত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলাম—হাম্‌সে কেয়া মাঙ্‌তা ?

ললনাটি বেশ মধুর অথচ একটু কাতর স্বরে বলিল—বাবুজি হামারা জেবর ?

'জেবর' ? কিছু বুঝিলাম না। মাগী কি সখের ভিখারিণী না কি। পয়সা না চাহিয়া অলঙ্কার চাহে ? আমি বলিলাম—কেয়া জেবর ?

রমণীটি এবার একটু রুক্ষস্বরে বলিল—কেয়া জেবর ? ভাই সে পুছো বাবুজি ! বাঙ্গালী সয়তান—বে-ধরম—

পশ্চাতে অশ্বপদ শব্দ পাইলাম। একটা সাহেব ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছিল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া পথের প্রাচীরের দিকে সরিয়া গেলাম। নির্জ্জন পথে যুবতীর সহিত রসালাপ করিতেছি ভাবিয়া সাহেবটি একটু মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিল। আমি লজ্জায় চোখ নামাইয়া লইলাম।

সাহেব দৃষ্টির অন্তরালে যাইলে আমি রমণীর দিকে তাকাইলাম। তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না। উপর নিচে সামনে পিছনে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিলাম কোথাও তাহাকে পাইলাম না ! কি ভয়ঙ্কর সমস্যা ! তাহা হইলে সে গোয়েন্দা নহে। কোনও বাঙ্গালীর নিকট

অত্যাচার সহিয়া রমণীটা আমার অনুসরণ করিতেছিল। কিন্তু সিমলায় এত অধিক বাঙ্গালী থাকিতে সে আমাকে কেন অনুসরণ করিতেছে বুঝিলাম না। 'ভাই সে পুছো', ভাই কে ? তবে কি ঝণ্টু খুড়ো ! আশ্চর্য্য নহে ! কিন্তু আমার চেহারার সহিত ঝণ্টু খুড়োর চেহারার যে বিশেষ সাদৃশ্য ছিল তাহা পূর্ব্বে কেহ লক্ষ্য করে নাই। এ রমণী নিশ্চয় কিছু সাদৃশ্য দেখিয়াছিল।

(৪)

আমার ঝণ্টু খুড়ো আমার সমবয়স্ক। তাহার ভাল নাম নরেশচন্দ্র। জীবনের যাবৎ বিশেষত্ব নরেশচন্দ্রের একচেটিয়া ছিল। ঝণ্টু খুড়ো আমাকে কাঁটাল বাগানে লইয়া গিয়া প্রথমে শুক্‌না লাউডগার চুরুট হইতে আরম্ভ করিয়া হারু তাঁতির তাঁত ঘরে বসিয়া ডাবা হুঁকায় তামাক অবধি খাওয়াইতে শিখায়। ঝণ্টু খুড়ার সঙ্গে স্কুল পলাইয়া মাঠে খেজুর রসের ভাঁড় নামাইয়া রস পানান্তে পুকুরের জলপূর্ণ করিয়া খেজুর গাছে সেই ভাঁড় পুনঃস্থাপন করিতে শিখি। ঝণ্টু খুড়ো কলিকাতায় আসিয়া নানারকম কৌশল শিখিয়াছিল। ঝণ্টু খুড়োর নেতৃত্বে ফুটবল ম্যাচ দেখিয়া ট্রামে ফিরিবার সময় মাশুলের পয়সা ফাঁকি দিতাম। খুল্লতাত আট আনা দিয়া থিয়েটারের গ্যালারির টিকিট কিনিয়া তৃতীয় অঙ্কের পূর্ব্বে প্রাচীর লাফাইয়া ষ্টলে গিয়া বসিতে পারিত।

আমরা উভয়েই ডাইরেক্টর জেনেরল অফ্ পোষ্ট আফিসের দপ্তরে কার্য্য পাইয়াছিলাম। আমাদের অফিসের লোকের সিমলা যাইবার পালা পড়িত। আমি এ বৎসর আসিয়াছিলাম। পূর্ব্ব বৎসরে ঝণ্টু খুড়োর পালা পড়িয়াছিল। বুঝিলাম গত বৎসর প্রথম সিমলায় আসিয়া ঝণ্টু খুড়ো পাহাড়ী সুন্দরীর সহিত কি একটা গর্হিত অধর্ম্মাচরণ করিয়া গিয়াছে। অলঙ্কার সম্বন্ধে সে কি বলিল বুঝিলাম না। নরেশচন্দ্র বোধ হয় তাহাকে গহনা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে—না! সন্দেহ হইল। তবে কি নরেশচন্দ্র প্রণয়ের ভান করিয়া দরিদ্রার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া বাড়ি ফিরিয়াছিল ? ভাবিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। আমাদের বংশে কেহ ওরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে পারে তাহা মনে হইল না।

(৫)

এক নূতন রকমের ভাবস্রোত আসিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থলকে আলোড়িত করিতেছিল। সিদ্ধান্ত করিলাম, যেমন করিয়া পারি এ সমস্যার মীমাংসা করিব।

বাস্তবিক যদি খুল্লতাতপুঙ্গব যুবতীর অমূল্য রত্ন হরণ করিয়া শেষে অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া চলিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে ত বিশেষ লজ্জা ও অবমাননার কথা। ভাবিলাম রমণীর নোকসানের ঠিক মাত্রাটা বুঝিতে পারিলে যেমন করিয়া পারি তাহার ক্ষতি পূরণ করিব।' পূর্ব্বে যেমন রমণীর দৃষ্টির তীব্রতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যত্নবান থাকিতাম এখন তেমনি তাহাকে খুঁজিয়া পাইবার জন্ত চেষ্টা করিতাম। কিন্তু প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া তাহার কোনও সন্ধান পাইলাম না।

রজনীর ওরূপ গরিমা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। দূরের নগ্ন পাহাড়গুলার উপর অমল শুভ্র চন্দ্রকিরণ পড়িয়া তাহাদিগের এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিয়াছিল। বোধ হইতেছিল যেন এক ভীষণ মহা সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গরাশি মন্ত্রবলে জমাট বাঁধিয়া ঐরূপ প্রস্তরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকস্নাত বিটপী শ্রেণীর ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিয়া শীতল বায়ু আমাদিগকে কাঁপাইতেছিল। দূরে পর্ব্বত শিরে ধবল তুষাররাশি কৌমুদী কিরণে ঝলসিতেছিল। মলের উপর দিয়া মোটা মোটা আলষ্টারাবৃত সাহেবের দল চুরুট টানিতে টানিতে ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিল। নিচের ঠাণ্ডি সড়কে চলিতে চলিতে ললিত কণ্ঠে কোন পাহাড়ী রমণী আপন মনে গাহিতেছিল—

হীর আন্দের আন্দের ব্যৈঠী সাওয়ীতে পিলি
লোক আখেন হীর মাইয়ঁ।
কামলিয়ঁা সেইয়ঁা মেরা হাল না পুছিয়ঁা।
মেইদি তাঁ লাওয়েন যাইয়ঁা নিঁ।*

দেখিলাম গায়িকা আমার পরিচিতা পাহাড়ী-ললনা। এবার সে আমায় দেখে নাই। দুইজনে উপর নিচে একই দিকে চলিতেছিলাম। আরও খানিক দূর অগ্রসর হইলে ইলিসিয়মে, গিয়া দুইটি পথ একত্র মিলিবে। আমি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম।

যেখানে দুইটি পথ মিলিয়াছে তাহার ঈষৎ দূরে একটি সুরঙ্গ আছে। সুরঙ্গের ভিতর দিয়া বাহির হইলে কুলি প্রভৃতি চলিবার জন্য একটা রাস্তা আছে।

* হীর (গায়িকার নাম) বসিয়া মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে সাদা ও হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যাইতেছে। লোকে বলিতেছে হীরার বিবাহ হইবে তাই সে হলুদ মাখিয়া অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে। পাগলিনী সখীর দল আমার প্রকৃত অবস্থা না বুঝিয়া, (আমার বিবাহ ভাবিয়া) আমাকে মেদি পাতা পরাইতে আসিয়াছে।

রমণী সুরঙ্গ মুখে পঁহুছিবার পূর্ব্বে আমি সুরঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সে আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে সুরঙ্গে প্রবেশ করিল।

আমার হাত কাঁপিতেছিল। আমি তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। তাহাকে অনুসরণ করিলাম। সুরঙ্গ হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রালোকে দুইজনের চক্ষু মিলিত হইল। আমি সাহসে ভর করিয়া বলিলাম—উস্ রোজ জেবরকা বাত কেয়া বোলতা থা? বাবুজি কা কেয়া নাম হায়?

সে স্থানে অত্যন্ত শীত। রমণী আমার উপর একটা স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিল। আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। রমণী অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—'ডরপুক্ বাঙ্গালী চোট্টা।'

একটা সামান্যা পাহাড়ী রমণীকে বুদ্ধিমান বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে এইরূপ অশ্রদ্ধভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতে শুনিয়া আমার ক্রোধ হইল। অথচ তাহাকে অর্থ দিয়া খুল্লতাতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। রমণী ফিরিয়া যেমন চলিতে আরম্ভ করিল আমি অমনি তাহার হাত ধরিলাম। নিমেষের মধ্যে আমার হাত ছাড়াইয়া রাজপথে না গিয়া পাহাড়ের গা বহিয়া একটু নামিয়া রমণী আমাকে তর্জ্জনী দ্বারা শাসাইয়া বলিল—তোমারা ভাইকো নেহি মিলে গা তো তুমারা খুন পিয়েগা। মেরা কলিজা ফাট্‌তা।

আমি বলিলাম—রোপেয়া লেও জেবরকা দাম লো।

রমণী বলিল—'বেধরম্ ঝুটা।'

তাহার পর সে পাহাড়ের গাত্র বহিয়া অবলীলাক্রমে খডের দিকে নামিয়া গেল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ব্যারাকাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

(৬)

ঝণ্টু খুড়ার পত্র পাইলাম। পত্র পাঠে আমার অশান্তি আরও বাড়িয়া উঠিল। প্রায় মাসাবধি রমণীকে দেখি নাই। সুতরাং তাহার সহিত একটা নিষ্পত্তি করিবার অবসর পাইলাম না। ঝণ্টু খুড়ার পত্রের ভাব হইতে বুঝিলাম সেও অনুতপ্ত। সে লিখিয়াছিল—"তুমি তো স্বয়ং তাহাকে দেখেছ। আর দেখেছ সিমলার স্বভাবের সৌন্দর্য্য, পথের ধারে বুনো গোলাপ ফুলের জঙ্গল, জ্যাকোর পিছনের পাহাড়ে চামেলির ছড়াছড়ি, চারিদিকে বরাস ফুলের শোভা, সাহেবদের বাগানের দালিয়া। আইবুড়ো ছেলে চিরটাকাল উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ঘুরেছি। পাহাড়ের উপর যুবতীর চাঁদ মুখখানা দেখে যদি তাকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকি তো বিশেষ কি অন্যায় করেছি? ঝুনিয়া তার মার সঙ্গে সহরে

দুধ বেচতে আস্‌তো। আমি রোজ সকালে তাকে জঙ্গিলাটের বাড়ি মোড়নের কাছে দেখতাম। তার মা' তার কাছে সব দুধের বাণ্টা গুলা রেখে উপরে সাহেবের কুটিতে দুধ দিতে যেত। এ প্রলোভন কে ছাড়তে পারে? তার মুখের সে লাবণ্য কত সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো। আমার সঙ্গে তার প্রণয় হ'ল। কি করব? সে রোজ সন্ধ্যার সময় মোসাত্রার পথে আমার সঙ্গে দেখা করত। অবশ্য আমি তাকে কল্‌কাতায় আন্‌বার, সাদি কর্‌বার লোভ দেখিয়েছিলাম। কিন্তু প্রেমে আর যুদ্ধে মানুষ ঠিক ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য করতে বাধ্য নয়।"

অলঙ্কারাপহরণ সম্বন্ধে ঝণ্টু খুড়ো যাহা লিখিয়াছিল তাহাতে আমার হৃদয়ের একটা গুরুভার অপনোদিত হইল। সে লিখিয়াছিল—"ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা! তুমি কেমন ক'রে বিশ্বাস করলে যে অবিনাশ সিংহের নাতি তোমার কাকা একটা গরীব পাহাড়ী গোয়ালিনীর সামান্য গহনা চুরি করবে। আমার আসবার কিছুদিন আগে ঝুনিয়া আমাকে গহনাগুলা দিয়েছিল। কলিকাতায় পালিয়ে আসবার সময় যদি সে সুবিধা করতে না পারে তাই আগে থেকে সেগুলি সংগ্রহ ক'রে আমার কাছে জমা রেখেছিল। আমি ভেবেছিলাম তার সঙ্গে আরও কিছু গহনা কিনে মিশিয়ে দিয়ে তাকে ফেরত দেব। তাকে কতবার অর্থ দিতে চেষ্টা করেছি কিন্তু সে গ্রহণ করেনি। আমি আজকের ডাকে সে গহনার বাক্স পাঠাচ্চি। যেগুলিতে টিকিট মারা আছে সেগুলি নূতন। আমি তার জন্যে কিনেছিলাম। ফেরবার আগে আর তা'র দেখা পাইনি তাই তার অলঙ্কারগুলি তাকে ফেরত দিতে পারিনি। তার সঙ্গে দেখা হ'লে এই সব কথা তাকে বলো। আর তাকে ব'লো আমার প্রেম অনেকগুণ বেড়েছে। তাকে কলকাতায় যদি আনতে পারো আমি তাকে বিবাহ ক'রে প্রতিজ্ঞাপালন করব। আমার উপর তার কতদূর ভালবাসা দেখলে। আমার চেহারা অহরহঃ তার হৃদয়ে স্থান না পেলে সে তোমাকে দেখে আমার বংশের লোক ব'লে কখনও চিনতে পারতো না। তারও মূরতি নিশি দিন আমার অন্তরে জাগছে, তার গানের সুর আমার কানে খেলা করছে। প্রথম প্রথম সিমলায় গিয়ে আমি পাজামা পরা আর পাঞ্জাবী পিরাণ গায়ে দেওয়া স্ত্রীলোক দেখলে বড় চটতাম। কিন্তু এখন বুঝেছি এদিককার স্ত্রীলোকদের পোষাক মোটেই সুশ্রী নয়।"

তার পর ঝণ্টু খুড়ো অনেক অনুতাপ করিয়া অনেক কথা লিখিয়াছিল।

(৭)

চারিদিক ঘনঘটাচ্ছন্ন হইতেছিল তবু আমি কামনা দেবী পাহাড়ের উপর উঠিতেছিলাম। সিমলার ঋতু বড় অনিশ্চিত। কে বলিতে পারে এখনি এই নিবিড় মেঘমালা যবনিকার মত সরিয়া যাইবে না, শৈলরাশি আবার এখনি গোধূলি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না। এই পাহাড়ের উপর হইতে বহুদূর দেখা যায়। পাঞ্জাবের সমতলভূমি এমন কি শতদ্রু নদের বালুকারাশিও লক্ষ্য হয়। তাই সাহেবরা এ শৈলটীর নামকরণ করিয়াছিল 'প্রস্পেক্ট হিল'।

পাহাড়ের উপর উঠিবামাত্র শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। পাথরের উপর বড় বড় 'বজরি' গুলা শব্দ করিয়া পড়িতে লাগিল। ঘনকৃষ্ণ নীরদমালা সমগ্র শৈলশিরটি তমসাবৃত করিল। কি করি, কোথা যাই। সম্মুখেই দেবীর মন্দির। দেখিলাম দ্বার রুদ্ধ। জুতা লইয়া সমস্যায় পড়িলাম। পাহাড়ের একটা গর্ত্তের মধ্যে জুতা রাখিয়া ছুটিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আকাশ আরও ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি ক্ষুদ্র দেব মন্দিরের এক পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

সহসা মন্দিরের দ্বার খুলিল। বুঝিলাম মন্দির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিল কিন্তু তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। মুক্ত মন্দির দ্বার দিয়া শীতল বায়ু আসিয়া আমাকে কাঁপাইতেছিল।

ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্—বিদ্যুৎ চমকিল—কড় কড় শব্দে বাজ পড়িল। বজ্রনিনাদ শৈলরাজিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। ভীষণ প্রতিধ্বনি উত্থিত করিল। আমি কিন্তু সে শব্দে কাঁপিয়া উঠি নাই। কাঁপিয়াছিলাম সেই ক্ষণপ্রভালোকে মন্দির মধ্যে পাহাড়ী ললনা ঝুনিয়াকে দেখিয়া। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল।

আমি সাহসে ভর করিয়া ডাকিলাম—ঝুনিয়া।

যুবতী এক পৈশাচিক হাস্য করিল। আবার দামিনী ঝলসিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমি শিহরিলাম। কিন্তু যে অবসর এতদিন ধরিয়া খুঁজিতেছিলাম তাহার অসদ্ব্যবহার করিলাম না। তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে আমি তাহার প্রণয়ীর ভ্রাতুষ্পুত্র। কি কারণে খুল্লতাত তাহার গহনার বাক্স লইয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিলাম। নরেশচন্দ্র তাহার জন্য ঝুনিয়ার নিজের ও অন্যান্য গহনা পাঠাইয়া দিয়াছে তাহাকে তাহাও বলিলাম। বৃষ্টি থামিলে তাহাকে বাসায় লইয়া গিয়া তাহার অলঙ্কারের বাক্স দিতে স্বীকৃত হইলাম। শেষে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলাম।

নিঃশব্দে ঝুনিয়া আমার কথা শুনিল। অন্ধকারে তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। আবার বিদ্যুৎ চমকিল—সর্ব্বনাশ! বিদ্যুতের আলোকে ঝুনিয়ার হস্তে একখানা বৃহৎ ছুরিকা ঝলসিল। সে ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর মত আমার উপর লাফাইয়া পড়িল। আমি হাত দিয়া তাহার ছুরি ধরিতে গেলাম। তর্জ্জনীতে ভয়ঙ্কর আঘাত পাইলাম। বক্ষে একটু আঘাত পাইলাম। তাহার পর মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি সেইখানে পড়িয়া গেলাম।

* * * *

যখন সংজ্ঞা হইল তখন আকাশ মেঘমুক্ত হইয়াছে। কামনা দেবীর মন্দিরের সাধুর ক্রোড়ে আমার মস্তক রক্ষিত ছিল। ক্ষুদ্র মন্দিরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ক্ষীণালোকে অভয়ার মূর্ত্তির আভাস পাইলাম মাত্র। সাধু আমাকে একটু মন্ত্রপূত মদ্য পান করাইয়া দিলেন। দেখিলাম বাহিরে একখানি রিকসা গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে। রিকসার বেহারাদিগকে আমায় সাবধানে ঘরে লইয়া যাইতে বলিয়া, সাধু বলিয়া দিলেন—'ভবিষ্যতে পাহাড়ী স্ত্রীলোকদের হৃদয় লইয়া খেলা করিও না।' আমি সে কথার প্রত্যুত্তর করিলাম না।

(৮)

তাহার পর আমি কয়েকবার সিমলায় গিয়াছি। পাহাড়ের উপর, খড়ের নীচে নানা স্থলে ঝুনিয়াকে খুঁজিয়াছি কেহ তাহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারে নাই। আমার বাম হস্তের তর্জ্জনীর এক গাঁট একেবারে কাটিয়া গিয়াছিল, বক্ষে একটা বৃহৎ দাগ ছিল।

বেচারা ঝণ্টু-খুড়া একেবারে শান্ত শিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে বার বার সেই গহনার বাক্স লইয়া সিমলায় গিয়া ঝুনিয়াকে অন্বেষণ করিয়াছিল কিন্তু সাক্ষাৎ পায় নাই। সে আজিও অনূঢ়াবস্থায় আছে। আমার কাটা আঙ্গুলটি তাহার নয়নপথে পড়িলে তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হয়। ঝুনিয়ার গহনার বাক্সটির একটু উন্নতি হইয়াছে! তাহার উপর স্বর্ণফলক মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে—ঝুনিয়া। নরেশচন্দ্র কতদিন এই যক্ষের ধন আগলাইয়া থাকিবে তাহা অন্তর্যামী মধুসূদনই জানেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গৃহপালিত জীবের শ্রেণী বৃদ্ধি।

মানবজাতির হিতসাধন করিবার জন্য, কখনও বা আপনার বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য গৃহে জীব জন্তু পালন করিয়া মানুষ যে প্রাণী-জগতে অশেষ প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে সে কথাটা সহজে আমাদের মনে হয় না। কেবল মানবজাতির সংশ্রবে আসিয়া এক এক জাতীয় জীব নানা নূতন নূতন শ্রেণীতে, নানা বিভিন্ন আকারে বিভক্ত হইয়াছে তাহা আমরা সাধারণতঃ বেশ দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিশক্তি বেশী দূর অবধি চালাই না বলিয়া জীবজগতে আমাদের হাতের ছাপ বেশ ভাল করিয়া ধরিতে পারি না। আমরা ঘরে বসিয়া যে সকল নূতন শ্রেণীর জন্তু বা উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করিয়াছি, স্বভাবের কার্য্যের দ্বারা ঐ সকল নূতন নূতন জীবের বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হইত কি না তাহা বলা কঠিন। কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে যেমন জার্ম্মানির তৈয়ারি মালে 'জারমানিতে প্রস্তুত' বলিয়া ছাপ দেওয়া থাকে, সেই রকম অনেক জন্তর কপালে 'মনুষ্যালয়ে নির্ম্মিত' মোহর মারিয়া দিলে মোটেই সত্যের অপলাপ করা হয় না।

এই ধরুন পারাবতজাতি। বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে কিম্বা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইলে কেহ এক কেলে গোলা (Rock pigeon) বা তজ্জাতীয় কপোত ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারের কপোত দেখিতে পাইবে না। সর্ব্বত্র গাছের উপর ঐ শ্রেণীর পায়রা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের ঝাঁকও দুর্লভ দর্শন নহে। কিন্তু শীতকালের সকালে আমাদের পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা যে গেরোবাজের ঝাঁক উড়ায় অমন সম্মিলিত পারাবত সমষ্টি বহুক্ষণ ধরিয়া বিমান-মার্গে ঘুরিতে বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে কন্দরে কোথাও দেখিতে পাওয়া না। কেবল তাহাই নহে। যাত্রার দলের 'দোহারকী' গায়কেরা সমস্বরে গাহিবার সময় যেমন এক এক জন তান মারিয়া নানাপ্রকার মুখভঙ্গী দ্বারা 'আসর জমাইবার' চেষ্টা করে আবার সুর নামাইয়া দলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিতে আরম্ভ করে, তেমনি গেরোবাজ পায়রার ঝাঁক হইতে মাঝে মাঝে একটা একটা পায়রা বাহির হইয়া শূন্যে গোটাকতক ডিগবাজি খাইয়া আবার ঝাঁকে ফিরিয়া গিয়া উড়িতে

আরম্ভ করে। এই যে প্রবৃত্তি দুইটা ইহাত বুনো পারাবতদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গেরোবাজ পায়রার চঞ্চু অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। গলাফুলা পায়রার ওরূপ গলা ফুলাইবার শক্তি বা লোটন পায়রার মাটিতে লুটাইবার শক্তি কোনও বন্য কপোতে দৃষ্ট হয় না। পায়রার বর্ণের তো অবধি নাই।

ভগবান এই যে এত রকম বিভিন্ন শ্রেণীতে গৃহপালিত পারাবতকে বিভক্ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এত রকম বর্ণ ফলাইয়াছেন, এ কার্য্যে তাঁহার প্রধান শিল্পী কে? জগদীশ্বর সমস্তই সৃষ্টি করিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট জীবের দ্বারাই তিনি তাঁহার এত বড় বিশাল সৃষ্টিটা পালন করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান সহায় মানুষের 'নির্ব্বাচন-শক্তি'। সেই নির্ব্বাচন শক্তির ব্যবহার দ্বারা মানবজাতি পারাবত-জগতে এত রূপান্তর ঘটাইয়াছেন, পারাবতের এত প্রকার শ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছেন। এই 'নির্ব্বাচন-শক্তি'টা কি এবং কিরূপে মানুষের এই শক্তি গৃহপালিত জীবদিগের মধ্যে কার্য্য করে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

আমরা উপরে পারাবতের উদাহরণ দিয়াছি। বস্তুতঃ কুকুর, ঘোড়া, গাধা, গরু, ছাগল, ভেড়া, খরগোস, লাল মাছ, হংস, মরাল, কুক্কুট প্রভৃতি মানবের যাবতীয় সহচরের জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পশুপক্ষী পালন করিয়া মানুষ তাহাদিগের সহিত এবং তাহাদিগের বন্য আত্মীয়দিগের সহিত আকারে, স্বভাবে, বর্ণে, শক্তিতে কত রকমের পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। রাঁচি, পালামো, হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলায় আমি 'বন বকরি' নামক এক প্রকারের ক্ষুদ্রাকার হরিণ দেখিয়াছি। সেগুলি হরিণও নহে, আমাদের গৃহপালিত ছাগলের মত ছাগলও নহে। অথচ এতদুভয় জাতির প্রত্যেকের সহিতই তাহাদের একটা সাদৃশ্য আছে। মানবগৃহে প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বে, আমার বোধ হয়, আমাদের অজ জাতি ঐরূপ ছিল। ক্রমে মানুষের আদর যত্নে এবং মনুষ্য সমাজের রক্ষণাবেক্ষণে তাহারা আমাদের পরিচিত নির্ব্বোধ অলস বেগশক্তিহীন গ্রাম্য ছাগলে পরিণত হইয়াছে। ঘরের বিড়াল বনে গেলে বনবিড়াল হইতে পারে আবার বনের বিড়ালও ঘরে ঢুকিলে দুই তিন পুরুষ পরে 'মিনি বিড়াল' হইয়া গৃহস্থের রন্ধনশালায় চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু একবার আলিপুরের পশুশালায় 'বর্দ্ধমান হাউসে'র পশ্চাতে রক্ষিত বিড়াল গুলাকে দেখিয়া আসিলে তাহাদের বিক্রম বুঝিতে পারা যায়। তাহারাই প্রকৃতপক্ষে বাঘের মাসি। ক্ষিপ্রগতি বালহাঁস

আমাদের ঘরের মন্দগতি উড্ডীয়মানাক্ষম পাতিহাঁসের জ্ঞাতি ভ্রাতা। মানুষের সুনজরে পড়িয়া তাহাদের কি ভীষণ অধোগতি হইয়াছে!

'সৃষ্টি-বৈচিত্র্য' প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে জগতে প্রত্যেক জীবের পিতামাতার আকার পাইবার প্রবৃত্তি থাকিলেও পিতামাতা আত্মীয় স্বজন হইতে বিভিন্নতা পাইবার প্রবৃত্তিও উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে পরিলক্ষিত হয়। কোনও বিশেষ কারণে এক একটা জীব বংশছাড়া, সৃষ্টিছাড়া রকমের জন্মিয়া উঠে। ঠিক কেন এমন হয় তাহা কেহ নির্দ্ধারিতরূপে বলিতে পারে না। কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলেন, মাতৃজঠরের বিশেষত্ববশতঃ ঐরূপ হয়। ডারবিন্ সাহেব বলেন যে অতি গ্রীষ্ম, অতি শীত, পান আহার প্রভৃতি জীবন ধারণের পরিবেষ্টনের ফলে জীবের সন্তানোৎপাদিকা শক্তির বিভিন্নতা জন্মিয়া থাকে। যেমন করিয়াই হউক আপনাদের গৃহপালিত জীবের ঐরূপ সৃষ্টিছাড়া, বংশছাড়া নূতন রকমের সন্তান পাইলেই মানুষ সেগুলিকে বাছিয়া লইয়া তাহাদের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের সন্তানও সৃষ্টিছাড়া হইতে আরম্ভ করে। তাহারা ক্রমে ক্রমে এক নূতন শ্রেণীতে পরিণত হয়।

মানুষ নানা কারণে পশু পালন করিয়া থাকে। কেহ ভোজনের জন্য গরু পুষিয়া থাকে, কেহ দুগ্ধের জন্য গোপালন করে, কেহ ভারবহনের জন্য গোজাতির রক্ষণাবেক্ষণ করে। গোয়ালার ঘরে গরুর পাঁচটি বাছুর জন্মিলে যে গরুটি অধিক দুগ্ধ দেয় সে সেই গরুর বাছুরই রাখিয়া দেয়। কৃষক বাছুরদিগের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া বেশ সবল হৃষ্ট পুষ্ট দেখিয়া বলীবর্দ্দ পৃথক করিয়া রাখে। বিলাতে গবাদির প্রদর্শনীতে যে এক একটা বৃহদাকার বলীবর্দ্দ দেখাইয়া লোকে উপহার পায় সেগুলি ঐরূপে উৎপাদিত হইয়া থাকে। দুই তিন পুরুষ এইরূপে কেবল বলিষ্ঠ এবং বিশেষত্ব যুক্ত শাবক নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদের দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিলে তবে প্রদর্শনীর বিরাটবপু বলীবর্দ্দ উৎপন্ন হয়। সার জন্ সেব্রাইট নামক একজন ইংরাজের বড় পায়রার সখ ছিল। তিনি বলিতেন —"আমি তিন বৎসরের মধ্যে যে কোনও বর্ণের পারাবত সৃষ্টি করিতে পারি। তবে বিশেষ আকারের চঞ্চু ও মস্তক গড়িতে ছয় বৎসর লইব।"

এ বিষয়ে ইতিহাস হইতে একটা উদাহরণ দিলে মানুষের নির্ব্বাচন-শক্তি কিরূপে প্রাণী-জগতে নূতন্ নূতন জীবশ্রেণী গঠিত করে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। ১৮১৩ সালে আমেরিকা হইতে Colonel Humphry বিলাতের সুবিখ্যাত Royal Societyতে এই ঘটনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

সেকালে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের উত্তরাংশে (Ancon sheep) এনকন্ ভেড়া নামক একজাতীয় ভেড়ার বড় বেশী প্রাদুর্ভাব ছিল। কিরূপে এই এনকন্ জাতীয় ভেড়ার উৎপত্তি হইয়াছিল কর্ণেল হামফ্রি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াই রয়েল সোসাইটিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মাসাচুসেটে সেট রাইট (Seth Wright) নামক একজন কৃষক বাস করিত। তাহার একটি ভেড়া ও বারোটি ভেড়ী ছিল। সে সময় আমেরিকার সকল কৃষকই ভেড়া পুষিত, আর একজনের ভেড়া বেড়া লাফাইয়া অপরের ক্ষেত্রে গিয়া অনিষ্ট করিয়া আসিলে কৃষকদিগের মধ্যে নানাপ্রকার কলহের সৃষ্টি হইত। সেট রাইটের মেষের পালে হঠাৎ একটা বড় সৃষ্টিছাড়া রকমের মেষশাবক জন্মিল। এ ভেড়াটার দেহটা লম্বা, পদগুলা ছোট এবং ধনুকের মত বাঁকা। সেট রাইট লোকটা বেশ চালাক চতুর ছিল। সে বুঝিল যদি সব মেষগুলা ঐ রকম আকার ধারণ করে তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে পশম বা মাংস ঠিকই পাওয়া যাইবে অথচ ঐ রকম পা লইয়া উহারা প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে গিয়া শস্যহানি করিতে পারিবে না। সেই বিকৃতাকার ভোঁদড়ের মত ভেড়াটি যখন যৌবনে পদার্পণ করিল তখন কৃষক রাইট পুরাতন ভেড়াটিকে উদরস্থ করিল এবং ঐ নূতন রকমের ভেড়াটির দ্বারা সেই বারোটী ভেড়ীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিল। সেই সকল শাবকের মধ্যে কতকগুলা পিতার আকার প্রাপ্ত হইল, কতকগুলা মাতাদিগের মত সাধারণ অবয়ব লইয়া জন্মিল। তখন আবার সেট রাইট সেই সকল ভোঁদড়াকার মেষ মেষী লইয়া শাবকোৎপাদন করিতে লাগিল। সেগুলিকে সাধারণ আকারের মেষদিগের নিকট হইতে একেবারে পৃথক করিয়া ফেলিল। তখন তাহার ঘরে একপাল এনকন্ ভেড়া জড় হইল। তাহার প্রতিবেশিগণ তাহাদের আকার দেখিয়া চমৎকৃত হইল। তাহারাও এনকন্ ভেড়া ক্রয় করিয়া খোঁয়াড়ে ভরিতে লাগিল। শেষে এনকন্ ভেড়ায় দেশ ছাইয়া ফেলিল।

এই এনকন্ ভেড়ার ইতিহাস হইতে বেশ বুঝা যায় যে মানুষের নির্ব্বাচন-শক্তি হইতে গৃহপালিত জীব নূতন নূতন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। আমাদের গৃহসজ্জার উপকরণ লালমাছগুলাকে লইয়া আমরা ঐরূপে নানা বর্ণের মৎস্য জাতি উৎপন্ন করি। সাধারণ পুচ্ছবিশিষ্ট লালমাছের ডিম্ব হইতে একবার আমার অনেকগুলা চারলেজা মাছ জন্মিয়াছিল। সেই চারলেজাগুলাকে আলাদা একটা গামলায় রাখিয়া আমি একঝাঁক চারলেজা লালমাছ পাইয়া-

ছিলাম। ঐ রকমে নানা বর্ণের মরসুমি ফুলও পাওয়া যায়। সবিশেষ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে প্রায় প্রত্যেক গাছে দুই একটি করিয়া নূতন আকারের বা নূতন বর্ণের ফুল ফুটিয়া থাকে। ঐরূপ বিশেষত্বযুক্ত ফুলকে 'Rogues' বা 'Sporting flowers' বলে। প্রত্যেক ফুল শুকাইলে একটি করিয়া অঙ্কুর জন্মে। ঐ অঙ্কুরগুলি বাছিয়া লইয়া পৃথক করিয়া পুঁতিলে কেবল সেই বিশেষত্বযুক্ত ফুলই এক পৃথক শ্রেণীর ফুল হইয়া দাঁড়ায়। মানুষে এরূপ কার্য্য নিত্য করিতেছে, কাজেই জগতে জীবের শ্রেণীও বাড়িতেছে।

জীবদেহের এক একটা অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত অপর এক একটা অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। প্রায় দেখা যায় শরীরের একটা অঙ্গ বড় হইলে সেই পরিমাণে অপর একটা অঙ্গ বড় হইয়া থাকে, আবার প্রথমোক্ত অবয়বটি ছোট হইলে শেষোক্ত অবয়বটিও ছোট হয়। হাত পা বড় হইলে মস্তকের আকার বৃহৎ হয়। বিড়ালের চক্ষু নীলবর্ণের হইলে সে শ্রবণশক্তি হীন হয়। কুকুরের গায়ে লোম না থাকিলে তাহার দন্তের আকৃতির বিকার জন্মায়। যে সকল শৃঙ্গী জীবের লোম দীর্ঘ বা অমসৃণ তাহাদের শৃঙ্গ লম্বা কিম্বা বহুশাখবিশিষ্ট হয়, পায়রার পায়ে লোম থাকিলে তাহাদের অঙ্গুলির মধ্যে অল্প চামড়া থাকে। পারাবতের চঞ্চুর আকার ক্ষুদ্র হইলে তাহাদের পা ছোট হয় এবং লম্বচঞ্চু কপোতও লম্বপদবিশিষ্ট। এই বিভিন্নাঙ্গের হ্রাস বৃদ্ধির পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইংরাজিতে Law of Correlation of Growth বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিভিন্নাবয়বের এইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে হ্রাস বৃদ্ধির কারণ অদ্যাপি অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এ নিয়মের কার্য্যটি লক্ষ্য করিয়াছেন মাত্র।

এই নিয়মটি ভাল রকম মনে করিয়া রাখিলে বুঝা যায় যে মানুষের কার্য্য দ্বারা জন্তুজগতে পরস্পরের মধ্যে যতটা পার্থক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে সে সকল পার্থক্যগুলা মানুষ ইচ্ছা করিয়া ফুটাইয়া তুলে নাই। হয়ত কোনও লোকের গৃহে অকস্মাৎ একটা বেশ নীলচক্ষুযুক্ত বিড়ালছানা জন্মিয়া উঠিয়াছিল। ভদ্রলোকের সখ হইল তিনি এক নীলচক্ষুযুক্ত মার্জ্জারশ্রেণী গঠিত করিবেন। রাইট যেমন ভেঁাদড়াকারের মেষপাল লাভ করিয়াছিল, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করায় নীলচক্ষু বিড়ালের পাল মিঁউ মিঁউ স্বরে তাঁহার প্রাঙ্গণ ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু তিনি কেবল নীল চক্ষু বিড়ালের শ্রেণী নির্ম্মাণ করিলেন না; তাঁহার অজ্ঞাতে জগতে একশ্রেণীর বধির বিড়াল সৃষ্টি হইয়া গেল।

মানুষ সকল সময় যে ইচ্ছা করিয়া গৃহপালিত জীবদিগের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে তাহা নহে। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সে যে গৃহপালিত জীবের শ্রেণী বৃদ্ধি করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মানুষের উৎপন্ন অনেক শ্রেণীর জীব বোধ হয় মানুষের তত্ত্বাবধানে না থাকিলে জীবনসংগ্রামে লুপ্ত হইয়া যায়। ঘরের সকল বিড়ালই বনে গিয়া বনবিড়াল হইতে পারে না। অনেক আদরপুষ্ট অপেক্ষাকৃত কোমল প্রকৃতির বিড়ালকে বনে ছাড়িয়া দিলে অচিরে বন্য শৃগাল প্রভৃতি প্রবল জীবে তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়া ফেলে।

এ প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, মানুষ গৃহপালিত জীবের মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করিয়া নূতন নূতন শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করিতেছে। স্বভাবের কার্য্যের দ্বারাও এইরূপে সৃষ্ট বৈচিত্র্য ঘটিতেছে। এই স্বভাবের নির্ব্বাচনের কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

কাব্য-কথা।

(বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত।)

কাব্যের উদ্দেশ্য ঃ—কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য ; বর্ণন ও শোধন।

এই জগৎ শোভাময়। যাহা দেখিতে সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমুদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ। কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্তু সৌন্দর্য্য খুঁজিতে হয় না—এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।

সংসার সৌন্দর্য্যময়, কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে কদাকার কুবর্ণ, পূতিগন্ধ, কর্কশ স্পর্শ, ইত্যাদি বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত

কাব্য মধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?

সকলেই বৃদ্ধিশালী। কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদৌ সুন্দরের বর্ণ বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা কাব্যে স্থান পাইয়াছে; কালে বর্ণনা মাত্রই বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত বর্ণনা কাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন— যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই" সেই আত্মচিত্ত প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি প্রকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক্ তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা শোধন বলিয়াছি। যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিয়াছি।

বঙ্গসাহিত্যে শোধন-কাব্যের দৃষ্টান্ত ঃ—যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেমবাবু প্রণীত "বৃত্রসংহার" তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে, কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই— কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই—কবির

হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে বর্ণন-কাব্যের দৃষ্টান্ত ঃ—এই শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত "ঋতু বর্ণন"। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোক চিত্র, ইহার উদ্দেশ্য।

গঙ্গাচরণ বাবুর কবিতা পড়িয়া, ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাব (Crabbe) কে মনে পড়ে। কিন্তু ক্রাবের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিতেছি বলিয়া, বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে বর্ণনা কাব্য দুর্লভ এমত নহে। বাঙ্গালি সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধনপটু। বর্ণন কাব্য প্রণেতৃগণ মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন।

কাব্য-বৈচিত্র্যের কারণ ঃ—যেমন অন্যান্য, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রূপ। দেশভেদে ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারত যে অবস্থার উক্তি, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। বঙ্গীয় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি. নিশ্চেষ্টতা, এবং গৃহসুখ নিরতির ফল।

প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, ইহা বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য। কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানা প্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি, জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবি মাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে, যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাঁহাদিগের জাতীয় দোষ গুণ। প্রাচীন কবি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেইগুলি তাঁহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র্য আছে। সেগুলি তাঁহাদিগের নিজ গুণ। অতএব, কাব্য বৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য।

কাব্যে আদিরস ঃ—প্রকৃত আদিরস জগতের একটি দুর্লভ পদার্থ।

ইহা পবিত্র, বিশুদ্ধ, অমূল্য। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এই আদিরস চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইংরাজিতে নানা স্থানে চমৎকার আদিরস পাওয়া যায়। অন্ধকবি মিল্টন যখন ইদন উদ্যান মধ্যে প্রথম নরদম্পতিকে সৃজন করিয়া, মনোহর গন্ধবাহী প্রভাতকালে তাহাদিগের দৃশ্য উন্মোচন করিয়াছেন, তখন তাহাতে কি অপূর্ব্ব আদিরস সঙ্ঘটিত হইয়াছে। সরলা নিষ্পাপা লোকমাতা নিদ্রা যাইতেছেন, আদিপুরুষ প্রত্যেক লোমকূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অলকাবলীর উপরি প্রভাত সমীরণ নৃত্য করিতেছে, নিমীলিত নয়নোপরি অলকাবলী ঝলঝল করিতেছে, আদম যতনে তাহা সরাইয়া দিতেছেন; এই চিত্র সমধিক মনোহর, ইহা অতুল্য, অমূল্য। সেইজন্য আদিরসের প্রধানত্ব।

কিন্তু এই অপূর্ব্ব রসের বিকৃতি আছে; পৈশাচিকী বিকৃতি আছে। একটা সামান্য কথায় বলে যে, মন্দ দ্রব্য কোনরূপে সেবন করা যায়, কিন্তু ভাল দ্রব্য মন্দ হইলে তাহা একেবারে অসহ্য হয়। ঘোল খাওয়া যায়, কিন্তু দুধ ছিঁড়িয়া গেলে, তাহা আর কাহার সাধ্য যে গলাধঃকরণ করে? আদিরস সম্বন্ধেও সেইরূপ। সংস্কৃত নানা গ্রন্থে এবং বাঙ্গালা অনেক গ্রন্থে আদিরসের কুৎসিত বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

কাব্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ—ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়; যথা, ১ম, দৃশ্য কাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য়, আখ্যান কাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপাল বধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার অন্তর্গত এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।

গীতিকাব্য কাহাকে বলে ঃ—খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে।

গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্যের উৎপত্তি ও প্রণালী ঃ—ভারতবর্ষীয়েরা

শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিলেন, যে তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজোলুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্ন এবং উর্ব্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল,আর্য্য প্রকৃতি কোমলতাময়ী আলস্যের বশবর্ত্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষ শূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষ শূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতী প্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতি চরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতার বিষয়ঃ—বৈষ্ণবদিগের কবিতা, সকলই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক, অন্য বিষয়ক কবিতা পাওয়া যায় না। ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে, তাঁহাদিগের গুণ এই যে তাঁহারা রাধাকৃষ্ণপোলক্ষে সাধারণ মানবহৃদয় চিত্রিত করিয়াছেন। মনুষ্য হৃদয়ের সঙ্গে মনুষ্য হৃদয়ের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহারই অভিব্যক্তি কবিতার বিষয়— যাঁহারা রাধাকৃষ্ণ নামে বিরক্ত, তাঁহারা উক্ত নামদ্বয়ের স্থলে ক ও খ আদেশ করিয়া পাঠ করুন, কোন ক্ষতি হইবে না। আর যখন রাধাকৃষ্ণ বাঙ্গালি জাতির অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তখন তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া, জাতীয় কবিতায় জাতীয় চরিত্র নিরীক্ষণে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না—দেহ কাটিয়া শরীরতত্ত্ব না জানিলে চিকিৎসক হওয়া যায় না।

কাব্যসাহিত্যে অপ্রাকৃত বর্ণনাঃ—বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের রচনায়, অপ্রাকৃত বর্ণনা-দোষ তাদৃশ দেখা যায় না—ভারতচন্দ্রাদি আধুনিক কবিদিগের রচনায় সে দোষ লক্ষিত হয়। "নিদ যাই মনের হরিষে" শ্রাবণ রজনীতে ও বৃষ্টির সময়ে "কোকিল কুহরে কুতূহলে" "ডাহুকী সে গরজে" এগুলি আধুনিক কবির লক্ষণ।

বিদ্যাপতির ভাষাঃ—বিদ্যাপতি যে ভাষায় গীত রচনা করিয়াছেন,

তাহা আধুনিক বাঙ্গালা হইতে বিভিন্ন—হিন্দীর সদৃশ। অনেকে বলেন, ইহাই প্রাচীন বাঙ্গালা। কেহ কেহ বলেন তাহা নহে, মাধুর্য্যহেতু বিদ্যাপতি প্রভৃতি বাঙ্গালায় হিন্দী মিশাইয়াছেন। কোন কোন আধুনিক লেখকও কদাচিৎ ঐ ভাষা অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন বিদ্যাপতিও সেইরূপ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রেরও দুই একটি গীতে ঐ হিন্দী মিশান ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন কবি, কবিকঙ্কনের ভাষায় হিন্দী নাই বলিলেই হয়। দেখা যাইতেছে জ্ঞানদাসের কতকগুলি গীত প্রচলিত ভাষায় লিখিত। আবার কতকগুলি গীতে বিদ্যাপতির ভাষা অনুকৃত হইয়াছে। অতএব কোন কোন কবি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালায় হিন্দী মিশাইতেন, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এমন সিদ্ধান্তও করা যায় না যে বিদ্যাপতির ভাষা কৃত্রিম। ভারতচন্দ্র বা জ্ঞানদাসের হিন্দী বা ব্রজভাষা, ছদ্মবেশী বাঙ্গালা, ইহা স্পষ্ট দেখা দেখা যায়—কোনস্থলে বুঝিবার কষ্ট নাই। বিদ্যাপতির ভাষা অনেক স্থানে একেবারে বুঝা যায় না। বোধ হয় বিদ্যাপতির ভাষা প্রকৃত—তিনি মাধুর্য্যের বাসনায় হিন্দীর অনুকরণ করেন নাই। তবে ভারতচন্দ্র, জ্ঞানদাস প্রভৃতি মাধুর্য্যহেতু, তাঁহার ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবকবি বলরাম দাস :—বলরাম দাস একজন অপরিচিত বৈষ্ণব কবি। অপরিচিত, কিন্তু যথার্থ কবিত্ব সম্পন্ন। দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা জানি না। আরও দুঃখের বিষয়, অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালা কবির ন্যায়, বলরাম অশ্লীলতা দোষশূন্য নহেন। অশ্লীলতা দোষশূন্য নহেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়পরতাশূন্য বটে। যে অশ্লীলতা লালসার পুষ্টিকর, বলরামে তাহা নাই। তথাপি যাহা আছে, তাহা বলরামের সময় ও শিক্ষা, বিবেচনা করিয়া মার্জ্জনা করিতে পারিলেও, তাঁহার কবিত্ব গৌরবানুরোধে মার্জ্জনা করিতে পারিলেও, আধুনিক কবির রচনায় তাঁহার মার্জ্জনা করিতে পারি না। কোন আধুনিক লেখক এই প্রাচীন কবিদিগের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী না হয়েন।

বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যে নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল :—১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়,—উহা নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরাজ। দীনবন্ধু ইহাদের

সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯৷৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল।

মধুসূদন ও হেমচন্দ্র :—হেমবাবু, কবিবর মধুসূদন দত্তের অপেক্ষায়, কয়েকটি বিষয়ে সুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধ বর্ণনা একটি।

হেমচন্দ্রের ছন্দঃ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা হয় নাই। ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠক মাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতককতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্ত্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশীপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্য সকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র্য এবং লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি রীতি বিনা সংশোধনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলেও হেমবাবু ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেশী প্রথা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বাঙ্গালার মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, "কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারি চরণে যেরূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশাক্ষর বিশিষ্ট পংক্তির চারি পংক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।" কিন্তু মাত্রাবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে, পদ্যের তাদৃশ উৎকর্ষ হয় নাই। বাবু বলদেব পালিত প্রভৃতি বাঙ্গালি কবিগণ দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের উৎকৃষ্ট অনুকরণ হইতে পারে; এবং বীরাদিরসের অবতারণায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ সকলেই বিশেষ কৃতকার্য্য হওয়া যায়। আধুনিক কবিদিগের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ভারতচন্দ্রে ইহার উদাহরণ আছে। অতএব হেমবাবু অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বন করিলে বোধ হয় ভাল করিতেন। তাঁহার কবিত্ব ও তাঁহার কাব্য যেরূপ, তাঁহার অমিত্রাক্ষর পদ্য তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু "একোহি দোষো গুণ সন্নিপাতে নিমজ্জতীত্যাদি।"

মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার ও পলাশির যুদ্ধ :—মেঘনাদবধ, বা বৃত্রসংহারের সহিত এই কাব্য (পলাশির যুদ্ধ) তুলন করিতে চেষ্টা পাইলে, কবির প্রতি অবিচার করা হয়। ঐ কাব্যদ্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিক, অতি

প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া কল্পিত এবং সুরাসুর রাক্ষস বা অমানুষিক শক্তিধর মনুষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া, আপনার অভিলাষ মত সৃষ্টি করিতে পারেন। পলাশির যুদ্ধের ঘটনা সকল ঐতিহাসিক, আধুনিক; এবং আমাদিগের মত সামান্য মনুষ্য কর্তৃক সম্পাদিত। সুতরাং কবি এস্থলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে পারেন না। অতএব কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।

তবে, এই কাব্য মধ্যে ঘটনা-বৈচিত্র্য, সৃষ্টিবৈচিত্র্য সংঘটন করা, কবির সাধ্য বটে। তৎসম্বন্ধে নবীন বাবু তাদৃশ শক্তি প্রকাশ করেন নাই। বৃত্রসংহারের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎকৃষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক আছে, এবং গীতিকাব্য আছে। পলাশির যুদ্ধে, উপাখ্যান এবং নাটকের ভাগ অতি অল্প—গীতি অতি প্রবল। নবীন বাবু বর্ণনায় এবং গীতিতে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। সেইজন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে। পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

নবীনচন্দ্র ও বায়রণ ঃ—তাঁহার (নবীনচন্দ্রের) লিপি-প্রণালীর সঙ্গে বায়রণের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুই জনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে 'ঘাত প্রতিঘাত'—দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজীতে বায়রণের কবিতা তীব্রতেজস্বিনী, জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়-নিরুদ্ধ ভাব সকল, আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নি-শিখাবৎ—যখন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহ্য। বায়রণ স্বয়ং একস্থানে কোন নায়কের প্রণয় বেগে বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার নিজের কবিতার বেগ এবং নবীন বাবুর কবিতার বেগ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

নবীন বাবুরও যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না! সেও গৈরিক নিস্রবের ন্যায়। যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্ব্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়, তবে সেই

দেশবাৎসল্য নবীন বাবুর এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্য মধ্যে (পলাশির যুদ্ধ কাব্যে) বিকীর্ণ হইয়াছে।

বায়রণের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী; বায়রণের ন্যায় তাঁহারও শক্তি আছে যে দুই চারিটী কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বায়রণ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি। এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে।

কাব্য ও বিজ্ঞান ঃ—আমাদিগের এইরূপ ধারণা আছে যে অত্যুচ্চ বিজ্ঞান এবং অত্যুচ্চ কাব্য, পরস্পরকে আশ্রয় করে। কেপ্লরের তিনটি নিয়ম আমাদিগের নিকট তিনখানি অত্যন্ত উৎকট সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কাব্য বলিয়া কখন কখন প্রতীয়মান হয়, এবং লিয়রে বা হামলেটে কখন কখন আমরা উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই।

আধুনিক গীতি কবি ঃ—আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুস্দন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট। হেমবাবুর গীতিকাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে যে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনা রহিত। অবকাশরঞ্জিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য প্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাব্য নিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতিকাব্য পাওয়া যায়। "মানস বিকাশ" নামে যে কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন ও আধুনিক গীতিকবিদের কাব্য-প্রকৃতি ঃ—তাঁহারা আধুনিক ইংরেজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্ব কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা, তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক, বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্ত মধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের

বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূর-সম্বন্ধ-গ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূর-সম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতি গুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়, মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

আমাদের গীত-কাব্যের আদিপুরুষ, এ শ্রেণীর সকল কবির (প্রাচীন গীতি কবির) আদর্শ, জয়দেব গোস্বামীর একটি গীত উদ্ধৃত করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জয়দেব যেমন সুকবি, তেমনি রসিক—তাঁহার কবিতার রস বড় গাঢ়। আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালি—তত গাঢ় রস বঙ্গদর্শনের পাঠকদিগের সহিবে না। তবে যাত্রাকরদিগের কৃপায় অনেকেই তাঁহার দুই একটি গীত, বুঝুন না বুঝুন, শুনিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা বুঝিয়াছেন, বা গীত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেবের একটি গীত স্মরণ করুন—"বদসি যদি কিঞ্চিদপি" ইত্যাদি গীত স্মরণ করিলেও চলিবে। এই কয়টি কবিতা (জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি", জ্ঞানদাসের "সই, কি না সে বঁধুর প্রেম", রায় শেখরের "সেহি পীরিতি পিয়া সে জানে", মধুসূদনের "মানস সরসে সখি ভাসিছে মরাল রে" ও মানস বিকাশের "প্রেম প্রতিমা" প্রভৃতি) তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন, প্রথম, জয়দেবে বহিঃপ্রকৃতি ভক্তি ইন্দ্রিয়পরতায় দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়, জ্ঞানদাস ও রায় শেখরে বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এবং সহচরী মাত্র। আর কবিতার গতি অতি সঙ্কীর্ণ পথে—নিকট সম্বন্ধ ছাড়িয়া দূর সম্বন্ধ বুঝাইতে চায় না—কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ পথে গতি অত্যন্ত বেগবতী।

তৃতীয়, মধুসূদনের কবিতার, সেই গতি পরিসর পথবর্ত্তিনী হইয়াছে—দূর সম্বন্ধে ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে—কিন্তু কবিতার আর সে পাষাণভেদিনী শক্তি নাই। নদীর স্রোতের ন্যায়, বিস্তৃতিতে যাহা লাভ হইয়াছে, বেগে তাহার ক্ষতি হইয়াছে।

চতুর্থ, মানস বিকাশে, আধ্যাত্মিকতা দোষ ঘটিয়াছে।

কাব্যে ইন্দ্রিয়পরতা ও আধ্যাত্মিকতা দোষ :—ভারতচন্দ্রাদি বাঙ্গালি কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য

ইন্দ্রিয়পর। কোন মূর্খ না মনে করেন যে ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে—কেবল কাব্যের শ্রেণী নির্ব্বাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালি কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এইজন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র, নিজের প্রতিভা শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু অবকাশরঞ্জিনীর লেখক, এবং মানস বিকাশ লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল। নিম্নশ্রেণীর কবিদিগের মধ্যেও ইহা প্রবল। যাঁহারা নিত্য পয়ার রচনা করিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন, তাঁহারা যেন না মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা এ দোষ আরোপিত করিতেছি ; অন্তঃপ্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতি কোন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের কোন দোষই নাই।

কাব্যে মনুষ্য হৃদয় :—মনুষ্য হৃদয়ের চিত্রই কাব্যের উদ্দেশ্য। মনুষ্য হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি যেমন কাব্যের সামগ্রী, নিকৃষ্ট বৃত্তিও তদ্রূপ। রাবণ ব্যতীত রামায়ণ হইত না', 'দুর্য্যোধন ব্যতীত মহাভারত হইত না। কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের কোন্ ভাগ বর্জ্জনীয়, কোন্ ভাগ অবলম্বনীয় তাহা যিনি বুঝিতে না পারেন, তাঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

কাব্যের উপকরণ :—রূপবহ্নি, ধনবহ্নি, মানবহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার, মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন,—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost". ধর্ম্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি, ক্লিওপেট্রা"। রূপবহ্নির রোমিও ও জুলিয়েট। ঈর্ষ্যাবহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহবহ্নিতে সীতা পতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি।

কাব্যে হতাদর :—এদেশে একদল নব্য মূর্খ জন্মিয়াছেন, তাঁহারা মনে করেন যে ক্ষণিক মনোরঞ্জন ভিন্ন, কাব্যে আর কোন উপকার নাই, এবং বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যা অনুশীলনের যোগ্য নহে। যদি এই মূর্খদিগের বিজ্ঞানে কিছুমাত্র অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। আমাদের

বিবেচনায় ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অধিক আদর কর্ত্তব্য বটে, কেন না বিজ্ঞান কিছুই নাই, কাব্যের তাদৃশ অভাব নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, কাব্যে হতাদর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আর বাঙ্গালি কাব্যকারদিগের জ্বালায় কাব্য সকলেরই অরুচিকর হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও স্বীকার করি।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

শয়তান।

(১)

"রহিম! দেখেছ, পাগলা মোল্লার সৈন্য দলে দলে আসছে! আমাদের প্রত্যেককেই গিরিশঙ্কট রুদ্ধ করে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু, এই স্ত্রীলোক দুইজনের কাছেও একজনকে থাকতে হবে!"

"হাঁ, হুজুর!"

"তবে তুমিই থাক, রহিম—যে পর্য্যন্ত না একটা কিছু শেষ হ'য়ে যায়।"

"হাঁ সাহেব, হুজুরের যেমন হুকুম!"

"আমার বিশ্বাস এই মোল্লার দল তোমাকেও একটু দয়া কর্ব্বে না। কি বল!"

"না সাহেব! আমার সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। অন্যের মত আমাকেও তা'রা হত্যা কর্ব্বে।" রহিম বেশ স্থিরকণ্ঠে এই কথা কয়টা বলিল। সে সেই সীমান্তের মোল্লার দলকে বিশেষরূপেই জানিত—তাহাদের নির্দ্দয়তার বিষয় তাহার অবিদিত ছিল না।

"তা' হ'লে আমার স্ত্রী ও তাহার ভগ্নীকে তোমার কাছেই রেখে চল্‌লাম। আমি যদি না মরি—যুদ্ধ শেষের পূর্ব্বেই একবার আসব—একবার শেষ সাক্ষাৎ—" সর্দ্দার সাহেবের মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল; কথা আর সমাপ্ত হইল না। সাহেব দ্রুতপদে যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গেল।

(২)

মাত্র পনের' জন সাহেব সেই গিরিশঙ্কট রুদ্ধ করিয়া শতাধিক পাহাড়ী

মোল্লার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। পাহাড়ী সৈন্যদের লক্ষ্য বিশেষরূপ ভাল না হইলেও, তাহাদের প্রত্যেক লক্ষ্যটাই যে ব্যর্থ হইতেছিল, এমত নহে। শিলা-বৃষ্টির মত তাহাদের সেই গুলিবৃষ্টি একজন না একজন ইংরাজকে হত বা আহত করিতেছিল। ইংরাজ সৈন্য কয়জনের অব্যর্থ সন্ধান—তাহাদের প্রত্যেক গুলি বর্ষণেই এক একটা পাহাড়ী সৈন্য ধরাশায়ী হইতেছিল। ইংরাজের মুহুর্মুহুঃ গুলি বর্ষণে পাহাড়ীদের যথেষ্টরূপেই লোকক্ষয় হইতে লাগিল। কিন্তু, তাহাতেও তাহাদের যুদ্ধ পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিল না।

ইংরাজের ক্রমে সাতজন মাত্র সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। সেই সাতজন তখনও গিরিশঙ্কট রুদ্ধ করিয়া শত্রুর প্রতি অবিরলধারায় গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। মাত্র দুই শত হস্ত ব্যবধানে উল্লসিত, উন্মত্ত শত্রু সৈন্য গিরিশঙ্কট আক্রমণের নিমিত্ত দারুণ ব্যগ্র! সেই সাত জন ইংরাজ কেহ আর কাহারও প্রতি চাহে না!—কলের মত তাহাদের হাত চলিতেছিল! আশ্চর্য্য সে ক্ষিপ্র হস্ত, ভীষণ সে তীব্র দৃষ্টি! কে তখন কাহার প্রতি চাহিবে—কে কাহার সহিত কথা কহিবে! স্বয়ং মৃত্যু যে তখন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহাদের চারিদিক ঘিরিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে একজন উরুদেশে ভীষণ আঘাত পাইয়া ধরাশায়ী হইল। অসহ্য যাতনায় ক্ষণকালের জন্য সে একবার মাত্র কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সেই নিরাশায় পূর্ণ নয়নদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া সে বাম করে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল, দৃঢ় হস্তে শেষ একবার তাহার সেই বন্দুকটা ধারণ করিল, কঠিন মৃত্যুর সঙ্গে বুঝিতে বুঝিতে শত্রুর প্রতি পুনর্ব্বার বন্দুক লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িল! তাহার প্রতি ভাবভঙ্গী তখন বলিতেছিল, মরিব—কঠিন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব কঠিন হৃদয়ে,—যাতনায় অধীর হইয়া কাঁদিয়া ধরাতল সিক্ত করিয়া নহে!

গিরিশঙ্কট হইতে মাত্র ছয়টী বন্দুক তখন শত্রুধ্বংসে নিযুক্ত ছিল। শত্রুপক্ষ ইহাদের সংখ্যার অল্পতা বিলক্ষণরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল;—আনন্দে বজ্র নিনাদে তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, মহাগর্ব্বে ও উল্লাসে কয়েক পদ অগ্রসর হইল! বন্দুকের ঘোড়া টিপিতে টিপিতে একজন ইংরাজ বলিল, "আর রক্ষা নাই—তবু যত পার শত্রু ধ্বংস কর। মোল্লার দল এখনি আমাদের উপর এসে পড়বে।"

(৩)

"ওঃ এ দুশ্চিন্তার কি আর অবসান হবে না!" ভয়বিহ্বলা বালিকা বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ সর্দার-পত্নী মেরী পল্লববিহীন নেত্রে ঘড়ির দিকে চাহিয়াছিল। কনিষ্ঠার কথার উত্তরে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তিনি যদি—তিনি যদি প্রাণে বেঁচে থাকেন, তা' হ'লে এখনি আসবেন। সন্ধ্যাও তো উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল!"

মেরীকে যে অনতিবিলম্বেই মরিতে হইবে, এ চিন্তাটা মেরীর মনে তখনো স্থান পায় নাই। তার চিন্তা তখন তার স্বামীর জন্য। তার স্বামীকে যদি সে শেষ দেখাও একবার না দেখিতে পায়—এই চিন্তাই তাহাকে বিষম ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। টেবিলের ধারে চেয়ারে উপবিষ্টা চিন্তাক্লিষ্টা মেরীকে দেখিলেই মনে হয়, যেন সে একটা মার্বেল-পাথরের প্রতিমূর্ত্তি! তা'র দেহের মধ্যে যে শোণিতের অবাধস্রোত তখনো প্রবহমান, শিরা উপশিরার স্পন্দন বিদ্যমান, তাহার জীবন-প্রদীপ তখনো যে তাহার প্রিয়তমের দর্শন আশায় দীপ্যমান,—ইহা তাহাকে দেখিলে বুঝিবার কোনও উপায় ছিল না!

বাতায়নের পার্শ্বে বসিয়া বালিকা আবার অর্দ্ধস্ফুট স্বরে দীর্ঘশ্বাসের সহিত কহিল, "নাঃ, শেষ আশা—তাও গেল! সাতটা বেজে গেল—আমাদের নূতন সৈন্যের সাহায্য আসবার আশাটুকুও ফুরা'ল!"

শুক্লা রজনী হইলেও আকাশ মেঘমুক্ত ছিল না। সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে বাতায়ন-পথ দিয়া বালিকা দেখিল অদূরে এক অশ্বারোহী ইংরাজ সহসা গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হইল। বালিকা শিহরিয়া উঠিল, কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "তবে আমাদেরও বধ করতে আসছে! আমাদেরও হত্যা করবে! এমনি ভাবে, গুলির আঘাতে!"

এই করুণ উক্তিটা মেরীর প্রাণে আঘাত করিল। মেরী ভাবিল, আমার অদৃষ্ট আমার স্বামীর অদৃষ্টাধীন, কিন্তু এ বালিকাকে কেন আমার সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এ তো সংসারের এখনো কিছু বুঝে নাই, কোনও সুখের আস্বাদ পায় নাই—জীবনের সকল সাধ অপূর্ণ থাকিতেই কি ইহাকে মৃত্যুর কঠিন-শীতল-কারা আলিঙ্গন করিতে হইবে! মেরী তখন আর শ্বেতপ্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি নহে—এই বালিকার চিন্তা তখন তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। বালিকার জন্য তাহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল!

মেরী কোনও কথা কহিল না, স্থির হইয়া একই ভাবে বসিয়া রহিল।

বাড়ীর সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ কক্ষে একটী দীপ সম্মুখে রাখিয়া সে এক ধ্যানে তাহার স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঘড়ির টক্ টক্ শব্দ, বন্দুকের বজ্রনির্ঘোষ ও রণোন্মত্ত সৈন্যদের ভীম কোলাহল তাহাকে বিশেষ ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে তাহার স্বামী জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই একবার আসিবেন, এমত অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন; তবে এখনো আসিলেন না কেন? তবে কি তিনি জীবিত নাই! আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব তাহার হৃদয়কে অধীর করিয়া তুলিল!

বালিকা ব্যাকুল ভাবে বলিল, "আমি কি পাগল হয়ে যাব! এ সংশয়ে যে আর থাকা যায় না! ঐ শোন, মোল্লা সৈন্যদের জয়োল্লাস! এইবারে আমাদের হত্যা করতে আসবে!"

মেরী—ভয়বিহ্বলা মেরী বালিকাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আমাদের আর কি উপায় আছে বোন্! তাঁর আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।"

"অপেক্ষা—অপেক্ষা! এ যেন এক যুগ অপেক্ষা করেছি মনে হচ্চে! আর অপেক্ষার চেয়ে মৃত্যু ভাল! যা' হয় একটা শেষ হয়ে যাক্!"

মেরী ধীরে ধীরে বালিকার কাছে গিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া বলিল, "সর্দ্দারের এখনো আসবার সময় আছে। আর যদি নাই আসেন—" মেরীর কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল; কিন্তু, তখনি আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "ভয় করে ফল কি বোন! মৃত্যু তো একদিন আছেই! আমরা বীরের কন্যা, বীরের ভগিনী, বীরের রমণী—আমাদের এত ভয় পাওয়া কি উচিত!"

কথাগুলা মেরী বলিল বটে, কিন্তু, তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। ভাবিল, কেন আসিলাম, আসিলাম তো এ বালিকাকে সঙ্গে করিয়া কেন আনিলাম! সর্দ্দারের নিষেধ কেন শুনিলাম না!

ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিল দেখিয়া মেরী আরও চঞ্চল হইয়া ডাকিল, "রহিম!"—রহিম সে কক্ষের বাহিরে ক্ষুদ্র এক কামরায় স্থির ভাবে বসিয়াছিল, "ইংরাজ কি এখনও গিরিশঙ্কট রুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে! না, সকলেই—"

"না মেমসাহেব, আমার বোধ হচ্চে এ পক্ষ হ'তে এখনও গুলি চলচে। দু'একজন এখনও জীবিত আছেন!" নির্ভীক রহিমের চোখে তখনো একটা জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছিল; সে অবিচলিতকণ্ঠে কথা কয়টা কহিল।

"তা' হ'লে মোল্লার দল এখনি আমাদের আক্রমণ করতে আসবে?"

"খুব সম্ভব, মেমসাহেব!"

"তবে কি আমাদের বাঁচবার আর কোনও আশা নেই ?"

"আপনাদেরও নেই, আমারও নেই, মেমসাহেব !"

মেরী, ভগিনীকে দুই বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিল ও ভাবিতে লাগিল, "আর কি একেবারেই সময় নাই। রণক্ষেত্রে এখন গেলেও কি একবার দেখা হয় না—শেষ দেখা—জীবনের শেষ বিদায় সম্ভাষণ"—সহসা সে বাটীর বহির্দ্বারে কে সজোরে পদাঘাত করায় তাহারা তিনজনেই শিহরিয়া উঠিল। মেরী স্বীয় বাহুদ্বারা নিজ বক্ষ বেষ্টন পূর্ব্বক গ্রীবা উন্নত করিয়া হতাশ ভাবে উর্দ্ধে চাহিল। বালিকা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। রহিম প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তিবৎ সমভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরস্পরের প্রতি তাহারা চাহিলেও, কাহারও মুখে কথা ছিল না। কথা না কহিলেও, কিন্তু, তাহারা তাহাদের প্রত্যেকের কম্পিত-হৃদয়ের গুরুগুরু শব্দ শুনিতে পাইতেছিল।

দ্বারে আবার পদাঘাত হইল। তাহার পর ধ্বনিত হইল, "মেরী, দ্বার খোল !" রহিম যাইবার পূর্ব্বেই মেরী নক্ষত্র-বেগে দ্বার খুলিতে ছুটিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার অবস্থার একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল। এই আনন্দের বেগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ এমনি কাঁপিতেছিল যে দ্রুতহস্তে দ্বার খুলিয়া সে তাহার স্বামীকে আপনার কাছে লইতেও সমর্থ হইতেছিল না।

সর্দ্দার—রণশ্রান্ত, আহত, পরাজিত সর্দ্দার—মাতালের মত টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার দক্ষিণ হস্ত সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য, বামহস্তও কিছু আঘাত-প্রাপ্ত—মুখ শুষ্ক, দৃষ্টি তীব্র ও যেন মমতাশূন্য ! মেরীর চোখে কিন্তু তখন একটা বেশ আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে ! স্বামী ফিরিয়াছে, আর কি, তাঁহাকে দেখিয়া মরিব, একসঙ্গে মরিব ! মেরীর এখন ইহাই সুখ ! বালিকা অবসন্নদেহে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল।

সর্দ্দার হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "সব শেষ—সব শেষ হয়ে গেল !"

মেরী রণশ্রান্ত স্বামীর স্কন্ধদেশে একবার হস্তার্পণ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিল। পরক্ষণেই তাহার বাহুদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া গভীর বিষাদের স্বরে কহিয়া উঠিল, "একি ! গুলির আঘাত !" মেরীর চোখে যে আনন্দ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিমেষেই অন্তর্হিত হইল ! মেরী বুঝে নাই যে, সমুদ্রে যাহার শয্যা, তুচ্ছ শিশিরবিন্দুতে তাহার কতটুকু ক্ষতি !

সর্দ্দার কহিল, "হাঁ—আমার হাত গিয়েছে ! রহিম, তুমি গুলি কর !"

মেরী কাতরকণ্ঠে কহিল, "একটু অপেক্ষা কর, প্রিয়তম, আর একটু

তোমায় দেখি! এই তো।জীবনের শেষ দেখা!" সর্দ্দারের কণ্ঠ সংলগ্ন হইয়া মেরী তাহাকে শেষ চুম্বন করিল।

সর্দ্দার গদগদকণ্ঠে কহিল, "মেরী, প্রিয়তমে—আমাকে ভালবাস?"

"কি উত্তর দিব! কি বলে আজ তোমাকে বুঝাব!"

তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। সেই মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে তাহাদের স্মৃতিপটে অতীতের কত কথা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু, সকল স্মৃতিকেই সরাইয়া দিয়া তখন মনে প্রাণে বাজিয়া উঠিল, "এই দেখা—শেষ দেখা!" মরণের কোলে বসিয়া প্রেমিক প্রেমিকার ক্ষণকালের জন্য নয়নে নয়নে নীরব বিদায় আলাপ—তাহার সম্যক ব্যাখ্যা কে করিবে!

সর্দ্দার অতি ধীরে ধীরে মেরীর নিকট হইতে আপনাকে সরাইয়া লইল এবং স্থিরকণ্ঠে কহিল, "রহিম, আর বিলম্ব করিও না। এখনি মোল্লার দল এ বাড়ী আক্রমণ করিবে। আমার ধরিবার শক্তি নাই, তুমিই আমার পকেট হ'তে রিভলভারটা বাহির করিয়া লও। দেখিও,টোটা বোধ হয়, চারিটা মাত্র আছে!"

"না সাহেব, মাত্র দুইটা।"

"দুইটা! ভুল করিয়াছি!—কিন্তু দেখিও, দুই জন স্ত্রীলোক, দুইজনকেই উহা দ্বারা শেষ করিতে হইবে! স্ত্রীলোক বধে এখন সঙ্কুচিত হইও না, ভীত হইও না! দেখো, যেন একটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়! তা'হলেই শত্রুর হাতে—" সর্দ্দার আর কহিতে পারিল না!

রহিম রিভলভারটা লইয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। কক্ষে চারিটী মূর্ত্তি—যেন প্রস্তর মূর্ত্তি—! কক্ষ নীরব নিস্তব্ধ—মধ্যে চারিজন চিন্তার মহা-তরঙ্গে দিশাহারা হইয়া উঠিতেছে পড়িতেছে। আর মধ্যে মধ্যে বিজয়ী শত্রুর ভীম কোলাহল বায়ুর সহচর হইয়া সর্দ্দারের শ্রবণে তীক্ষ্ণ বর্ষার আঘাত করিতেছে!

সর্দ্দারের ইঙ্গিতে রহিম রিভলভার ঠিক করিয়া মেরীর প্রতি লক্ষ্য করিল। মাত্র দুই হস্ত ব্যবধানে মেরী—মেরী স্থির দৃষ্টিতে সর্দ্দারের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল! যেন স্বামীর নিকট চিরতরে বিদায় লইতেছে। সর্দ্দার চোখ ফিরাইয়া লইল—কিন্তু, মেরীর সেই শেষ দৃষ্টিকে তাহার চোখ এড়াইতে পারিল না!

অবস্থা দেখিয়া রহিম কাঁপিয়া উঠিল! মুহূর্ত্তমধ্যে সে দুই পদ হটিয়া রিভল-ভারটা আপনার প্রতি ছুড়িল।

"শয়তান! শয়তান!" বলিতে বলিতে সর্দ্দার শার্দ্দূল বিক্রমে তাহাকে

আক্রমণ করিতে গেল। কিন্তু, সর্দ্দার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে দ্বিতীয় গুলিটাও আপনার ললাট লক্ষ্য করিয়া ছুড়িল ও নিমেষে ভূতলশায়ী হইল!

"ভীরু! শয়তান! বিশ্বাসঘাতক!" বলিয়া সর্দ্দার গর্জ্জিতে লাগিল।

মেরী স্বামীর কণ্ঠ জড়াইয়া বলিল, "মরিবই তো—আরো একটু যদি তোমায় দেখ্‌তে পাই ক্ষতি কি!"

"ক্ষতি কি?"—সহসা বাহিরের দ্বার উন্মোচনের শব্দে সর্দ্দার স্তব্ধ হইল!

রক্তাক্ত কলেবরে একজন সৈন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "শত্রু পালিয়েছে। আমাদের নূতন সেনার দল এসেই তাদের পিছু নিয়েছে!"

অশ্রুভরা চোখে মৃত রহিমের প্রতি চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে মেরী কহিল, "সর্দ্দার! একি শয়তান!" *

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

মনের অনাবিষ্কৃত অংশ।

মানুষের মনের মধ্যে যে ভাবস্রোত অবিরাম বহিয়া যাইতেছে, তাহার সহিত জগতের কোন বস্তুর সাদৃশ্য নাই। সূর্য্যাস্তে সাগরবক্ষে ভাবাতীত বর্ণবৈচিত্র্যের সহিত তাহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

সুখ, দুঃখ, কল্পনা, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি ভাবগুলি অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে মানুষের মনে যে অসংখ্য সূক্ষ্ম বিচিত্র ভাবের জটিল সংমিশ্রণ ঘটিতেছে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ অসম্ভব। এই মুহূর্ত্তে আমার মনের মধ্যে যে আনন্দ-হিল্লোল বহিয়া গেল তাহা অনির্ব্বচনীয়, এবং তাহার মনের কোন্ উৎস হইতে উঠিল কে জানে!

মনোবিজ্ঞান এই অসংখ্য বিচিত্র ভাবগুলির মধ্যে কতকগুলি শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছে। যেমন সুখ, দুঃখ, জ্ঞান ও ইচ্ছা। প্রত্যেক ভাবের মধ্যে এই গুলির আভাষ পাওয়া যায়। সহানুভূতির উপাদান অপরের দুঃখ জ্ঞান, দুঃখানুভূতি, ও দুঃখ-দূরীকরণের বাসনা। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার বর্ণ, গন্ধ, ও স্বাদের

* ইংরাজি গল্প অবলম্বনে।

যেমন নাম নাই, তেমনি অসংখ্য ভাব অনুভূত হইলেও শব্দ দ্বারা নিবদ্ধ হয় নাই। কুন্দনন্দিনী যখন খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া নগেন্দ্রনাথকে কহিল, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই?" এই ক্ষুদ্র প্রশ্নের পশ্চাতে যে ভাব লুকায়িত ছিল, তাহা অব্যক্ত।

মনোরাজ্যে ভাষার এই দীনতার কারণ যথেষ্ট। ভাবগুলি পশু ও উদ্ভিদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে না। তাহারা সূক্ষ্ম, ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল, এবং পরস্পরে মিলিত হইয়া এক ব্যবধানহীন স্রোতের মত চলিয়াছে। তাহাদের উপাদানসমূহের পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ, এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্য অনুভূত হইলেও ভাষা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব। সন্ধ্যাকাশে বর্ণ ও মেঘের বিচিত্র ক্রীড়া ভাষাতীত।

নদীবক্ষে যেমন কোন স্থানে আলোক, কোন স্থানে ছায়া, ভাব-প্রবাহের মধ্যে তেমনি কোন স্থান উজ্জ্বল, কোন স্থান নিষ্প্রভ। এই মুহূর্ত্তে কতকগুলি ভাব আমার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, আবার তখনি তাহারা অস্পষ্ট হইয়া গেল। এইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে কতকগুলি ভাব উজ্জ্বল, কতকগুলি অন্ধকার হইতেছে। কোন ভাবই মুহূর্ত্তের অধিক মনের উজ্জ্বলতম অংশে স্থান পাইতেছে না। এই উজ্জ্বলতম কেন্দ্রমুখে ভাবগুলি ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, এবং তথা হইতে অপসৃত হইয়া মনের অন্ধকারময় অংশে বিলীন হইতেছে। পূর্ণ অনুভূতি হইতে বিস্মৃতির ক্রম সর্ব্বজনবিদিত।

মনের উপর এই আলো ও ছায়ার খেলাকে আমরা মনোযোগ বলি। সাধারণ কথায় যাহাতে আমি মনোনিবেশ করি তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, এবং কোন বিষয়ে কয়েক সেকেণ্ডের অধিক মনোনিবেশ অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে যে অজ্ঞাত কারণে ভাবপ্রবাহ অবিরাম উদ্বেলিত হইয়া ক্ষণেক উজ্জ্বল ক্ষণেক অন্ধকার হইতেছে তাহার সাধারণ নাম মনোযোগ। দৈহিক কতকগুলি প্রক্রিয়ার নাম প্রাণ, প্রাণ তাহাদের কারণ নহে।

সমুদ্রের যেমন সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহার অভ্যন্তরে, সেইরূপ মনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাহার অন্ধকারময় অংশে নিহিত আছে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে মনের উজ্জ্বলতম অংশে কতিপয় ভাবমাত্র প্রতিভাত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে, আব-ছায়ার মধ্যে, অসংখ্য অস্পষ্ট ভাবরাশি বর্ত্তমানের ভাবগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করি-তেছে। শিক্ষিত ব্যক্তির অর্জ্জিত বিদ্যা সর্ব্বক্ষণ সুস্পষ্টভাবে মনের সম্মুখে থাকে না, কিন্তু বর্ত্তমানের চিন্তা ও কার্য্যের উপর তাহার প্রভাব তাঁহার

প্রত্যেক কথা ও ভঙ্গী ও দৃষ্টির উপর লক্ষিত হয়। বারাণসীধাম শব্দটি হিন্দুর মনে যে অপূর্ব্বভাব আনয়ন করে, তাহা যে কত অসংখ্য বিস্মৃত ভাবরাশি হইতে উত্থিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেইরূপ 'মা' কথাটির সহিত অসংখ্য ভাব বিজড়িত হইয়া আছে। কাব্যে প্রচলিত শব্দগুলি মধুর ভাবের সংসর্গে মনোহর হইয়া গিয়াছে। জ্যোছনা, কোকিল, বাঁশরী, যমুনা-পুলিন, আঁখি, মরম প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। ইহাদের প্রতিশব্দগুলি মনোহর নহে, এবং ইহাদের সমাবেশে কাব্যভ্রম উৎপন্ন হয়।

এই অস্পষ্ট ভাবরাশির অস্তিত্ব ও প্রভাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। নিদ্রায়ও তাহারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত নহে। অপ্রশস্ত শয্যায় নিদ্রিত ব্যক্তি ভূমে পতিত হয় না। পরিচিত স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। নিদ্রিতা মাতা আপন শিশুর রোদনে জাগ্রত হন, অপরের রোদনে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। ট্রেণ ধরিতে হইলে নিরূপিত সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়। স্বপ্নের মধ্যেও স্বপ্নজ্ঞান লক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্থানে একই ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ সচেতন চেষ্টা দ্বারা রক্ষা করিতে হয় না। অভিজ্ঞতার ফলে যে স্তূপীকৃত ভাবরাশি মনোমধ্যে সঞ্চিত হইতেছে তাহারাই আমার আমিত্ব-জ্ঞানের মূল। শৈশব ও যৌবনের অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট স্মৃতি আমার বর্ত্তমানের মানসিক ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার বিশেষত্ব রক্ষা করিতেছে। চিন্তা অনবরত এই সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে ভাব আহরণ করিতেছে। স্বপ্ন ইহাদেরই বিচিত্র সমাবেশ। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সুখ-দুঃখের মূল ইহাদেরই মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই অতল ভাব-সমুদ্রের মধ্যে বিজ্ঞান এখনও ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই। ইহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে যে বিচিত্র ভাবহিল্লোল অনুভূতির মধ্য দিয়া বহিয়া যায় তাহার বিশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব। দিবসের ক্ষণে ক্ষণে অকস্মাৎ মনের উপর দিয়া যে প্রীতি বা বিষাদ বহিয়া যায় তাহার কারণ কত অস্পষ্ট ও জটিল! ইহাদিগকে ভাষা দ্বারা সংবদ্ধ করা অসম্ভব। কিন্তু এক শ্রেণীর কবি এই অস্পষ্ট, জটিল, ক্ষণস্থায়ী ভাবগুলিকে কাব্যে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেলী ও রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কবি। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা কুসুম-সৌরভের ন্যায় সমস্ত হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া কত অব্যক্ত সুখ ও বেদনা জাগাইয়া তোলে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। অথচ কথা কয়টি হয়ত অতি তুচ্ছ। মনে করুন এই কবিতাটি—

মনে পড়ে, সেই আষাঢ়ে
ছেলেবেলা,

নালার জলে ভাসিয়েছিলাম
পাতার ভেলা,
বৃষ্টি পড়ে দিবসরাতি
ছিল না কেউ খেলার সাথী
নালার জলে ভাসিয়েছিলাম
পাতার ভেলা।

ইহার মধ্যে ভাষার ঝঙ্কার নাই, উপমা নাই, বিশদ বর্ণনা নাই, অথচ জীবনের সায়াহ্নে শৈশবের সেই অস্পষ্ট সুখস্মৃতির কত মধুর হিল্লোল হৃদয় মধ্যে বহিয়া গেল। অনেক কবিতার প্রতি ছত্রে এইরূপ দুই একটি তুচ্ছ কথা হৃদয়তন্ত্রীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলে—তাহার হয়ত কোন অর্থ নাই, কোন স্পষ্ট ভাব বা ছবি, কোন নির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা, বেদনা বা সুখ তাহার সঙ্গে জাগিয়া উঠে না। তাহা ব্যক্তিগত ও জাতীয় অভিজ্ঞতার সমস্ত অস্পষ্ট বিস্মৃত ভাবরাশির মধ্যে এক অপূর্ব্ব স্পন্দনের ফল। শ্রাবণের অবিরাম বারিপাত বা দূরাগত স্বপ্নময় সঙ্গীতের মত তাহারা হৃদয়ের কোন্ অজ্ঞাত তন্ত্রীতে আঘাত করে তাহা কে জানে! সারেঙ্গের ভাষাহীন রাগিণী যেমন অনির্ব্বচনীয় অস্পষ্ট ভাবোচ্ছ্বাসে সমস্ত হৃদয় আপ্লুত করে, সেইরূপ এক একটি কবিতা এইরূপ এক একটি ক্ষণস্থায়ী অপরিস্ফুট ভাবোচ্ছ্বাসকে ভাষায় নিবদ্ধ করিয়াছে।

মনোবিজ্ঞানে এই শ্রেণীর ভাবের এ পর্য্যন্ত এত অল্প আলোচনা হইয়াছে যে, তাহাদের বিশ্লেষণ দূরে থাকুক তাহারা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অনেকের ধারণা যে বাহ্যবস্তুজ্ঞান ও স্বেচ্ছাকৃত দৈহিক স্পন্দন এই দুইটিই বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু মনোরাজ্যে যে শুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণের ক্ষেত্র অসীম তাহা ভাল করিয়া সকলের উপলব্ধি হয় নাই এবং সেই ক্ষেত্রের অন্ধকারময় অংশে, যেখানে সমস্ত সংস্কারের মূল প্রবেশ করিয়াছে সেখানে প্রায়ই কেহ প্রবেশ করে নাই। ধর্ম্ম, নীতি, প্রেম প্রভৃতি সমস্ত প্রচলিত বিশ্বাসের মূল ইহারই মধ্যে। ধর্ম্মের মূলে মৃত্যুভয় কি অমরত্বের বাসনা তাহার অনুসন্ধান এই ক্ষেত্রে করিতে হইবে। নীতির মূলে স্বার্থ কি আত্মত্যাগ, রাজনৈতিক বশ্যতার মূলে ভয় কি ভক্তি তাহা এই ক্ষেত্রে অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইবে। মানুষের সমস্ত অভ্যাস ও প্রবৃত্তির ভিত্তি ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। আবাল্য শাসনের স্মৃতি ইহারই মধ্যে সঞ্চিত হইয়া মনুষ্যকে সমাজোপযোগী করিয়াছে। ইহারই মধ্যে সঞ্চিত সুখ দুঃখ বিবাহ প্রভৃতি পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধগুলিকে মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। সাধারণ প্রতিজ্ঞামাত্রেরই

ভিত্তি মনের এই অন্ধকারময় অংশে প্রোথিত। সংখ্যাতীত বিস্মৃত প্রত্যক্ষের উপর তাহারা প্রতিষ্ঠিত। মানুষ যে মরণশীল তাহার প্রমাণ অসংখ্য মনুষ্যের মৃত্যু। সেই প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতা—যাহার উপর সমস্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে তাহা এক্ষণে প্রায় বিস্মৃত, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলি দাঁড়াইয়া আছে। কারণ, প্রত্যক্ষজাত অভিজ্ঞতার অস্পষ্ট ছায়া মনের মধ্যে লুকায়িত আছে। প্রচলিত সাধারণ প্রতিজ্ঞাগুলির এই কারণে বিশ্বাস উৎপাদন করে।

মনের এই আবছায়ার মধ্যে প্রত্যেক মানুষ এক একটি ভাবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। বৈষ্ণবের জগৎ প্রেমে ও কারুণ্যে আপ্লুত হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের জগৎ বর্ত্তমানে এক ভীষণ রক্তাক্ত অস্ত্রকণ্টকিত রণক্ষেত্র,অনন্ত অন্ধশক্তির ক্রীড়া। অনেকেই বিজ্ঞান বা কাব্যরচিত এক অবান্তর জগতের মধ্যে বাস করে—আমাদের গৃহমধ্যে সীতা, বনমধ্যে রাধা। সম্মুখে পরজন্ম, পশ্চার্তে পূর্ব্বজন্ম। জগতের মধ্যে অণু পরমাণু প্রভৃতি কাল্পনিক উপাদানে বাস্তবজগতের সহিত মিশিয়া আছে। এই মানবীয় ভাবরাজ্যের সমস্ত উপাদান মনের অন্ধকার অংশে আশৈশব স্তূপীকৃত হইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এইক্ষেত্রে ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞান ভাল করিয়া প্রবেশ করে নাই। যদি কোন ভারতবর্ষীয় ছাত্র এই বিষয়ে আপন মৌলিকতা প্রয়োগ করেন, তিনি আশাতীত ফললাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীপান্নালাল বসু।

আকবরের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা।

বৃটিশ শাসনের অধীনে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে আহার-বিহারে, ধর্ম্ম কর্ম্মে, ও সমাজ-সাহিত্যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইয়াছি, একথা এখন আর অস্বীকার করা চলে না। তবে অনেকে যে বলেন, প্রতীচ্য সভ্যতার মোহে আকৃষ্ট হইয়াই আমাদের দেশে সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার উদ্ভব হইয়াছে, ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে এ চেষ্টা আর কখনও এ দেশে কেহ করে নাই, এ কথার মূলে কোন সত্য নাই। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগের দেশে বাল্যবিবাহ প্রথার বিলোপ-সাধন ও যৌবন-বিবাহের যে প্রচলন-চেষ্টা হইতেছে,

বহুবিবাহপদ্ধতি একেবারে সমাজ হইতে বিদূরিত হইয়াছে বলিয়া যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতেছে, সতীদাহ-প্রথাকে নির্ম্মমতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলিয়া যে ঘৃণার হাস্যরোল চারিদিকে শুনা যাইতেছে, এবং এ সকল সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা যাঁহারা করিয়া লোকের নিকট প্রশংসাভাজন হইতেছেন,—সে সকল চেষ্টা ভাল কি মন্দ, সে বিচার এখানে করিতেছি না, তবে সেগুলি যে নূতন নহে, সেগুলি যে এই বিংশ শতাব্দীতেই নূতন করিয়া করা হয় নাই, তাহা আমরা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইব। এজন্য আমাদিগকে বড় বেশী পশ্চাতে যাইতে হইবে না,—ষোড়শ শতাব্দীর ভারতেতিহাসের একাংশ পর্য্যালোচিত হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতের সিংহাসন যে নরোত্তমকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল, যিনি বৈচিত্র্যে ও নূতনত্বে, কৃতিত্বে ও প্রতিভায়, এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে তাঁহার সমসাময়িক সমগ্র লোককেই বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার নামোল্লেখ স্পষ্ট করিয়া করিবার বড় প্রয়োজন নাই,—এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের নাম সকলের সুপরিচিত। ইঁহার সম্বন্ধে নানা কথা আমরা তাঁহার অন্যতম প্রিয় সভাসদ্-রচিত "আইন-ই-আকবরী" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই।

এই "আইন-ই-আকবরী" পুস্তকের একাংশে যাহা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্মানুবাদ আমরা এইস্থানে প্রদান করিলাম :—

"বাল্যবিবাহ ঈশ্বরের অপ্রীতিকর; কারণ, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত দাম্পত্য-মিলনের উপলব্ধি হইতে যেমন বহু বিলম্ব, তেমনই নিশ্চিত বিপদ। যে জাতির মধ্যে বিধবার পুনঃ দার-পরিগ্রহের বিধি নাই, সে জাতির পক্ষে এই প্রথা অতীব ক্লেশদায়ক।"

"হিন্দুস্থানের একটী প্রাচীন প্রথা আছে যে, কোন রমণী যতই কেন ভীতা হউন না, তাঁহাকে তাঁহার মৃত স্বামীর সহিত এক চিতায় 'জীয়ন্তে' দগ্ধ হইতে হইবে। তাঁহার এই কার্য্যদ্বারা তাঁহার স্বামীর মোক্ষলাভ হইবে, এই বিশ্বাস মনোমধ্যে পোষণ করায় তিনি প্রফুল্লমুখে চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। আশ্চর্য্য এই সকল পুরুষ!—ইহারা রমণীগণের এই আত্মজীবন-ত্যাগ দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে চাহে!"

"১৪ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালিকার এবং ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে কোন বালকের বিবাহ হইতে পারিবে না।"

"রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।"

"ভারতবর্ষে বিবাহের রীতি অতি অদ্ভুত। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু সম্রাট আদেশ করেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে বর, কন্যা ও তাহাদিগের পিতামাতার সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।"

"সম্রাট আকবর দুইজন ধীরবুদ্ধি ও বিচক্ষণ লোককে নিযুক্ত করেন। ইঁহাদের একজন বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রের অবস্থা ও অপর একজন পাত্রীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইঁহাদিগকে "তুইবেগী" নামে অভিহিত করা হইত। ইঁহারা বিবাহ-ব্যাপারের হর্ত্তা-কর্ত্তা ছিলেন।"

"জনসাধারণের বিবাহ-কার্য্যের "তুইবেগী" ছিলেন,—সহর-কোতোয়াল বা পুলিশের বড়কর্ত্তা।"

"মুঁতাক্ষবুল্ত্-তওয়ারিখ্"-প্রণেতা বাদাওনী বলেন,—"পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে হইলে প্রত্যেক সাধারণ প্রজাকে সহর-কোতোয়াল বা তাহার প্রতিনিধির কাছারীতে পুত্রকন্যাসহ উপস্থিত হইতে হইত। সহর-কোতোয়াল উভয়েরই প্রকৃত বয়স-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেন। এরূপ না করিলে বিবাহ হইতেই পারিত না। এই ব্যাপারে সহর-কোতোয়াল হইতে তাঁহার কাছারীর অতি নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর পর্য্যন্ত যথেষ্ট উৎকোচ-প্রাপ্তি হইত।"

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত বিধিব্যবস্থার প্রচার করেন:—

"স্ত্রী নিঃসন্তান না হইলে কোন পুরুষই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু অন্য সকল ব্যাপারেই আইন হইতেছে এই,—"এক ঈশ্বর, এক স্ত্রী।"

আবুল ফজল বলেন,—"প্রত্যেক লোকেই যে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে, ইহা সম্রাট অনুমোদন করেন না। কারণ একাধিক স্ত্রী-গ্রহণকারী পুরুষের স্বাস্থ্য ও গৃহশান্তি বিনষ্ট হয়।"

সতীদাহ-সম্বন্ধে "আকবরনামা"য় এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—"সম্রাট আকবর দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া অবধিই হিন্দুদিগের সতীদাহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রত্যেক বড় বড় সহরে বা জেলায় পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আদেশ করেন যে, তোমরা সতীদাহ-ব্যাপারে এই দুইটী বিষয়ের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। প্রথমতঃ দেখিবে,—মৃত স্বামীর পত্নী স্বেচ্ছায় স্বামীর সহগমন করিতেছে অথবা রমণীর আত্মীয়-স্বজন উহাকে বলপূর্ব্বক

চিতাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছে। এই বিষয় দুইটি বেশ বিচার করিয়া দেখিবে, এবং যদি দেখ যে, বলপূর্ব্বক রমণীকে চিতাদগ্ধ করাইবার উপক্রম হইতেছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে কার্য্যে বাধা প্রদান করিবে।"

১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর স্বয়ং এক উচ্চবংশীয় রাজপুত বিধবার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা ইঁহাকে বলপূর্ব্বক মৃত স্বামীর সহিত দগ্ধ করিতে যাইতেছিলেন।

বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্যও আকবর বাদশাহ বড় অল্প চেষ্টা করেন নাই। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে এতদুদ্দেশ্যে কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থার প্রণয়ন হয়। তন্মধ্যে একটি এই :—

"হিন্দু বিধবাগণ ইচ্ছা করিলে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পারে। তবে এ কার্য্য হিন্দু আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।"

রাজনীতিকই হউক বা অপর যে কোন কারণেই হউক, আকবর আন্ত-র্জ্জাতিক বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপনে যথেষ্ট উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এ পক্ষে তিনি স্বয়ংই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি স্বয়ং রাজপুত-রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সেলিমের বিবাহও এক রাজপুত-রাজকন্যার সহিত প্রদান করিয়াছিলেন।

মোটের উপর সম্রাট আকবরের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ দ্বারা জাতি-সমন্বয় ঘটন।

২। বাল্যবিবাহপ্রথা-নিবারণ।

৩। বহুবিবাহপ্রথার বিলোপ-সাধন।

৪। সতীদাহ-প্রথা-রোধ।

৫। হিন্দু বিধবার পুনঃ দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তন।

বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে যে পদ্ধতি-অনুযায়ী সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা চলি-তেছে, তাহা আকবরের রাজত্বকালেই আরব্ধ হইয়াছিল। এ চেষ্টায় নূতনত্ব কিছুই নাই। বিলাতী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ইহা সজীবতা লাভ করিয়াছে মাত্র। সম্রাট আকবরের পর প্রায় দুইশত বৎসর ভারতে সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার কোন লক্ষণই দেখা যায় না; ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাই না। তবে জাতি-সমন্বয়-সংঘটনের পক্ষে কবীর ও নানক, রামানন্দ ও চৈতন্যের প্রচারিত ধর্ম্মমত যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রভেদ এই,—

আকবর বৈবাহিক আদান-প্রদান দ্বারা এই জাতি-সমন্বয় ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন, আর চৈতন্যাদি মহাপুরুষ স্ব স্ব প্রচারিত ধর্ম্মমতের মধ্য দিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আকবর যাহার "পত্তন" করিয়াছিলেন, ইংরাজের আমলে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও রাজা রামমোহনের চেষ্টার ফলে সতীদাহপ্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বহুবিবাহের কথা আজ-কাল আর শুনা যায় না। বর-পণের অত্যধিক দাবীতে বাল্যবিবাহ-প্রথাও বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। স্বর্গীয় পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় দেশে বিধবা-বিবাহের প্রচলনও যে কতকটা না হইয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। আকবরের সময়েও রাজজাতি ও প্রজার জাতিতে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুগেও এ দৃশ্য বিরল নহে। ইংরাজ পুরুষের সহিত বাঙ্গালী রমণী এবং বাঙ্গালী পুরুষের সহিত ইংরাজ রমণীর বিবাহ আজিকার দিনে কাহারও অবিদিত নহে। তার পর আধুনিক যুগের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ও আকবরের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ-ধর্ম্মের মধ্যেও যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। ধর্ম্মসংস্কারের নূতনত্বেও আকবরের প্রতিভা বড় অল্প কার্য্য করে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে উহার অনুকরণে প্রচলিত, এমন কথা বলিতেছি না, তবে এই প্রকার ধর্ম্মের কল্পনা যে ভারতে নূতন এবং ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে এরূপ ধর্ম্মমত ভারতে প্রচলিত ছিল না, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর আকবরী ধর্ম্ম যে এ পক্ষে পথপ্রদর্শক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কাজে কাজেই আমাদিগকে প্রবন্ধারম্ভে বলিতে হইয়াছে যে, আধুনিক যুগের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল—ষোড়শ শতাব্দীতে, আর উহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীতে। *

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

---

* এই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে যে সকল উদ্ধৃতাংশ আছে, সেগুলি এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত Lowe ও Blochmann-কৃত বাদাওনী ও আবুল ফজলের ইংরাজী অনুবাদ হইতে বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত হইয়াছে।—লেখক।

নিয়তি-চক্র।

"কি হে তুমি অমন চম্‌কে উঠ্‌লে যে?"

সাঙ্গামৌলের উন্মুক্ত প্রান্তর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে অশ্বিনীকুমার তাঁহার বন্ধু সুবোধচন্দ্রকে উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল।

"না, ও কিছু না!"

এই উত্তরে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল যে সুবোধচন্দ্র কথাটা চাপিয়া যাইতেছে। অশ্বিনীকুমার বলিল—"তোমার যদি গোপনীয় কিছু থাকে তা হ'লে বলবার দরকার নাই—কিন্তু তোমার মলিন শুষ্ক চেহারা দেখে তা' ত মনে হয় না।"

সুবোধচন্দ্র বলিল—"তোমার কাছে গোপনীয় কিছু নাই, তবে লোকে অবিশ্বাস করবে ব'লে বলি না। একটা যেন আতঙ্ক, আশঙ্কা, মৃত্যুচ্ছায়া আমাকে বেষ্টন করে রয়েছে!"

অশ্বিনী। "সে কিহে, তুমি পাগল হ'লে না কি! ব্যাপারখানা কি খুলেই বল না—"

সুবোধ। "তবে বলি শুন, আমার কাল ফুরাইয়াছে তাই আজ একটা গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিয়া যাইব। এতদিন বলি নাই, লোকে পাগল ভাব্‌বে বলে। আজ আমি তোমায় বল্‌ব।" অশ্বিনীকুমার বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, সুবোধচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিল—"সে আজ তিন বৎসরের কথা! ঐ যে দূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম দেখ্‌ছ, ঐ গ্রামখানির সহিত আমার একটা পূর্ব্ব দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত। আমি, আমাদের পুলিশের বড় সাহেব আর আমার একজন বিলাত-ফেরত ডাক্তার বন্ধু এই তিন জনে ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে শীকার করিতে যাই। যাইবার দু'দিন আগে আমাদের তাঁবু ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ঐ গ্রামে পাঠাই—উদ্দেশ্য, আমরা পৌঁছিয়াই একটা থাকিবার আড্ডা পাইব। ঐ যে কতকগুলি আম্রবৃক্ষ দেখিতেছ ঐ গুলির মধ্যে আমাদের তাঁবু পড়ে। আমরা পৌঁছিয়াই দেখিলাম, আমাদের আবশ্যক দ্রব্যাদি যথাযথ স্থানে রহিয়াছে। আমাদের অন্যতম সঙ্গী পুলিশ সাহেবের হুকুম মত জনকয়েক কনষ্টেবল তাঁবু পাহারা দিতেছে।

বন্য পশুদিগকে তাড়া দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে আনিবার জন্য একজন ঢাকী আবশ্যক হওয়ায় আমরা গ্রামের ভিতর একজন লোক পাঠাইতেছি এমন

সময়ে গেরুয়া বসনধারী, শীর্ণকায়, ছায়াপ্রায় একটী কঙ্কালসার মানব-মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উপনীত হইল। তাহার মস্তকে জটা আজানুলম্বিত হইয়া দুলিতেছিল, নয়ন-যুগল ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া জ্বলিতেছিল! সে আমাকে সম্বোধন করিয়া গুরু গম্ভীরস্বরে কহিল—"আমি তোমাদিগকে এস্থান হইতে তাঁবু উঠাইতে বলিতে আসিয়াছি। ইহা একটা পবিত্রভূমি, তোমাদের সংস্পর্শে ইহা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে।" এই বলিয়া সে আমাদের কুলী এবং বাহকদিগকে দেখাইয়া পুনরায় তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে কহিল—"ইহা হনুমানজীর পবিত্র মন্দির। মানুষ জানে না এ মন্দির কত দিনের! আমি তোমাদের চাকরদের একথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু অসভ্য ছোটলোকেরা আমাকে অযথা গালাগালি দিয়াছে!"

সে যোগীই হোক্ আর স্বয়ং ঈশ্বরই হোক্—আমাদের মত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী বিশেষতঃ পুলিশ সাহেবের সমক্ষে এরূপ অভদ্র অসভ্য লোকের ন্যায় কথা কহা তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্পর্দ্ধার কথা নহে কি? কনষ্টেবল্‌কে সেইজন্য কড়া হুকুম দিলাম যে, যে দুই দিন আমরা এখানে থাকব, এ লোকটা যেন তাঁবুর ত্রিসীমায় না আস্‌তে পায়! তার পর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম—"নিকালো, হামেরা নজর্ সে তফাৎ যাও উল্লুক। তোমরা কোই বাৎ হাম নই শুন্‌নে মাঙ্গ্‌তা!"

আমার এই কটূক্তিতে সে পুলিশ কনেষ্টেবলের হস্ত হইতে নিজের হাত ছিনাইয়া লইয়া সাঁওতালী ভাষায় আমাদিগকে গালি ও অভিশাপ দিতে লাগিল!

আমার বিলাত-ফেরতা বন্ধুটী হাসিতে লাগিল! কনষ্টেবল তাহাকে তাঁবুর বাহিরে লইয়া গেল!

(২)

আমরা তাঁবুর ভিতর হইতে শুনিতে পাইলাম,—বাহিরে খুব গোলমাল হইতেছে। আমরা তিনজনে তখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম যোগী তখনও আমাদিগকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতেছে! পুলিশ সাহেব খুব ঠাণ্ডা মেজাজের লোক হইলেও আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, যোগীর পৃষ্ঠদেশে একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। সেই দারুণ প্রহারের চোটে যোগী ভূমে পড়িয়া গেল! যোগীকে গ্রামের সকল লোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। আমার ভয় হইল, বুঝি এই লইয়া তাহাদের সঙ্গে একটা গণ্ডগোল হয়! যোগী গা ঝাড়িয়া উঠিয়া পুলিশ সাহেবের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"একবৎসর পরে তুই মরবি!""

'তার পর ?' চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া অশ্বিনীকুমার বলিল—'তার পর ?'

সুবোধচন্দ্র ম্লানমুখে বলিল—"তার পর আর কি ! ঠিক একবৎসর পরে পুলিশ-সাহেবের মৃত্যু হইল !"

"তুমি কিন্তু এই ঘটনাটি অভিশাপের ফল, একথা জোর করে বল্‌তে পার না, একটা আকস্মিক ঘটনা বল্‌তে পার।"

"একে যা ইচ্ছে তাই বলতে পার কিন্তু যোগীকে প্রহার করার ঠিক এক বৎসর পরে যে তারিখে যোগীকে পুলিশ সাহেব প্রহার করেছিল ঠিক সেই তারিখে তাহার মৃত্যু হয়।"

অশ্বিনীকুমার হাসিয়া বলিল—"এমন আকস্মিক ঘটনা সকলের সকল সময় ঘটিতে পারে।"

"শুন, ঠিক তার তিন সপ্তাহ পরে আমার বিলাত-ফেরত বন্ধুটী একটা ছোট ষ্টীমারের ধাক্কায় জলমগ্ন হয়, তাহার শবদেহ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই ! বোধ হয় কুম্ভীরের উদরে তাহার স্থান হইয়াছে। এইবার এইবার—আমার পালা। কখন কি হয় ! উঃ ভীষণ অভিশাপ !"

অশ্বিনীকুমার বলিল—"শান্ত হও, অত ভয় ক'রো না, ভয় কি ! তুমি শিক্ষিত লোক। তোমরা এরূপ অমূলক ভয় কর্‌লে সাধারণ লোকে কি কর্‌বে বল দেখি ! এরূপ দুর্ভাবনায় যে শীঘ্র ব্যায়রামে পড়বে ! নাও একটু হুইস্কী খাও—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা দূর কর।"

সুবোধচন্দ্র—"পুলিশ-লাইনে থেকে অনেক শক্ত শক্ত কাজ করেছি, অনেক চোর ডাকাতের সঙ্গে লড়েছি, বড় বড় মোকদ্দমায় পড়েছি, কিন্তু কখনও ত এত ভয় পাই নাই ! বুক্ গেল—বুক্ গেল ! বড্ড বুক ধড়ফড় কর্‌ছে, আজ তুমি তোমার বাংলায় যেও না, আমার কাছে এই তাঁবুতে থাক !"

সুবোধচন্দ্রের বদনমণ্ডল বিশুষ্ক, চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, গাত্রের মাংসপেশী কুঞ্চিত। তাহার এরূপ মানসিক অবস্থা দেখিয়া অশ্বিনীকুমার তাহাকে অভয় দিল, বলিল—"তুমি কেন বৃথা কাল্পনিক ভাবনায় দেহ মাটী করিতেছ—আচ্ছা আমি আজ তোমার কাছে থাক্‌ব।"

(৩)

সন্ধ্যার পর দুই বন্ধুতে তাঁবুর বাহিরে দুইখানি কেদারায় বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার নানা কথার অবতারণা করিয়া সুবোধচন্দ্রের মন অন্য দিকে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছিল।

তখন আকাশ খুব গুমোট করিয়াছিল, গাছের একটী পাতাও নড়িতেছিল না। অশ্বিনীকুমার বলিল—"যদি এরূপ গুমোট থাকে তা হ'লে রাত্রে খুব বৃষ্টি হ'বে, তোমার কি বোধ হয়?"

সুবোধ উত্তর করিল—"যদি ভালোয় ভালোয় ক'টা দিন কেটে যায় তা হ'লে দেশে গিয়ে এমন সময় বিশ্রামভোগ করব!—আস্ছে বছর এমন্ দিনে আমি কোথায় থাক্‌ব!" সুবোধচন্দ্রের মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর এইরূপে উত্তেজিত ও বিকৃত হইয়া পড়িতেছিল।

অশ্বিনীকুমার তখন তাহার হস্তধারণ করিয়া বলিল—"চল বন্ধু শুইগে, রাত বারোটা বাজে। তুমি শোবার আগে ব্র্যাণ্ডী দিয়ে একটু কুইনিন্ খেও।"

(৪)

তখন রাত্রি দুইটা। অশনিসম্পাতের ভীষণ শব্দে অশ্বিনীকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল।

মাথার উপর কড়্ কড়্ করিয়া পুনরায় বজ্রনিনাদ হইল, বিদ্যুৎ হানিয়া তাঁবুটী আলোকিত করিল! হঠাৎ তাহার কর্ণে একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ প্রবেশ করিল। কিসের শব্দ, কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, অশ্বিনীকুমার তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল। কি এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! ধীরে ধীরে বন্দুকটী হাতে লইয়া অশ্বিনীকুমার শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। শব্দ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া তাহাকে সুবোধচন্দ্রের কামরার নিকট আনয়ন করিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে তাঁবুর একটা পর্দ্দা সরাইয়া যাহা দেখিল তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেল! তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল!

ভিতর হইতে একটা কিসের দুর্গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে দেখিল, ঘরের জিনিসপত্র চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, মধ্যে শয্যার উপর রক্তাক্তকলেবরে সুবোধচন্দ্র শায়িত। তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি ছিন্নভিন্ন, দেখিয়া মনে হয় অনতিপূর্ব্বেই একটা খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি হইয়া গিয়াছে। তাহার দেহের উপর একটা বিকটাকার ভীষণ জন্তু বদন ব্যাদান করিয়া বসিয়াছিল, অন্ধকারে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিতেছিল। সম্মুখে অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়া জন্তুটা তাহাকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। অশ্বিনীকুমার ত্রস্তভাবে রিভলভার ধরিয়া তাহার উপর দুইবার গুলিবর্ষণ করিল। মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে জন্তুটা তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। অশ্বিনীকুমার সভয়ে দেখিল, জন্তুটার হস্ত তখনও রক্তরঞ্জিত, সুবোধচন্দ্রের কণ্ঠনালী বিচ্ছিন্ন!

বন্দুকের আওয়াজে তাঁবুর পরিচারকবৃন্দ ছুটিয়া আসিলে অশ্বিনীকুমার বলিল—"তোমরা শীঘ্র আলো লইয়া আস, এবং একজন শীঘ্র গিয়া গ্রাম্যমণ্ডলকে লইয়া আইস, বাহিরের অন্য কেহ যেন তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ না করে।"

(৫)

তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছিল, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে গ্রামখানি উদ্ভাসিত হইতেছিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ভয়-বিকম্পিতপদে গ্রামের মণ্ডল তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিল। অশ্বিনীকুমার তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"দেখ, পুলিশ ইনস্পেক্টর খুন হইয়াছেন।" বৃদ্ধ লোকটী সুবোধচন্দ্র ও মৃত জন্তুটার মৃতদেহ দুইটী দেখিয়া স্বীয় শিরোদেশে করাঘাত করিয়া সাঁওতালী ভাষায় কহিল—"হায়! প্রভু, হনুমানজী! প্রভু হনুমানজী!" এবং আরও কত কথা বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতেছিল।

অশ্বিনীকুমার একজন অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিল—"লোকটা বলে কি ?"

উত্তরে সে বুঝাইয়া দিল যে,এই বৃহদাকার জন্তুটী এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ হনুমান। হনুমানজীর মন্দিরে সে থাকিত। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টিতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছে। এইবার, এই হনুমান হত্যায় গ্রামের মহা অমঙ্গল সূচিত হইল।"

অশ্বিনীকুমারের মাথা ঘুরিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। সে কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না। সমবেত লোকমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখিল যে, গেরুয়া বসনধারী সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপিত একজন যোগী তাহাদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার এক হস্তে কমণ্ডলু অন্য হস্তে জপমালা। সে যেন অশ্বিনীকুমারের দিকে চাহিয়া একটা বক্র হাসি হাসিতেছে! তাহাকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিল! তাহার মনে হইল, সুবোধচন্দ্র-বর্ণিত যোগীই এই ব্যক্তি। ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অশ্বিনীকুমার উচ্চকণ্ঠে বলিল—"ঐ সেই যোগী, ঐ হনুমানজীর মন্দিরের পুরোহিত—ধর ওকে, শীঘ্র ধর, বাঁধ—ওকে পলাইতে দিও না। যে উহাকে ধরিতে পারিবে তাহাকে ১০০৲ টাকা পুরস্কার।"

চক্ষুর পলকে যোগী জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইল!

গ্রামের মণ্ডল সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অশ্বিনীকুমারের বক্তব্য বুঝিয়া কম্পিত কণ্ঠে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—"হুজুর এখানে কোনো যোগী

নাই। হনুমানজীর মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত আজ ছয় মাস হইল দেহত্যাগ করিয়াছে। ঐ দূরে—ভগ্নাবশেষ মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড়ে তাহার দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে। *

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

কবিতা-কুঞ্জ।

লছ্‌মন্ ঝোলায় গঙ্গা।

ও কার করুণা বহে তরল তরঙ্গরূপে,
দ্রব করি' প্রবেশিছে প্রবল প্রস্তরস্তূপে;
ও কার মমতা নাহি পাষাণে পাষাণ জ্ঞানে,
ঝরিতেছে অবিরত স্বর্গ-মর্ত্ত্য সমজ্ঞানে;
ও কার হৃদয় যেন স্নেহের উন্মাদে ধায়,
ঊর্দ্ধতম ব্যোম হ'তে এই নিম্ন বসুধায়;
ও কেরে পতিত হ'য়ে পতিতে উদ্ধার করে,
আপনি কাতর হ'য়ে কাতরে ক্রোড়েতে ধরে;
ও কার মোহিনী মায়া পাষাণে জীবন আনে,
পেলব করিছে তারে পুষ্পিত পল্লবদানে;
ও কার অমল প্রেম বিমল প্রবাহে বয়,
সান্ত্বনা-সম্পদ দিয়া বিপন্ন ভুবনময়;
ও কার সরস বাণী অনিল আনিছে ব'য়ে,
সরস প্রাণের তার সরস পরশ ল'য়ে:
ও কার পরশে, ভাষে, জাগিয়া উঠিছে সব,
অনন্ত মুখর হ'য়ে আনন্দে করিছে রব?
হরি হরি এ প্রাণের দুঃখ আর কারে কব?
এ বিশ্ব উদ্ধার হবে, একা আমি প'ড়ে র'ব।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

মৃত্যুতত্ত্ব।

"সবাই এসেছি হেথা কিছুদিন তরে,
ধরা'কার্য্য শেষ হ'লে পুন যাব ফিরে।
শেষের যাবার কাল স্থির সুনিশ্চয়,
মর জগতের লোকে মৃত্যু তারে কয়।

বড়ই ভীষণ দৃশ্য শেষের সময়,
প্রেমের মধুর ভাব বিষবোধ হয়—
হস্ত পদ ফিরে নাক আমার ইচ্ছায়
সুগন্ধ দুর্গন্ধ সম জ্ঞান নাসিকায়।

চক্ষু নাহি হেরে প্রিয় বান্ধব স্বজন—
কর্ণ নাহি শুনে যত আত্মীয়-ক্রন্দন
দূরে থাকি বন্ধুগণ বেদনা জানায়
সকলে তেয়াগি' যায় মৃত্যুর শয্যায়।

এই আমি মৃত্যু হ'লে 'মড়া' কবে সবে
অশ্রদ্ধায় কোনমতে বিদায় করিবে—
বিরহের সনে ব্যস্ত রবে প্রিয়জন
রত্নরাজি দেহ হ'তে করিতে মোচন।

বলেছিল জানিত না আমি বিনা কারে—
হেন প্রিয়া শীঘ্র দূর করে মড়াটারে!
পশ্চাতে গোময়-ছড়া ছড়াইয়া দিবে—
বিধিমতে গৃহস্থের কল্যাণ সাধিবে!

---

* ইংরাজী হইতে।

অগ্নিতে পুড়িয়া ছাই হবে চারু দেহ—
মিটিবে আমার গোল হ'তে মোর গেহ—
সেই তা'রা মোর সবে রহিল সকলে
আমি যে কোথায় গেনু কেহ নাহি বলে।

নানা মুনি নানামতে নানা কথা কহে—
গিয়ে সেথা ফিরে আসি কেহ নাহি কহে,
ভগবান বলেছেন, গীতায় প্রকাশ—
দেহসনে নাহি হয় আত্মার বিনাশ।

পুরাতন বাস ত্যজি, নরেতে যেমন,
সানন্দে নূতন বাস করয়ে ধারণ
তেমতি এ জীর্ণ দেহ করি পরিহার,
আত্মা যে নূতন দেহে করেন বিহার।

মৃত্যু হলে শেষ হয় ভাবি এই মনে
যেচ্ছামত সুখভোগ করে জীবগণে—
এ ভাব হৃদয় হ'তে করিয়া মোচন—
আত্মার উন্নতি তরে ব্যস্ত বিজ্ঞগণ।

মৃত্যু পরে রহে পড়ি কীর্ত্তি যশ আর
আত্মাতে খোদিত রহে শিক্ষাগুণ তার—
সংস্কারের বেশে পুনঃ হইবে প্রচার
মেধাশক্তি গুণবৃত্তি পরজন্মে তার।

দেহ যায় আমি যাই, আত্মা রহে স্থির—
অমর অজর নিত্য বিদগ্ধ শরীর—
সেই হেতু সাধুকর্ম্ম সাধি জ্ঞানীজন
ছুটেছে লভিতে তা'রা জ্ঞান-মহাধন!

যতই লভিবে জ্ঞান উন্নত আত্মার—
তত উচ্চে মহাউচ্চে উঠিবে সবায়—
নর জগতের যারা জন্ম মৃত্যু জরা—
ভেটিবে না আর তোমা' মুক্ত হবে ত্বরা।

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্ব-স্মৃতি।

(সুরের অনুকৃতি)

(১)

নীরব নিশীথে, বাঁধে নাই যবে
ঘুমের বাঁধন মোরে—
অতীতের স্মৃতি, জেগে উঠে ধীরে,
মরম আকুল ক'রে।

(২)

জেগে উঠে মনে পুরাণো সে কথা
অতীতের হাসি-রাশি,
সুখ দুখ কত চোখভরা জল
কত ভালবাসাবাসি।

(৩)

স্বরগের জ্যোতি শোভিত বদনে,—
তেজোহীন আঁখি আজ,
সাধ, আশা কত র'ত হৃদি ভরি'—
বিলীন স্বপন-মাঝ!

(৪)

কত স্মৃতি জাগে, সুখ অতীতের
পরাণ আকুল-করা—
আলোকে উজল ছিল যে ভবন
এখন আঁধার-ভরা।

(৫)

ছেড়ে চলে গেছে অতিথি সবাই
নিভিয়া গিয়াছে আলো,
কুসুমের মালা, ঝরিয়া পড়েছে,
থেমে গেছে কোলাহল।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাসন।

১

হাসিয়া বসিলে তার পাশে আমি
সে যদি সরোষে চায়;—
জানা'ব তখনি আমি তার স্বামী
কুসুম-বীজন-বায়।

২

ওঠে যদি তাহে সহসা ফুকারি
চমকি' কিশোরী বালা ;
ফাঁস টেনে দিব গলায় তাহারি
দোলায়ে মুকুতামালা।

৩

তথাপি যদি সে ফেলি' মৃদুশ্বাস
মুরছিয়া পড়ে ধীরে ,—
গলায় জড়া'য়ে তার বাহু-পাশ
ঢালিব গোলাপ শিরে।

৪

কাঁপে যদি তার প্রবাল অধরে
মৃদুহাসি সুধাঢালা ;
পরা'ব নিগড় তা'র দুটি করে
দু'গাছি হীরার বালা।

৫

সে যদি গো হায় হইয়ে বিমুখ
বসে ঘোর অভিমানে,
শাসিব তখনি ধরিয়া চিবুক
কুন্তল দুলা'য়ে কানে।

৬

সে যদি আনন ঘোমটায় ঘেরি
ফিরে যায় করে ছল ;—
পায়ে দিব তার চার গাছা বেড়ি—
ডায়মন্-কাটা মল।

৭

সাত পাক ঘুরে বাঁধিল সে মোরে
আমি কি ছাড়িব তারে ?
নিয়ত রাখিব সোহাগের ডোরে
বেঁধে হৃদি-কারাগারে।

শ্রীরসময় লাহা।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বাঙ্গলার বেগম।—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর জীর্ণ কঙ্কাল সংগ্রহ করিয়া নবীন গ্রন্থকার ব্রজেন্দ্রবাবু যে সুন্দর মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন, তাহা সৌন্দর্য্যে ও নূতনত্বে বরণীয় ও রমণীয় হইয়াছে। একখানি ৬৭ পৃষ্ঠার পুস্তকে তিনি অতি কৃতিত্ব ও নিপুণতার সহিত সিরাজ-পত্নী লুৎফুন্নিসা, সিরাজ-মাতা আমিনা বেগম, আলিবর্দ্দী বেগম, মির্জ্জাফর-পত্নী, মণি বেগম, সিরাজের মাতৃষসা ঘসিটী বেগম, মুর্শিদকুলির কন্যা জিন্নতুন্নিসা বেগম প্রভৃতি কয়েকটী ঐতিহাসিক চিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। এই সমালোচ্য গ্রন্থখানি ব্রজেন্দ্রনাথের ইতিহাস আলোচনার ফল—কল্পনা-প্রসূত নহে। তিনি সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় স্থান-বিশেষে উজ্জ্বলবর্ণ সমাবেশে, এই লুপ্ত চরিত্রগুলিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, ঘসিটী বেগম, লুৎফুন্নিসা ও আমিনা বেগমের চিত্র এ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট অজ্ঞাত ছিল—ব্রজেন্দ্রনাথ এই চিত্র-সংগ্রহেও বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ত্রিবর্ণে মুদ্রিত ঘসিটী বেগমের চিত্রখানি অতি সুন্দর।

লেখক নূতন ব্রতী হইয়া প্রথম চেষ্টায় যেরূপ সাফল্য ও নিপুণতা দেখাইয়াছেন, আশা করি তাঁহার পরবর্ত্তী চেষ্টা "ভারতীর রোগন" তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সফলতর করিয়া বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে স্থায়ী আসন প্রদান করিবে। ভাষা প্রাঞ্জল, উপন্যাসের ন্যায় পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক। আমরা ইতিহাসপ্রিয় ও উপন্যাস-প্রিয় পাঠকগণকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শরতের পূর্ণচন্দ্র—উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হরিপদ ঘোষ প্রণীত। নাম কটমট হইলেও ইহার একটা সার্থকতা আছে। শরৎ ও পূর্ণচন্দ্র লেখকের স্নেহের সামগ্রী ছিলেন। তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ লেখক তাঁহাদের নামে এই পুস্তকখানির নামকরণ করিয়াছেন। লেখকের ভাষা বেশ সরল অথচ বেগবতী। লেখার ভঙ্গিমা কৃতী লেখকের পরিচায়ক। উপন্যাসাংশ অতি মনোরম। ইহা বেশ শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস। লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে এক রাজপুত রাজা সিংহভূমে এক আদর্শ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী কমলকুমারীর এবং তাঁহার সৌমাদর্শন কুমার রতিকান্তের চরিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। প্রভাবতীর প্রেমের চিত্র অতি মনোরম হইয়াছে। আমাদের আশা আছে, এই উচ্চশিক্ষাপ্রদ হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসখানি বাঙ্গালী সাধারণের নিকট আদৃত হইবে।

গোধূলি—পুস্তকের নামের নীচেই একটী সর্পচিহ্ন, তাহার নীচে একটী হস্ত থাকিলে নিয়ে লেখকের নাম না থাকিলেও বুঝিতাম যে, উহা "ভুজঙ্গধর" বাবুর লেখা। শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি অতি উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সূতায় গ্রথিত হইয়া এ কবিতা-কুসুম-মালা বড় সৌরভময় হইয়া উঠিয়াছে। তবে সাধারণ বাঙ্গালা-পাঠক বুঝিয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ।

"মম নাভি-পদ্ম-মূলে জ্যোতির মৃণাল
তব হৃদি-পদ্ম সনে যুক্ত নিরন্তর,
নানা ভাব-ফুলে গাঁথা মম মনোমাল
তোমারি সে চিত্র-সূত্রে গ্রথিত সুন্দর।"

পুস্তকখানি শিক্ষিত লোকে আদর করিবে, আমাদের এ বিশ্বাস আছে।



৺দ্বিজেন্দ্রলাল

Printed at The Fine Art Printing Syndicate, Jorasanko, Calcutta.

সেকাল ও একাল * ।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার নরনারীর মনে যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, মুখে যেমন নিত্য হাসির রেখা ফুটিয়া থাকিত, গৃহে যেমন শান্তি নিত্য বিরাজ করিত, আজ কেমন দুর্দ্দিন উপস্থিত, কেমন শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিতেছি, মনে আর তেমন সুখ নাই, মুখে তেমন হাসি নাই, গৃহে তেমন শান্তি নাই। কেমন এক অভাবের নিপীড়নে বাঙ্গালার নরনারী নিত্য নিপীড়িত। এক অভাবের পূরণ হইতেছে, অন্যবিধ নূতন অভাব আসিয়া মনে আসন পাতিয়া বসিতেছে। এইরূপ অভাবনীয় অভাবেরও শেষ হইবে না, পূর্ব্বকার মত সুখ-শান্তিও আর আমরা পাইব না। মহর্ষি দক্ষের পরিকল্পিত "রুটীন্" অনুসারে প্রত্যেক নর-নারী সে সময়ে প্রতিদিনের দৈনিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, মহর্ষি মনুর ব্যবস্থিত "বজেট" অনুসারে প্রত্যেক গৃহপতিই প্রাত্যহিক আয়কে ভাগ করিয়া প্রতি-দিনের গৃহকার্য্যে ব্যয় করিত। আজ দক্ষের "রুটীন্" বিস্মৃত, মনুর "বজেট" স্মরণের অতীত।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও গ্রাম নগর দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, বালক, যুবক, বৃদ্ধ তখনও গ্রাম্যপথে ও রাজপথে বিচরণ করিত, আজও বিচরণ করিতেছে। তখনকার বালকের কেমন সৌম্য চাঞ্চল্যে বিজড়িত নবনীতনধর দেহকান্তি, লাবণ্যে উদ্ভাসিত প্রসন্ন মুখশ্রী, প্রসাদ-সুন্দর লোচন-যুগল। পরিচিত, অপরিচিত নাই, খোলা গায়ে খেলা করিতেছে, ধূলীধূসরিত দেহ, তথাপি দেখিলেই একবার টানিয়া কোলে তুলিতে ইচ্ছা করিত। আর আজ সুসভ্য বাঙ্গালীর সভ্য বালক 'নিকার বোকার' জামায় আবৃতদেহ, টুপীতে আবৃতমস্তক, জুতা ও মোজায় আবৃত কোমলপদদ্বয়। তথাপি কোলে করা দূরের কথা, দেখিলেই কেমন বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয়, চক্ষুঃ সে মূর্ত্তি দেখিলে পীড়িত হইয়া পড়ে। বালকদিগেরও মুখের প্রসন্নতা, দেহের লাবণ্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তখনকার যুবকের দেহ কেমন কমনীয় কান্তিতে

---

* "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে"র বারাণসী শাখার সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হরিহর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক পঠিত।

উচ্ছ্বসিত অন্তঃসারবিশিষ্ট শৌর্য্যদৃপ্ত ছিল, এখনকার যুবকের দেহের সহিত তাহার তুলনা করিলে কেমন আকাশপাতাল প্রভেদ হয়,—ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেমন পেশীবিজড়িত মাংসল বলিষ্ঠ বাহুযুগল, কেমন বিস্তৃত ঘাতসহ বক্ষঃস্থল, কেমন কেশরিক্ষীণ মধ্যদেশ, কেমন উদ্দীপ্ত চিন্তাশূন্য নেত্রদ্বয়, কেমন কেশরি-খেলায়মান গতি, স্মরণ করিলেও বক্ষঃস্থল আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। আর এখনকার যুবককে একবার দেখ, বিস্মিত হইবে, ভীত হইবে, দুঃখে ক্ষোভে মন নিপীড়িত হইয়া পড়িবে। জানি না, কোন্ পাপের ফলে যৌবনের প্রারম্ভেই বাহু উরু হইতে স্ফীতি নামিয়া ও উঠিয়া আধুনিক বাঙ্গালী যুবকের উদরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কিশোর বয়স হইতে সঞ্চয় করিতে করিতে আজ প্রৌঢ় বাঙ্গালী সঞ্চিত অর্থের ভাণ্ডারটীকে জগতের সম্মুখে ধরিয়া নিজের কৃতিত্ব-প্রদর্শনে সমর্থ।—গতিকরণ চরণকেও পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রবর্ত্তী উদরটী সর্ব্বাগ্রে দুলিয়া দুলিয়া গমন করে। উদর-বহনে অসমর্থ প্রৌঢ় অল্পেই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। দালালী করিয়া, হৌসের মুচ্ছুদ্দীগিরি করিয়া, বিচারক সাজিয়া, উকিল এটর্নি হইয়া রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও মুখে প্রসাদ-সৌন্দর্য্য নাই, হাসির রেখা ফুটে না, চিন্তাক্লিষ্ট মুখে কেমন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, কোটরস্থ চক্ষুর পার্শ্বে কেমন কালিমা প্রলিপ্ত হইয়াছে। কুঞ্চিত ললাটে কেমন সুস্পষ্ট রেখাপাত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালের কৃশবৃদ্ধ দেহেও কেমন শৌর্য্যসৌন্দর্য্যের সমাবেশ ছিল, মুখে কেমন সরলতা, উদারতার সহিত সদানন্দ ভাবের অভিব্যক্তি হইত, আজ সেই পূর্ণানন্দভাবের অভাব সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। পূর্ণানন্দ দূরের কথা, আজ আনন্দ কাহাকে বলে বঙ্গবাসী জানে না, হাসি কাহাকে বলে বাঙ্গালী বুঝিতে পারে না, হাস্যরেখা আজ বিষাদক্লিন্ন-মুখ-নীলিমায় নিলীন। পল্লী, গ্রাম, নগরে তেমন বৃদ্ধ এখন দেখিতে পাওয়া যায় না, যৌবন-শরীরে এখন বার্দ্ধক্য প্রবেশ করিয়াছে। অভাবের জ্বালায়, চিন্তার জ্বালায়, রোগের জ্বালায় বালক, কিশোর, যুবক আজ সকলেই ক্লিষ্ট।

অন্তঃপুরে হাত পা ছড়াইয়া, মুখে ফেনবুদ্বুদ্মালা উদ্গীরণ করিয়া হিষ্টিরিয়ায় গৃহলক্ষ্মী ভূশয়ানা অচেতনা। জ্বর যকৃতে পাণ্ডুবর্ণ বালক শীর্ণহস্তে আউন্স গ্লাস ধরিয়া বিষণ্নমুখে বিস্বাদ তিক্তকষায় ঔষধ গিলিতেছে। অফিসের সময় হইয়াছে, আর কর্ত্তা থাকিতে পারেন না, ডিস্পেপ্সিয়ায় আহারে রুচি নাই, তাহাতে আবার নবাগত চিত্রিত-কপাল তাম্বুলরাগরঞ্জিত ও সুকদম

যাজপুর-নিবাসী বলভদ্র রথের স্বহস্তপাচিত ও পরিবেশিত তথাবিধ নবরসে পূর্ণ অন্নব্যঞ্জন। স্বাদগ্রহণের সময় নাই, কোন ক্রমে শীঘ্র শীঘ্র নাকে মুখে গুঁজিয়া চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্কা অনূঢ়া কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে অফিসড্রেস পরিধান করিয়া চিন্তাক্লিষ্টমুখে তাড়াতাড়ি কর্ত্তার গাড়ীতে আরোহণ। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই ভাবের দৃশ্য চক্ষুর উপরে পড়িতেছে, এই শোচনীয় অবস্থা নগর, উপনগর, গ্রাম, পল্লী সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই যে স্বদেশের কল্যাণের জন্য, মাতৃভূমির দুর্দ্দশামোচনের জন্য শিক্ষিত যুবকদল বদ্ধপরিকর, উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য দিবারাত্রি চিন্তামগ্ন; জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কি এই দুর্ব্বিষহ দুঃখের প্রতীকারের জন্য কোনরূপ চিন্তা করিয়াছেন? এই অচিকিৎস্য রোগের নিদান কি,—অবধারণ করিয়াছেন?



শিক্ষিত সম্প্রদায় ত ভারতের যত কিছু দুর্গতি জাতিভেদপ্রথার প্রবর্ত্তনার ফল, বিধবাবিবাহের অপ্রচলনের ফল ও বালিকাবিবাহ-প্রচলনের ফল বলিয়া অবধারণ করেন। এতক্ষণ আমরা যে দুঃখ-বিভীষিকার উল্লেখ করিলাম, তাহারও মূলে কি এই এই কারণত্রয় বিদ্যমান? বলিব কি করিয়া, পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে সমাজে কি জাতিভেদ ছিল না? দশমবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিলেই কন্যার পিতার মুখ কি শুকাইয়া যাইত না? বিধবাবিবাহ কাহাকে বলে, সেকালের লোক কি জানিত? তবে সে কালেই বা কেন সেই উল্লিখিত দুঃখগুলির অস্তিত্ব বঙ্গদেশে ছিল না? আর একালেই বা কেন সেই মর্ম্মস্পর্শী দুঃখ-রাশি বঙ্গদেশের প্রত্যেক গৃহেই অধিকার করিয়া বসিয়াছে? বলিলে উপন্যাস মনে করিবেন, কিন্তু স্বচক্ষে দেখা, সত্য ঘটনা। সেকালের বৃদ্ধেরা নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়া অম্লানমুখে ৩।৪ সের দধি, ৪।৫ সের ক্ষীর ও ৩।৪ সের সন্দেশ খাইয়া দক্ষিণহস্তপৃষ্ঠে সংযোজিত, বামহস্তে ধৃত ও উত্তোলিত পূর্ণ ঝারির প্রায় জল নিঃশেষ করিয়া হাস্যমুখে উঠিতেন। আর আজ যুবকদের পর্য্যন্ত বন্ধুবান্ধবের গৃহে নিমন্ত্রণ বন্ধ, একবেলা যদি ৩।৪ বৎসরের পুরাতন দাদখানি চাউলের অন্ন অল্পমাত্র সাঁতলাইয়া একটু মাগুর মাছের ঝোলের সহিত খাওয়া হয়, তবে বৈকালের জন্য নিশ্চয় বার্লীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। গৃহলক্ষ্মীরাও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহেন।

রসায়ন, বিজ্ঞান জানি না, বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বা দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র জানি না, কাজে কাজেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জানি না। কিন্তু

অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল এই পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ভূয়োদর্শন আছে, পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করিয়া একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। সেই সাহসে ভয়ে ভয়ে আজ এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

যে সময়ের কথা বলিলাম, সে সময়ে সমাজে হিন্দুয়ানী পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। চুল পরিমাণে অহিন্দুভাব সমাজে প্রবেশ করে নাই। সে সময়ের হিন্দুরা আহারে, বিহারে, শয়নে, গমনে, উপবেশনে পূর্ণমাত্রায় হিন্দু ছিল, বিদেশীর চালচলন সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেকালের হিন্দুর বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা ছিল না, তাহারা মোটা চাল-চলনে দিন কাটাইত, তখন ভারতে জীবনসংগ্রাম প্রবেশ করে নাই। অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশে বা বিলাসিতার খাতিরে এখনকার মত তখনকার হিন্দু সহরে বাস করিয়া জনতার বৃদ্ধি করিয়া সহরে অস্বাস্থ্য-বীজ ছড়াইয়া দিত না। উন্মুক্ত বায়ুর লীলাভূমি উন্মুক্ত প্রান্তরের সন্নিধানে শস্যতরঙ্গিত নিঃসীম শ্যামল ক্ষেত্রমালার নিকটবর্ত্তী স্বচ্ছন্দ বায়ু-সঞ্চারে পূত বর্ষার জলস্রোতে ধৌত বিরল-বৃক্ষরাজি বিরল-গৃহরাজি গ্রামে তাহারা বাস করিত। দক্ষের শাসনে গ্রাম্য নরনারী ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিত, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাহারা ক্ষেত্রপ্রান্তরে গমন করিয়া আবশ্যক কার্য্যের শেষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুচি হইয়া প্রাতঃস্নান করিত। সূর্য্যাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ ও প্রাভাতিক বিশুদ্ধ বায়ুর সংস্পর্শে পবিত্র হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিত, পুষ্পপাত্র হস্তে করিয়া দেবপূজার উদ্দেশে দেবভাবে ভাবিত হইয়া পুষ্প-আহরণের জন্য উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমণ করিত। প্রাতঃস্নাতা গৃহিণীরা সেই সমাহৃত পুষ্পসম্ভারে পুষ্পসজ্জা প্রস্তুত করিত। কাহারও মনে স্বার্থপরতা নাই, সকলেই যেন দেবপূজায় ব্যাপৃত, সকলেই যেন অন্যের সেবায় নিযুক্ত। স্বার্থপরতাশূন্য মনে কলুষতা আসে না; গৃহমেধীর হৃদয় দেবসেবায়, অতিথিসেবায়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে ক্রমে প্রশস্ততা লাভ করে, সেই প্রশস্ত হৃদয় নিত্য আত্মতৃপ্তি লাভ করে, প্রসন্নতা লাভ করে। মনের সহিত শরীরের কেমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, মন প্রসন্ন থাকিলে সে দেহ নিয়ত সজীবতা লাভ করে, স্ফূর্ত্তি প্রসন্নতা লাভ করে, সবলতা লাভ করে, তাহাতে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে না, করিলেও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

গৃহদেবতার অর্চ্চনার জন্য আহৃত পুষ্পসম্ভারের সৌগন্ধে, ঘৃষ্টচন্দন অগুরুর সৌরভে, ষোড়শাঙ্গ ধূপের সুরভি ধূমে, গুগ্‌গুলুসর্জ্জরসের উদ্গীরিত ধূমধারায়

গৃহ আমোদিত, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ দেবগৃহে পরিণত ছিল। গৃহের একদিকে নিত্যসেবিত গৃহদেবতার পবিত্র মন্দির, অন্যদিকে নানা সময়ে অর্চ্চনীয় দেবী-মণ্ডপ, একদিকে তুলসীবৃক্ষ, অন্যদিকে বিল্ববৃক্ষ। সেই দেবমন্দিরের সন্নিধানে ও পবিত্র দেবরূপী বৃক্ষদ্বয়ের নিকটে যাহাতে কোনরূপ অমেধ্য বস্তু পতিত হইতে না পারে, সে জন্য গৃহী, গৃহিণী ও পরিবারবর্গ সকলেই সতর্ক, সকলেই সাবধান। একালের মত সেকালে পাকশালার নিকটে বা ভোজনস্থানের নিকটে পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না, পায়খানা কাহাকে বলে, সেকালের লোক বড় জানিত না। গৃহে মল-মূত্র ত্যাগ দূরের কথা, মুখে থুতু আসিলে গৃহের ত্রিসীমায় ফেলিত না, স্বচক্ষে দেখিয়াছি. গৃহের সর্ব্বত্র দেবতার অধিষ্ঠান মনে করিয়া দূরে গিয়া ফেলিয়া আসিত। সুতরাং মলমূত্র ও নিষ্ঠীবনে আর্দ্রপাদ ক্লিন্নপক্ষ মক্ষিকা আসিয়া অন্নে বসিতে পারিত না। দেবতার ভোগে লাগিবে, গুরুরূপী অতিথির সেবায়, ব্রাহ্মণ-ভোজনে নিয়োজিত হইবে, এইজন্য গৃহিণী হস্ত-পদ প্রক্ষালন করিয়া, পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, থুতু উড়িবে ভয়ে মৌনাবলম্বনে কুটনো কোটা হইতে আরম্ভ করিয়া পাক-পরিবেশনে পর্য্যন্ত সতর্কতা ও সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। দেবতার ভোগে-লাগিবে এইজন্য পাকান্তে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রত্যেক বস্তুই পাত্রান্তরে আচ্ছাদিত হইত। ধূলী উড়িয়া না পড়িতে পারে, মক্ষিকা, পিপীলিকা উঠিয়া দেবদ্রব্য অপবিত্র না করিতে পারে, এইজন্যই এত সতর্কতা, এত সাবধানতা। দেবতার সন্নিধান আছে এই ভয়ে সর্ব্বদা গৃহের পবিত্রতা রক্ষিত হইত, সর্ব্বদা সম্মার্জ্জনী-মুখে আবর্জ্জনা উৎসারিত হইত, গৃহ গোময়-জলে বিধৌত হইত। সমস্ত বাড়ীখানি নিকনো-ঝিকনো. সর্ব্বদা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, কোন স্থানে একটু মলিনতা, কোন স্থানে একটু পঙ্কিলতা নাই, বাড়ীতে দূরে দূরে দুই একটী বৃক্ষ আছে, কিন্তু নীচে একটীও পত্র পড়িয়া নাই। দেখিলে বোধ হয় বাড়ীতে সর্ব্বদা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান।

এ কালের মত সে কালে প্রত্যূষে ক্ষুধা পাউক আর না পাউক, তৃষ্ণা পাউক বা না পাউক, মল-মূত্র পরিত্যাগের পূর্ব্বে হাত-মুখ না ধুইয়াই গোলাপী রংয়ের চায়ে পূর্ণ পেয়ালা লইয়া বাবুরা ও 'বাব্বীরা' বসিত না, ক্ষুদ্র চামচায় করিয়া আস্তে আস্তে চা পান করিত না, ম্লেচ্ছ দেশ হইতে আনীত টীনের বাক্স হইতে বিস্কুট (বিষকুট ?) বাহির করিয়া কখনও বাঁ হাতে, কখনও ডান হাতে ভাজিয়া মুখে গুঁজিত না, হোটেল অব প্যারিসের পাঁউরুটী টোষ্ট করিয়া মাখন মাখিয়া বামহস্তে মুখে তুলিয়া দিত না, গরম জলে অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম্ববিশেষ ফুটো

করিয়া ক্ষুদ্র চামচায় তাহার হরিদ্রাভসার অংশ মুখে উঠাইয়া এইভাবে দেশের কুসংস্কারগুলির মুণ্ডচ্ছেদ করা হইতেছে মনে করিয়া গর্ব্বিত হইত না। তাহাদিগের প্রাতে আহারের সময় কোথায়? সন্ধ্যা-বন্দনা, তর্পণ, দেবপূজা, গোগ্রাস-দান, বলিবৈশ্বদান, অতিথিসেবা করিতে করিতেই ত মধ্যাহ্ন অতীত হইত। গৃহী, অধ্যাপক হইলে পূর্ব্বাহ্নেই নিজের বা অন্যের বিষয় কার্য্যের আলোচনা করিতে হইত। যে প্রকারেই হউক, গৃহীর পক্ষে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে অন্নাহার করিবার সম্ভাবনা ছিল না। সকলের আহারের পরে গৃহী, গৃহিণীর হস্তচালিত দর্ব্বী দ্বারা পরিবেশিত প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন আহার করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিত। হস্তপরিবেশিত অন্নভক্ষণ যে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাহা সকলেই জানিত।

প্রত্যেক গৃহেই দেবতার ন্যায় গোপূজার ব্যবস্থা ছিল। বাড়ীর অনতি-দূরে গোশালা করিয়া তাহাতে গোবৎস রক্ষিত হইত। গৃহী, গৃহিণী, পরিবার-বর্গ সকলেই গো-সেবায় ব্যাপৃত থাকিত এখনকার মত গোসেবায় অবহেলা ছিল না, গোজাতির উপরে অত্যাচার ছিল না। সেবাপরিপুষ্ট ধেনুর প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ হইত; সেই দুগ্ধ গৃহদেবতার সেবার জন্য দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও নানাবিধ মিষ্টান্ন বাড়ীতেই পবিত্রভাবে প্রস্তুত হইত, দেবতাকে নিবেদন করিয়া অতিথিকে ও বাড়ীর সকলকে অর্পণ করিয়া গৃহী ও গৃহিণী তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজনে সমর্থ হইত। সেকালে ময়রার দোকানের সন্দেশ দেবতাকে নিবেদন করিবার পদ্ধতি ছিল না। সেকালে এ আকারের ময়রার খোলা সন্দেশের দোকান বা সন্দেশের ফেরিয়ালাও ছিল না। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপারে ময়রার সন্দেশ ও গয়লার ক্ষীর দই লইবার অবশ্য নিয়ম ছিল। কিন্তু ময়রা ও গয়লা সেইরূপ ক্রিয়াকর্ত্তার আদেশ না পাইলে কখনই সন্দেশ ও দই ক্ষীর প্রস্তুত করিত না। এখনকার মত সেকালে যখন তখন ময়রার দোকানে সন্দেশ বা গয়লার দোকানে দই ক্ষীর পাওয়া যাইত না, তাহারা সন্দেশে ও দই ক্ষীরে দোকান সাজাইয়া ক্রেতার অপেক্ষায় তামাকু টানিত না, বা সিগারেটের ধূমে দোকান আমোদিত করিত না। জমাখরচ লিখিতে যাইয়া পঞ্চাশবার পেন্‌শিলের অগ্রভাগ চাটিত না ও ঐরূপ হস্তে নাকের সিক্‌নী ঝাড়িয়া মুখের চর্ব্বিত পানের ছিব্‌ড়া দূরে ফেলিয়া দুই হাতে ছানার চিনি চটকাইতে বসিত না। ভোঁতা ছুরীর দ্বারা দদ্রু ও ফুসকুড়ী-যুক্ত ময়লা আঙুল ও হাতের চেটো হইতে পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত চিনি ছানা কেঁকরাইয়া তুলিয়া ওজনে সন্দেশের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিত না, রসগোল্লার রসে বোল্‌তা পড়িয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া

টিপিয়া তাহার রসে রসগোল্লার রস বৃদ্ধি করিত না। সেকালের ময়রা ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু, গয়লা ধর্ম্মবিশ্বাসী হিন্দু, ব্রাহ্মণভোজনে লাগিবে এইজন্য তাহারা অতি সন্তর্পণে পবিত্রভাবে সন্দেশ ও দধি ক্ষীর প্রস্তুত করিত।

এইভাবে হৈয়ঙ্গবীন ঘৃতপৃক্ত সুগন্ধি পবিত্র শাল্যোদন, ঘৃতে আঘারিত পবিত্র মুদ্গযূষ, উপাদেয় পবিত্র ব্যঞ্জন, পবিত্র দধি দুগ্ধ, যদৃচ্ছালব্ধ রম্ভা আম্র প্রভৃতি সুপক্ক ফল ক্ষুধার সময়ে ভক্ষণ করিলে কেবল রসনার তৃপ্তি হয় না, শরীরের পুষ্টিসাধন হয় ও রোগের জ্বালা হইতে নিবৃত্তি পাইবার উপায় হয়। দেশের কুসংস্কার লোপ করিতে যাইতে যাইতে বাঙ্গালার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। লালার সহিত কত প্রকার উৎকট সংক্রামক রোগের বীজাণু আসিতে পারে, এইজন্য মুখে হাত দিবার ব্যবস্থা নাই, দিলে তৎক্ষণাৎ হস্ত প্রক্ষালনের ব্যবস্থা। শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক কি জন্য এ বিষয়ে অবজ্ঞা করেন, বুঝি না; প্রয়োজন অপ্রয়োজন নাই, যেখানে সেখানে তাঁহারা লালা সংযোজিত করেন। বাহিরের বাতাসে ও রৌদ্রে যে তাহাতেও ফারমেণ্টসনের (Fermentation) আশঙ্কা আছে,তাহা আর বুঝাইয়া দিতে চাই না। অন্নব্যঞ্জনে পর্য্যন্ত ফারমেণ্টসন হয় বলিয়া শাস্ত্রকারেরা "যাতযাম" অন্নব্যঞ্জনভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন। যাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, প্রভুবাৎসল্য নাই, এইরূপ পাচকের পরিপক্ক অন্ন, এইরূপ ময়রার দোকানের চর্ব্বি-মিশ্রিত নামমাত্র ঘৃতভর্জ্জিত পক্কান্ন, আর যাহাদিগের শৌচাচমন নাই, মেধ্যামেধ্য নাই, সেইরূপ ম্লেচ্ছের পরিপক্ক খাদ্য ভক্ষণ করিয়া কুসংস্কারশূন্য শিক্ষিত সম্প্রদায় যে স্বধর্ম্মের উপরে, সদাচারের উপরে, স্বদেশীয়তার উপরে, স্বাস্থ্যের উপরে জলাঞ্জলি দিয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে রসাতলে ডুবাইতেছেন, মুহূর্ত্তের জন্যও কি সে বিষয়ে তাঁহারা একবার চিন্তা করেন?

আজও যাঁহারা যথাসম্ভব আর্য্যাচার-প্রতিপালনে সমর্থ, তাঁহাদিগের দেহে কি এইরূপ কদর্য্য রোগের প্রবেশ হইয়াছে? অভাবেই হউক, অভ্যাসেই হউক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত আর্য্যাচারের অনুষ্ঠান করেন; কৈ, তাঁহারা ত এইরূপ দুশ্চিকিৎস্য কুৎসিত পীড়ায় নিপীড়িত নহেন। আজও অশীতিবর্ষবয়স্ক পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীধামে জীবিত রহিয়াছেন, এখনও শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার দ্বিগুণ উৎসাহ দেখিতে পাই। তাঁহার পবিত্র দেহে সেইরূপ রোগ-প্রবেশের কথা কোন দিন শুনি নাই। পূজনীয় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় চতুরশীতিবর্ষ বয়সের সময় কাশীলাভ

করিয়াছেন; তিনি স্বহস্তপক্ক অন্ন নিত্য আহার করিতেন। কোন দিন তাঁহার অজীর্ণ রোগ হয় নাই, কোন দিন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয় নাই। আমরণ তিনি চশমা ব্যবহার করেন নাই। বাচস্পত্যাভিধানের মত ক্ষুদ্র অক্ষরের প্রুফ তিনি নগ্নচক্ষে নিজে দেখিয়া দিতেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখে প্রায় শুনিতে পাই, চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রায়ই ডাইবিটিশ রোগে দেহপাত হইয়া থাকে। আমি কিন্তু এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। নব্য ন্যায়ের মত উৎকট চিন্তার বিষয় কঠিন শাস্ত্র জগতে আর কিছু আছে কি না, অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত আমি শুনি নাই। বলিতে পারেন কি, বাঙ্গালার কোনও নৈয়ায়িকের ডাইবিটিশে মৃত্যু হইয়াছে? অতি পূর্ব্বের কথা বলিব না, জগদীশ, গদাধর বা চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, কমল সার্ব্বভৌম, রুদ্রমঙ্গল, ন্যায়ালঙ্কারকে টানিয়া আনিব না, একালের সকলেরই যাঁহারা পরিচিত, সেই পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, রামধন তর্কপঞ্চানন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, প্রসন্নকুমার ন্যায়রত্ন, প্রসন্নকুমার তর্করত্ন, রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন—ইঁহাদিগের কাহার ডাইবিটিশে মৃত্যু হইয়াছে? পূজনীয় ন্যায়রত্ন মহাশয় ডাইবিটিশ কাহাকে বলে জানেন না, বন্ধুবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়েরও ডায়েবিটিশ একান্ত অপরিচিত।

অন্বয় ব্যতিরেকেই পদার্থের নির্ণয় হয়। আমরা দেখাইয়াছি, প্রাচীন কালের বঙ্গীয় নরনারী বলিষ্ঠ শরীরে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগের ঈদৃশ জীবনব্যাপী উৎকট রোগ ছিল না, মুখে বিষাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। আর একালের সমস্ত নরনারী উৎকট দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত, সকলেরই মলিন মুখমণ্ডলে বিষাদের ছায়া নিপতিত। পূর্ব্বকালের বঙ্গের নরনারী সকলেই আর্য্যাচার প্রতিপালন করিত; একালের নরনারীর মধ্যে অধিকাংশ রুগ্ন রুগ্না আর্য্যাচারের পরিবর্ত্তে ম্লেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তনা করে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে পারি, ম্লেচ্ছাচারই দেশে অশান্তি আনিয়াছে, দেশে রোগের বীজ ছড়াইয়া দিয়াছে। এখনও যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চৈতন্য হয়, নেত্র উন্মীলিত হয়, আশা করি, তাহা হইলে দেশ হইতে রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইবে।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল।

'মহাসিন্ধু' ওপার হ'তে,
কি সঙ্গীত এল ভেসে,
যার 'মধুর তানে' পাগল ক'রে
নিয়ে গেল তোমা' এসে!

জীব-রঙ্গ-নেপথ্যের
অজ্ঞাত দীপক রাগ,
এত কি লাগিল ভাল,
যাহে এত অনুরাগ?

তাই কি হে ত্বরা করি
'পরপারে' যাবে বলি,
'আনন্দ বিদায়' দিয়ে,
বঙ্গ হতে গেলে চলি?

'বঙ্গ' তোমার 'জননী' তোমার
'ধাত্রী' তোমার তোমার 'দেশ'
প্রিয় সুত শোকে আজি
সত্য 'দৈন্ত', সত্য 'ক্লেশ'!

বঙ্গ রঙ্গ অন্ধকার,
ঘন মেঘে দিল ছেয়ে,
হারায়ে 'গিরিশে' শুধু
ছিল তব মুখ চেয়ে।

সাহিত্যের নবপ্রাণ—
নব তান নব সুর—
নূতন মূর্চ্ছনা দিয়ে
উঠাইলে কতদূর।

শুনিতে তোমার স্বর
বুঝি সুরপুরযোগ্য,
সাদরে আহ্বানে দেব,
মরতের নহে ভোগ্য।

কিম্বা সিন্ধু-গম্ভীরতা
হাসিমাখা গান গেয়ে
ভাঙ্গিতে হইবে ব'লে,
অমরে ডাকিল ধেয়ে!

'প্রতাপ' বীরত্ব-গাথা,
মহাবীর্য্য 'মেবারের'
'বিশ্বেশ্বর' বিশ্বপ্রেম
রুদ্রমূর্ত্তি 'চাণক্যের'—

সমাজের অধঃপাত,
ধরমের ভিন্ন স্রোত,
আঁখিতে আঙ্গুল দিয়ে
কে দেখাবে ওতঃপ্রোত?

স-রসি হাসির রসে
তীক্ষ্ণ-শ্লেষ-ইষু শত
উন্মার্গ সমাজদেহে
এড়িলে শোধিতে কত।

দ্বিজেন্দ্র-মরণে আজ
বিধবা 'কুটীর-রাণী'
আছাড়িয়া বীণা ভূমে
কাতরে কাঁদিছে বাণী।

কাঁদিছে সমগ্র বঙ্গ,
শতধারে অশ্রু ঝরে,
ধ্বংস ধায় সৃষ্টি-পাশে,—
অমর না কভু মরে।

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ।

ভারতে প্রথম রেলওয়ে।

(শেষ অংশ।)

বঙ্গদেশেই ইংরাজের সব বড় বড় কাজ হইয়াছিল। বঙ্গদেশে হুগলীর কুঠী ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী। মোগল-শক্তির দ্বারা উৎপীড়িত ভাগ্য-বিতাড়িত জব চার্ণক—সুতানুটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে, আজ এই প্রাসাদমালাপূর্ণ কলিকাতা নগরী। ইংরাজই বঙ্গদেশে প্রথম রেল খুলিয়াছিলেন। হাবড়ায় একদিন—একটী শুভ মুহূর্ত্তে, যে বীজ উপ্ত হইয়াছিল, আজ তাহার ফলে—সমগ্র ভারতে রেলপথে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে।

রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড ষ্টিফেনসন বঙ্গের রেলের প্রথম এজেণ্ট বা বড়কর্ত্তা আর জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্ বিলাতে বাষ্পীয় শকটের তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন। এক নামেরই দুইজন লোক। বিলাতী ষ্টিফেনসন প্রথম আবিষ্কার দ্বারা, যে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন—ম্যাক্‌ডোনাল্ড ষ্টিফেনসন ভারতে—তাঁহার আবিষ্কারের প্রথম বীজ বপন করিয়া, এদেশের একটা মহোপকার সাধন করিয়াছেন। এই রেলের ফলেই, সিলেটী ও নাগপুরী কমলা, লক্ষ্ণৌ ও বেনারসের খরবুজা, কাশীর কুল ও পেয়ারা, কাবুলী ও পেশোয়ারি মেওয়া, মান্দ্রাজের আম, ত্রিহুতের ল্যাংড়া, মজঃফরপুরের লিচু, সবই আমরা এই কলিকাতায় বসিয়া পাইতেছি। আগে কাশী যাইতে হইলে,লোকে উইল করিয়া বাড়ীর বাহির হইত—আর এখন শনিবার রেলে চড়িলে, রবিবার মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে কাশী পৌছান যায় ও সমস্ত দিন কাশীবাস করিয়া বিশ্বনাথের আরতি দেখিয়া, রবিবারের রাত্রেই বোম্বাই-মেল ধরিতে পারিলে পরদিন অপরাহ্নে কলিকাতায় আসা যায়।

প্রথম যখন পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রেল হইল, তখন দুইখানি বই ট্রেণ ছিল না। একখানি সকালে—অপর খানি অপরাহ্নে। কখন যে ট্রেণ পাণ্ডুয়ায় পৌছিবে, তাহার কোন নির্দ্ধারিত সময় দেওয়া হইত না। মাত্র আটখানি গাড়ী—আপ্ এবং ডাউন ট্রেণে যাতায়াত করিত। রাত্রে ট্রেণ চলা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

হাবড়ায় রেল-ষ্টেসন যে স্থানে ছিল না, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দুই ধার হইতে মাটী কাটিয়া রেলের পথ তৈয়ারি হইয়াছিল। দুই পাশের এই খনিত খাদে, জল পচিয়া একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ হইত। ফার্ষ্ট-ক্লাসের গাড়ী কম ছিল। দেশী বিলাতী অনেকেই তখন ফার্ষ্ট-ক্লাসে যাইতেন। তখনকার ফার্ষ্ট-

ক্লাসে আর এখনকার ফার্ষ্ট ক্লাসে আকাশ-পাতাল তফাৎ। দেশী লোকে পয়সা দিয়া ফার্ষ্ট-ক্লাসে যাইত—সাহেবদের তাহা সহিত না। নিম্নোদ্ধৃত ইংরাজীটুকু সেই সময়ের সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইতেছে। ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠক, এই টুকু পড়িলেই তখনকার সাহেব-রেলযাত্রীদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

একজন ইংরাজ কোন সংবাদপত্র স্তম্ভে লিখিয়াছিলেন—

"The Upgoing passengers in the First Class carriages on the day noted were for the most part exceedingly respectable but all sorts of riff-raff of all colors were in the same carriages on the return trip. Some of the male gender were all the worse for their holiday making and two of them in the same compartment amused the other passengers with their amativeness. One very dark East Indian Gentleman and his very dark lady, stood up the greater part of the journey, looking out of the window, the sterner-sexed passenger winding his arm fondly round the neck of the passenger of the feminine gender. There was another billing and cooing couple of the Saxon breed and two, who were almost vehemently affectionate—another gentleman treated his fellow passengers with a brief dance and various practical jokes &c. &c. ইহাত গেল ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি সমাজের অবস্থা। এর মধ্যে "Oily natives in a state akin to nudity in the first class carriages এরূপ একটা অভিযোগও সে সময়ে বড় প্রবল ছিল।

সেই সময়ে এদেশী লোকেদের সম্বন্ধেও নানাবিধ আজগুবী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। একটী ঘটনা এই—"রূপচাঁদ ঘোষের দোকান চীনাবাজারে। পারফিউমারি ও পিস্‌গুড্‌সের কারবার করিয়া, তিনি বেশ দুপয়সা করিয়াছেন। রূপচাঁদ ঘোষ রেলে চড়িয়া, হুগলীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হুগলীর টিকিট ছিল। তাঁহাকে গাড়ি হইতে নামিতে বলিলে, তিনি বেকুবের মত উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশ্বাস—যে হুগলী আসিতে সারাদিন কাটিয়া যায়—এত শীঘ্র সেই হুগলীতে আসা অসম্ভব! যখন তিনি দেখিলেন, গাড়ি সেইখানেই স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন ঘোষজা অগত্যা গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন। তবুও তাঁহার বিশ্বাস হয় না, যে তিনি হুগলী আসিয়াছেন। ষ্টেসন হইতে নামিয়া, ঘোষজা যাহাকে সম্মুখে পান, তাহাকেই বলেন—"হাঁ গা! এ জায়গাটার নাম কি? সত্যই কি এটা হুগলী?" যখন

লোকে বলিল সত্য সত্যই তিনি হুগলীতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল।

তখন আর্ম্মানীঘাটে রেল-কোম্পানীর একটা টিকিট বিক্রয়ের স্থান ছিল। অনেকে আরমানিঘাট হইতে টিকিট কিনিয়া, গঙ্গা পার হইয়া হাবড়ায় যাইত।*

তৎসময়ের একখানি সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত দুইটী কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। এখনকার কালে ইহা অবিশ্বাস্য হইতে পারে, কিন্তু যখন এ ঘটনা গুলি তৎসময়ের সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন যে ইহা একবারে অপ্রকৃত তাহাও ত বলা চলে না।

একদিন সন্ধ্যাকালে দেখা গেল, একজন সরকার গোছের লোক ঘোড়ার মত দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাস্তায় যাইতেছে। তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। লোকটা দ্রুতবেগে চিৎপুরের রোডের দিকেই যাইতেছিল। আশেপাশের অন্যান্য পথিকেরা লোকটাকে দ্রুতবেগে যাইতে দেখিয়া, তাহাদের স্ব স্ব সিদ্ধান্ত মত এই দৌড়ানর একটা উদ্দেশ্য খাড়া করিয়া লইল। কিন্তু অদূরে একজন চৌকীদার দাঁড়াইয়াছিল তাহার মনে সন্দেহ হইল, লোকটা নিশ্চয়ই কোন কুকর্ম্ম করিয়া পলাইতেছে। চৌকীদার সাহেব কাজে কাজেই লোকটাকে পাকড়াও করিল। শেষে প্রকাশ পাইল—এই ভদ্রলোকটীর নাম কালীকুমার দে। জাহাজের কাপ্তেনদের নিকট তিনি খুব পরিচিত। কাপ্তেনদের সঙ্গেই তাঁর কারবার। প্রকৃত ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, লোকটা বলিল—"এইমাত্র আমি রেল হইতে নামিতেছি। রেলের গতি আংশিক ভাবে অনুকরণের একটা সখ্ হওয়ায়, আমি রেলের গতির অনুকরণ করিয়া দৌড়াইতেছিলাম। †

আর একটী ঘটনা এই, "রাধালঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নিষ্ঠাবান ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ। তাঁহার একবার রেল-ভ্রমণের ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মণ পাঁজি পুঁথী ঘাঁটকাইয়া একটী শুভ সময় বাহির করিলেন। যাত্রার দিনে, তিনি তিনবার গঙ্গাস্নান করেন। সহস্রবার ইষ্ট দেবতার নাম জপ করেন। যতক্ষণ

* For many years The East Indian Railway had a Booking Office at Armenian Ghat and the passengers could take their tickets there before crossing the river (First opening of the E. I. Ry. B. P. & P.)

† The individual was no other than Kalikumar Dey so well-known to the commanders of ships and was having once 'realised' a full idea of Railway speed felt an irresistible impulse to accelerate his personal locomotion by running instead of walking.

তিনি চলন্ত রেলগাড়ীতে ছিলেন, ততক্ষণ কাহারও সহিত কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া, অতি গম্ভীর ভাবেই নিজস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। হুগলীতে পৌঁছিয়া, ব্রাহ্মণ গাড়ি হইতে নামিলেন। কিন্তু সে দিন আর তিনি ফিরিলেন না। লোকে তাঁহার না ফিরিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"বাপু হে! কোথায় হাবড়া আর কোথায় হুগলী। যে অগ্নি-গর্ভ-যান পথের হ্রস্বতা সাধন করিতে পারে, সে যে জীবন পথের হ্রাস করিবে না—তাহারই বা আশ্চর্য্য কি? পুনঃ পুনঃ রেল-যাত্রা করিলে আয়ুক্ষয় সম্ভাবনা।"

বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুর গৃহে ফিরিয়া আসিলে, প্রতিবাসী ও বন্ধুবর্গ যখন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ রেল-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তখন তিনি নানাবিধ শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইয়া রেলের গতি ও অবস্থার বর্ণনা করিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায়, তাঁহার শ্রোতাগণ একবারে মন্ত্রমুগ্ধ। কাহারও আর কথাটী কহিবার নাই। শেষ পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বুঝাইলেন—"নিশ্চয়ই ঐ রেলের গভীর গহ্বরে (বয়েলারে) একটা দৈত্য অবরুদ্ধ আছে। তাহার লাঙ্গুলে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রয়োগ করিলেই—সে রেলের কলটাকে চালাইয়া দেয়। আর তাহাকে উত্তপ্ত লৌহ শলাকার দ্বারা আঘাত করিলেই, দৈত্যটা মধ্যে মধ্যে মর্ম্মভেদী চীৎকার করে। *

কেবল এদেশী লোক নহে, অনেক সাহেব সুবো, রেলে চড়িয়া—বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। ইহার একটী উদাহরণ দিয়া এ প্রস্তাব শেষ করিব। জোন্‌স সাহেব—তিন দিন ধরিয়া ক্রমাগত রেল চড়িতেছিলেন। তিনি রোজই একবার হুগলী যান—আবার ফিরিয়া আসেন। এইরূপে তাঁহার রেল চড়ার নেশা চড়িয়া গেল। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া মহা বিপদ উপস্থিত। তাঁহার একখানি বগী গাড়ি ছিল। একটা বুড়া ঘোড়া, বহুদিন হইতে তাঁহার দানা-পানি খাইয়া এই বগী টানিয়া বেড়াইত। কিন্তু রেলযাত্রা হইতে ফিরিবার পর সাহেবের মাথায় এক নূতন খেয়াল চাপিল। তিনি ঘোড়াটাকে চাবুক প্রহারে

* Indeed the learned Radhalankar and his learned compeers felt a firm conviction that a mighty demon is kept imprisoned in the green boiler of the Locomotive and made to work the machinery by the application of live coals to his tail and that every time the stokers stir him up with their long hot pokers he utters that dreadful diabolical shriek which the Engineers facetously call the whistle.

জর্জ্জরিত করিয়া, রেলের ন্যায় গতিশীল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনিবও চাবুক কসিয়া জান হায়রান—ঘোড়ারও প্রাণপণে দৌড়াইয়া প্রাণান্তকর অবস্থা। শেষ তাঁহার মাথা হইতে এই খেয়ালটা একদিন সহসা সরিয়া যাওয়ায়, বুড়া ঘোড়াটা সে যাত্রা রেহাই পায়। *

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

স্বর্ণ-শৃঙ্খল।

(১)

একখানি বেতের চৌকিতে বসিয়া লাইফুঙ ছুহিতা চাইমু পিতার নিষ্ঠুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফুলিতেছিল। তাহার পিতা দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহার হস্তে মাত্র দশটি টাকা দিয়া কোন্ জাহাজে কর্ম্ম করিতে চলিয়া গিয়াছিল। কলিকাতার মত স্থানে দশ টাকায় যুবতীর কয়দিনই বা চলিতে পারে? চীনাপাড়ার মোড়ের আঙ্ঘি চীনবাসীর দোকান হইতে সে ধার করিয়া 'চাউ চাউ' 'তাই ছয় কুই' প্রভৃতি 'সেকফান' বা খাদ্যদ্রব্য আনিয়া কয়দিন জীবন ধারণ করিতেছিল। তাহাকে অচিরে স্বজাতির নিকট ভিক্ষা করিতে হইবে ইহা ভাবিয়া গর্ব্বিতা চাইমু এক দুর্ব্বিবহ যাতনায় দগ্ধ হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল—"হা ভগবান, কেন আমাকে শৈশবে মাতৃহীনা করিয়াছিলে, কেন আমার পিতাকে কর্ত্তব্যপথ বিচ্যুত হইতে দিয়াছিলে?" ধর্ম্মের নামে কেন চীনবাসীগণ দ্যূতক্রীড়া করে অভাগিনী চাইমু তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদের "স্বর্গীয় জাতি" কেন এমন নির্ব্বোধের মত ব্যবহার করে এ সমস্যা তাহার নিকট এক বিরাট দুর্ভেদ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

এমন সময় ঝলমলে পায়জামা পরিহিত কাবুলি জবরদস্ত খাঁ হস্তে একটি স্থূলকায় লগুড় লইয়া, পাগড়ির একাংশ বক্ষে ঝুলাইয়া চাইমুর সম্মুখীন হইল।

---

* Having acquired a notion of speed such as he never knew before he can no longer reconcile himself to the jog trot of his buggy horse and accordingly does nothing but whip the poor brute as soon as he gets behind him, in the vain hope of making him go at something like Railway speed.

অসময়ে এ প্রকারের "নারকী জীব" (ছাউ কো) দেখিয়া ক্রোধে ঘৃণায় চাইমুর বাক্যস্ফুরণ হইল না। জবরদস্ত খাঁ 'শয়তান কন্যার' মুখভাব দেখিয়া অপেক্ষাকৃত রুক্ষ স্বরে বলিল—"কাঁহা হায় চীনা সাব ?"

গম্ভীর ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে অপর দিকে চাহিয়া চাইমু বলিল—"চাও চাও, নি হায়, নি হায়।"

জবরদস্ত খাঁ ছাড়িবার পাত্র নয়। দুই মাসে তাহার এক শত টাকার প্রায় পঞ্চাশ টাকা সুদ হইয়াছিল। তাহার উপর পলায়িত লাইফুঙের সন্ধান লইবার জন্য তাহাকে চীনাপাড়ায় অনেকবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। সুতরাং যুবতীর কথায় সে ভূমে লাঠি ঠুকিয়া বলিল—কিয়া নি হায় ? তুম্ রুপি লাও।

চাইমু রাগত ভাবে বলিল—লুপি দেগা হায়। সাব আয়েগা হায়, লুপি দেগা হায়।

জবরদস্ত বলিল—কিয়া জুয়াচুরি। সাব কব আবেগা ? কব রুপি দেগা। শয়তান্।

এবার যুবতীর ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল। একজন বিদেশী ভিন্নধর্ম্মী ঘৃণিত লোকের হস্তে এরূপ ভাবে স্বীয় কন্যাকে নির্য্যাতন করিবার অবসর দিয়া তাহার পিতা যে এক জঘন্য কার্য্য করিয়াছিল ঐ ধারণাটা যুবতীর হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিল। পিতার নির্ম্মম ব্যবহারে চাইমুর বাক্‌রোধ হইল। তাহার ছোট ছোট গোল গোল চক্ষু দুইটি আর অশ্রুর বেগ ধারণ করিতে পারিল না। সে তাহার সাঙ্কাই রেশমের "নোউ সাম" জামার একাংশ তুলিয়া চক্ষের জল মুছিতে লাগিল।

এক একটা সামান্য ঘটনায় মানুষের জীবনস্রোতের কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে। তাহার সহিত কলহ করিলে, তাহাকে গালি দিলে অপরাধীর শাস্তির কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয় সে তত্ত্ব বলিষ্ঠ জবরদস্ত খাঁ বিশেষরূপে বিদিত ছিল। কিন্তু তাহার সম্মুখে একটা অসহায়া যুবতীকে রোদন করিতে দেখিয়া যুবক জবরদস্ত খাঁর হৃদয়ে এক নূতন রকমের ভাব আসিল। সে রোরুদ্যমানা চীনা যুবতীর প্রতি নূতন চক্ষে চাহিল। এবার তাহাকে সে শয়তান কন্যা ভাবিতে পারিল না। বলিষ্ঠ আফগানের কঠোর প্রাণে সে চিত্র বড় স্নিগ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইল। সে আপন মনে বলিয়া উঠিল—'ইয়া আল্লাহ দাজ্ জিনেই ডেরা খায়েস্তা।' (হাঃ ভগবান্ এ যুবতী বেশ সুন্দরী)।

তাহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া কাবুলী বলিল—মাৎ রো। কিয়া হুয়া ? পরোয়া নেই।

কিন্তু সে বহুদিনের রুদ্ধস্রোত কি সহজে থামিতে পারে ? যুবতীর অভিমান বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে নীরবে অশ্রুমোচন করিয়া পিতার নির্দ্দয়তার প্রতিশোধ লইল।

যুবক জবরদস্ত বড় বিব্রত হইল। সে যুবতীর নিকট সরিয়া গিয়া বলিল—মাৎ রো। রূপি সাব্ সে লেগা। মাৎ রো।

চাইমু জবরদস্তের মুখের দিকে চাহিল। অর্থের কাঙ্গাল যেমন অন্ধকারে অর্থের চিহ্ন দেখিতে পাইলে তাহার হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করে সোহাগের কাঙ্গালের প্রাণও তেমনি সোহাগের লক্ষণে নাচিয়া উঠে। চাইমু মুখ তুলিয়া সেই ঘৃণিত কাবুলির চক্ষে সহানুভূতির চিহ্ন দেখিল। আজ দুই মাস ধরিয়া জগতের কোথাও এ দুর্লভ পদার্থটি চাইমু খুঁজিয়া পায় নাই। সুতরাং মনের আবেগে রোদনের অবসরে সে যথাসম্ভব হিন্দুস্থানী ভাষা সংগ্রহ করিয়া নিমেষ মধ্যে তাহার বর্ত্তমান অবস্থাটা পিতার উত্তমর্ণের নিকট বলিয়া ফেলিল। অবশ্য জবরদস্তের সহানুভূতি-পূর্ণ চক্ষু গর্ব্বিতা চাইমুর নিকট হইতে কথাগুলি টানিয়া বাহির করিতে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

গল্প শুনিয়া নিঃশব্দে কাবুলি আপনার পাগড়ির এক প্রান্ত খুলিয়া দশটি মুদ্রা চাইমুর সম্মুখে রক্ষা করিল। এবার চাইমু বড় লজ্জিতা হইল। ভীষণ আত্মগ্লানি আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। তবে কি কাবুলি ভাবিল যে সে তাহার নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিতেছে ? লজ্জায় তাহার অশ্রু শুকাইয়া গেল। গর্ব্ব তাহার স্বরকে একটু দৃঢ়, একটু কর্কশ করিয়া দিল। সে বলিল—নি মাঙ্গতা হায় লুপি।

পরে কাবুলি যখন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে সে তাহাকে দশ টাকা ঋণ-প্রদান করিল তখন চাইমু আশ্বস্ত হইল। সে "লশ লুপি" না লইয়া উপস্থিত "লু লুপি" গ্রহণ করিল।

(২)

কেবল যে সরস বসন্তে কুসুম-সুবাস-পরিপূরিত কলকণ্ঠবিহঙ্গম কূজিত পুষ্প-বীথিকায় অথবা ফুল্লারবিন্দ-শোভিত সরোবরের তীরেই কান্তবপু মন্মথদেব বাছিয়া বাছিয়া কেবল বিলাস-বিলোল-লোচন যুবকদিগকে পুষ্পশর মারিয়া বিব্রত করিয়া থাকেন এ ধারণাটা একেবারে অভ্রান্ত নহে। বস্তুতঃ প্রদ্যুম্নদেবের দেশ কাল পাত্র নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি মোটেই নাই। তাহা না হইলে এই ভীষণ কোলাহল পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় চীনাপাড়া পল্লীতে বৈশাখের

দারুণ গ্রীষ্মের সময় অপরিষ্কৃত বেশধারী তৈলসিক্ত উষ্ণীষ-শির জবরদস্ত খাঁকে তিনি ফুলশর মারিবেন কেন? প্রথমে তাহার হৃদয়ের নবজাত কোমল বৃত্তিটাকে জবরদস্ত খাঁ সহানুভূতি, দয়া, বীরধর্ম্ম প্রভৃতি বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, পরে ফৌজদারী বালাখানার নানেবাই বা রুটিওয়ালার দোকানে ঢালের মত রুটি ও শিক্‌কাবাব খাইতে খাইতে সে বেশ বুঝিয়া ফেলিল যে তাহার হৃদয়ের এ বৃত্তি প্রেম ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যখন তাহার পার্ব্বত্য-দেশের সফরীনয়না যুবতীদিগের কথা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইত তখন তাহার মনের মধ্যে একটা স্বর কাজির বিচার করিয়া বলিয়া দিত যে স্ত্রীলোকের চক্ষু ক্ষুদ্রায়তন ও গোল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেই কাজির স্বরই তাহাকে বলিত, খর্ব্বাকৃতিতেই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য, হরিদ্রা বর্ণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ, ছাতার কাপড়ের মত কৃষ্ণবর্ণের রেশমী কাপড়ের পায়জামা পিরাণই রমণী জাতির শোভনীয় পরিচ্ছদ। সেই দিন অবধি সে প্রত্যহই একবার করিয়া চীনা-পাড়ায় যাইত। তাহাকে দেখিয়া ফিরিঙ্গী ডি শাণ্টুর কুকুরটা বিকট চীৎকার করিত তাহাতে সে অনুমাত্র বিরক্ত হইত না। কোন কোন দিন সে চাইমুর গৃহের দরজা অবধি গিয়া লজ্জায় ফিরিয়া আসিত; কোন কোন দিন সে চাইমুকে শুধু জিজ্ঞাসা করিয়া আসিত যে সে কেমন আছে। চাইমু যখন হাসিয়া তাহাকে বলিত—টিক হায়, আচ্ছা হায়—তখন চাইমুর চক্ষু দুটি একেবারে মুদিয়া আসিত। তখন জবরদস্ত দেখিত, চীনবাসিনীদের দশনপংক্তি পাঠান রমণীদিগের দশনপংক্তি অপেক্ষা সুষমা মণ্ডিত।

চীনা জাতির বিজাতিবিদ্বেষ ভুবনবিদিত; চীনা রমণীর তো কথা নাই। কিন্তু হৃদয় বলিয়া একটা দুর্ব্বল পদার্থ সুসভ্য জাতির মধ্যে এবং ফিজি দ্বীপের নরখাদকদিগের মধ্যে সমভাবে অবস্থিত। এ দুর্ব্বলতা কাহারও অধিক কাহারও অল্প। কিন্তু ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি কোনও দ্বিপদের নাই। চাইমু গর্ব্বিতা চীনা ললনা হইলেও জবরদস্ত খাঁর ব্যবহারে সে তাহাকে আর 'নারকী জীব' বলিয়া ভাবিতে পারিত না। তাহার স্বজাতিদিগের মধ্যে কেহ তাহাকে সাহায্য করে নাই। ইদানীং কাবুলীকে তাহার প্রাঙ্গণে ঘন ঘন আসিতে দেখিয়া চাইমুর প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মানুষের কেমন একটা চিরন্তন স্বভাব আছে যে সে কোনও অবৈধ কার্য্য করিলে তাহার দায়িত্বটুকু সর্ব্বান্তঃকরণে অপরের স্কন্ধে চাপাইতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকে। সুতরাং চাইমুর পিতার চীনা বন্ধুরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিল সে তাহাদের

স্বজাতীয় মহিলা, বন্ধু কন্যা চাইমু একটা জঘন্য কাবুলীর কৃপা ভিক্ষা করিয়া তাহার নিকট হইতে সপ্তাহে একবার করিয়া অর্থ কর্জ্জ না লইলে তাহারা নিশ্চয়ই তাহাকে অর্থ সাহায্য করিত। তাহারা যে তাহাকে অর্থ সাহায্য করে না এ দোষ চাইমুর।

(৩)

জবরদস্ত খাঁ ভাবিল আজ একবার চাইমুকে পরীক্ষা করিবে। হৃদয়ের মধ্যে অগ্নি পোষণ করিয়া রাখাও তো বড় সহজ নহে। বিশেষ পূর্ব্বদিনে হ্যারিসন রোডের রহিম খাঁ কাবুলি তাহার ভেলভেটের উপর জরির কাজওয়ালা ফতুয়াটা তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিল। সে কম্পিত হৃদয়ে চাইমুর প্রাঙ্গণে অগ্রসর হইল। তাহাকে দেখিয়া আনন্দে চীনা যুবতী হাসিল। তাহার মুখের চতুর্দ্দিক হইতে মাংস কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহার ছোট ছোট চক্ষু দুইটিকে একেবারে মুদিত করিয়া দিল। কাবুলী ভরসা করিয়া তাহার সেই মুখখানি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া সাহসে বুক বাঁধিল।

একটু গৌরচন্দ্রিকা গাহিবার জন্য জবরদস্ত বলিল—রূপি মাঙ্গতা ?

কৃতজ্ঞতার সুরে চাইমু বলিল—বহুৎ ছিলাম। আবি নি মাঙ্‌তা।

কাবুলী চুপ করিল। তখনও চীনাপাড়া সুষুপ্ত। প্রভাত মলয় বহুকষ্টে গড়ের মাঠ হইতে আসিয়া লালবাজার অবধি পৌঁছিতেছিল কিন্তু চীনাপাড়ার অট্টালিকার ব্যূহভেদ করিবার সুযোগ পায় নাই। ইডন উদ্যানে দুই একটা কোকিল ডাকিতেছিল, পুলিস কোর্টের ছাদে একটা ঘুঘু অতি করুণভাবে কাঁদিতেছিল, কিন্তু চীনাপাড়ায় বায়সের কা কা রব ব্যতীত অপর বিহঙ্গম স্বর শুনা যায় নাই। জবরদস্ত খাঁ চাইমুর বায়ুহীন প্রাঙ্গণে বসিয়া ঘামিতেছিল। তাহার হৃদয়ের ভিতর পুস্ত ভাষায় প্রেমের স্রোত বহিতেছিল কিন্তু সে স্রোতকে কিরূপে চীনারমণীর বোধগম্য হিন্দুস্থানীতে পরিণত করিবে প্রেমিক জবরদস্ত তাহাই ভাবিতেছিল। তাহার কপালের স্বেদ দেখিয়া চাইমু ছুটিয়া তাহাকে একখানা চিলের পালখের হাতপাখা আনিয়া দিল। কৃতজ্ঞ জবরদস্ত বলিল—'চাইমু পিয়ারে—'

চাইমু একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—কিয়া বোলতা হায় ?

জবরদস্ত বলিল—পিয়ারে—পিয়ারা—

চাইমু হাসিল। কাবুলীর সর্ব্বশরীরের ভিতর দিয়া তাড়িত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। চাইমু বুঝিল, কাবুলী পিয়ালা চাহিতেছে—চা পান করিবে। সে ইহা সৌভাগ্যের কথা মনে করিল। সে বলিল—পিয়ালা ?

কাবুলী জীবনে এত সুখ কখনও ভোগ করে নাই। সে তাহার উচ্চারণ অনুকরণ করিয়া বলিল—পিয়ালা! হাঁ পিয়ালা—ইন্‌শাল্লা তালা—

ততক্ষণে যুবতী ছুটিয়া গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গিয়াছিল। কাবুলী ঠিক বুঝিতে পারিল না কেন সে গৃহে প্রবেশ করিল। সে ভাবিল—লজ্জায় যুবতী ওরূপ করিতেছে—লজ্জাই স্ত্রীলোকের প্রধান সৌন্দর্য্য।

তখনই যুবতী বাহিরে আসিল। ঘরে দিয়াশলাই নাই। কাবুলী বলিল—পিয়ালা, জানকি রোসনি—

চাইমু তাহাই চাহিতেছিল। সে বলিল—হাঁ, রুস্‌নি, বাতি—

প্রেমিক জবরদস্ত বলিল—হাঁ রস্‌নি, বাতি, মেরি ছরি—

চাইমু অবশ্য অতটা বুঝিল না। তবে জবরদস্ত যে বুঝিয়াছে তাহার আলোকের আবশ্যক তাহাতে সে জবরদস্তকে খুব বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচনা করিল। দিয়াশলাই গ্রহণ করিবার জন্য সে তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। আর কি জবরদস্ত তাহাকে ছাড়ে? সে এক হাতে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া নতজানু হইয়া বসিয়া অপর হস্তে আপনার উষ্ণীষ খুলিয়া যুবতীর পদতলে রাখিল। তাহার পর উপরে হাত তুলিয়া বক্ষে হাত দিয়া হিন্দী, পুস্তু, ফারসী নানা ভাষায় বকিতে লাগিল। চাইমু প্রথমটা বিস্মিত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইতে পারিল না। শেষে তাহার ভাবগতিক দেখিয়া সে ব্যাপারটা বুঝিল। শিশু ও স্ত্রীলোক প্রেমের নিদর্শন চক্ষে দেখে, ভাষায় ব্যক্ত হইবার বহুপূর্ব্বে তাহারা বুঝিতে পারে কে তাহাদের ভালবাসে। সুতরাং ফার্সী, পুস্তু বা হিন্দি না বুঝিলেও জবরদস্তের আবেগের প্রত্যেক বর্ণ চাইমু বুঝিয়া ফেলিল। সে কি করিবে বুঝিতে পারিল না, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সে চিত্রার্পিতের মত সে স্থলে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪)

লাইফুঙ চীনা ক্রোধে ফুলিতেছিল। কলিকাতায় আসিয়া গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে সিচং মিউ নামক চৈনিক সমিতিতে বসিয়া দুই চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকটে যখন সে শুনিল যে তাহার যুবতী কন্যা স্বজাতির সাহায্য উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের সুপরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া একটা ঘৃণিত কাবুলীর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে, তাহাকে প্রাঙ্গণে বসিতে দেয়, তাহার সহিত হাসিয়া গল্প করে, তখন তাহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তাহার

স্বজাতীয় বন্ধুবর্গ যেরূপ ভাবে তাহার কন্যার কাবুলী-প্রীতি বর্ণনা করিল তাহা হইতে সে স্পষ্ট বুঝিল যে কন্যার কোনও অবৈধ ব্যবহার ইহারা তাহার মঙ্গলের জন্য গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। এখন গৃহে যাইলে বোধ হয় কাবুলীকে তথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাদের মধ্যে একজন তাহাকে ইঙ্গিতে তাহাও বলিল।

লাইফুও ভাবিয়াছিল সমিতিগৃহে একটু অহিফেন সেবন করিয়া গৃহে ফিরিবে। কিন্তু বন্ধুদের কথায় তাহার আর বিশ্রাম করা হইল না। সে সদলবলে গৃহাভিমুখে চলিল।

বাড়িতে ঢুকিয়া লাইফুও সেই দৃশ্য দেখিল। যুবতী দাঁড়াইয়া, কাবুলী জানু পাতিয়া এক হাতে তাহার দক্ষিণ হস্তটি ধরিয়াছে অপর হস্ত এক একবার নিজের বক্ষদেশে রাখিতেছে আর এক একবার উপরদিকে ভগবানের প্রতি তুলিতেছে। এ দৃশ্যে লাইফুওের দেহে সিংহবিক্রম আসিল। তাহার বন্ধুবান্ধব ঈর্ষাপরবশ হইয়া যে কথার মিথ্যা আভাস দিয়া গর্ব্বিতা চাইমুর বিপক্ষে তাহার পিতাকে উত্তেজিত করিতেছিল, সে কথা সত্য বুঝিয়া আশাতিরিক্ত ফল পাইল। পরক্ষণেই তাহাদের স্বজাতিগৌরবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই নারকী জীবটার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা কৃতসংকল্প হইল। সুতরাং সে বাটিতে তাহাদের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে জবরদস্ত বুঝিল যে একেবারে পাঁচ সাতজন চীনা বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে টিপিয়া ধরিয়াছে। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদিগকে আপনার হস্তপদ বাঁধিতে দিল। একজন চীনা কোথা হইতে একটা বাক্স আনিয়া সেই স্থানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একগোছা নোট জবরদস্তের পকেটে ভরিয়া দিল। তাহার পর তাহারা তারস্বরে 'চোল, চোল' 'লুট্, লুট্' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বিস্মিতা চাইমু বলিল—ফু সাট (হাঃ ভগবান।)

(৫)

জমাদার রামচরিত্র সমভিব্যাহারে কলুটোলার ইনস্পেক্টার সাহেব যখন লাইফুও চীনার বাটীতে দস্যুতা মামলার সরেজমিনে তদন্ত করিতে আসিলেন তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। জমাদার রামচরিত্রের নিষেধ সত্বেও নানাজাতীয় লোক লাইফুওের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। চীনাম্যান, মুসলমান, বাঙ্গালী এবং জেনচুয়া, এগুয়া, গোমেজ, ডি সুজা প্রভৃতি চীনাপাড়ার ফিরিঙ্গী অধিবাসিগণ দলে দলে এই ভীষণ ডাকাতীর তদন্ত দেখিতে আসিয়া-

ছিল। সকলেই একদৃষ্টে অগ্রবর্ত্তী পুলিস ইনস্পেক্টারের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহাকে লাইফুঙ ভাঙ্গা বাক্স দেখাইতেছিল, কিরূপে সেই স্থলে তস্করকে হাতে হাতে ধরিয়াছিল তাহা বুঝাইয়া দিতেছিল।

অভাগিনী চাইমু সমস্তদিন ঘরের মধ্যে পড়িয়া কাঁদিতেছিল। কি লজ্জা! কি ঘৃণা! পিতৃসন্দর্শনে সে কোথায় পিতাকে তিরস্কার করিবে, না তাহার পিতা বলিল—'নারকী! এই কুকুরটার ব্যবস্থা করিয়া তোর শাস্তির বিধান করিব।' তাহার পিতা একবার তাহার কথা শুনিল না, তাহার দোষগুণ বিচার করিল না, তাহার মাথার উপর একটা কলঙ্কের ডালি তুলিয়া দিল। কতকগুলা চীনাভূতের পরামর্শে একটা নিরপরাধ ব্যক্তিকে দস্যুতার অপবাদ দিয়া পুলিসের হাতে দিয়া পিতা অধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিল। যুবতী ভাবিল আমি যথাসম্ভব হিন্দুস্থানী ভাষায় কাবুলির নির্দ্দোষিতার সাক্ষ্য দিব। পরক্ষণেই আবার তাহার পিতার রোষদীপ্ত নয়নযুগল তাহার মনে উদিত হইল। যুবতী শিহরিয়া উঠিল।

যখন সেই মিশ্র জনতা আসিয়া তাহার প্রাঙ্গণে জমিল, তখন যুবতীর হৃদ্‌কম্প হইল। তাহার পিতা একটা দীপহস্তে পুলিস কর্ম্মচারিকে সকল কথা বুঝাইতেছিল। সকলের দৃষ্টি সেইদিকে। জবরদস্ত খাঁর হস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ, কোমরে একটা দড়ি বাঁধা, দড়ির এক প্রান্ত একটা পাহারাওয়ালার হস্তে ছিল। সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া লাইফুঙের আবেগপূর্ণ এজাহার শুনিতেছিল। জবরদস্ত ভিড়ের এক প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেদিকটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। নিমেষমধ্যে চাইমু গৃহ হইতে একটা বৃহৎ ছুরিকা বাহির করিয়া নিঃশব্দে জবরদস্তের কোমরের রজ্জু কাটিল। তাহার পর তাহার পৃষ্ঠে হাত দিল। জবরদস্ত শিহরিয়া উঠিল। তাহার ইঙ্গিতমত জবরদস্ত খাঁ নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। দুইটা অন্ধকার গলি পার হইয়া পিছনের দরজা দিয়া তাহারা পথে বাহির হইল। তাহার পর চাইমু নিঃশব্দে অন্ধকারময় সংকীর্ণ পথ দিয়া একটা জনশূন্য চামড়ার গুদামে প্রবেশ করিল। নির্ব্বাক জবরদস্ত মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল। রাশি রাশি দুর্গন্ধময় গোচর্ম্মের মধ্যে তাহারা অদৃশ্য হইল। তখনও কাহারও মুখে কথা নাই। শেষে যখন চাইমু একখানি ক্ষুদ্র উকা বাহির করিয়া জবরদস্তের হাতকড়ি কাটিয়া তাহার ভুজযুগল বন্ধনমুক্ত করিল, তখন জবরদস্ত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিল ও বলিল—আমার উদ্ধারকর্ত্রী! আমার হুরী! আমার

জীবনপ্রদীপ। লৌহশৃঙ্খল কাটিয়া তুমি আমায় (সিরাজল জনজির) স্বুবর্ণ শৃঙ্খলে বন্ধন করিলে।

তাহারা চর্ম্মান্তরাল হইতে রাস্তায় নানারূপ শব্দ শুনিতে পাইল। দুই একজন লোক চামড়ার গুদামে প্রবেশ করিয়াও একবার এদিক ওদিক দেখিয়া গেল। শেষ ভোর রাত্রে শ্রান্ত প্রহরী দলের অজ্ঞাতে তাহারা সে পল্লী ছাড়িয়া পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল।

যে কবি একদিন গাহিয়াছিলেন,—

"এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভালো ;
সে মরণ স্বরগ সমান।"

আমাদের সেই কবি, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার বৈশাখের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথির জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে 'চাঁদের আলো' দেখিতে দেখিতে চির-নিদ্রার অঙ্কে শয়নলাভ করিয়াছেন। সাহিত্যের পূর্ণচাঁদ যেন আকাশের চাঁদের অঙ্গে সহসা দেহ মিশাইল! ঐ গানের মধ্যে কবির যে মর্ম্মগীতি স্পন্দিত হইতেছে, তাহা আজ সার্থক হইল!

ছয়মাস পূর্ব্বে, আর একদিন, দ্বিজেন্দ্রলাল 'পতিতোদ্ধারিণি স্বুরধুনি'কে তাঁহার প্রার্থনা জানাইয়া গাহিয়াছিলেন,—

"পরিহরি' ভবসুখদুঃখ যখন মা, শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে,
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে,—
মা ভাগীরথি! জাহ্নবি! স্বুরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে!"

এ সাধও দ্বিজেন্দ্রলালের অপূর্ণ থাকিয়া যায় নাই। তিনি যখন 'অন্তিম শয়নে শায়িত', তখন মা ভাগীরথী অমৃত বরিষণে তাঁহার অঙ্গ স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দু হিসাবে এমন মরণত 'স্বরগ সমান'ই বটে ; কিন্তু আমাদের— আমাদের কি হইল! কি অমূল্য রত্ন আমরা হারাইলাম!

১৩১৮ সালের শেষ ভাগ হইতে বঙ্গদেশ মনীষীশূন্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গীয় সারস্বতকুঞ্জে মরণ যেন কঠোর হৃদয় কিরাতের মত তাহার অব্যর্থ

শরসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই বৎসরাধিক কালের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, এমন মহা ক্ষতি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। এই অল্পকালের মধ্যে বাঙ্গালার দুইটি শ্রেষ্ঠ কবির মধুমাখা কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য নীরব হইল। এই দুইটির মধ্যে একটি গিরিশচন্দ্র, এবং অপরটি দ্বিজেন্দ্রলাল। দুইজনের মনীষাই নাটক গড়িতেছিল। এই মনীষীদ্বয়ের তিরোভাবে বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্য একেবারে ম্লান হইয়া গেল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য!

নীরবতাই যে শোকের ভাষা, একথা অন্যত্র সত্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এক্ষেত্রে নহে। যিনি কীর্ত্তি-মন্দিরের উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তাঁহার জন্য দেশবাসীর যে শোক, সে শোকের অভিব্যক্তি তাঁহার কীর্ত্তি-কথা-কীর্ত্তনে;—নীরব ভাষায় নহে। নীরবতা এ শোকে অশোভন বলিয়াই মনে করি। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালায় এক মহা কীর্ত্তিমান্ পুরুষ। তাঁহার কীর্ত্তি-কথা কহিবার এই ত উপযুক্ত সময়! শোকে তাহাই ত সান্ত্বনার উপায়!

মধুসূদনকে যেমন বাঙ্গালার মিল্টন, নবীনচন্দ্রকে যেমন বাঙ্গালার বায়রণ প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে, সে হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার কি? তাহা জানি না। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার প্রতিভা-প্রসূত যে কয়টি ফল আমরা উপহার পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই অসামান্য, অনন্যসাধারণ।—তাহাই তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। দ্বিজেন্দ্রলাল—বাঙ্গালার দ্বিজেন্দ্রলাল। ইহার চেয়ে অধিক গৌরব, ইহার চেয়ে আর তাঁহার ভাল পরিচয় জানি না।

দ্বিজেন্দ্রলাল মাতৃভাষার এক পরম নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। লেখা জিনিষটাকে ছেলে খেলা মনে করিয়া কখনও তাঁহাকে কাগজের উপর যথেচ্ছ কালীর আঁচড় কাটিতে দেখি নাই। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা—কঠোর সাধনার এক চূড়ান্ত উদাহরণ। সখের হিসাবে সাহিত্য-সেবা করা তিনি পাপ বলিয়াই মনে করিতেন। সেইজন্য, তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে আন্তরিকতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মাতৃভাষার সেবা ও মাতৃসেবা তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। তাই তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে শুনি,—

"পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি;
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাবো তোমার চরণ দুটি;
চাহি না ক কিছু, তুমি মা আমার, এই জানি, কিছু নাহি জানি আর;
—তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ।"

এই সঙ্গীতের ভিতর দ্বিজেন্দ্রলালের যে শুধু সাহিত্য-সাধনার পরিচয় চিত্রিত

আছে, তাহা নহে। ইহার প্রতি ছত্রে বঙ্গভাষায় প্রতি কবি-হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি অকৃত্রিম ভালবাসা স্পন্দিত, দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্র-চরিত্রের মূলসূত্র,—তাঁহার মৌলিকতা। তাঁহাকে জীবনে কখনও কাহারও অনুকরণ করিতে দেখি নাই। সাহিত্যাকাশে তিনি যে সময়ে সমুদীয়মান, মধুসূদন সে সময়ে পরলোকগত। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সে সময়ে জীবিত থাকিলেও, কবিবর বিহারীলালের শিষ্যবর্গের নবোদয়ে তাঁহাদের 'জারিজুরী' তখন কমিয়া আসিতেছিল। হেম-নবীনের অনুকারিগণ* তখন জল বুদ্বুদের মত উঠিতেছিলেন আর কাল-সাগরের জলে মিশাইতেছিলেন। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য কাহারও প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া, কাহারও মতামতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বিত ক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিলেন। এই নূতন পথে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রতারিত হন নাই। তাঁহার 'হাসির গানে'র নূতনতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালী—তাঁহার 'হাসির গান'কে সাহিত্যের আসরে সাদর অভিবাদনের সহিত আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গ সাহিত্যে যে শুধু একটা অপূর্ব্ব রূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। বাঙ্গালার কাব্য-ভাষায় তিনি একটি বিশেষ শক্তি-সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের কাব্য-ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী করিয়া তুলিবার আশায় যে সকল বঙ্গ কবি নিজেদের প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই সকল কবির মধ্যে মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলালের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ, ইঁহারা দুই জনে বঙ্গভাষার যে অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সে শক্তির কথা কেহ কখনও ভাবে নাই বা আশা করে নাই। এই মৃদু মোলায়েম ভাষায় যে দুন্দুভি বাজাইতে পারা যায়, মধুসূদনের পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিত না বা বিশ্বাস করিত না। এই কৃশাঙ্গী ভাষার ভিতর হইতে যে 'ডমরুর ঝর্ঝর রব' বাহির করা যাইতে পারে, একথা দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না। বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীতে আমরা যে তেজ, যে পৌরুষ (Masculinism) দেখিতে পাই ; সেই তেজ, সেই সজীবতা, সেই পৌরুষ, দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ভাষার সাহায্য না লইয়া বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। ইহাই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

বঙ্গভাষায় এই পৌরুষের আভাস যদিও বিবেকানন্দের 'বীরবাণী'তেই সর্ব্বপ্রথম আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু জনসাধারণে তাহার সংবাদ রাখে না। বিবেকানন্দের হস্তে যাহার উন্মেষ হইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-প্রভাবেই তাহা বিকশিত হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষাকে যেমন নিজের মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলেন, তেমনই তিনি তাঁহার ভাষার উপযোগী ছন্দেরও রচনা করিয়াছিলেন। সে ছন্দ কোন দেশ-প্রচলিত ছন্দ নহে, তাঁহার মনগড়া ছন্দ। এই ছন্দ তাঁহার ভাষার সহিত চমৎকার 'খাপ' খাইয়াছে। অনেক কবিতায় তিনি অক্ষরের সংখ্যার উপর নির্ভর না করিয়া মাত্রা (Syllable) দ্বারা ছন্দ পরিমিত করিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে তিনি মিতাক্ষরিক চতুর্দ্দশপদী কবিতা না লিখিয়া মাত্রিক দশপদী কবিতা লিখিতেন। এই দুঃসাহস কোন প্রতিভাহীন কবির পক্ষে ধৃষ্টতা হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-প্রভাবে এ সমস্ত কার্য্য যেন বিনা আয়াসে সুসম্পন্ন হইয়া যাইত। কি ভাষা সংগঠনে, কি ছন্দো রচনায় তাঁহার চেষ্টা সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ। বঙ্গীয় লেখকগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে দ্বিজেন্দ্রলালের সমান দুই একজন ছাড়া বড় বেশী কাহাকেও দেখি নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা-রীতির একপ্রকার বেশ খোলাখুলি সরল ভাব আছে, যাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা কবির স্বভাব হইতে উৎপন্ন। কবির প্রতি ভাব-ভঙ্গীতে, আচার-ব্যবহারে যে তেজস্বিতা, সরলতা ও সাহসিকতা প্রকাশ পাইত, সেই তেজস্বিতা ও সরলতা তাঁহার রচনার ভিতর হইতে যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, দেখা যায়। আত্মস্বভাবের ছায়া থাকায়, উহা যেমন তাঁহার কাব্যের একটা গুণের কারণ হইয়াছে, তেমনই উহা দোষের কারণও হইয়াছে। তিনি তাঁহার নাটকান্তর্গত পাত্র পাত্রী হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার ছোট বড়, স্ত্রী ও পুরুষ প্রায় প্রত্যেক চরিত্রেই তাঁহার আত্মপ্রকৃতির বিশেষরূপ ছাপ পড়িয়াছে। জীবনে ও সাহিত্যে এমন ঐক্য অতি অল্প কবির মধ্যেই দেখিয়াছি।

"পরের দুঃখে কাঁদতে শেখা—তাহাই শুধু চরম নয়
মহৎ দেখে কাঁদতে জানা—তবেই কাঁদা ধন্য হয়!"

এই উচ্চভাবে তাঁহার নাট্যকাব্য ওতঃপ্রোত। এই মহতী শিক্ষায় তাহা বিভাসিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের আরও একটি বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

সে উপকার, আমরা তাঁহার সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলি হইতে পাইয়াছি। বঙ্গদেশে যখন কবিতা ও হেঁয়ালীর ব্যবধান ক্রমশঃ লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল, সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু স্বকীয় সুন্দর ও সুস্পষ্ট কবিতায় নহে, যুক্তিপূর্ণ ও সুতীব্র সমালোচনার দ্বারা তাহা শাসন ও সম্মার্জ্জন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি বাঙ্গালীর 'তন্দ্রা বিজড়িত কাব্য উপভোগে'র (Passive enjoyment) মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ উপভোগের (Intelligent appreciationএর) পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। *

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব আজ সমগ্র দেশে প্রসৃত হউক। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে খুব বেশী না হইলেও গুণে অতুলনীয়। বাঙ্গালী তাহা হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিবে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

বিলাপ।

১

সহসা এক ভীষণ ঝঞ্ঝা এসে
নিভিয়ে দিলে মোদের সাঁজের বাতি;
আলোর থেকে মোর আঁধারে শেষে
রইল জেগে ভীষণতর রাতি।

২

তুই ছিলি সেই শান্ত সাঁজের আলো,
ছিলি রে তুই কান্ত নয়ন-তারা—
সে দুর্দ্দিনে তোরে হারিয়ে ফেলে
বেড়াই যেন ফণী মণি-হারা।

৩

স্বর্গ ঝরা ওরে জীবন-সুধা
তোর অভাবে জগৎ ভরা বিষে;
শ্বাসে শ্বাসে খসছে বুকের বাঁধন
ফোঁস ফোঁসিয়ে বেড়াই দিশে দিশে।

৪

ছিলিরে তুই মায়ের কালো মাণিক,
প্রভায় ক'রে কুটীরখানি আলো;
কোথায় গেলি তুই রে স্নেহের জ্যোতিঃ!
করে মাতৃহৃদয় নিবিড় কালো।

৫

বাপের বুকে শ্যামল মরুদ্বীপে—
ছিলি কতই সাধের কল্পতরু—
তোর বিহনে জীবন মরীচিকা—
বাষ্প লুপ্ত শোক দগ্ধ মরু!

শ্রীরসময় লাহা।

---

* এ বিষয়ে সাহিত্য-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের নিকটও আমরা ঋণী।—লেখক।

স্বাভাবিক নির্ব্বাচন।

জীবজগৎ নানা জাতীয় জীবে বিভক্ত। এক একটি জাতি, আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্ব্বে জগতে বহু প্রকারের জীব বাস করিত; এখন বরফের মধ্যে বা মৃত্তিকাতলে তাহাদের কঙ্কালমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পূর্ব্বে যে সকল শ্রেণীর জীব পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যাইত না, এখন সেই সকল জীব পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। কত নূতন রকমের প্রাণী পৃথিবীতে বাড়িতেছে, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? আবার ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যে সব নূতন জীবশ্রেণী বাস করিবে তাহাদের আকার-প্রকার আমাদের কল্পনার অতীত। মনুষ্যের নির্ব্বাচনের ফলে জগতে কিরূপে নানা রকমের জীব উদ্ভূত হইতেছে, তাহা আমরা গত মাসের 'অর্চ্চনা'য় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য, মনুষ্য যাহা করিতে পারে স্বভাবের নিয়ম তাহা আরও উত্তমরূপে সম্পাদিত করিবে তাহা বিচিত্র নহে। স্বাভাবিক কার্য্যের গতিতে জগতে নানা-রকম পশুপক্ষী জীবজন্তুর সৃষ্টি হইতেছে, এক শ্রেণীর জীব হইতে অপর শ্রেণীর জীবের উদ্ভব হয়। মানুষে যে নিয়মে গৃহপালিত জীবের ভিতর হইতে বিশেষত্বযুক্ত জীব নির্ব্বাচিত করিয়া নূতন শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করে, স্বভাবও সেই নিয়মে নির্ব্বাচন দ্বারা ঐরূপে জীবশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই নির্ব্বাচন-শক্তি কিরূপে স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করে, এ প্রবন্ধে আমরা তাহার পরিচয় দিব।

পুরাকালে পাশ্চাত্যে ধারণা ছিল যে, আমরা ইতস্ততঃ যে সকল পশুপক্ষী কীট পতঙ্গের জাতি দেখিতে পাই, ভগবান সৃষ্টির প্রাক্কালে সেই সকল জাতীয় জীব নির্ম্মাণ করিয়া জগতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাদেরই সন্তান-সন্ততি ক্রমশঃ জগৎকে জীবজন্তুতে পূর্ণ করিয়াছে। কুকুরজাতি নেকড়ে বাঘ জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বা লক্কা পায়রা কেলে গোলা পায়রা হইতে সৃষ্ট হইয়াছে,—এ সকল ধারণা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গ্রীক দার্শনিক পাইথেগোরস হিন্দুদের মত বলিয়াছিলেন বটে যে, আত্মা অবিনশ্বর, আত্মা কুকুর বিড়াল ছাগল ভেড়ার দেহের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া শেষে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে। কিন্তু তিনি ডারবিন্, স্পেনসার, হাক্স্লের মত জীবজন্তু নাড়িয়া চাড়িয়া শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া বলেন নাই যে, একজাতীয় জানোয়ার হইতে অপর জাতীয় জানোয়ার জন্মগ্রহণ

করে। অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের ফলে ইতর শ্রেণীর জীব হইতে ক্রমে বানরের মত বুদ্ধিমান জন্তু আবির্ভাব হইয়াছে এবং বানর হইতে ক্রমশঃ বুদ্ধি-বিদ্যাভিমানী মনুষ্য জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

এক শ্রেণীর জীব হইতে অপর শ্রেণীর জীব উৎপন্ন হইতে পারে,—এ কথাটা প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া বুঝিলেও, ঠিক কি নিয়মে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইয়ুরোপের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী তাহা অভ্রান্তরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে ইংরাজ বিজ্ঞানবিদ্ ডারবিন সাহেবের 'নির্ব্বাচন-বাদ' এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বলিয়া ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে গৃহীত হইয়াছে।

জীবের শ্রেণীবৃদ্ধিসম্বন্ধে ডারবিন সাহেব তাঁহার নির্ব্বাচন-বাদ ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লামার্ক (Lamarck) সাহেবের মত সকলে একপ্রকার গ্রহণ করিয়াছিল। এ প্রবন্ধে আমরা লামার্ক সাহেবের 'পরিবর্ত্তন-বাদ' বা Transmutation Theoryরও সামান্য পরিচয় দিব।

সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে মাংসপেশীর উন্নতি হয়। আবার ব্যবহার না করিলে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এ কথার যাথার্থ্য আমরা নিত্যই অনুভব করি। কামার ~~সর্ব্বদা~~ মুদ্গর ব্যবহার করে বলিয়া তাহার যেমন হাতের জোর আছে, আমরা কলম পিসিয়া হাতের মাংসপেশীগুলিকে সে রকম সবল করিতে পারি না। আমাদের দেশে এক রকম ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ঊর্দ্ধবাহু থাকিয়া হস্তকে একেবারে অবশ করিয়া ফেলে। ডাক-হরকরার পায়ের যেমন জোর হয়, ঘৃত-দুগ্ধ-মৎস্য-মাংস-পুষ্ট বিলাস-বর্দ্ধিত জমিদার-তনয় সর্ব্বদা গাড়ী-পালকি চড়িয়া বেড়ায় বলিয়া তাহার পায়ে সে রকম জোর থাকে না। কাকের রূপও নাই, গুণও নাই। তাহার উপর তাহার কণ্ঠস্বর এতদূর বিরক্তিকর যে, জগতের সকলেই কাকের শত্রু। কাককে সেইজন্য সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়, প্রতিক্ষণে আশে পাশে দেখিতে হয়। তাই কাকের দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর, কাক চতুরের শিরোমণি।

অভ্যাসে অঙ্গের স্ফূর্ত্তি হয়, অনভ্যাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অকর্ম্মণ্য হয়; এই সত্য আবিষ্কার করিয়া লামার্ক সাহেব সৃষ্টি বৈচিত্র্যের একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অধ্যবসায় ও অবিশ্রান্ত চেষ্টার দ্বারা এক শ্রেণীর জীব অপর শ্রেণীর জীবে পরিণত হয়। ধরুন, এক শ্রেণীর পক্ষী মৎস্যাহারী অথচ তাহারা হাঁসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইতে পারে না। পূর্ব্বে তাহাদের পাগুলি হয় ত ছোট ছিল। সুতরাং একেবারে জলাশয়ের ধারে যে মাছগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িত,

তাহাদের ধরিয়া খাইয়া তাহারা জীবন ধারণ করিত। ক্রমশঃ মাছগুলা সতর্ক হইয়া গেল। তাহারা স্বল্পজলে পুকুরধারে আসা ছাড়িয়া দিল। তখন সেই ক্ষুদ্র পদবিশিষ্ট মৎস্যাহারী পক্ষীকে 'বককুলীরয়ো'র গল্পের বকের মত জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল। সে বুঝিল যে, তাহার স্বচ্ছন্দাহারের প্রধান অন্তরায় তাহার সেই খর্ব্ব পদদ্বয়। সে দেখিল, এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামে তাহার বাঁচিবার একমাত্র উপায় পদদ্বয়কে বর্দ্ধিত করা। কাজেই সে পা ছড়াইয়া পদদ্বয় লম্বা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরুষানুক্রমে এই চেষ্টা চলিতে লাগিল। ব্যায়ামের দ্বারা পা লম্বা করিবার চেষ্টা করিয়া প্রথম পক্ষী যতটুকু কৃতকার্য্য হইল, সে কর্ম্মফলটুকু তাহার সন্তানগণ উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে প্রাপ্ত হইল। আবার তাহাদের চেষ্টার ফলে এবার সেই জাতীয় জীবের পদদ্বয় আরও একটু বর্দ্ধিত হইল। এইরূপে ক্রমশঃ সেই খর্ব্বপদবিশিষ্ট মৎস্যভোজী জীব লম্বপদবিশিষ্ট পক্ষীতে পরিণত হইল। অঙ্গের পরিবর্ত্তন (Transmutation) দ্বারা জগতে এক নূতন শ্রেণীর জীব সৃষ্ট হইল।

বলা বাহুল্য, এ মত আজকাল কেহ অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে না। আমরা জানি "ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবৎ পাঠ্যতে বকঃ"। জীবের মনে একটা অসম্ভব বাসনা হইতে পারে, বকের মনে টিয়া পাখীর মত রাধাকৃষ্ণ বুলি বলিবার সাধ হইতে পারে। কিন্তু জগতের জীবন-সংগ্রাম যে রকম ভীষণ, তাহাতে বক মহাশয়কে ধৈর্য্য ধরিয়া বংশপরম্পরানুক্রমে পড়িবার সখ রাখিতে গেলে তাহাকে কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে। বাজারের এক দোকানদার যখন দেখে যে সস্তায় দ্রব্য বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন যে দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দেয়; কিন্তু জিনিসের সঙ্গে ভেজাল মিশাইতে আরম্ভ করে। খর্ব্বপদবিশিষ্ট মৎস্যাহারী পক্ষী যখন দেখিবে যে, তাহার পক্ষে মৎস্য ধরা অসম্ভব, তখন সে দীর্ঘপদ হইবার জন্য ব্যায়াম না করিয়া মৎস্য ছাড়িয়া পুকুর-ধারের পোকা ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করিবে, শেষে হয়ত পোকার অভাবে সে মাঠে ধান খাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের জাতির মধ্যে যেগুলার শরীরে পোকা বা ধান সহ্য হইবে সেইগুলাই বাঁচিয়া যাইবে, বাকি গুলার ধ্বংস হইবে। এক প্রকার ধান্যাহারী বকের সৃষ্টি হইবে বটে কিন্তু সে সৃষ্টি ব্যায়ামের দ্বারা বা ইচ্ছার দ্বারা হইবে না, তাহা নির্ব্বাচনের দ্বারা হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষ নির্ব্বাচনের দ্বারা জীবের শ্রেণী বৃদ্ধি করে এবং

প্রকৃতিও বিশেষত্ব বাছিয়া নূতন শ্রেণীর জীবের উদ্ভাবন করে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও মানুষের নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যের মূলে একটা বিষম পার্থক্য বিদ্যমান আছে। মানুষ নিজের সুখের জন্য, নিজের উপকারিতার জন্য জীব-জগতে বৈচিত্র্য ঘটাইয়া থাকে। প্রকৃতি সেই জীবের উপকারের জন্য, তাহাকে জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত করিবার জন্য জীবের নূতন শ্রেণী গঠন করে। মানুষ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ঘটাইয়া অনেক সময় জীবকে অধঃপতিত করে, স্বাভাবিক নিয়মে যে নূতন শ্রেণী সৃষ্ট হয় সে শ্রেণীর জীব পূর্ব্বপুরুষাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত হয়। দ্রুতগামিতা এবং শৃঙ্গযুদ্ধে নিপুণতা যদি অজ-জাতীয় জীবের জীবন-সংগ্রামের উৎকৃষ্ট গুণ হয়, তাহা হইলে 'বনবকৃরি' হরিণকে গ্রাম্য ছাগলে পরিণত করিয়া মানুষ অজজাতির অধঃপতন সাধিত করিয়াছে। আবার চাতুরী যদি বায়সের প্রধান গুণ হয় তাহা হইলে দাঁড়কাক হইতে সহরের কাক উন্নত জীব, কারণ সহরের কাক দাঁড়কাক অপেক্ষা চতুর। দাঁড়কাকের মত কর্কশ জীবের পক্ষে মনুষ্যালয়ে বাস করা দুরূহ। স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে সহরের জন্য সহরের কাক সৃষ্ট হইয়াছে। দাঁড়কাককে সহরের বাহিরে পলাইতে হইয়াছে।——.

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কারণ জীবকে জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত অস্ত্রভূষিত করা অর্থাৎ যখন এক জাতীয় জীব জীবন-সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত হইয়া যায় এ জগতে তাহাদের পক্ষে বাস করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাদের মধ্যে যে কয়জনের একটু বিশেষত্ব আছে সেই কয়জনই বাঁচিয়া যায় এবং যাহারা বিশেষত্ব-বর্জ্জিত তাহারা ধ্বংস-কবলিত হয় কিম্বা নূতন স্থানে গিয়া নূতন উপায়ে প্রাণধারণ করিতে থাকে। এই এক জাতীয় দুই প্রকার জীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। যাহারা বিশেষত্বযুক্ত তাহারা সেই বিশেষত্বটুকু সন্তান-সন্ততিকে দিয়া যথাক্রমে এই পার্থক্যের গণ্ডী বাড়াইয়া যায়। জগতে নূতন জীবের সৃষ্টি হয়।

আমরা পূর্ব্বে লামার্ক সাহেবের পরিবর্ত্তনবাদ বুঝাইবার সময় যে দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা লইয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, স্বভাবতঃ কিরূপে এক শ্রেণীর জীব হইতে নূতন শ্রেণীর জীব জন্মিতে পারে। পুকুর-ধারে স্বল্পজলে মাছেরা চলাফেরা বন্ধ করিল বলিয়া তাঁহার মতে খর্ব্বপদবিশিষ্ট মৎস্যভোজী পক্ষী লম্বপদ হইয়া এক নূতন জাতি গঠন করিয়াছিল। এ সিদ্ধান্তে ডারবিন সাহেবের মতেও উপনীত হওয়া যায়। কেবল উভয়ের প্রণালী স্বতন্ত্র। লামার্ক

বলিবেন, অনুশীলন দ্বারা সেই পক্ষী পদদ্বয়কে বর্দ্ধিত করিবে। ডারবিন বলিবেন, নির্ব্বাচনের দ্বারা লম্বপদ পক্ষীর সৃষ্টি হইবে। যখন সেই পক্ষীশ্রেণীর মধ্যে মৎস্যাহার দুর্লভ হইবে, তখন তাহাদের মধ্যে যেগুলা অপেক্ষাকৃত লম্বপদ তাহাদের একটু সুবিধা হইবে। স্বভাবে এ রকম প্রায়ই হয়। এক মাতার সন্তানকুলের মধ্যে পাঁচটি সন্তান পাঁচ রকমের আকৃতি লইয়া জন্মিয়া থাকে। এক একটা সন্তান আবার একটু বিশেষত্বযুক্ত হয়, আমাদের দৃষ্টান্ত-বর্ণিত বিহঙ্গম-কুলে যদি কতকগুলা অপেক্ষাকৃত লম্বপদ পক্ষী জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহা-দের পক্ষে একটু জলে নামিয়া মাছ ধরিয়া খাইবার সুবিধা হইবে। সেই পাখীগুলা মৎস্যাহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে, বাকীগুলা কতক অনাহারে মরিবে, কতক অপর রকম খাদ্যে দেহরক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। এই অপেক্ষাকৃত লম্বপদ-গুলার সন্ততির মধ্যে যেগুলা আবার আরও লম্বপদ হইবে সেগুলার আরও সুবিধা হইবে। তাহাদের জাতির মধ্যে সেইগুলাই শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কতকগুলা বেঁটে পাখী বিনষ্ট হইবে। এইরূপে আপনাআপনি বাছাই হইতে আরম্ভ হইবে। এনকন ভেড়া লইয়া আমেরিকার কৃষক যাহা করিয়াছিল, স্বভাবতঃ সেই নির্ব্বাচন কার্য্য হইতে আরম্ভ হইবে; তাহার ফলে জগতে এক নূতন শ্রেণীর জীব সৃষ্ট হইবে।

এ দৃষ্টান্তে বুঝা গেল স্বভাবতঃ নির্ব্বাচন কার্য্যের ফলে যোগ্যতম জীবগুলা বাঁচিয়া যায়, তাহার ফলে সেই জীব জীবন-সংগ্রামের জন্য উপযুক্ত অস্ত্রভূষিত হইয়া থাকে। এই জীবন-সংগ্রাম কি, ইহা কিরূপে জগতে কার্য্য করে, আমরা আগামীবারে সে তত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরে আবার স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের কথার পুনরুল্লেখ করিব।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

স্মৃতি।

হেরি যারে একবার প্রাণ, লভিয়াছে প্রেমের সন্ধান,
বিরহের চির ব্যবধানে কোথা সেথা বিস্মৃতির স্থান!
সূর্য্যমুখী নির্নিমেষ আঁখি—যে অবধি গগনে তপন—
ফিরে তার কিরণ সম্পাতে বিকশিত মুদিত নয়ন।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

অতীত ও বর্ত্তমান ঢাকা। *

ঢাকা বঙ্গের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ—উল্লেখযোগ্য স্থান। এক সময়ে ঢাকা মস্‌লিন বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঢাকা বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। কিন্তু পরে তথা হইতে রাজধানী মুরশিদাবাদ বা মুকৃহুদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ায় ঢাকার গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয়।

কহ্লণ-প্রণীত রাজতরঙ্গিণী পুস্তকে ঢাকার প্রাচীনেতিহাস-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত আছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য ঢাকায় শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন—বিক্রমপুর তাহার প্রমাণ।

পাল ও সেন বংশের পূর্ব্বে বঙ্গে কোন রাজা ছিল না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকে স্ব স্ব বাসভূমির সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ শাসন করিতেন। †

১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ জয় করেন। মোগল রাজত্বের প্রথমাংশে ঢাকার পনর মাইল দূরে অবস্থিত সোণার গাঁ বা সুবর্ণগ্রাম কতিপয় পাঠান রাজার বাসস্থান ছিল। সম্ভবতঃ এই সুবর্ণগ্রাম হইতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজামসা পারশ্য-কবি হাফিজের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ‡ সুতরাং মোগলেরা রাজধানী স্থাপন করিবার পূর্ব্বে ঢাকা যে একটি বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও উল্লেখ-যোগ্য স্থান ছিল, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঢাকায় ৫২টী বাজার ও ৫৩টি গলি ছিল। স্থানীয় প্রচলিত গল্প এইরূপ। ঢাকায় বাঙ্গালা বাজার নামে একটি স্থান আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টেলার বলেন, ঢাকাই ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ কর্ত্তৃক অভিহিত বাঙ্গালা। এই সমস্ত পর্য্যটক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। §

---

* এই প্রবন্ধটী প্রসিদ্ধ East and West নামক মাসিকপত্রে প্রকাশিত Dacca Past and Present নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।

† Cunningham's Archaeological Survey of India, Vol. XV. 1882.

‡ Journal of the Bengal Asiatic Society, Vol XLIII.

§ Ibid.

কানিংহাম বলেন যে, ভার্টোমেনাস্ খৃষ্টীয় ১৫০৩ অব্দে বঙ্গে আগমন করেন, তিনি বাঙ্গালাকে একটি সুন্দর, মনোরম স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভার্টোমেনাস্ বলেন যে, "এই সহর ধন, ধান্যে, পুষ্পে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত। পৃথিবীর যে কোন সহরের সহিত ইহার সমতুলনা হইতে পারে। মানবের জীবনধারণ অথবা আনন্দ-উৎপাদনের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, এ সহরে তাহার বিন্দুমাত্র অভাব নাই; বরং প্রাচুর্য্য আছে।"

ঢাকায় অনেক ইউরোপীয় বণিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে আসিয়াছিলেন। সুদূর মালদ্বীপ হইতে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্ দি মিল্ভারিয়া ঢাকায় আগমন করেন। তিনি এখানে কারখানা-স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। *

যে সমস্ত ইউরোপীয় ঢাকায় বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের বাসস্থান ছিল বলিয়া ঢাকা সহরের এক অংশের নাম ফিরিঙ্গীবাজার।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আদেশে আলাউদ্দিন ইস্লাম খাঁ বঙ্গদেশ শাসন করিতে আগমন করেন এবং ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। প্রভুর প্রতি অযাচিত ভক্তি-প্রদর্শনের নিমিত্ত তিনি ঢাকাকে "জাহাঙ্গীর নগর" নামে অভিহিত করেন।

ঢাকার নিকটে ঢাকেশ্বরী নামে একটি গুপ্তা দেবী ছিলেন, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু এইরূপ অনুমানের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় না।

মোগল-সম্রাট্ এত স্থান থাকিতে ঢাকায় বঙ্গদেশের রাজধানী-প্রতিষ্ঠার আদেশ করিলেন কেন, তাহা একটি চিন্তনীয় বিষয়। সে সময়ে ঢাকা অঞ্চলে পর্ত্তুগীজ ও আরাকান বা মগসম্প্রদায় যথেষ্ট অত্যাচার করিত। তাহারা তত্রত্য অধিবাসীর ধনরত্ন-লুন্ঠন, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিনাশ করিত। সম্ভবতঃ এই অত্যাচারিগণকে দমন করিবার নিমিত্ত মোগল শাসকগণ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন।

ইস্লাম্ খাঁর পরে পর পর কয়েকজন শাসক ঢাকার মস্নদে উপবেশন করেন, কিন্তু তন্মধ্যে একজন ভিন্ন আর কেহ পর্ত্তুগীজ ও আরাকানের দুর্দ্দমনীয় অত্যাচার দমন করিতে পারেন না।

এই সময়ে যুবরাজ খুরাম (সাজাহান) তাঁহার পিতার সহিত বিবাদ করেন

---

* Hunter's Statistical Account of Bengal.

এবং অবিলম্বে বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। তিনি তাঁহার নিজের বিশ্বস্ত একজন লোককে ঢাকার মস্‌নদে স্থাপন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে পিতা-পুত্রে আবার স্নেহ ও ভক্তির বিনিময় হয়।

পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর ধরিয়া কতিপয় শান্তপ্রকৃতি শাসক ঢাকার শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহারা ঢাকার স্বাভাবিক শান্তি অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে পর্ত্তুগীজ ও আরাকানদিগের সহিত ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিয়া শান্তিরক্ষার পরিবর্ত্তে অশান্তির পরিমাণ কেবল বৃদ্ধি করিতেন।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান সুজা বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন। সেই সময়ে আওরেঙ্গজেব ভ্রাতৃ-বঞ্চনা দ্বারা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে আওরেঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ মিরজুম্‌লা ঢাকার মস্‌নদে উপবেশন করেন। তিনি তদীয় প্রভুর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আওরেঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান সুজাকে তিনি দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন। রাজদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে অনাবিল রাজভক্তি ও সুশৃঙ্খলা স্রোত দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। সূক্ষ্মদর্শী মিরজুম্‌লা মগ (আরাকান্) দিগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে লক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীর তীরে কয়েকটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

মিরজুম্‌লার পর সায়েস্তা খাঁ ঢাকার মস্‌নদে আরোহণ করেন। তাঁহার ন্যায় আর কোন মোগলশাসকই দীর্ঘকালব্যাপী শাসন-কার্য্য পরিচালনা করেন নাই। তাঁহার শাসনসময়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যেরূপ সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছিল সেরূপ সুখ, সেরূপ সমৃদ্ধি আর কোন শাসকের শাসনাধীনে তাহারা ভোগ করে নাই।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঢাকায় অবস্থিতি করে। ইহার অষ্টাদশ বৎসর পরে তাহারা বঙ্গের তদানীন্তন শাসক আজিমের নিকট হইতে ২০০০ দুই সহস্র পাউণ্ড দিয়া বাঙ্গালায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু সায়েস্তা খাঁ যখন দ্বিতীয়বার ঢাকার মস্‌নদে আরোহণ করেন, তখন তিনি ইংরাজদিগের যাবতীয় কারখানা বাজেয়াপ্ত করেন ও সম্রাট্ আওরেঙ্গজেবের আদেশে ইংরেজদিগকে ঢাকায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন।

সায়েস্তা খাঁর শাসন-সময়ে ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ট্যাভারনিয়ার (Tavernier) ঢাকা নগরী পরিদর্শন করেন। তিনি নবাবকে দারু-নির্ম্মিত

গৃহে দরবার করিতে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হন। * সম্ভবতঃ রাজপ্রতিনিধির বাসস্থান লালবাগের নির্ম্মাণ তখনও শেষ হয় নাই। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে লালবাগের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়; কারণ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিতেছেন, এই লালবাগ অতি মনোরম প্রাসাদ, যথার্থই ইহা রাজ-প্রতিনিধির অবস্থিতির যোগ্য। †

সায়েস্তা খাঁর কন্যা বিবি পেরির সমাধি-চিহ্ন এই লালবাগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও দেখা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুরশিদকুলী খাঁ বঙ্গের সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে তিনি ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে বাঙ্গালার রাজধানী স্থানান্তর করেন। ‡

মোগলের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে থাকায় ঢাকা এক সময়ে বঙ্গের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। মিঃ হাণ্টার বলেন,—"নগরটী একজন ম্যাজিষ্ট্রেট ও ছয়জন আমিনের সীমার অন্তর্ভূত ছিল। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ব্যতীত "ইত্তিসব" নামে একজন কর্ম্মচারী ছিল। তিনি অত্যধিক কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিতেন। তিনি অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগকে অর্থদণ্ড করিতেন, তাহাদিগকে শারীরিক শাস্তি দিতেন। অবশ্য নবাব ও অর্থসচিবের উপর তাঁহার কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব ছিল না। এতদ্ভিন্ন কাজী ও কানুনগো নামে আরও অনেক কর্ম্মচারী ছিল। §

পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঢাকা মুরশিদাবাদ হইতে প্রেরিত প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইয়াছে।

যাহা হউক অবশেষে ইংরাজেরা দেশের আধিপত্য-লাভ করেন। তখন ডেপুটী নবাবেরা বিদায়-লাভ করেন এবং তাঁহাদের শূন্য স্থান ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পূরণ করেন। নূতন শাসনাধীনে আসিয়া ঢাকার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। সহরটী একটি জেলায় পরিণত হইল এবং একজন জেলা জজ ইহার হর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন। একজন বিচারক তাঁহার আজীবনব্যাপী সঞ্চিত ধনদ্বারা মিট্‌ফোর্ড হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করেন—আজিও সেই হাঁসপাতালটী তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্ত্বের কীর্ত্তিচিহ্ন।

---

* Tavernier's travels, Edited by Ball.

† Hunter's Statistical Account of Bengal.

‡ Stuart's History of Bengal.

§ Hunter's Statistical Account of Bengal.

বাঙ্গালার মোগল রাজধানী ঢাকা হইতে বিলুপ্ত হইতে না হইতেই ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন মুসলমান দারিদ্র্যে পতিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিতেছেন,—"সহরের সন্নিকটে কয়েকজন মুসলমান পীর বাস করেন। ফকিরের সংখ্যা অগণ্য। এই ফকিরেরা প্রতিবেশী ধনী মুসলমানদিগের দানের উপর জীবিকানির্ব্বাহ করে। * ঢাকার "মহরম" উৎসব তখনকার দিনে একটা দেখিবার মত জিনিস ছিল। এই উৎসব-দর্শনার্থী হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া ঢাকায় সম্মিলিত হইত।

মস্‌লিন শিল্পের অধঃপতনই ঢাকার অবনতির অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

সান্ধ্য ছবি।

সুরধুনী তীরে মধুর সমীরে
বেড়াতেছিলাম প্রদোষে;
তুলিয়া লহরী কুলু কুলু করি
গাহিছে তটিনী হরষে।
পশ্চিম গগনে রক্তিম বরণে
ডুবিছে সবিতা আবেশে;
নেহারে নয়ানে আকুল পরাণে,
সুরপুর নারী প্রাণেশে—
আপন ভবন তেয়াগি তপন
গিয়াছিল কোন্ প্রবাসে;
এসেছে ফিরিয়া দুজনে মিলিয়া
মগন মনের উল্লাসে।
সোহাগ বিভোল কনক নিচোল
খসিয়া পড়েছে আকাশে,

সে সোণার ছায়া ভাগীরথী কায়া
উজলি মধুর বিভাসে।
উঠিছে ঝলকে সে শোভা পুলকে
শতধা হইয়া বাতাসে;
চল দল দল সরাগ কিশল'
হেলায় পল্লব বিলাসে।
সুকাকলী তুলি শিশু পাখীগুলি
বসিয়া আপন আবাসে,
কলকণ্ঠ তুলে গাহি পক্ষীকুলে
আসিছে শাবক সকাশে।
বিকাশি তারায় সন্ধ্যা ধীরে যায়
ফিরে ফিরে চায় তরাসে
চমকে চপলা যত দিক্‌বালা
কাঁপায় অধর সহাসে।

শ্রীরসময় লাহা।

* Hunter's Statistical Account of Bengal.

ত্রৈমাসিক পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি।

গত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যে সকল গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রদত্ত হইল—

	গ্রন্থাদি			
একভাষায় প্রকাশিত :—	সাধারণ পাঠ্য	স্কুলপাঠ্য	মোট সংখ্যা	সাময়িক পত্রাদি
বাঙ্গালা	২৪৯	৬৬	৩১৫	১৯৮
মুশলমানী-বাঙ্গালা	৪	—	৪	—
সংস্কৃত	৫	—	৫	১
আসামী	৭	৩	১০	১২
উড়িয়া	১৮	১	১৯	—
হিন্দী	৮	৪	১২	৭
মণিপুরী	২	১	৩	—
উর্দ্দু	—	২	২	—
তিব্বতীয়	২	—	২	—
গুরুমুখী	১	—	১	—
ইংরাজী	৫০	২৮	৭৮	৮৫
আরব্য	১	—	১	—
গারো (Garô)	—	—	—	৭
মোট সংখ্যা	৩৪৭	১০৫	৪৫২	মোট সংখ্যা ৩১০
দুই ভাষায় প্রকাশিত :—				
বাঙ্গালা ও সংস্কৃত	৪৫	৩	৪৮	১৬
বাঙ্গালা ও ইংরাজী	১০	২৩	৩৩	১২
বাঙ্গালা ও হিন্দী	—	১	১	
ঐ ও পালী	৩	—	৩	
বাঙ্গালা ও উর্দ্দু	১	—	১	
আরব্য ও মুশলমানী বাঙ্গালা	১	—	১	
আরব্য ও ইংরাজী	—	১	১	
সংস্কৃত ও উড়িয়া	১	—	১	
হিন্দী ও সংস্কৃত	২	—	২	
মুশলমানী বাঙ্গালা ও উর্দ্দু	২	—	২	
ইংরাজী ও সংস্কৃত	১	২	৩	
ইংরাজী ও পাঞ্জাবী	—	১	১	
ইংরাজী ও পারস্য	—	—	—	১
মোট সংখ্যা	৬৬	৩১	৯৭	২৯
তিন ভাষায় প্রকাশিত :—				
বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত	২	৩	৫	
ইংরাজী পারস্য ও সংস্কৃত	—	—	—	১
বাঙ্গালা, মুশলমানী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত	১	—	১	
বাঙ্গালা, হিন্দী ও উড়িয়া	১	—	১	
আরব্য, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু	১	—	১	
আরব্য, মুশলমানী বাঙ্গালা ও পারস্য	১	—	১	
ইংরাজী, হিন্দী ও সংস্কৃত	১	—	১	
মোট সংখ্যা	৭	৩	১০	

চন্দ্রালোকে বারাণসী।

দেখিলাম বারাণসী নিশির হৃদয়দেশে—
বিশ্বেশ্বর ব'সে যেন ভুবনমোহন বেশে ;
শুভ্রকান্তি-সৌধময় স্ফাটিক প্রতিমা-প্রায়,
সুপ্রসন্ন সমুজ্জ্বল শুভ্র চারু চন্দ্রিকায় :
পরিপূর্ণ শোভাধর, শিরে শোভে শশধর ;
ব্যোমজটা উজলিয়া উছলিছে চন্দ্রকর ;
তারকা-কুসুমজালে সজ্জিত সুকেশদাম ;
দিগম্বরে বামদেব ত্রিভুবন-অভিরাম।

সমাসীন যোগীশ্বর দিব্য যোগাসন 'পরে,
দুই ধারে দুই উরু অসি বরুণার ধারে,
সম্মুখে সন্নদ্ধ সুখে বিশ্ববন্দ্য পদদ্বয়
অর্দ্ধচন্দ্র-অনুকারী জাহ্নবীর বারিময় ;
শশিস্নাত সোপানের শত শ্রেণী সুবিমল,
পদে যেন ভক্তার্পিত সচন্দন মালাদল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

প্রসঙ্গ।—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই গ্রন্থে লেখক চতুর্দ্দশটি প্রবন্ধ পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। প্রত্যেক প্রবন্ধই সুলিখিত, সুচিন্তার ফল। তবে ১৩ পৃষ্ঠায় 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গেলে সে প্রবন্ধ খুব বেশী পরিস্ফুট হওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদের বোধ হয় 'ধর্ম্ম' শীর্ষক প্রবন্ধটি একটু অস্ফুটতা-দোষে দূষিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে লেখক অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধটি আদ্যন্ত পাঠ করিলেও লেখকের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। 'ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধটি বেশ সুচিন্তিত ও স্বাধীনভাবপ্রকাশক। 'আনন্দ' সুখপাঠ্য নিবন্ধ। ইহার ভাষা মনোরম ; অপরাপর প্রবন্ধের মধ্যে 'সমাজের ভিত্তি' নামক প্রবন্ধটি বেশ নির্ভীক, তীব্র অথচ শিক্ষাপ্রদ। লেখক একস্থলে বলিতেছেন—'সমাজের যাহা ভিত্তি স্বরূপ সেই আন্তরিকতাই আমাদের নাই—সবই মৌখিক, ভাসাভাসা, কোনও বিষয়ে বিশ্বাস বসে না।' এটুকু অপ্রিয় হইলেও খাঁটি সত্য। লেখক রোগটি ধরিয়াছেন ঠিক কিন্তু তাঁহার কথায় কি কেহ কর্ণপাত করিবেন ? 'কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা' এবং 'সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী' বেশ সুখপাঠ্য ও লেখকের কৃতিত্বের পরিচায়ক হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এই দুইটি এবং 'সারা মার্টিন' প্রভৃতি কতকগুলি প্রবন্ধ অন্য গ্রন্থে মুদ্রিত করিয়া এ গ্রন্থে আরও দুই চারিটি সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ দিলে ভাল হইত। মোটের উপর প্রসঙ্গগুলি উচ্চদরের হইয়াছে। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ঢাকার ইতিহাস।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৩॥০ টাকা মাত্র। প্রায় ৬০০ শত পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ঢাকার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে ৪০ খানি চিত্র ও মানচিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আধুনিক শিক্ষার বলে হনলুলু, ফুসিয়ামা, টিমবাকটু, পাপাকাটিপাটেল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যে গ্রামে বা যে জেলায় আমাদের জন্ম সে গ্রাম সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন কথা জানি না এবং সে জেলা-সম্বন্ধে অধিক কথা জানিবার উপায়ও আমাদের অল্প। Hunter's Statistical Account নামক গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে কিন্তু সে মহার্ঘ্য পুস্তক দুই একটা বৃহৎ পুস্তকাগারের শোভা বর্দ্ধন করে মাত্র। শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রমোহন বাবুর এই ঢাকার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ঢাকা জেলার ভূবৃত্তান্ত, প্রাকৃতিক বিবরণ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, ও ঐতিহাসিক দৃশ্য এবং প্রাচীন কীর্ত্তি প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখনও ঢাকার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয় নাই। তাহা বোধ হয় দ্বিতীয় খণ্ডে হইবে।

ঢাকা বাঙ্গালী মাত্রের নিকট প্রিয় স্থান। ঢাকার ইতিহাসের সহিত এক প্রকার সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস বিজড়িত। সুতরাং এই পুস্তক সন্নিবেশিত তথ্যগুলি বাঙ্গালী মাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। যতীন্দ্রমোহন বাবু তাঁহার মাতৃভূমির এই সুবৃহৎ সযত্ন-রচিত সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া কেবল ঢাকাবাসীর কেন সমস্ত বঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এমন মনোরম প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি এ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন যে গ্রন্থার্গত রাশি রাশি সংবাদ পাঠ করা মোটেই বিরক্তিকর নহে। যাঁহারা স্বচক্ষে ঢাকার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখিয়াছেন। তাঁহারা এ গ্রন্থে অত্যধিক আনন্দ পাইবেন, যাঁহারা সে সকল দৃশ্য দেখেন নাই যতীন্দ্র বাবুর ভাষা এবং চিত্র হইতে তাঁহারা মানস-নয়নে সে সকল দৃশ্য অবলোকন করিবেন। যেরূপ যত্নের সহিত যতীন্দ্র বাবু ঢাকা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ, তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ধন্য। আমরা অতীব আনন্দের সহিত ঢাকার ইতিহাস পাঠ করিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা সাহিত্যে এ গ্রন্থ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। আমরা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত রহিলাম। এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি লোকের আস্থা বাড়িয়াছে। আমাদের ভরসা আছে বাঙ্গালী পাঠক এই গ্রন্থখানি ক্রয় করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিবেন এবং লেখককে উৎসাহিত করিবেন।

সাহিত্য-সমাচার।

অর্ঘ্য।—চৈত্র ও বৈশাখ—আমরা যতগুলি ছোট মাসিক পত্র পাই তন্মধ্যে 'অর্ঘ্য' পত্রখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রবন্ধগুলি সুলিখিত, সুনির্ব্বাচিত ও সুসম্পাদিত। কিন্তু অনিয়মিত প্রকাশ ইহার প্রধান ত্রুটী। আশা করি, এ দিকে সম্পাদকের দৃষ্টি পড়িবে।

'যোগেন্দ্র-কথা'—পাঠ করিবার ও জানিবার অনেক কথা আছে, সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। 'মুসলমান শাসনকালে গোয়েন্দা'—প্রবন্ধটী জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। 'বসন্তে'—কবিতা—অন্ধ অনুকরণ দোষ-দুষ্ট। আমাদের ভাল লাগিল না। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের

জন্মোৎসব'—ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই, তবে ভাল কথা চিরদিনই ভাল। 'স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর'—আমাদের শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ রায় রচিত। প্রশংসা করিলে আত্মপ্রশংসা করা হয়, সুতরাং নীরব থাকাই প্রশস্ত। 'দীর্ঘ জীবন-লাভের রহস্য'—(এডিসনের উক্তি) লিপিপ্রসঙ্গ। আগামীবারে (অর্থাৎ বৈশাখ সংখ্যায়) সম্পাদক মহাশয় বৈজ্ঞানিকপ্রবর এডিসনের আরও অনেক কথা বলিবেন আশা দিয়াছিলেন—দুঃখের বিষয় বৈশাখ সংখ্যায় তাহা দেখিলাম না। 'সৎ-সঙ্গ'—যবন হরিদাসের জীবনের একটী আখ্যায়িকা। 'অক্ষয়চন্দ্রের অভিভাষণ'—সম্বন্ধে লেখকের অনেকগুলি মন্তব্য সমর্থন-যোগ্য। 'তুলনায়'—কবিতা মন্দ নহে। 'তাণ্ডের প্রতি' কবিতা বেশ হইয়াছে। 'কবিতা ও গান' সম্বন্ধে বিখ্যাত গান-রচয়িতা প্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের বক্তব্য ও তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

কুশদহ।—জ্যৈষ্ঠ ১৩২০—এই পত্রখানি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু ইহা পাঠে আমরা তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না, কারণ ইহাতে সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবেশ করিয়াছে। 'দাস' মহাশয় বা সম্পাদক মহাশয় যে একজন ভক্ত ব্রাহ্ম মাসিক কুশদহে প্রকাশিত 'দাসের দৈনিক'প্রার্থনা' তাহার নিদর্শন। এইরূপ 'আত্ম-বিজ্ঞাপনী' ফলে আত্ম-প্রসাদ জন্মিতে পারে কিন্তু তাহাতে পাঠকের লাভ কি? "কিসের আশে প্রাণ রাখিবে"—নূতনত্ব বর্জ্জিত। 'ভিক্ষা'—ব্রহ্মসঙ্গীতের অনুকরণে সঙ্গীত বা কবিতা। 'দ'য়ের ভাঁড়'—কবিতা—কোন আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিলে কথা নাই, অন্যথা বিশেষত্ব বর্জ্জিত। 'রেল-সংঘর্ষ' ই, আই, রেলওয়ে যে রেল সংঘর্ষ হইয়াছিল সেই ভাঙ্গা গাড়ীগুলির একখানি প্রতিলিপি। ইহা মানস-চক্ষে অথবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিতে হয়। অতঃপর অর্থব্যয়ে ব্লক না কাটাইয়া কাষ্ঠফলক ছাপিলেও এরূপ ছবি ছাপার 'পিত্তিরক্ষে' হইতে পারিবে। 'কুশদহের ইতিহাস'—বেশ কতকগুলি নূতন কথা আছে। 'দাসের আত্মকথা'—অর্থাৎ সম্পাদকের আত্মকথা। সম্পাদক মহাশয় নিজেকে যাহাই মনে করুন না কেন, সাধারণ পাঠকের কর্ণে তাঁহার 'আত্মকথা' যে অমৃত সিঞ্চন করিবে এ দুরাশা আমাদের নাই। তাঁহার 'দৈনিক প্রার্থনা' 'আত্মকথা' প্রভৃতিতে যে পাঠকের প্রতি অযথা অত্যাচার করা হইতেছে, সম্পাদক মহাশয় এ কথা বুঝিলে আমরা বাধিত হইব।

নন্দিনী—বৈশাখ, ১৩২০। ক্ষুদ্র মাসিক, উদ্দেশ্য "নূতন লেখকদিগকে উৎসাহ দেওয়া" —সম্পাদকীয় টিপ্পনী (কভারের উপর) "যশের জন্য ও ব্যবসার নিমিত্ত সকলে বিব্রত; * * * সাহিত্য-সেবীর অভাবে দেশের অনেক সুগন্ধী-কুসুম অনাঘ্রাত লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।"—সম্পাদকের উদ্দেশ্য সাধু হইতে পারে কিন্তু সমালোচ্য সংখ্যায় "নিতান্ত মন্দ নয়" শ্রেণীভুক্তও কোন রচনা দেখিলাম না। নববর্ষে, মিনতি, আশা, কামনা, ইত্যাদি শীর্ষক কতকগুলি কবিতা, 'মীরাবাই' 'কুসুম-কুন্তলা' (উপন্যাসদ্বয়) প্রভৃতি জঘন্য রচনাগুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে। আমরা সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, এইগুলিই কি "সুগন্ধী-কুসুম"? এইগুলিই কি অনাঘ্রাত লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় "নন্দিনী"র প্রকাশ? তাঁহার সদুদ্দেশ্য যদি সামান্য মাত্রাতেও সফল হইতে দেখিতাম, তাহা হইলে এত কথা বলিতাম না। কোথাও কিছু নাই আছে কেবল 'লম্বা লম্বা' বচন এবং সম্পাদক সাজিয়া বলিবার ধৃষ্টতা।



অযোধ্যার নবাববৃন্দ

১। নবাব বরহান উল্ মুল্ক, ২। নবাব সফদার জঙ্গ বাহাদুর, ৩। নবাব সুজাউদ্দৌলা,
৪। নবাব আসফউদ্দৌলা, ৫। নবাব ওয়াজীর আলি খাঁ, ৬। নবাব সয়াদৎ আলি খাঁ,
৭। কীং গাজীউদ্দীন হাইদার, ৮। কীং নসীরুদ্দীন হাইদার, ৯। প্রিন্স মনুজান,
১০। কীং মহম্মদ আলি সা, ১১। কীং আমজাদ আলি সা,
১২। কীং ওয়াজীদ আলি সা, (ইনি অযোধ্যার শেষ নবাব,—১৮৮৭ খৃঃ অঃ কলিকাতায় ইহার মৃত্যু হয়।)

Engraved and Printed at The Fine Art Printing Syndicate, Jorasanko, Calcutta.

লক্ষ্ণৌর নবাব।

যখন মোগলদিগের সৌভাগ্য-ভাস্কর ভারতাকাশে অস্তাচল-গমনোন্মুখ, তখন সুবা বাঙ্গালা ও সুবা ঔধের রাজপ্রতিনিধি নবাবগণ যশে মানে বিলাসব্যসনে দিল্লীশ্বরের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা নামে মাত্র দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন, দিল্লি রাজকোষে কিছু কিছু অর্থ দিতেন বটে, কিন্তু ক্রমশঃ লক্ষ্ণৌর নবাব প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দিল্লি দরবারের প্রভা যত মলিন হইয়া আসিতে লাগিল ইঁহারাও তত প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। শেষে ভারতের পূর্ব্বাকাশ ইংরাজাধিপত্যের ঊষালোকে উদ্ভাসিত হইল। পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালার নবাবের অধঃপতন ঘটিল, ক্রমশঃ সেই জ্যোতি অগ্রসর হইয়া অযোধ্যা প্রদেশকে আলোকিত করিল। আউধের নবাব-বংশ রাজ্য হারাইয়া ইংরাজের বন্দী হইয়া কলিকাতার সন্নিকটস্থ মেটিয়াবুরুজে ইংরাজপ্রসাদে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন।

মহম্মদ সাহ বাদসাহের সাম্রাজ্য কালে ১৭৩২ খৃঃ অব্দে বরহান্ উলমুল্ক নবাব সায়াদত খাঁ আউধের নবাব পদে নিযুক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌর মসনদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এবার 'অর্চ্চনা'য় প্রথম চিত্রখানি তাঁহারই। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নবাব আবু আল্-মন্সুর খান্ সফদরজঙ্ সাহেব আউধের মসনদে অধিরোহণ করেন। ইনি দিল্লির তোপখানার সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র নবাব সুজাউদ্দৌল্লা বাহাদুর ঐ পদ প্রাপ্ত হয়েন। উনি ফৈজাবাদ সহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় অনেকগুলি মনোরম প্রমোদোদ্যান ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত নগরকে সুদৃশ্য করিবার চেষ্টা করেন।

এই সময় বাঙ্গালা দেশ লইয়া ইংরাজ ও মোগলে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সুজাউদ্দৌলা বৃদ্ধ বাদসাহ সাহ আলমকে সঙ্গে লইয়া বেহার প্রদেশ জয় করিবার জন্য পাটনার দিকে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের সৈন্যাধ্যক্ষ মনরো সাহেবের নিকট পরাজিত হইয়া ইংরাজের হস্তগত হয়েন। সাহ আলম বাদসাহের জন্য আউধের কতকগুলি পরগণা দিতে হইল। এই সময় হইতেই

আউধে ইংরাজ প্রভাবের সূত্রপাত। তাহার পর ক্রমে তাঁহারা আউধ রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হয়েন।

তাঁহার পুত্র মহানুভব নবাব আসফ্‌উদ্দৌলা তাঁহার পর সুবা আউধের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েন। ইঁহার প্রজাবাৎসল্য ও সহৃদয়তা আজিও আউধ প্রদেশের আপামর সাধারণের মুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রবচন হইয়া গিয়াছে—

যিস্কো না দে মৌলা উস্কো দে আসফদ্দৌলা—

অর্থাৎ—যাঁহাকে ভগবানও সাহায্য করেন না তাঁহাকে আসফুদ্দৌলা সাহায্য করেন। তাঁহার নবাবি আমলে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ আউধপ্রদেশকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যাহাতে প্রজাগণ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বৃহৎ ইমামবারাটি নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের কবল হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যাহারা এই স্থাপত্য কার্য্যে যোগদান করিত, তিনি তাহাদিগকে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত করিতেন। ভদ্রবংশীয় দরিদ্রগণ প্রকাশ্যে কার্য্য করিলে তাহাদের মর্য্যাদাহানি হইতে পারে এইজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে ঐরূপ লোক রাত্রে কাজ করিবে। এই ইমামবারা দেখিতে বড় সুন্দর। ইহার একটি কামরা ১৬৭ ফিট লম্বা এবং প্রস্থে ৫২ ফিট। ইং ১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইহা সম্পূর্ণ হয়। উক্ত আছে যে ইহা নির্ম্মাণ করিতে এক কোটি আসরফি ব্যয় হইয়াছিল। ঐ সময়ে জেনারাল মারটিন, রাজা ঝাউলাল এবং তকীত্‌ রায়ও সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া লক্ষ্ণৌ সহরের শোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয়তা এতদূর বিখ্যাত যে অদ্যাবধি লক্ষ্ণৌর দোকানদারগণ তাঁহার নাম করিয়া দোকান খুলিয়া থাকে এবং শত শত নরনারী এখনও তাঁহার কবরে পূজা দিয়া আসে।

তাঁহার মৃত্যুর পর মির্জা আলি আরিফ্‌ উজীর আলি নবাবী প্রাপ্ত হয়েন। তিনি এতই নির্গুণ ছিলেন যে ইংরাজ কোম্পানী তাঁহাকে গদি হইতে নামাইয়া তাঁহার খুল্লতাত নবাব সয়াদৎ আলি খাঁকে মসনদে বসাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইনি সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং প্রভূত মিতব্যয়ে লক্ষ্ণৌর রাজকোষে সতের কোটি টাকা রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

এই সময়ে ইংরাজ প্রভাব আউধপ্রদেশে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। সয়াদৎ আলির মৃত্যুর পর ইংরাজেরা তাঁহার মধ্যম পুত্র গাজিউদ্দীন হায়দারকে আউধের সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে টাকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইনি নামে মাত্র নবাব ছিলেন। ১৩ বৎসর নবাবি করিয়া ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইনি পর-

লোক গমন করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র নসিরুদ্দীন হাইদার লক্ষ্ণৌর সিংহাসন অধিরোহণ করেন। ইনিও পিতার ন্যায় অকর্ম্মণ্য ছিলেন এবং ভোগাভিলাস ও জঘন্য আমোদ-প্রমোদের চেষ্টায় পিতামহ-সঞ্চিত অতুল ধন নষ্ট করেন। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌর ইংরাজ রেসিডেণ্টকে লিখিয়া দিয়া যান যে তিনি অপুত্রক এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে ইংরাজেরা যাঁহাকে ইচ্ছা লক্ষ্ণৌর সিংহাসন প্রদান করিতে পারেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর কিন্তু তাঁহার মাতা বাদসা বেগম মুন্নাজান নামক এক ব্যক্তিকে মৃত নবাবের পুত্র বলিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দেন। ইহাতে ইংরাজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যের দ্বারা রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করেন এবং অবশেষে মুন্নাজান ও বাদসা বেগমকে ধৃত করিয়া কানপুরের সন্নিকটস্থ চুনাড়গড় নামক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। ইহার বংশ এখনও চুনাড়গড়ে বাস করিতেছে।

মুন্নাজানের পর নবাব মহম্মদ আলি সাহ লক্ষ্ণৌ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। ইনি বৃদ্ধ ও চক্ষুরোগাক্রান্ত হইলেও লক্ষ্ণৌর ইতিহাসে যশ রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি তথায় অনেকগুলি সুদৃশ্য সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার নির্ম্মিত হোসেনাবাদের ইমামবারা আজিও বিদ্যমান আছে। ইহার নিকট তিনি একটি জুমা মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনি লক্ষ্ণৌ সহরে একটি লৌহের পুল নির্ম্মাণ করিবার জন্য সমস্ত মাল-মসলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু উহা সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে তিনি পরলোকগত হন। ইনি দীন দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, অনেক অর্থ দান করিয়া ব্যয় করিয়াছেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

আমজাদ আলি সাহ তাহার পর লক্ষ্ণৌর ভূপতি হয়েন। ইনি পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৮৪৮ খৃঃ পরলোক গমন করেন। ইহার মৃত্যুকালে ঔধের রাজকোষে ৩৫ লক্ষ মুদ্রা বিদ্যমান ছিল।

আউধের শেষ ভূপতি ওয়াজীদ আলি সাহ লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব। পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ইনি নানারূপ বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতে যত্নবান ছিলেন। দেশে অরাজকতার প্রশ্রয় পাইতেছে দেখিয়া সহৃদয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কলিকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ইনি ইহলীলা সম্বরণ করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

(বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত) *

উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি :—সাহিত্য-সম্বন্ধে ইংলণ্ডের গৌরবের কাল এলিজাবেথ্‌ ও জেম্‌সের সময়। অনেকে বলেন, লুথর কৃত ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে তৎকালীন সাহিত্যের এত উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগকে ইউরোপীয় সাহিত্যের একটী উৎকৃষ্ট সময় বলা যাইতে পারে। অনেকে তৎকালীন সাহিত্যের উন্নতিকে ফরাশী রাজবিপ্লবের ফল বিবেচনা করেন। ফরাশী রাজবিপ্লব, কেবল রাজকীয় বিপ্লব নহে—ধর্ম্মবিপ্লবও বটে। তবে কি ধর্ম্মবিপ্লবে সাহিত্য সৃষ্ট হয়? ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের সেরূপ নিকট সম্বন্ধ নহে। কিন্তু মানব-হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে, তাহার গতি বেগবতী হয়। ধর্ম্মের উৎসাহে হৃদয় চঞ্চল হইলে হৃদয়ের গতি বেগবতী হয়। সামাজিক হৃদয়ের গতি বেগবতী হইলে, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। অতএব ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে কখন কখন উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উদয় হইয়া থাকে।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্মবিপ্লবের ঐরূপ ফল ফলিয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক যে বহু গ্রন্থযুক্ত সাহিত্যশাস্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে; তাহা অনেকে অবগত নহেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার সম্প্রদায়, বহুসংখ্যক—তন্মধ্যে অনেকে সুপণ্ডিত, এবং সুলেখক। নদীয়ার ন্যায়শাস্ত্র, বৈষ্ণবদিগের সাহিত্য, বাঙ্গালার ব্যবস্থাশাস্ত্র, এবং আধুনিকী সুশিক্ষা এই চারিটী বাঙ্গালীর গৌরব।

বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে কেবল চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী গ্রন্থ বুঝায়, এমত নহে। গীতগোবিন্দাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের বহুপূর্ব্বে লিখিত। চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বৈষ্ণব কাব্য সকলের বাহুল্য দেখিয়া বোধ হয়, কৃষ্ণভক্তি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেই বাঙ্গালায় বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধিকাংশ বৈষ্ণবগ্রন্থ চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী।

সাহিত্যে অশ্লীলতা :—অশ্লীলতা দোষের উচ্ছেদকরণ জন্য অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদ্রূপ করিলে, কেহই কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না; তাহাতে অশ্লীলতার বৃদ্ধি ভিন্ন আর হ্রাস হইবে না।

---

* বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের—'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' ও তাঁহার অন্যান্য দুই একটি রচনা হইতে এই অভিমতগুলি সংগৃহীত হইতেছে।—সংগ্রহকর্ত্তা।

এমন অনেক কাব্য আছে যে, তাহার অশ্লীলতায় অপবিত্রতার ছায়াও নাই। এমন অনেক কাব্য আছে যে তাহা অশ্লীলতা-দোষযুক্ত হইলেও মনুষ্য বুদ্ধি সৃষ্ট রত্নের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া চিরকাল আদরে রক্ষণীয়। কোন কোন স্থানে, অশ্লীলতা, কাব্যের উৎকর্ষ পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যিনি এ কথা হঠাৎ বুঝিতে পারিবেন না, তিনি দুর্য্যোধনের সভায় দ্রৌপদীর কথা, মহাভারতে পাঠ করিবেন। ইহাও আমরা স্বীকার করি, যাহার চরিত্র বিশুদ্ধ, অশ্লীলতা তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। "আমার পুত্রটির স্বভাব পবিত্র—অশ্লীল গ্রন্থ পড়িলে সে পাপ-প্রিয় হইবে," যিনি এরূপ আশঙ্কা করেন, তাঁহার বুদ্ধির আমরা প্রশংসা করি না।

দেশী ও বিদেশী রুচি ঃ—দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতাপরা মলপরা পা দর্শনে বিশেষ আপত্তি। আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি. এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বত-শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচি বিরুদ্ধ; স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী-মুখ চুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে স্নেহ করিয়া 'মাতা বসুমতী' বলি, আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপ চিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক; এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মহর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ,কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা

শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমরা অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

পারিস রহস্য ঃ—পারিসরহস্য গ্রন্থ ভাল বটে, এবং রচনাশক্তির বিশেষ পরিচয় উহাতে আছে, কিন্তু উহাতে রুচির বিকৃতি জন্মে। রুচির বিকৃতি জন্মে এ কথা বলার এমত উদ্দেশ্য নহে যে উহা অশ্লীলতা পূর্ণ, বা পাপের উদ্দীপক। তাহা নহে। কিন্তু উহাতে অদ্ভুতের অত্যন্ত বাহুল্য। অপ্রাকৃত অদ্ভুত উহাতে কিছু নাই—কিন্তু যাহা প্রকৃত অথচ অদ্ভুত, তাহারই অবতারণা ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ঈদৃশ গ্রন্থ পাঠে রুচির এমন বিকৃতি জন্মে যে পাঠকের অদ্ভুত ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না—চিত্তশোধক বিশুদ্ধ কাব্যরসে ভক্তি থাকে না। বিশেষ গ্রন্থের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, উহা পাপের চিত্রে পরিপূর্ণ। ইউজীনের লিপি-শক্তির গুণে সেই সকল চিত্রেরও একটু আকর্ষণী শক্তি ঘটিয়াছে। এই পারিস রহস্যে ইংলণ্ডে অতি কদর্য্য ফল ফলিয়াছে—ইহারই অনুকরণে রেণল্ড্স নামক গ্রন্থকারের "Mysteries of London" প্রভৃতি কদর্য্য গ্রন্থ সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকের রুচি, আজি কালি এই সকল গ্রন্থের অনুসারিণী। তাঁহারা সৎকাব্যে ও রেণল্ড্সের কাব্যে প্রভেদ কি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না।

গালি, ব্যঙ্গ ও ছেব্লামি ঃ—গালি এবং ব্যঙ্গ দুইটি পৃথক্ বস্তু, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গালি ভদ্রের পরিহার্য্য, তদ্দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক ; এবং সুলেখকের হস্তে তাহা মহাস্ত্র। অনেক লেখক গালিকেই ব্যঙ্গ মনে করেন ; পক্ষান্তরে অনেক পাঠক ব্যঙ্গকে গালি মনে করেন। আবার অনেকে নিরর্থক ছেব্লামিকে ব্যঙ্গ মনে করেন।

এদেশীয় পাঠকেরা সচরাচর, পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করিয়া অথবা মূর্খ, পাপিষ্ঠ, নরাধম বলিয়া কাহাকে গালি দিলে, বুঝিতে পারেন যে একটা রহস্য হইল বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে যে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা সকলে বড় বুঝিতে পারি না। যে সকল ইংরেজ সমালোচক, যাহা কিছু আর্য্য সাহিত্যে, আর্য্য দর্শনে, আর্য্য ভাস্কর্য্যে, বা আর্য্য বিজ্ঞানে উৎকৃষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, এবং যে সকল দেশী

সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুরি মনে করেন, তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য, আমরা সেবার লিখিয়াছিলাম যে শকুন্তলা মিরন্দার যেখানে সাদৃশ্য আছে, সেখানে অবশ্য সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস চুরি করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত! কি সর্ব্বনাশ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্ত্তী! আর একখানি গ্রন্থ সমালোচনা-কালে, লেখক যে সকল পচা পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বিত পুনশ্চর্ব্বিত তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া, অতিশয় অভিনব বলিয়া পাঠককে উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পড়িয়া পাঠক বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, "আমার লিখিত বিষয় সকলের নবীনত্ব আছে বলিয়া বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে!" কি দুঃখ!

বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস :—বাঙ্গালা সাহিত্যে চারিজন রহস্যপটু লেখকের নাম করা যাইতে পারে,—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত হুতোমের যতদূর সাদৃশ্য, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর ততদূর সাদৃশ্য না থাকুক, অনেক দূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (wit) প্রধান; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন,—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বরগুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন।

পূর্ব্বেকার ও এখনকার ব্যঙ্গ-প্রণালী :—আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী একজাতীয় ছিল—এখন আর একজাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভাল বাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠীয়ালের ন্যায় মোটা

লাঠী লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলী ফাটিয়া যাইত; এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু লান্‌সেট খানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরাজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠীয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠীয়াল আর নাই, এমন নহে; দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠী ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠীর ভরে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বরগুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠীয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠী, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠীর আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

প্রহসন ঃ—'একেই কি বলে সভ্যতা'র জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে। সেই সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাস্যরস-বিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে প্রহসন বলে। দুইখানি প্রহসন এই পরি-ভাষা হইতে বিশেষরূপে বর্জ্জিত, একেই কি বলে সভ্যতা এবং সধবার একাদশী। সধবার একাদশী অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইলেও, অন্যান্য গুণে ভারতবর্ষীয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ।

ব্যঙ্গের যোগ্য কি ?—যাহা ব্যঙ্গের যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ প্রযুজ্য; তাহাতে অনিষ্ট নাই, ইষ্ট আছে।

কার্য্যের যে সকল গুণ আছে, তাহার মধ্যে একটি ফলোপধায়কতা। কার্য্য হয় সফল, নয় নিষ্ফল। কার্য্য সফল হইলে, তাহার ফলে যদি অন্যের ইষ্ট হয়, তবে তাহাকে পুণ্য বলি। যদি তাহার ফলে পরের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাকে কর্ত্তার অভিপ্রায়ভেদে পাপ বা ভ্রান্তি বলি। যদি অসদভিপ্রায়ে সেই অনিষ্টজনক কার্য্য কৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা পাপ বা দুষ্ক্রিয়া। যদি অসদভিপ্রায় ব্যতীত ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা ভ্রান্তিমাত্র।

দেখা যাইতেছে যে পুণ্য, পাপ বা ভ্রান্তি কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। পাপ, ভৎর্সনা, দণ্ড শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। যাহাতে দুঃখ করা উচিত, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। তদ্রূপ ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য।

নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থাবিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে, উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ইংরাজি ভাষায় এই দুইটির জন্য পৃথক পৃথক নাম আছে। একটিকে Error বলে, আর একটিকে mistake বলে। Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ, ক্রিয়ায় পরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। পুণ্যের উপযোগী চিত্তভাবকে ধর্ম্ম বলা যায়; পাপের উপযোগী ভাবকে অজ্ঞানতা বলি। এই তিনই ব্যঙ্গের অযোগ্য। কিন্তু যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য। আমরা দুইটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করিয়াছি, আর একটি ব্যবহার করিলে অধিক দোষ হইবে না। Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, follyও তদ্রূপ।

সাহিত্যে অনুকরণ ঃ—অনুকরণ-প্রবৃত্তি-জাত উৎকৃষ্ট কাব্যের অপেক্ষা লেখকের নিজ কল্পনাপ্রসূত একখানি নিকৃষ্টতর কাব্যের অধিক আদর করিতে প্রস্তুত আছি।

সত্য বটে যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়। আমরা যখন যাহা কিছু প্রচলিত দেখি, বিচার না করিয়া বিবেচনা না করিয়া তখনই তদভিমুখে ধাবমান হই। কিন্তু এ কথা অন্যান্য পক্ষে যাহা হউক, এ পক্ষে তত শোভমান নহে। আমাদিগের অনুকরণ-প্রিয়তা আছে বলিয়াই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বা একখানি ক্ষুদ্রকাব্য রচনা করিতে গিয়া শত শত সহস্র সহস্র বর্ষ ক্রমাগত প্রচলিত কবিতা বা প্রস্তাবের ছত্রে ছত্রে অনুকরণ করিলে চলিবে না। রচনা বিষয়ে অনুকরণের আরও মহোদ্দোষ এই যে, লেখকের নিজের যাহা কিছু কবিত্ব থাকে, অন্যের অনুকরণ করিতে গিয়া হয়ত তিনি তাহা হারাইয়া বসেন। এ বিষয়ের বহুবিধ প্রমাণ দর্শান যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রস্তাবের তাহা উদ্দেশ্য নহে; পাঠক দেখিবেন অনেক আখ্যায়িকা, গীতিকাব্য ও সাময়িক পত্রিকা লেখকদিগের এই দশা। সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের মধ্যে এই রীতি অত্যন্ত প্রচলিত। প্রাচীন মহাকবিরা যে প্রণালীতে যে কোন বস্তু বর্ণন করিয়াছেন, অধস্তন কবিরা সেই সেই বস্তু বর্ণনস্থলে তাঁহাদিগের মধ্যে অবশ্যই কাহারও না কাহারও অনুকরণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত অনেক সংস্কৃত কবির কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও কবিতা সুরস হয় নাই; এই নিমিত্ত অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থে সাদৃশ্য যোজনা

প্রায়ই একরূপ ও এই নিমিত্তই অধস্তন সংস্কৃত কাব্যের উত্তরোত্তর অধোগতি। আমরা এইস্থলে এ বিষয়ের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিব। সকলেই জানেন যে মুখ বর্ণনায় উপমাস্থলে চন্দ্রপদ্ম সংস্কৃত গ্রন্থকারের একায়ত্ত। কিন্তু যে কবি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুখের সাদৃশ্যস্থলে চন্দ্রপদ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন, ও যে কবি তদ্দ্বারা কেবল অনুচিকীর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন উভয়ের কবিত্বে কিরূপ প্রভেদ, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা সকলে অনুভব করিতে পারিবেন।

চন্দ্রংগতা পদ্মগুণান্নভুঙ্‌ক্তে পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাং।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রিয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মী॥

অন্যত্র

ধৃতলাঞ্ছন গোময়াঞ্চলং বিধুমালেপন পাণ্ডরং বিধি।
ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ভজা নমু নীরাজন বর্দ্ধমানকং॥
সুষমা বিষয়ে পরীক্ষণে নিখিলং পদ্মমভাজিতন্মুখাৎ।
অধুনাপি নভঙ্গলক্ষণং সলিলোন্মজ্জন মুদ্রয়াতিস্ফুটং॥

পাঠক দেখিবেন প্রথম কবিতাটী ও শেষ দুইটী একই ভাবাত্মক, কিন্তু কবি সুলভ রচনা ও অনুচিকীর্ষা বশতঃ প্রথমটী যে পরিমাণে হৃদয়গ্রাহিনী, অন্য দুইটী সেই পরিমাণে কর্ণজ্বর।

অনুকরণ মাত্রেই হেয় নহে ঃ—"নকল" শুনিয়াই কেহ ঘৃণা করিবেন না; অনুকরণ হইলেই গ্রন্থ নিকৃষ্ট হয় না। ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। বর্জিলের মহাকাব্য যে ইলিয়দের অনুকরণ, ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। স্বয়ং সেক্ষপীয়রও অনেক সময়ে, নিকৃষ্টতর কবিদিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আপন অপূর্ব্ব নাটক সকল রচনা করিয়াছিলেন। অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে, অনুকৃতের অপেক্ষা অনুকারী প্রতিভাশালী।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, সে চিরকালই অনুকারী থাকে তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে, এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্ম্মনীয়গণ, অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন, যে শেষোক্ত জাতি সকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল।

বঙ্গভাষায় অর্থশাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ঃ—একদা কোন দুর্ভিক্ষ দুঃখ নিবারণী সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম। একজন সুবিজ্ঞ সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, চাউল সস্তা করিবার অন্য উপায় নাই, বাজারের দর বাঁধিয়া দেওয়া হউক। যখনই দুর্ভিক্ষের কোন সূচনা উপস্থিত হয়, তখনই দেশীয় লোকে প্রায় বাজারের দর বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হয়েন। পুনশ্চ দেশীয় লোকে সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে দেশের অনিষ্ট হইতেছে, বিলাতীয় সওদাগরেরা আসিয়া দেশের টাকাটা লুটিয়া লইয়া যাইতেছে। এই সকল গুরুতর ভ্রম যে ভ্রম, ইহা তাঁহাদিগকে বুঝান, প্রায় অসাধ্য। এ সকল ভ্রমে দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে—অনেক অবাঞ্ছনীয় বিষয়ে যত্ন হইতেছে, অনেক মঙ্গলের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা হইতেছে, অনেক বৃথা ভয়ে লোকে কষ্ট পাইতেছেন। কিসে সামাজিক উন্নতি কিসে অবনতি তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, সমাজের গতি পর্য্যবেক্ষণায় তাঁহারা অশক্ত। এই সকল দেখিয়া আমাদিগের সর্ব্বদা মনে হইত যে যতদিন না বাঙ্গালা ভাষায় অর্থশাস্ত্রের প্রচার হয়, ততদিন দেশের উন্নতির প্রধান পথ রুদ্ধ। যিনি অর্থশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় প্রচার করিবেন, তিনি দেশের পরম উপকার করিবেন।

সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ ঃ—কোন জাতি নূতন শিক্ষা-প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, সেই জাতির সাহিত্য প্রায় দুই অংশে বিভক্ত হয়, এক অনুবাদ আর এক অনুকরণ। কদাচিৎ দুই একজন, স্ববুদ্ধিমূলক অভিনব সাহিত্য রচনায় সক্ষম হয়েন। আরব জাতিয়েরা অনুবাদ ভিন্ন প্রায় আর কিছুই করিতে পারেন নাই। রোমক সাহিত্য যুনানী সাহিত্যের অনুকরণ মাত্র। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা, অনুবাদ করেন; মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, প্রভৃতি সুকবিরা অনুকরণ করেন। মেঘনাদবধ, ইলিয়দের অনুকরণ, নবীন তপস্বিনী, "Merry wives of Windsor" নামক নাটকের অনুকরণ। কিন্তু অনেক সময়ে, অনুকরণ অপেক্ষা অনুবাদ সুসাধ্য, এবং সাধারণের উপকারী হয়। অনুকরণ দুই একজন প্রতিভাশালী লেখকের হস্তেই ভাল হইয়া থাকে; ভাল হইলেও উপকারীতায় সকল সময়ে অনুবাদের তুল্য হয় না।

বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ ঃ—সোডা না বলিয়া "সিতক্ষারদ" পোতাস না বলিয়া "সিতক," এরূপ রীতি স্বদেশ ভাষা প্রিয়তা হইতে উৎপন্ন বটে,

কিন্তু তাহা স্বদেশ ভাষা-প্রিয়তার ভ্রংশতা মাত্র। এইরূপ সংস্কৃত নিবিষ্ট হইতেই বঙ্গভাষায় জারজত্ব সম্পাদন হয়, কাম্বেল সাহেব বলিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার কথার অর্থ নাই তথাপি এ কথা বলিতে পারা যায় যে, এই এপিডেমিকগ্রস্ত দেশে সোডা, কইনাইনের আর নূতন নামের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? বাঙ্গালা পাঠশালে একবার সিতক্ষারদ শিখিয়া যাইয়া আবার ইংরাজি পাঠকালে শিখিতে হইবে যে সিতক্ষারদ সোডাকে বলে মাত্র। যদি বলেন যে পূর্ব্বেই তাহা শিখান হইয়াছে মাত্র। আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ দুই দুই শিখাইয়া বালমস্তিষ্ক ভারগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য করিবার আবশ্যকতা কি? বলিবেন, ভাষার-বিশুদ্ধতা যত্নে রক্ষণীয়া। যাহা অধিকাংশ লোকে বুঝে তাহাইত ভাষা, তাহার বিশুদ্ধতা সহজেই রক্ষিত হয়; পণ্ডিত চৌকিদারে মধ্যে মধ্যে তাহার লোপ করিবার চেষ্টা করেন। এরূপ পাণ্ডিত্য কদর্য্য। আমাদের বিবেচনায় মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের শিক্ষকেরা বা ছাত্রেরা যেরূপ শব্দ অধ্যাপনায় বা শিক্ষাকালে ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহারই প্রচার করা সাধারণের আপাততঃ কর্ত্তব্য।

বঙ্গভাষায় দেশী চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রচার কর্ত্তব্য :—আধুনিক লোকের ইংরেজি চিকিৎসাতেই ভক্তি। আমাদিগের বোধ আছে অন্যান্য বিদ্যায়, ইউরোপীয়দিগের যেরূপ প্রাধান্য, চিকিৎসাশাস্ত্রে সেরূপ নহে। দেশী চিকিৎসা প্রণালীতে অনেক সময়েই ইংরেজি চিকিৎসা অপেক্ষা সুসিদ্ধি জন্মিয়া থাকে। উভয়ের গুণ, উভয়ের অভাব আছে। একের যাহা আছে, দ্বিতীয়ের তাহা নাই; দ্বিতীয়ের যাহা আছে, প্রথমের তাহা নাই। উভয়ে সংমিলিত হইলেই পরস্পরের অভাব পূর্ণ হইয়া সর্ব্বরোগ শান্তিদায়ক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ ডাক্তারেরা প্রায় সংস্কৃত জানেন না, বৈদ্যেরা কেহই ইংরেজি জানেন না। এজন্য উভয়ের বিদ্যা অসম্পূর্ণ রহিতেছে। এক্ষণে যদি, দেশী চিকিৎসাশাস্ত্র বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়, তবে দেশী ডাক্তারগণ, তাহার মর্ম্মাবগত হইতে পারেন।

আধুনিক সাধারণ বাঙ্গালা বহি :—আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তান সন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর

যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না।

অশুভক্ষণে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণীত করিয়াছিলেন। ভরসা ছিল, বাঙ্গালার অঙ্গুলি কণ্ডূয়ন ব্যাধিগ্রস্ত মহাশয়েরা, বিষয়াভাবে কাব্যনাটক রচনায় বিমুখ হইবেন। কিন্তু রামায়ণ থাকিতে তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। রামের বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, রামের যুদ্ধ, কুশীলবের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়াবলম্বন করিয়া অসংখ্য অপাঠ্য কাব্যনাটকের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে রত্ন আছে বলিয়া, অধ্যবসায়শালী বাঙ্গালী কবিগণ অবিরত লোণাজল সেচিতেছেন।

কতদিনে এই সকল ঘৃণিত পুস্তক প্রণয়ন রহিত হইবে? এই সকল পুস্তক প্রণেতৃগণ অবশ্য মনে মনে বিবেচনা করেন, আমাদিগের গ্রন্থে বড় রস আছে, এবং আমরা উত্তম নীতিশিক্ষা দিতেছি, কেন না এরূপ কোন বিশ্বাস না থাকিলে, গ্রন্থ প্রচারিত করিবেন কেন? এই বিশ্বাস ভূমণ্ডলে অতি আশ্চর্য্য বিষয় সন্দেহ নাই।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

মিলনে

১

বরষার বরিষণে স্নিগ্ধ শ্যাম বসুন্ধরা,
কুসুমিত উপবন, মুখর ভ্রমর গানে
গগনে উজল শশী পরাণ আকুল করা,
পিক বধূ কলকণ্ঠে ঝঙ্কার পঞ্চম তানে!

২

এমন মধুর দিনে, বহুদূর হ'তে আসি,
দেখা দিল প্রিয় বঁধু মধুর মিলন আশে—
গলে ফুল ফুলমালা, অধরে মধুর হাসি!
বাঞ্ছিত রতনে চির, বাঁধিতে প্রেমের পাশে—

৩

উদিল কি ব্রজে পুনঃ রাধা আশে শ্যামরায়?
আকুল মুরলী গানে, ব্যাকুলা গোপীকা প্রাণ
বরাননা ব্রজাঙ্গনা, হৃদয় সঁপিল পায়;
যমুনার কল কলে ধ্বনিল মিলন তান!

৪

এ মধু মিলন হেরি, তিরপিত আঁখি মোর,
এ মধু যামিনী আজি যেন নাহি হয় ভোর!
এ শুভ মিলন দিনে, আশীর্ব্বাদ করি দোঁহে
মিলন তরণী খানি যেন চির সুখে বহে!

রাণী রাধাপিয়ারী দেবী।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ *।

জানি না, কি শুভ মুহূর্ত্তে কারুণিক মহর্ষি বাল্মীকির কমনীয় কণ্ঠ হইতে অনুরণিত হইল,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

কলনাদিনী তমসা নদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। তীরে মনোজ্ঞ কানন। চতুর সমীরণ অতর্কিতে একবার পুষ্পিত লতার মুখচুম্বন করিয়া ত্বরিতগতিতে তমসার চঞ্চল লহরীতে অঙ্গ মিশাইয়া খেলিতেছে। সমীরণের সে সুখস্পর্শে লতাবধূর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বিকচ কুসুমরাশির সৌরভভারে দিগন্ত আমোদিত। অশোকশাখার অন্তরালবর্ত্তী কোকিলের শ্রুতিসুখকর সঙ্গীতালাপে ও ভ্রমরের মৃদুমধুর গুঞ্জনে কাননভূমি মুখরিত।

কি যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাববিশেষের উন্মাদনায় ক্রৌঞ্চের হৃদয়ের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত মৃদুপদবিক্ষেপে শনৈঃ শনৈঃ ক্রৌঞ্চবধূর কাছে আসিল, এবং চঞ্চুপুটের দ্বারা ধীরে ধীরে তাহার কোমল অঙ্গ কণ্ডূয়ন করিয়া দিতে লাগিল। ক্রৌঞ্চদম্পতির এ সুখসম্ভোগ বুঝি ভাগ্যদেবতার অসহ্য হইল।—প্রিয়তমার প্রতি একবার সস্নেহ কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিষাদশর-বিদ্ধ ক্রৌঞ্চ ভূপতিত হইল। এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া তপস্বী বাল্মীকির করুণামসৃণ হৃদয় গলিয়া গেল,—হৃদয়ের ভাব ভাষায় —কবিতায় প্রকাশিত হইল,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

এই শোক হইতেই রসাত্মক শ্লোকের উৎপত্তি। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়া গেল,—কবিতার প্রভাব, কাব্যের আদর সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শুভক্ষণে কালিদাস জন্মিলেন; তিনি কবিতাসুন্দরীর বরাঙ্গ, রসভাবের মহার্ঘ রত্ন-আভরণে মণ্ডিত করিয়া দিলেন। কবিতাসুন্দরীর সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ যে লক্ষ্য করিল, সে-ই যেন কি এক মধুর ভাবের আবেশে মুগ্ধ হইল। তা'র পর ভবভূতি ভারবি হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহর্ষ জয়দেব পর্য্যন্ত

* ৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২০) 'বারাণসী-সাহিত্য-পরিষদে'র সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ভাবসমূহগণ কবিতাদেবীর প্রসাধন সম্পাদন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। কবিতাদেবীর শেষ সেবক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। সেই মহাকবি জগন্নাথ ও তাঁহার কবি-প্রতিভা-সম্বন্ধে আজ কিছু আলোচনা করিব।

জগন্নাথ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সুবিদিত হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশের অনেকেই তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। বঙ্গীয় শাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের মধ্যেও অল্প লোকই জগন্নাথের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার সহিত পরিচিত। জগন্নাথের এক একটী কবিতা, চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল; তাহার সহিত সহৃদয়তার জ্যোৎস্না সম্পৃক্ত হইলে অনবরত রসধারা প্রস্যন্দিত হইয়া থাকে। এ-হেন কবিশ্রেষ্ঠ বঙ্গদেশে সুবিখ্যাত নহে, জানি না, ইহা কাহার দুরদৃষ্ট,—কবির না, বঙ্গের।

জগন্নাথ বহু গ্রন্থ রচনা করিলেও তন্মধ্যে "রসগঙ্গাধর", "ভামিনীবিলাস" ও "অমৃতলহরী" ('গঙ্গালহরী' নামে প্রসিদ্ধ) (১)—এই তিনখানি গ্রন্থই প্রধান ও সমধিক বিখ্যাত। "ভামিনীবিলাস" কোষকাব্য, "অমৃতলহরী" ভাগীরথীর ভক্তিরসপূর্ণ স্তোত্রমালা। "রসগঙ্গাধর" অলঙ্কার শাস্ত্র। এই গ্রন্থে পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথ অসাধারণ কলা-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাব্যের লক্ষণ-সম্বন্ধে 'কাব্যপ্রকাশ'কার মম্মটভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বতন আল-ঙ্কারিকগণের মত খণ্ডন করিয়া জগন্নাথ নূতন রীতিতে কাব্যের লক্ষণ করিয়া-ছেন,—"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্"। চিত্তচমৎকারক অর্থের প্রতি-পাদক শব্দই কাব্য। অলঙ্কারাদির লক্ষণ ও প্রভেদ-সম্বন্ধেও জগন্নাথ এই গ্রন্থে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সহৃদয়ের উপভোগ্য মনোজ্ঞ বিচারচাতুরী প্রকাশ করিয়াছেন। এই "রসগঙ্গাধরে" যেরূপ তার্কিকতাপূর্ণ সরস আলঙ্কা-রিক বিচার দৃষ্ট হয়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। জগন্নাথ এই গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের রীতিতে সমস্ত লক্ষণাদির পরিষ্কার করিয়াছেন।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এইরূপ একখানি বিচারবহুল সরস অলঙ্কারগ্রন্থ অসম্পূর্ণ। "রসগঙ্গাধরে"র দ্বিতীয় আননের উত্তরালঙ্কার পর্য্যন্তই পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী তিন আনন এবং দ্বিতীয় আননের অবশিষ্ট অংশ গ্রন্থ-প্রকাশকগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এমন কি, শেষ উদাহরণ

(১) জগন্নাথ "রসগঙ্গাধরে" অনন্বয়ালঙ্কারের বিচারপ্রসঙ্গে—"উদাহরণমমৃতলহর্য্যাখ্যে মদীয়ে গঙ্গাস্তবে"—ইহা লিখিয়া "গঙ্গালহরী" নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্রের একটী শ্লোক প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং জগন্নাথকৃত গঙ্গাস্তোত্রের 'অমৃতলহরী' নামই গ্রন্থকারের সম্মত।

শ্লোকটীও সম্পূর্ণ নহে, তৃতীয় চরণ পর্য্যন্তই পরিলক্ষিত হয়। নাগেশভট্ট "গুরু-মর্ম্মপ্রকাশ" নামে "রসগঙ্গাধরে"র টীকা লিখিয়াছেন; তিনিও উত্তরালঙ্কার পর্য্যন্তের ব্যাখ্যা লিখিয়াই টীকা শেষ করিয়াছেন। ইহাতেই অনুমান হয় যে, জগন্নাথ এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই; বিধির বিড়ম্বনায় এক শ্লোকের চতুর্থ চরণ পর্য্যন্ত লেখা না হইতেই তাঁহার লেখনীকে চিরবিশ্রাম দিতে হইয়াছে।

এই অভিনব অলঙ্কার গ্রন্থের ইহাই বিশেষত্ব যে, ইহার উদাহরণের শ্লোকাবলী গ্রন্থকারের স্বরচিত। গ্রন্থকার এই পাণ্ডিত্য-প্রতিভার জন্য একটু গর্ব্ব করিয়াছেন, লিখিয়াছেন,—

"নির্ম্মায় নূতনমুদাহরণানুরূপং কাব্যং ময়াত্র নিহিতং ন পরস্য কিঞ্চিৎ।
কিং সেব্যতে সুমনসাং মনসাপি গন্ধঃ কস্তূরিকাজননশক্তিভৃতা মৃগেণ ॥"

"উদাহরণের অনুরূপ নূতন কবিতা নির্ম্মাণ করিয়া আমি এই অলঙ্কারগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি, অন্যের রচিত একটী শ্লোকও লই নাই। যে মৃগের কস্তূরী উৎপাদনের শক্তি থাকে, সে কি কখনও কুসুম-সৌরভ গ্রহণ করে?"

জগন্নাথ সাহঙ্কারে এই "রসগঙ্গাধর" নামক স্বকৃত গ্রন্থ-রত্নের মহার্ঘতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"নিমগ্নেন ক্লেশৈর্মননজলধেরন্তরুদরং
ময়োন্নীতো লোকে ললিতরসগঙ্গাধরমণিঃ।
হরন্নন্তর্ধ্বান্তং হৃদয়মধিরূঢ়ো গুণবতা-
মলঙ্কারান্ সর্ব্বানপি গলিতগর্ব্বান্ রচয়তু ॥"

"আমি অত্যন্ত আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক চিন্তাসাগরের অন্তর্নিমগ্ন হইয়া এই রমণীয় রসগঙ্গাধরমণি পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছি। ইহা গুণবানের হৃদয়ারূঢ় হইয়া অন্ধকার (গ্রন্থপক্ষে অজ্ঞান) হরণ পূর্ব্বক যাবতীয় অলঙ্কারের (গ্রন্থপক্ষে অলঙ্কারশাস্ত্রের) অহঙ্কার চূর্ণ করুক।"

অন্যান্য আলঙ্কারিক নিবন্ধসত্ত্বেও এই নূতন অলঙ্কারগ্রন্থ রচনার আবশ্যকতার কথা বলিতে গিয়া জগন্নাথ বেশ একটু দম্ভের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"পরিষ্কুর্ব্বন্ত্বর্থান্ সহৃদয়ধুরীণাঃ কতিপয়ে
তথাপি ক্লেশো মে কথমপি গতার্থো ন ভবিতা।
তিমীন্দ্রাঃ সংক্ষোভং বিদধতু পয়োধেঃ পুনরিমে
কিমেতেনায়াসো ভবতি বিফলো মন্দরগিরেঃ ॥"



বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক,

বঙ্গভাষায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রচার ও প্রণয়নকর্ত্তা

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন।

"কতিপয় সহৃদয় সাহিত্যরসিক অলঙ্কারশাস্ত্র পরিষ্কার করুন, তাহাতে আমার "রসগঙ্গাধর"-প্রণয়নের ক্লেশ ব্যর্থ হইবে না। তিমীন্দ্রসমূহ সমুদ্র আলোড়িত করে বলিয়া কি মন্দর পর্ব্বতের আয়াস বিফল হয়?"

শ্লোকের ধ্বনি এই যে, যেমন মন্দরাচলের আলোড়নের ফলে সমুদ্র হইতে দেবভোগ্য অমৃত বাহির হইয়াছিল, তেমনই অলঙ্কারশাস্ত্র মৎকর্ত্তৃক পরিষ্কৃত হইয়া সহৃদয়ের উপভোগ্য অনাবিল রসরাশি প্রসব করিবে।

জগন্নাথের এইরূপ আত্মনৈপুণ্যখ্যাপনের প্রয়াস, কেবল বাহ্যাড়ম্বর নহে, সত্যই তিনি একজন ক্ষমতাশালী মহাকবি। তাঁহার ভক্তিরসের কবিতা কেমন পবিত্র মধুরিমায় পূর্ণ, তাহার দৃষ্টান্তরূপে তৎপ্রণীত "অমৃতলহরী" নামক গঙ্গাস্তোত্র হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"তবালম্বাদম্ব স্ফুরদলঘুগর্ব্বেণ সহসা
ময়া সর্ব্বেঽবজ্ঞাসরণিমথ নীতাঃ সুরগণাঃ।
ইদানীমৌদাস্যং ভজসি যদি ভাগীরথি তদা
নিরাধারো হা রোদিমি কথয় কেষামিহ পুরঃ॥"

"মা গঙ্গে, তোমার আশ্রিত, এই সাহসে অহঙ্কারে বুক ফুলাইয়া সকল দেবতাকে অবজ্ঞা করিয়াছি। এখন যদি এ পাপীকে উদ্ধার করিতে তুমি ঔদাস্য কর, তবে এ নিরাশ্রয় আর কাহার কাছে কাঁদিবে মা!"

জগন্নাথের অন্যোক্ত্যলঙ্কারের কবিতাগুলি, হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল; "ভামিনীবিলাস" হইতে একটী কবিতা উদাহৃত হইল,—

"তৃষ্ণালোলবিলোচনে কলয়তি প্রাচীং চকোরীগণে
মৌনং মুঞ্চতি কিঞ্চ কৈরবকুলে কামে ধনুর্ধুন্বতি।
মানে মানবতীজনস্য সপদি প্রস্থাতুকামেঽধুনা
ধাতঃ কিং নু বিধৌ বিধাতুমুচিতো ধারাধরাড়ম্বরঃ॥"

"সতৃষ্ণ চঞ্চল নয়নে চকোরীবৃন্দ পূর্ব্বদিকে চাহিয়া আছে, কুমুদবন সবে মাত্র ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মদন তাহার কুসুম-কোদণ্ডে টঙ্কার দিতেছে, সবে মাত্র মানিনীর মান ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে, হা বিধাতঃ, এমন সময়ে কি চন্দ্রকে মেঘে ঢাকিয়া ফেলা তোমার উচিত হইল?"

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের সামান্য অনুষ্টুপ্ ছন্দের শ্লোক পর্য্যন্ত কেমন হৃদয়-গ্রাহী, তাহা নিম্নপ্রদর্শিত কবিতাটী পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয়।—

"শ্যামলেনাঙ্কিতং ভালে বালে কেনাপি লক্ষ্মণা।
মুখং তবান্তরাসুপ্তভৃঙ্গফুল্লাম্বুজায়তে॥"

"বালে, তুমি কপালে কাল 'টিপ্' পরিয়াছ বলিয়া তোমার মুখখানি ভৃঙ্গা-লিঙ্গিত ফুল্ল কমলের ন্যায় কেমন সুন্দর দেখাইতেছে!"

জগন্নাথের প্রত্যেক কবিতাই চমৎকার, প্রত্যেক কবিতাই বিশেষত্বে পূর্ণ। কোন্‌টী ত্যাগ করিয়া কোন্‌টী উদ্ধৃত করিব, বুঝিতে পারি না। সকল কবিতাই দেখাইতে ইচ্ছা করে।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যে কেবল কবিত্ব-বৈভবেই গরীয়ান্ ছিলেন, তাহা নহে,—দর্শনাদি সকল শাস্ত্রেই তাঁহার অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ছিল। "রসগঙ্গাধর" গ্রন্থে তিনি যেরূপ অভিনব প্রণালীতে প্রৌঢ় বিচারচাতুরী প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে অভিজ্ঞমাত্রেই চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারেন না। গ্রন্থকার প্রায় প্রত্যেক অলঙ্কারেরই স্বকৃত লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মত খণ্ডনার্থ নানাবিধ সুসঙ্গত আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন। বিদ্বৎ-সম্প্রদায়ে অনেকেরই এইরূপ মত যে, অলঙ্কারশাস্ত্রে "রসগঙ্গাধরে"র সমকক্ষ গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণতা লাভ করিলে নির্ব্বিবাদে সকলেরই এইরূপ মত প্রকাশ করিতে হইত, ইহা নিঃসন্দেহ।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ নানা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিলেও তিনি সম্ভবতঃ গুরুশুশ্রূষা করিয়া অধিক অধ্যয়ন করেন নাই। তিনি "রসগঙ্গাধরে"র প্রথমে লিখিয়াছেন,

"মননতরিতীর্ণবিদ্যার্ণবো জগন্নাথপণ্ডিতনরেন্দ্রঃ।
রসগঙ্গাধরনাম্নীং করোতি কুতুকেন কাব্যমীমাংসাম্॥"

"যিনি চিন্তা-তরণীর সাহায্যে বিদ্যা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই রাজপণ্ডিত জগন্নাথ, কৌতুকবশতঃ "রসগঙ্গাধর" নামক সাহিত্যের বিচারশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন।"

জগন্নাথ যদি গুরুর নিকটে যথারীতি অধ্যয়ন করিতেন, তবে অবশ্যই গ্রন্থে গুরুগণের নাম উল্লিখিত হইত। যে হেতু, তাঁহার পিতা, কোন্ কোন্ অধ্যাপকের নিকটে কি কি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, জগন্নাথ "রসগঙ্গাধরে"র প্রথমে তাহার পর্য্যন্ত পরিচয় দিয়াছেন (১)। চিন্তা ব্যতিরেকে শাস্ত্রমাত্রেরই

---

(১) "শ্রীমজ্‌জ্ঞানেন্দ্রভিক্ষোরধিগতনিখিলব্রহ্মবিদ্যাপ্রপঞ্চঃ
কাণাদীরাক্ষপাদীরপি গহনগিরো যো মহেন্দ্রাদবেদীৎ।
দেবাদেবাধ্যগীষ্ট স্মরহরনগরে শাসনং জৈমিনীয়ং
শেষাঙ্কপ্রাপ্তশেষামলভণিতিরভূৎ সর্ব্ববিদ্যাধরো যঃ।"

মর্ম্মগ্রহ হওয়া অসম্ভব, ইহা সত্য হইলেও জগন্নাথ উল্লেখযোগ্য প্রণালীতে গুরুকরণ করিয়া অধিককাল অধ্যয়ন করিলে অবশ্যই অধ্যয়ন-রীতির পরিচয় প্রদান সম্বন্ধে একেবারে মৌনাবলম্বন করিতেন না। নৈয়ায়িক-সম্রাট্ রঘুনাথ শিরোমণি "অনুমিতি"র প্রথমে স্বকীয় শাস্ত্র-পরিজ্ঞানের হেতুরূপে অধ্যয়ন এবং ভাবনা উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়।—

"অধ্যয়নভাবনাভ্যাং সারং নির্ণীয় নিখিলতন্ত্রাণাম্।
দীধিতিমধিচিন্তামণি তনুতে তার্কিকশিরোমণিঃ শ্রীমান্॥"

জগন্নাথের সময়-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এইবার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। জগন্নাথ দিল্লীশ্বরের আশ্রয়ে যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তিনি "ভামিনী-বিলাসে"র শেষে এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন (১)। তিনি "রসগঙ্গাধর" গ্রন্থেও দিল্লীশ্বরের গুণগৌরবপূর্ণ তিনটী উদাহরণ শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, দৃষ্ট হয় (২)। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ, দিল্লীর কোন্ বাদ্সাহের সভাপণ্ডিত-পদ লাভ করিয়াছিলেন, ইহার নির্ণয়ের জন্য প্রমাণান্তরের অনুসন্ধান করিতে

---

(১) "শাস্ত্রাণ্যাকলিতানি নিত্যবিধয়ঃ সর্ব্বেঽপি সম্ভাবিতা
দিল্লীবল্লভপাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ।
সম্প্রত্যুজ্ঝিতবাসনং মধুপুরীমধ্যে হরিঃ সেব্যতে
সর্ব্বং পণ্ডিতরাজরাজিতিলকেনাকারি লোকাধিকম্॥"

(২) "দৃষ্টঃ দৃষ্টিকৃতা পুরা কিল পরিত্রাতুং জগন্মঙ্গলং
ত্বং চণ্ডাতপ নির্দ্দয়ং দহসি যজ্জ্বালাজটালৈঃ করৈঃ।
সংরম্ভারুণলোচনো রণভুবি প্রস্থাতুকামোঽধুনা
জানীমো ভবতা ন হন্ত বিদিতো দিল্লীধরাবল্লভঃ॥"

—"রসগঙ্গাধর", বারাণসীতে মুদ্রিত পুস্তকের ৬৪৩ পৃষ্ঠা।

"সুরাণামারামাদিহ ঝটিতি ঝঞ্ঝানিলহতাঃ
পতেয়ুঃ শাখীন্দ্রা যদি তদখিলো নন্দতি জনঃ।
কিমেভির্বা কার্য্যং শিব শিব বিবেকেন বিকলৈ
শ্চিরং জীবন্নাস্তামধিধরণি দিল্লীনরপতিঃ॥"

—"রসগঙ্গাধর", বারাণসীতে মুদ্রিত পুস্তকের ৬৬৯ পৃষ্ঠা।

"মাহাত্ম্যস্য পরোঽবধির্নিজগৃহং গম্ভীরতায়াঃ পিতা
রত্নানামহমেক এব ভুবনে কোবা পরো মাদৃশঃ।
ইত্যেবং পরিচিন্ত্য মাস্ম সহসা গর্ব্বান্ধকারং গমো
দুগ্ধাব্ধে ভবতা সমো বিজয়তে দিল্লীধরাবল্লভঃ॥"

—"রসগঙ্গাধর", বারাণসীতে মুদ্রিত পুস্তকের ৭৮৬ পৃষ্ঠা।

হয় না, তিনি স্বয়ং "রসগঙ্গাধরে"র একটী উদাহরণ শ্লোকে স্পষ্টতঃ ভারত-সম্রাট্ শহাজহান মহীপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন,—

"ভূমীনাথ শহাজহান ভবতস্তুল্যো গুণানাং গণৈ
রেতদ্ভূতভবপ্রপঞ্চবিষয়ে নাস্তীতি কিং ক্রমহে।
ধাতা নূতনকারণৈর্যদি পুনঃ সৃষ্টিং নবাং ভাবয়ে
ন্নস্যাদেব তথাপি তাবকতুলালেশং দধানো নরঃ॥"

"হে পৃথ্বীপতে শাহজহান, গুণগরিমায় আপনার তুল্য মনুষ্য যে বর্ত্তমান সৃষ্টিতে নাই, ইহার কথা আর কি বলিব? বিধাতা যদি নূতন উপাদানে নূতন সৃষ্টি করেন, তথাপি আপনার সহিত আংশিকভাবেও উপমিত হইবার যোগ্য লোক জন্মগ্রহণ করিবে না।"

এই সম্রাট্ শাহজহানই যে জগন্নাথের গভীর পাণ্ডিত্য ও অনন্যসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'পণ্ডিতরাজ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, জগন্নাথের স্বকৃত "আসফবিলাস" নামক আখ্যায়িকার প্রথমে লিখিত —"সার্ব্বভৌমশ্রীশহাজহানপ্রসাদাধিগতপণ্ডিতরাজপদবীবিরাজিতেন তৈলঙ্গকুলাবতংসেন পণ্ডিতজগন্নাথেনাসফবিলাসাখ্যেয়মাখ্যায়িকা নিরমীয়ত। সেয়মনুগ্রহেণ সহৃদয়ানামনুদিনমুল্লাসিতা ভবতাৎ।" ইত্যাদি লিপিই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। সম্রাট্ শাহজহান ১৬২৭—১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীই জগন্নাথের স্থিতিকাল অবধারিত হয়। জগন্নাথ জীবনের শেষ ভাগ বারাণসীতে ও পরে মথুরায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তা'ই তিনি "ভামিনীবিলাসে"র শেষে লিখিয়াছেন,—

"সম্প্রত্যুজ্ঝিতবাসনং মধুপুরীমধ্যে হরিঃ সেব্যতে"

"এক্ষণে সমস্ত আশা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া মথুরাধামে শ্রীহরির চরণসেবা করিতেছি।"

হলায়ুধ প্রণীত "কবিরহস্য" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় রাজা শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে স্ববংশের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয়প্রদান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"The celebrated poet Jagannath who received the title of "The King of the Learned" (পণ্ডিতরাজ) was descended from this family. The Rasagangadhara, Bhaminivilash,

Rekhaganita (Geometry) (১) and other works have kept alive the fame of Jagannath."

রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের এ উক্তি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ, "ভামিনীবিলাস" "রসগঙ্গাধর" প্রভৃতির প্রণেতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বাঙ্গালী নহেন, তৈলঙ্গ। "রসগঙ্গাধরে"র প্রথমে তিনি নিজ পিতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"পাষাণাদপি পীযূষং স্যন্দতে যস্য লীলয়া।
তং বন্দে পেরুভট্টাখ্যং লক্ষ্মীকান্তং মহাগুরুম্॥"

"যাঁহার মহিমায় পাষাণ হইতেও পীযূষ নিস্যন্দিত হয়, লক্ষ্মী যাঁহার পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী, সেই মহাগুরু পিতৃদেব পেরুভট্টকে নমস্কার করি।"

'পেরুভট্ট' নাম যে বাঙ্গালীর নহে, ইহার জন্য সম্ভবতঃ প্রমাণান্তরের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। এই আকারের নাম দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই প্রচলিত। জগন্নাথ যে তৈলঙ্গজাতীয়, তৎপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ, পূর্ব্বোদ্ধৃত "আসফবিলাস" আখ্যায়িকার গদ্যাংশে অভিহিত হইয়াছে। তিনি ইহাতে স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন,—"তৈলঙ্গকুলাবতংসেন পণ্ডিতজগন্নাথেনাসফবিলাসাখ্যেয়মাখ্যায়িকা নিরমীয়ত।" স্বকৃত "প্রাণাভরণ" নামক গ্রন্থেও "তৈলঙ্গান্বয়মঙ্গলালয়—" ইত্যাদি শ্লোকে তিনি নিজেকে তৈলঙ্গবংশোদ্ভব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"রসগঙ্গাধর" "ভামিনীবিলাস" ও "অমৃতলহরী" (গঙ্গালহরী) ভিন্ন জগন্নাথের রচিত "করুণালহরী", "লক্ষ্মীলহরী", "সুধালহরী", "প্রাণাভরণম্" ও "চিত্রমীমাংসাখণ্ডনম্" মুদ্রিত হইয়াছে। তৎকৃত "জগদাভরণম্" "আসফবিলাসঃ" ও "মনোরমাকুচমর্দ্দনম্" এখন পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই;—এই কয়েকখানি গ্রন্থের মধ্যে কোনও খানি সম্পূর্ণ কোনও খানি বা অসম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। "চিত্রমীমাংসাখণ্ডনম্" অপ্পয় দীক্ষিতের রচিত "চিত্রমীমাংসা" নামক

---

(১) "রেখাগণিত", কবিরূপে প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-প্রতিপাদ্য জগন্নাথের প্রণীত কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, "রেখাগণিত"-কার জগন্নাথের উপাধি সম্রাট্, আর ইঁহার উপাধি পণ্ডিতরাজ। আর দ্বিতীয়তঃ "রেখাগণিত" মহারাজ জয়সিংহের আদেশে ইউক্লিডের জ্যামিতির আরবী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া প্রণীত হয়। "রেখাগণিতে" গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন,—"শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে। পারম্পর্য্যবশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥ তদ্বুৎসন্নং মহারাজজয়সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ। প্রকাশিতং ময়া সম্যগ্‌গণকানন্দহেতবে॥" শাহজহানের রাজ্যচ্যুতির পর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ যে জয়পুরে আসিয়া মহারাজ জয়সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অলঙ্কারগ্রন্থের ও "মনোরমাকুচমর্দ্দনম্" ভট্টোজী দীক্ষিতের রচিত "মনোরমা" নামক তৎকৃত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র টীকাগ্রন্থের খণ্ডন। "আসফবিলাসঃ" জাহাঙ্গীরের প্রধান মন্ত্রী, শাহজহানের শ্বশুর আসফ খাঁর চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত। এই আসফ খাঁর সাহায্যেই শাহজহান রাজসিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১)।

জনশ্রুতি, এই জগন্নাথের জীবনের একটী রহস্যময় ঘটনার প্রচার করে। জগন্নাথ দিল্লীতে অবস্থানকালে বাদসাহের কন্যাস্থানীয়া কোনও যবনীর প্রতি আসক্ত হন; এমন কি সেই যবন-কন্যাকে বিবাহ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। "যবনী নবনীতকোমলাঙ্গী শয়নীয়ে যদি নীয়তে কথঞ্চিৎ। অবনীতলমেব সাধু মন্যে ন বনী মাঘবনী বিনোদহেতুঃ॥" জগন্নাথের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইত্যাদি পদ্যই তথাকথিত কিংবদন্তীর সাক্ষ্য প্রদান করে। শাহজহানের রাজ্যচ্যুতির পর জগন্নাথ কাশীধামে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহেন। কিন্তু বারাণসীর কোনও পণ্ডিতই তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিলেন না, অধিকন্তু তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার চেষ্টা করিলেন। জগন্নাথ এইভাবে প্রত্যাখ্যাত ও অবমানিত হইয়া পাপক্ষালনের উদ্দেশে গঙ্গাতীরে বসিয়া ভক্তিগদ্‌গদস্বরে ভাগীরথীর স্তব করিতে আরম্ভ করেন। জগন্নাথ এক একটী শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, আর গঙ্গার জলপ্রবাহ এক এক সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোক পূর্ণ হইলে জগন্নাথের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিল। এই স্তোত্রমালাই "অমৃতলহরী" বা "গঙ্গালহরী" নামে বিখ্যাত।

"কৃতক্ষুদ্রৈনস্কানথ ঝটিতি সন্তপ্তমনসঃ
সমুদ্ধর্ত্তুং সন্তি ত্রিভুবনতলে তীর্থনিবহাঃ।
অপি প্রায়শ্চিত্তপ্রসরণপথাতীতচরিতান্
নরানূরীকর্ত্তুং ত্বমিব জননি ত্বং বিজয়সে॥"—১৭শ শ্লোক।
"ত্রপন্তে তীর্থানি ত্বরিতমিহ যস্যোদ্ধৃতিবিধৌ
করং কর্ণে কুর্ব্বন্ত্যপি কিল কপালিপ্রভৃতয়ঃ।

---

(১) Shah Jehan, 1627-1658. On the news of Jehangir's death, Prince Kurram and Muhabat Khan hurried from the Deccan. Shariyar, aided by Nur Jehan, had meanwhile made an attempt to seize the throne. Fortunately for Prince Kurram he had a powerful friend at court in the person of Asaf Khan, Jehangir's chief minister. Kurram had married his daughter Mumtaz Mohal, and Asaf Khan was therefore deeply interested in helping him to secure the throne.

History of India
By C. F. De La Fosse M.A., Oxon.

ইদং তং মামদ্য ত্বমিরমনুকম্পার্দ্রহৃদয়ে
পুনানা সর্ব্বেষামঘমথনদর্পং দলয়সি।"—২৮শ শ্লোক।

ইত্যাদি "গঙ্গালহরী"র শ্লোক দৃষ্টি করিলে সহজতঃই অনুমিত হয় যে, জগন্নাথ একটা গুরুতর মহাপাতকানুষ্ঠানের পর গঙ্গার স্তব করেন। কাজে কাজেই পূর্ব্বোল্লিখিত জনশ্রুতি যে একেবারে অমূলক, একথা বলা কঠিন। বিশেষতঃ "ভামিনীবিলাসে"র টীকাকার অচ্যুত রায়, শৃঙ্গারোল্লাসের প্রথম কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত জনপ্রবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন (১)।

শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্য।

চুম্বন।

অলক্ষ্যে শিশির বিন্দু চুমিতেছে ফুলরাশি;
জোছনা চুমিছে সিন্ধু কি আনন্দ পরকাশি
সিন্ধুও অধীর ভাবে চুমিছে বালুকা বেলা;
নির্জ্জনে নির্ঝর ঝরে চুমিতে হৃদয় শিলা।
চুমিতে সুনীল শূন্য গিরিবর আত্মহারা;
চুমিতে ধরণী বক্ষ ঝরিছে শ্রাবণ ধারা।
জননী আপনা হারা চুমিতে সন্তানগণে;
চকিতে চপলা চুমে চারু নীল নবঘনে।
কে তুমি অধরে নাথ দিয়েছ' এমন সুধা?
প্রণয়ীর চুম্বনেতে মিটে যায় প্রেমক্ষুধা।
তুষার চুম্বনে বুঝি পাষাণও গলিয়া যায়—
তপত চুম্বনে কত হৃদয় পাগল প্রায়।
কে বলেরে আছে ধরা শুধু মাধ্য-আকর্ষণে?
আমি দেখি বাঁধা ধরা প্রণয়ের সে চুম্বনে॥

শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক।

---

(১) "কিমত্র কবেনির্জধর্ম্মপত্ন্যেব বর্ণনীয়ত্বেনাভিমতেতি ব্রুবে। যদ্বা বা লোকপ্রসিদ্ধা "যবনী নবনীতকোমলাঙ্গী শয়নীয়ে যদি নীয়তে কথঞ্চিৎ; অবনীতলমেব সাধু মন্যে ন বনী মাঘবনী বিনোদহেতুঃ॥" ইতিসুপ্রসিদ্ধৈতদীয়পদ্যসিদ্ধা যবনবিশেষস্য কস্যচিৎ পৃথ্বীপতে-র্দুহিতা। আদ্যে শ্রীমদ্‌গঙ্গাপ্রসাদাসাদিতসূরিবরত্বোত্তরমিশ্রগ্রন্থে পৃথ্বীপতিং প্রত্যুপেত্য "শীতার্ত্তা ইব সঙ্কুচন্তি দিবসা নৈবাম্বরং শর্ব্বরী শীঘ্রং মুঞ্চতি কিঞ্চ সোঽপি হুতভুক্‌কোণং গতো ভাস্করঃ। ত্বঞ্চানঙ্গহুতাশভাজি হৃদয়ে সীমন্তিনীনাং গতো নাস্মাকং বসনং ন বা যুবতয়ঃ কুত্র ব্রজামো বয়ম্॥" [শীতার্ত হইয়া দিন গুলি সঙ্কুচিত হইতেছে, রজনীও শীঘ্র অম্বর ছাড়িতে চাহে না, এত শীত যে ভাস্কর পর্য্যন্ত অগ্নিকোণ আশ্রয় করিয়াছে, তুমিও সীমন্তিনীদিগের কামানলদীপ্ত হৃদয় আলিঙ্গন করিয়াছ, আমাদের না আছে বসন, না আছে যুবতি, আমরা কোথায় যাই?] ইতিশ্লোকেন স্ববৃত্তবিনিবেদনং যদনেন কবিনা কৃতমিতি বৃদ্ধপরম্পরোদন্তসুপ্রসিদ্ধ-মেব। তত্র স্বপত্ন্যাভাবস্য ব্যক্ততরত্বাদসম্ভব এব। তদুর্দ্ধন্ত নিরস্তবদ্ধা এব শ্রীমদ্‌গঙ্গাপ্রসাদ-মদেনাঙ্গীকারাৎ ক নাম ধর্ম্মপত্নীত্বসম্ভবঃ। যতস্তদর্থমেব কাশ্যাং সম্ববিপ্রৈর্বহিষ্কারে কৃতে ততঃ পাবনতায়ৈ পূর্ব্বতপোবশীকৃতাং শ্রীগঙ্গামেব "পীযূষলহরী" নাম্না "সমৃদ্ধং সৌভাগ্যং সকল-বসুধায়াঃ কিমপি তৎ' ইত্যাদিদ্বিপঞ্চাশৎপদ্যাত্মনা গঙ্গাস্তবেনাভিনবেন তাং স্তুত্বা প্রতিশ্লোক-মেকৈক সোপানং জলেনাতিক্রামন্ত্যা তয়াসাবস্তিকালিত ইত্যপি বৃদ্ধপ্রসিদ্ধ্যৈব সিদ্ধম্।"

জীবন-সংগ্রামে স্বাভাবিক নির্ব্বাচন।

বিষম জীবিকা-রণ
যুঝে' যুঝে' অনুক্ষণ

কেবল বড়াল-কবি বিরক্ত হইয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার বলিয়াছিলেন

অনিবার্য্য এ সংগ্রাম—
যুঝি তবে অবিরাম
করি প্রাণপণ।

তাহা নহে। তাঁহার মত ললিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে না পারিলেও পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই এই বিষম জীবিকা-রণে ব্যতিব্যস্ত হইতেছে অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে বুঝিতেছে যে অবিশ্রান্তভাবে এ সমরে যুঝিতে না পারিলে কাল-কবলিত হইতে হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে এ সংগ্রামে কত জীব ধ্বংস হইতেছে তাহার কে ইয়ত্তা করিবে? আমরা প্রকৃতির লাবণ্যভরা মুখচ্ছবি দেখি। নাট্যশালায় পরম ভক্ত নারদমুনির বীণাযন্ত্রে হরিনাম গান শুনিয়া ক্ষণেকের জন্য প্রাণমন পবিত্র করি। তখন ভাবি না যে সেই নারদ-বেশী নট যবনিকার অন্তরালে কত সুরার পাত্র নিজদেহে নিঃশেষ করিয়াছে, কত ঘৃণিত কার্য্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। যখন তন্দ্রাবিজড়িতনেত্রে রজনীর সুখস্বপ্নের স্মৃতিতে অলসভাবে শয্যায় শুইয়া কলকণ্ঠ শ্যামার মধুর সঙ্গীত লহরীতে মজিয়া থাকি তখন আমাদের হৃদয়তন্ত্রী হইতে শব্দ উঠে—'কি ধন্য পাখী বিধাতার কি পুণ্যময় সৃষ্টি।' তখন ভাবি না যে এই মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গম কত নিঃসহায় কীটের প্রাণ সংহার করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, কত জীবন ইহার দ্বারা নষ্ট হইয়াছে। ময়ূরের কি শোভনীয় পুচ্ছ, কি শান্ত মূর্ত্তি। কিন্তু উনি জীব সংহার করিতে বড় মনের শোভার পরিচয় প্রদান করেন না। পোকা, মাকড়, ছোট ছোট চতুষ্পদ জীব, দরিদ্র কৃষকের যত্নবর্দ্ধিত অনেক শস্য শিখী প্রত্যহই আপনার জঠরাগ্নিতে আহুতি প্রদান করে। আবার যাহাদের আমরা নিরীহ ভাবি সেই কীট পতঙ্গগুলিও তাহাদের অপেক্ষা দুর্ব্বল কীট-পতঙ্গের প্রাণনাশ করিতে পরাঙ্মুখ নহে।

এ সংগ্রাম জগতে অহরহঃ চলিতেছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এক শ্রেণীর জীব অপর শ্রেণীর জীবকে ধ্বংস করিতেছে; একটি জীব অপর জীবকে

ধ্বংস করিতেছে। যেমন সৃষ্টি হইতেছে তেমনি সংহার হইতেছে। রুদ্রমূর্ত্তিতে ভগবান যত সংহার করিতেছেন, ব্রহ্মামূর্ত্তিতে তাহা অপেক্ষা তিনি যত জীব সৃষ্টি করিতেছেন বিষ্ণুমূর্ত্তিতে কেবল সেই উদ্বৃত্ত সংখ্যাই তিনি পালন করিতেছেন। একত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় চলিতেছে। যে সকল জীব বা উদ্ভিদকে তিনি এই সংহারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন তাহারা কোন্ মন্ত্রের বলে এ বিষম সমরে জয়ী হইতেছে, আমরা তাহার তথ্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব।

এই অবিশ্রান্ত সমর নানারূপে চলিতেছে। প্রথমতঃ একজাতীয় জীব অপর জাতীয় জীবকে মারিয়া খাইতে না পারিলে উহার ক্ষুধানল প্রশমিত হয় না। সিংহ ও শার্দ্দূলের আহারের নিমিত্ত হরিণ, ছাগল, গরু, ভেড়া প্রভৃতিকে প্রাণদান করিতে হয়। আবার হরিণ, ছাগল, গবাদির উদর-পূরণের জন্য শস্পলতা ক্ষুদ্রতরুকে-প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। ইহা তো গেল খাদ্য-খাদকের সংগ্রাম। আবার দেখি একই জাতীয় দুই শ্রেণীর জীবের মধ্যে প্রতিযোগিতা। বাঘও ছাগল ধরিয়া খায়, সেই বনে পশুরাজ সিংহ থাকিলে তাহাকেও ছাগল ধরিয়া খাইতে হয়। সুতরাং সিংহ কমিলে বাঘের আহারের সুবিধা হয়। কতকগুলা বাঘকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে কেশরীর পক্ষে অজসংহার তত কঠিন কার্য্য হয় না। বাঘ দেখিলেই সিংহ গর্জ্জন করে, বাঘও সুবিধা পাইলে সিংহের টুঁটি টিপিয়া ধরে। একই জাতীয় জীবের মধ্যে এ রণদুন্দুভি নীরব নহে। একজন সিংহ অপরকে দেখিলে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবমান হয় বটে তবে সে আলিঙ্গনে বন্ধুত্বের হৃদ্যতা থাকে না, তাহা মরণের শীত আলিঙ্গন। অনেক সময় ঠিক এক জাতি অপর জাতিকে গলা টিপিয়া মারে না। জীবনের জন্য উভয়েই ছুটিতে থাকে, একজন পিছনে পড়িয়া থাকে বলিয়া সে আর ছুটিতে পারে না, পথে মরিয়া পড়িয়া থাকে। যে ছুটিতে পারে সে আর তাহার দিকে তাকায় না। অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত ভূমিতে যদি একটী সুপারির চারা ও একটী রসাল শিশুকে পুতিয়া রাখা যায় তাহা হইলে সেই জমি হইতে সমস্ত রস, জীবনের সমস্ত উপকরণ সুপারি বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া বাড়িতে থাকিবে, আম্রতরু অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে। এ নীরব জীবন সংগ্রামে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। আষাঢ়ের বারিসিঞ্চনে যখন মাঠপথ শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, রাশি রাশি আগাছা জন্মিয়া কৃষককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, তখনও শাল গাছের বনে সুপারী কাননে বা পেয়ারা বাগানে আমরা অক্লেশে বিচরণ করিতে পারি। এ সকল গাছের তলায় আগাছা জন্মিতে পারে না, এমন কি একটা কচু

গাছও ইহাদের আওতায় জন্মিয়া ইহাদের পদসেবা করিবার ক্ষমতা পায় না। বরষার পূর্ব্বে যেমন সর্ব্বত্র আগাছার বীজ পতিত হয়, শালবনেও তেমনি আগাছার বীজ উড়িয়া পড়ে। কিন্তু শাল-বৃক্ষের জীবন-সংগ্রামে এমন নিপুণতা যে সে ইতস্ততঃ মাটিতে কোথাও এমন একটু আহার্য্য রাখে না যাহা দ্বারা লতা-গুল্ম ক্ষুদ্র বৃক্ষ পুষ্ট হইতে পারে।

আরও এক রকমে জীবন-সংগ্রাম চলিয়া থাকে। মাধবীলতা যখন রসালের দেহে নির্ভর করিয়া থাকে তখন সেই চ্যুতবৃক্ষকে ছেদন করিলে পরোক্ষে মাধবীলতাকেও বিনষ্ট করা হয়। কুকুর শৃগালের গাত্রে সংবদ্ধ থাকিয়া এটেলি পোকা তাহাদের রক্তে জীবনধারণ করে। প্রত্যক্ষে কুকুর শৃগাল মারিলে পরোক্ষে এটেলি পোকার প্রাণবধ করা হয়। শ্যেন পক্ষী ছোট ছোট পক্ষী মারিয়া খায়। ছোট পাখী ভূমি হইতে পোকা ধরিয়া খায়। সেই পোকা গাছের বীজ আহার করে। সুতরাং সেই বীজের বাহুল্যের উপর শ্যেন পক্ষীর বাহুল্য নির্ভর করে। মধুচক্রের শত্রু মূষিক। কাজেই মার্জ্জারের হ্রাস-বৃদ্ধির উপরে মধুচক্রের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। মৌমাছির দল আসিয়া যখন আমাদের বাসগৃহের এক কোণে মধুচক্র রচনা করে তখন যে কেবল তাহারা আমাদের বিরক্ত করিবার জন্য বা আমাদিগকে মধুর আস্বাদন দিবার জন্য এরূপ কার্য্য করে তাহা নহে। তাহারা জানে যে লোকালয়ে বিড়াল, কুকুর বা মানুষের তাড়নায় ইঁন্দুর জাতি তাহাদের নিজেদের প্রাণ লইয়া শশব্যস্ত থাকিবে, তাহারা মধুচক্র ভাঙ্গিতে আসিবে না।

এই জীবন-সংগ্রাম দেশের ঋতুর উপর অনেকটা নির্ভর করে। এই বৎসরে জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বিষম বরষা নামিয়াছে তাহাতে কলিকাতা সহরে জলপ্লাবিত পথিমধ্যে অনেক বায়সের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের জীবন-সংগ্রামে এ একটা নূতন শত্রু আসিয়া অনেককে ধ্বংস করিয়াছে। বালকেরা শীতকালে বুলবুলি পাখি পুষিয়া তাহাদিগকে কলা, তেলাকুচা, ছাতু খাওয়াইয়া কত যত্ন করিয়া রাখে, ফাল্গুনের হাওয়ায় যখন চারিদিকে কোকিল ডাকিয়া উঠে, তখন বুলবুলের লেজের পালক খসিতে আরম্ভ হয়, বৈশাখের শ্যামা দোয়েল কোকিল পাপিয়ার কূজন শুনিতে শুনিতে বেচারা প্রাণত্যাগ করে। যাহারা শীতকালে কলিকাতায় বসিয়া দীর্ঘলোম ভূটীয়া কুকুর কিনিয়া মনের সুখে বন্ধুবান্ধবের প্রশংসা শুনিতে পায়, গ্রীষ্মে তাহাদের সেই সারমেয়ের জন্য শোকাভিভূত হইতে হয়।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও জীব-জগতে যে পরিমাণে সৃষ্টি হয় তাহাতে এই ভীষণ অবিশ্রান্ত জীবন-সংগ্রাম অনিবার্য্য। স্বল্পপ্রসবিনী হস্তিনীর বংশবৃদ্ধির একটা হিসাব করিলে বুঝিতে পারা যায় কি পরিমাণে পৃথিবীতে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হস্তিনী ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে নব্বই বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান প্রসব করিতে পারে। এই ষাইট বৎসরের মধ্যে এক হস্তীমিথুনের তিন জোড়া শাবক জন্মিতে পারে। হস্তিনী অপেক্ষা স্বল্পপ্রসবিনী জীব জগতে নাই। যদি তাহাদের সকল সন্তান-সন্ততি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, পঞ্চ শতাব্দী পরে এক জোড়া হস্তীর এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ বংশধর জীবিত থাকিবে। মূষিক, শশক প্রভৃতি জীবের কিরূপ বাহুল্য হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। মানুষের সংখ্যা পঁচিশ বৎসরে দ্বিগুণ হয়। যদি মনুষ্য জগতে অকালমৃত্যু রোধ হয় তাহা হইলে কয়েক সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীতে মানুষের পাশাপাশি কেবল দাঁড়াইয়া থাকিবার স্থান সঙ্কুলন হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, জগতে এই ভীষণ জীবন-সংগ্রাম অনিবার্য্য। একের হস্তে অপরের মরণ অবশ্যম্ভাবী; এক জাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির উচ্ছেদ স্বাভাবিক।

মানবজাতির রুচি যতই মার্জ্জিত হউক তাহাদের অভাব-অভিযোগ, সাধ-অভিলাষ যতই বিভিন্ন আকারের হউক, জীব-জগতের সহিত তাহাদের দুইটা প্রবৃত্তি সমান আছে। বস্তুতঃ এই দুইটা প্রবৃত্তি জীবজগতে স্বাভাবিক। এই দুইটা প্রবৃত্তি জগতের সমগ্র অধিবাসীর হৃদয়ে বিদ্যমান। এই দুইটা প্রবৃত্তি লইয়া তাহারা ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। প্রথম প্রবৃত্তি—আত্মরক্ষা। জগতের সর্ব্বত্র ঐ এক নীতি—'আত্মানং সততং রক্ষেৎ'। দ্বিতীয় প্রবৃত্তি বংশ বৃদ্ধি করিবার। উপরে যে জীবন-সংগ্রামের কথা বলিয়াছি তাহা ঐ প্রথম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। বংশবৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যও জীবকে নিত্য সংগ্রাম করিতে হয়। একটা কুক্কুরীর জন্য পাঁচটা কুক্কুরকে কামড়াকামড়ি করিয়া রক্তাক্ত কলেবর হইতে হয়। ভোমরাকে আকর্ষণ করিবার জন্য ফুলেদের লাল নীল রঙ্গে সাজিতে হয়, ময়ুরকে নাচিতে হয়, কোকিলকে ডাকিতে হয়, এমন কি ঝিঁঝিপোকাকে স্ত্রীজাতীয় ঝিঁঝিপোকা আকর্ষণ করিবার জন্য পায়ে পায়ে ঘষিয়া বিষম শব্দ করিতে হয়। অবশ্য এ জীবন-সংগ্রাম প্রত্যেক জাতীয় জীবের নিজেদের মধ্যে আরদ্ধ এবং পুরুষে পুরুষে কখনও বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে হইয়া থাকে। মোটের উপর লড়াইটা স্ত্রী-

লাভের জন্য পুরুষদিগের মধ্যেই অধিক হইয়া থাকে। জীবনের জন্য সংগ্রাম যত ভীষণ, স্ত্রীলাভের জন্য সংগ্রাম অবশ্য ততটা ভয়ঙ্কর নহে। তবুও দেখা যায়, একটা স্ত্রী-লাভের জন্য কতকগুলা কুম্ভীর পরস্পরের সহিত ভীষণ-ভাবে দশনযুদ্ধ, পুচ্ছযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ করিয়া জলকে তোলপাড় করিয়া দেয়। পুরুষজাতীয় বিলাতী সামন মাছগুলা না কি স্ত্রী-লাভের জন্য সারাদিন পরস্পরের সহিত যুঝিয়া থাকে। কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ বলেন, এই যুদ্ধের জন্যই নাকি সিংহের কেশর থাকে, বন্যবরাহের দন্ত থাকে।

পক্ষীজাতির মধ্যে এ বিষয়ক দৈনিক সংগ্রাম অল্প। পুরুষ পাখীগুলা গান গাহিয়া 'কুহু, কুহু' 'চোক গেল' 'বৌ কথা কও' প্রভৃতি ডাকিয়া সঙ্গিনী সংগ্রহ করে। শিখী পুচ্ছ ছড়াইয়া একটু নাচিয়া শিখিনীর প্রেমলাভে কৃতচেষ্ট হয়। বার্ড অফ্ প্যারাডাইস্ প্রভৃতি পাখিদের একদিকে অনেকগুলি পুরুষ দাঁড়ায় এবং অপর দিকে অনেকগুলি পক্ষিণী সমবেত হয়। পক্ষীদিগের মধ্য হইতে একটী একটী করিয়া পাখী অগ্রসর হইয়া তাহাদের সুন্দর পক্ষ বিস্তার করিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া নানা প্রকারে পক্ষিণী আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। যাহার পক্ষের জাঁকজমক অধিক, দেহ সবল, তাহার কাছে একটী স্বয়ম্বরাভিলা-ষিণী পক্ষিণী আসে, তখন উভয়ে উড়িয়া গিয়া উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আমরা দেখিয়াছি জগতে কিরূপ অবিশ্রান্তভাবে জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। এক জাতীয় জীব অপর জাতীয় জীবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, এক জাতীয় জীবের মধ্যে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত বাদ সাধিতেছে, এক শ্রেণীর মধ্যে এক আকারের জীব বিভিন্ন আকারের জীবের সহিত যুঝিতেছে এবং এক আকারের প্রত্যেক জীব অপরটির সহিত ভীষণ সংগ্রামরত। আবার বংশ-বৃদ্ধির জন্যও পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব হইতেছে। প্রত্যেক জীবের যত সন্তান-সন্ততি জন্মিয়া থাকে, তাহাদের সকলের পক্ষে খাদ্যদ্রব্য ও বাসস্থান সংগ্রহ করা অসম্ভব। তাই এই যুদ্ধ, সেই জন্যই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রত্যেকেই সম্মুখে ছুটিতেছে। যে পিছনে পড়িতেছে তাহাকে কালরূপ রাক্ষসী ধরিয়া খাইতেছে। যে যোগ্যতম সেই বাঁচিতেছে যে অযোগ্য তাহাকে ধ্বংসের মুখে পড়িতে হইতেছে।

এই যে যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) ইহা কিরূপে সংঘটিত হইতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তা করিলেই প্রদান করা যাইতে পারে। যে তাহার পরিবেষ্টনীর সাহায্য লইতে পারে, যে তাহার আশপাশের অবস্থা বুঝিয়া আপনার জীবনধারণের ব্যবস্থা করিতে পারে, যে আপনার

জীবনকে পরিবেষ্টনীর সহিত 'খাপ' খাওয়াইতে পারে (adaptation to environment) এ সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী তাহার দিকে। একটী অরণ্যে যদি দুই শ্রেণীর হরিণ থাকে আর তাহাদের পরম শত্রু গুটিকতক ব্যাঘ্র সেই বনে বিরাজ করে, তাহা হইলে উভয় জাতীয় মৃগের মধ্যে যে জাতি অধিক সতর্ক, যাহার নয়নের জ্যোতিঃ অধিক উজ্জ্বল, যাহার কর্ণ সামান্যমাত্র শব্দ ধরিতে পারে, যাহার নাসিকা পূর্ব্বেই ব্যাঘ্রের গন্ধের আস্বাদন পায় এবং পরিশেষে যাহার চরণগুলি ত্বরায় তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে পারে—সেই মৃগই আপনার পরিবেষ্টনীর মধ্যে আপনাকে 'খাপ' খাওয়াইতে পারে। যে বুঝে

আগে চল্ আগে চল্ ভাই
পড়ে থাকা পিছে
মরে থাকা মিছে
আগে চল্ আগে চল্ ভাই—

জীবন-সংগ্রামে সেই জয়ী হয়, তাহারই জাতি জগতে রহিয়া যায়।

আবার ধরুন ঐ বনে কেবল দুই শ্রেণীর হরিণ আছে, সে বনে কোনও বাঘ নাই। বনের মধ্যে যত ঘাস ছিল, হরিণের আহারোপযোগী লতাগুল্ম ছিল তাহা দাবানলে বা কীটের অত্যাচারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই বনের মাঝে একটী পাহাড় আছে, কষ্ট করিয়া যে মৃগদল সেই পাহাড়ে উঠিতে পারে কেবল তাহার পক্ষে আহার আহরণ সম্ভব। তখন দুই দলের মধ্যে যে দলের পক্ষে পর্ব্বতারোহণ সহজসাধ্য সেই দলই বাঁচিয়া যায়, অপর দলকে ক্রমে কালকবলিত হইতে হয়।

এইরূপে জীবন-সংগ্রামে বাঁচিবার জন্য, পরিবেষ্টনীর সাহায্য লইবার জন্য আপনা আপনি জীবজগতে বাছাই চলিতেছে। তাহার ফলে জীবের শ্রেণীবৃদ্ধি হইতেছে। যেমন বৎসরের শেষে শিক্ষক পরীক্ষা দ্বারা বাছিয়া এক শ্রেণীর ছাত্রের মধ্যে কতকগুলিকে উচ্চ শ্রেণীতে তুলিয়া দেন, তেমনি প্রকৃতিও এক শ্রেণীর জীবকে বাছিয়া তুলিয়া দেন, অপর শ্রেণী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়ে। স্বভাবতঃ কিরূপে এই নির্ব্বাচনকার্য্য চলিয়া থাকে তাহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন বুঝিতে পারা যাইবে, কেন এইরূপ ভাবে সর্ব্বদাই নির্ব্বাচন হইয়া থাকে এবং এক জাতি হইতে উদ্ভূত দুই শ্রেণীর জীবের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। মনে করুন উপরোক্ত দৃষ্টান্তে বনে কেবল বাঘ ছিল এবং এক জাতীয় হরিণ ছিল। সেই জাতীয় হরিণের মধ্যে শার্দ্দুল

নিত্যই দুই একটা করিয়া ধরিয়া খাইত। তাহাদের মধ্যে যেগুলা বলিষ্ঠ, দ্রুত-পদ বা সতর্ক তাহাদেরই সন্তান জন্মিতে পারিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি নানা কারণে জীবের সন্তানদের মধ্যে একটু স্বাতন্ত্র্য জন্মিয়া থাকে। সুতরাং সেই মৃগদিগের মধ্যে একটু লম্বপদ একটু বড় ও একটু অধিক চঞ্চলনয়ন মৃগশাবক জন্মগ্রহণ করা অস্বাভাবিক নহে। এই সকল হরিণ শিশুগুলা তাহাদের সামান্য স্বাতন্ত্র্য লইয়া ব্যাঘ্রের আগমনে শীঘ্রই পলাইতে পারিবে। আবার তাহাদের সন্তানদের মধ্যে কেহ কেহ আরও চঞ্চললোচন এবং দ্রুতপদ হইবে। কাজেই ইহাদের সহিত তাহাদের জ্ঞাতিদিগের পার্থক্য ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে। তাহাদের জ্ঞাতিদের সকলের উচ্ছেদ না হইলেও তাহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হইবে। দুই দলের পার্থক্যের গণ্ডী ক্রমশঃই বাড়িবে। এইরূপ স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে জীবের শ্রেণী বৃদ্ধি হইবে। নূতন রকমের এক শ্রেণীর হরিণ জগতে জন্মিবে, হয় ত এক শ্রেণীর পুরাতন আকারের হরিণ ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইবে। তাহাদের কঙ্কাল মৃত্তিকাতলে বা বরফের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া তিন হাজার বৎসর পরে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদের কঙ্কাল অধ্যয়ন করিবে।

বংশবৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদাই যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহার ফলেও উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতে স্বভাবতঃ বাছাই কার্য্য চলিয়া কখন কখন তাহাদের শ্রেণীবৃদ্ধি হইতেছে। অনেক ফুলের রেণু মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরে লইয়া অপর স্ত্রীজাতীয় পুষ্পে ঢালিয়া দিলে তবে ফুলের বীজ জন্মাইয়া থাকে। মৌমাছি ভোমরারও রুচি একটু মার্জ্জিত। একত্র লাল ও কালো রঙের দুইটা ফুল ফুটিলে তাহারা লাল ফুলের উপরই গিয়া বসে। এ বিষয়ে একজন উদ্ভিদ্‌বিদ্‌ পণ্ডিত বেশ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি নানা রকম কাগজের ফুল তৈয়ারি করিয়া একটা ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সে ঘরে তিনি গোটা কতক মৌমাছিও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মৌমাছিগণ পুষ্পভ্রমে সেই রঙীন কাগজের ফুলের উপর বসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে আবার যে ফুলগুলার বর্ণ উজ্জ্বল মধুমক্ষিকাগণ সেই সকল কাগজের ফুলের প্রতি অধিক আসক্তি দেখাইতে লাগিল এবং কৃত্রিম ফুলের বিবিধ বর্ণের প্রতিও বিবিধ পরিমাণে পক্ষপাতিত্ব দেখাইল। কাজেই বুঝা যায় যে এক উদ্যানে যদি কতকগুলি লাল ফুলের গাছ থাকে আর কতকগুলা শ্বেত পুষ্পের বৃক্ষ থাকে তাহা হইলে মৌমাছিরা লাল ফুলেই সাধারণতঃ মধুলোভে গমন করিবে। লাল ফুলের অধিক বীজ হইবে। লাল ফুলের গাছ সে সময়ে বিজয়লাভ করিবে।

এখন ধরুন একটা মরসুমি ফুলের গাছে যদি কতকগুলা লাল ফুল ও কতকগুলা সাদা ফুল জন্মায় তাহা হইলে লাল ফুল হইতেই বীজ উৎপন্ন হইবে। সেই বীজে উৎপন্ন গাছে লাল ফুলই বেশী হইবে। আবার মৌমাছির পক্ষপাতিত্বে লাল ফুলের বীজ জন্মিবে। এইরূপে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে লাল ফুল একটা বিশিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হইবে। স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে উদ্ভিদের একটা জাতি বৃদ্ধি হইবে।

ঠিক এইরূপে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে ময়ূর বংশপরম্পরায় পাখার সৌন্দর্য্য জমাইয়া অতটা সৌন্দর্য্যের আধার হইয়াছে। সিংহ কেশরী হইয়া পশুজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে। যেখানে এক জাতীয় জীবের আকৃতির পার্থক্য সম্ভবতঃ তাহার অনেক স্থলে এই স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক সৌন্দর্য্যের বা পার্থক্যের উপাসনা ফলবতী হইয়াছে।

আমরা গৃহপালিত জীবের শ্রেণীবৃদ্ধিসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলাম এ স্থলেও তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। দেখা যায় শরীরের একটা অবয়বের হ্রাসবৃদ্ধির উপর অপর একটা অবয়বের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। হাত লম্বা হইলে মাথা বড় হয়। সুতরাং স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের ফলে জীবের একটা অঙ্গের বিশেষত্ব জন্মিলে অপর একটা অঙ্গেরও বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই জাতিভেদের গণ্ডীটা আরও বাড়িয়া যায়। বক জাতীয় পক্ষীর গলা লম্বা হইলে তাহার পা লম্বা হইতেই হইবে। একটা বকশাবকের গলা যদি তাহার পিতামাতার গলার অপেক্ষা দুই ইঞ্চি লম্বা হয় তাহা হইলে তাহার সহিত তাহার পিতামাতার পার্থক্য কেবল গলার পরিমাণে হইবে না পায়ের পরিমাণেও হইবে। কাজেই পার্থক্যটা খুব বেশী বলিয়া বোধ হইবে।

এইরূপে স্বভাবে বাছাই কার্য্য হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে জীবশ্রেণী পরিবর্ত্তিত ও নূতন নূতন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সকল সময়ে যে জাতিবৃদ্ধিই হইবে এমন নহে। অনেক সময় পুরাতন জাতি নূতন জাতির সহিত জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়া একেবারে লোপ পাইয়া যায়। এইরূপে কত জাতির যে উচ্ছেদ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। ইতিহাস-পাঠে যেমন জানিতে পারা যায় যে, এক জাতির উন্নতির সহিত অপর জাতির ধ্বংসের ইতিহাস জড়িত, জীবতত্ত্ব পাঠেও তেমনি বুঝিতে পারা যায় যে এক জাতীয় জীবের ইতিহাসের সহিত অনেক জাতীয় জীবের উচ্ছেদের ইতিহাস মিশ্রিত। মিশরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যেমন প্রাচীন মিশরবাসীর মহত্ত্বের পরিচয় পাই, ভীমদশন ম্যামথের কঙ্কাল দেখিয়া তেমনি সেই অতিকায় জীবের দেহের বিশালতা উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

জুতার মান।

মানুষের যেমন আত্মসম্মান আছে, জুতারও তেমনই একটা মান আছে। মানুষের আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্য যেমন সময়-বিশেষে অনেক মূল্য দিতে হয়, সেইরূপ জুতার মান রাখিতেও যথেষ্ট মনুষ্যত্বের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মানুষের আত্মসম্মানের সহিত তাহার জুতার মানের বড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জুতার মানহানি হইলে মানুষের আত্মসম্মানের যথেষ্ট হানি হইয়া থাকে। আজ যেমন আমরা জুতা পায়ে দিয়া বড় বড় রাজপুরুষের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, আমাদের একপুরুষ পূর্ব্বেকার লোকদিগের ঠিক এইরূপ অধিকার ছিল না। জুতার মান বজায় রাখিতে তাঁহাদিগকে অনেক লড়াই করিতে হইয়াছে।

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে একটা নূতন জিনিষ আনিয়া ফেলিয়াছে,—সেটী হইতেছে সাম্যবাদ। এ শিক্ষা যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি গুরু-শিষ্যের মধ্যে বড় একটা প্রভেদ দেখেন না। ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের গুরু ইংরাজ। সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইংরাজী শিখিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগকে গুরুর সমকক্ষ মনে করিতেন। তাঁহারা দেখিতেন, ছোট সাহেব বড় সাহেবের সহিত দেখা করিতে যায়, কৈ ছোট ইংরাজ তো জুতা খুলে না। তবে আমরাই বা জুতা খুলিব কেন? আমরা জুতা পায়ে দিয়া ইংরাজ রাজপুরুষদের সম্মুখে যাইব। নহিলে আমাদের শিক্ষায় ধিক্, মনুষ্যত্বে ধিক্, আত্মসম্মানে ধিক্! এই সাহেব-দিগের নিকট জুতা-খুলিব-না ভাব,—ইহাই হইল জুতার মানের জন্মদাতা।

আজ যদি কোন বাঙ্গালী ভূস্বামীকে জুতা-বিহীন নগ্নপদে না আসিলে কোন সাহেব দেখা করিব না বলেন, তাহা হইলে দেশময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। জুতার মান আজকাল এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে এই জুতার মান রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ সংগ্রাম করিতে হই-য়াছে, নিম্নে তাহার দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দিলাম :—

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঘোষণাপত্র পাঠ করিবার জন্য এক বিরাট রাজকীয় দরবারের অনুষ্ঠান হয়। যথাসময়ে দরবারের অধি-বেশন হইলে সর্ব্বপ্রথমে মহারাণীর মূল ঘোষণা-পত্র ইংরাজী ভাষায় পঠিত হয়।

কলিকাতার তাবৎ সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার পরই ঘোষণা-পত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিবার কথা। সেই অনুবাদ-পাঠের ভার পড়িয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপরে। কিন্তু সভাস্থলে তিনি নাই! তখনই চারিদিকে লোক প্রেরিত হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। শেষে দেখা গেল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় দরবার-মণ্ডপের দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দ্বার-রক্ষকেরা ধুতিচাদর ও চটী জুতা-পরা বিদ্যাসাগরকে দরবার-মণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। তখনই সসম্ভ্রমে তিনি সেই মহাকর্ত্তব্য পালনের জন্য দরবার-মঞ্চে নীত হইলেন। চটী জুতা ও দেশী ধুতি-চাদর যেমন গায়ে ছিল, তেমনই রহিল। বিদ্যাসাগরের চটী জুতার মান রহিল, ধুতি-চাদরের মান রহিল, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার আত্মসম্মানও অক্ষুণ্ণ রহিল।

আর একবার এই চটী জুতার মান লইয়াই বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতার 'মিউজিয়ম' বা যাদুঘরের কর্তৃপক্ষের সহিত লড়াই হইয়াছিল। "১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর মহাশয় কাশীর মৃত কবি হরিশ্চন্দ্রকে কলিকাতার 'মিউজিয়ম' বা যাদুঘর দেখাইতে লইয়া যান। সঙ্গে রাজকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। তখন পার্ক ষ্ট্রীটে যাদুঘর ও এসিয়াটিক সোসাইটি এক বাড়ীতেই ছিল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশ,—সেই থান ধুতি, থান চাদর ও চটি জুতা। কবি হরিশ্চন্দ্রের পোষাক-পরিচ্ছদ আধুনিক সভ্যজনোচিত,—পায়ে ইংরেজী জুতা, গায়ে চাপকান চোগা এবং মস্তকে পাগ্‌ড়ী। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনজনেই যাদুঘরে প্রবেশোন্মুখ হইলেন। দ্বারবান বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাইতে নিষেধ করিল। হরিশ্চন্দ্রের পক্ষে নিষেধ রহিল না। সুরেন্দ্রবাবুও নিশ্চিতই সুসজ্জিত ছিলেন, কেন না তিনি অবাধে প্রবেশাধিকার পাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্য বুঝান হইল, তাঁহার মতন একজন উড়িয়াকে জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। এ সংবাদ তাৎকালিক "এসিয়াটিক সোসাইটী"র আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আমি আর যাইতেছি না; অগ্রে কর্ত্তাদিগকে পত্র লিখিয়া জানিব, এরূপ কোন নিয়ম

আছে কি না ; আর যদি থাকে, তাহার প্রতীকার করিতে পারি ত আসব।" এই বলিয়া তিনি সঙ্গিগণকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসেন।"* সাগরের চটি জুতার মান এতই অধিক ছিল। যেখানে চটি জুতার অপমান, সেইখানেই বিদ্যাসাগর বুঝিতেন,—আমার আত্মসম্মানেরও হানি হইল। জুতার মান বজায় রাখিতে তিনি যে জেদ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে উত্তরকালে আমরা জুতা-পায়ে যেখানে সেখানে যাইবার অধিকার পাইয়াছি সত্য ; কিন্তু তিনি যেরূপ ধুতি চাদর ও তালতলার দেশী চটির মান রাখিতে পারিয়াছিলেন, আজিকালিকার দিনে সেইরূপ আর কেহ পারেন কি ?

আর একবার স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কেও জুতার মান রাখিবার জন্য ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৮৭৫ সালে লাহিড়ী মহাশয় এলাহাবাদে বেড়াইতে গিয়া তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় নীলকমল মিত্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এলাহা-বাদে নীলকমল বাবুর খ্যাতি-প্রতিপত্তি তখন খুব। ধনে মানে তাঁহার মত লোক তখন এলাহাবাদে আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। সেই সময়ে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের (আধুনিক যুক্তপ্রদেশ) ছোট লাট ছিলেন,—স্যর এডওয়ার্ড ড্রামণ্ড। ইনি পূর্ব্বে এক সময়ে বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সেই সময়ে লাহিড়ী মহাশয় তথাকার এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সুতরাং ড্রামণ্ড সাহেবের সহিত রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের তখন একরূপ আলাপ-পরিচয়ও ছিল। বর্দ্ধ-মানের সেই ড্রামণ্ড সাহেব এই প্রদেশের ছোটলাট হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া লাহিড়ী মহাশয় নীলকমলবাবুকে বলিলেন যে,লাট সাহেবের সহিত আমি দেখা করিব। তিনি কখনই একজন পূর্ব্বপরিচিত স্কুলমাষ্টারকে (শিক্ষক) এত শীঘ্র ভুলিয়া যান নাই। নীলকমলবাবু উত্তর দিলেন,—"লাহিড়ী মহাশয় এ আশা ত্যাগ করুন। তিনি তোমার মত মাষ্টারকে আবার মনে করিয়া রাখিয়াছেন!" কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় তাহা শুনিলেন না। তিনি লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন,—আমি লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। অবশ্য এই পত্রে তাঁহার পরিচয়-সূত্রও তিনি দিয়াছিলেন। শীঘ্রই পত্রের উত্তর আসিল। লাট সাহেব তাঁহার সহিত দেখা করিতে সম্মত হইয়াছেন। নীলকমলবাবু অবশ্য এই ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু বন্ধুর এই সম্মানে তিনি যথেষ্ট আনন্দ লাভও করিলেন। অব-শেষে নির্দ্দিষ্ট সময়ে লাহিড়ী মহাশয় নীলকমলবাবুর প্রকাণ্ড 'ল্যাণ্ডো' শকটে

* শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রণীত "বিদ্যাসাগর"—৪৬২-৬২ পৃষ্ঠা।

আরোহণ করিয়া লাট-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। প্রাসাদের সোপানাবলী পার হইয়া তিনি বারাণ্ডায় উপস্থিত হইতেই চারিদিক হইতে চাপরাশীর দল তাঁহাকে বেষ্টন করিল। সকল চাপরাশীই বলে, "বাবু আমি আপনাকে লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিতেছি। কিন্তু উপরে উঠিয়া লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে জুতা পায়ে সেখানে যাওয়া চলিবে না। জুতা আপনি এখানে খুলিয়া রাখিয়া যাউন।" রামতনু প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু চাপরাশীর দল অটল। তাহারা বলিতে লাগিল,—"না জুতা খুলিতেই হইবে; এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।" লাহিড়ী মহাশয় চাপরাশী-প্রাচীরে আবদ্ধ হইয়া নিশ্চলভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এদিকে দেখা করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্তপ্রায়। ছোটলাট ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এক এ-ডি-কংকে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের খোঁজ করিতে পাঠাইলেন। এ-ডি কং আসিয়া দেখেন, লাহিড়ী মহাশয়কে চাপরাশীরা জুতা-পায়ে উপরে উঠিতে দিতেছে না। এ-ডি-কং গিয়া এই কথা লাট সাহেবকে জানাইলেন। লাট সাহেব বলিলেন, "জুতা শুদ্ধই বাবুকে আমার কাছে লইয়া আইস।" আর কোন আপত্তি হইল না। পাদুকা-পরিহিত রামতনু লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার জুতার এইরূপ সম্মানাধিক্য দেখিয়া চাপরাশীর দল অবাক হইল। কিন্তু যেমন করিয়া বাঙ্গালী রামতনুকে সুদূর এলাহাবাদে জুতার মান রাখিতে হইয়াছিল এখনকার দিনে তেমন করিয়া আত্মসম্মান রক্ষা কয়জনে করিতে পারেন।

এমনই করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া সেকালের ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীকে জুতার মান রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই বহুমূল্যে ক্রীত জুতার মানের ধারা আজিও বজায় রহিয়াছে। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীদিগের দেশী জুতা কিন্তু অদ্যাপি এতাদৃশ সম্মানে বঞ্চিত।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

নসুর খাঁ

(১)

"ছিঃ বাবা নসু! অমন কথা কি বল্‌তে আছে?"

দশ বৎসরের পুত্র নসিরামের অন্তরে মাতার এ কাতর অনুরোধ প্রবেশ করিল না। সে ক্রুদ্ধ সর্পের মত গর্জ্জন করিয়া বলিল—'বেশ্‌ করব্‌, খুব করব। তুমি আমায় ধমকাবার কে?'

"ছিঃ! ও কি কথা বলছিস্‌ বাবা নসু! আমি যে তোর মা হইরে বোকা ছেলে!" এবার জননীর চক্ষুদ্বয় একটু আর্দ্র হইল। তাঁহার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কম্পিত হইল। তাঁহার বৈধব্য জীবনের যত আশা যত ভরসা সকলই এই একমাত্র পুত্র নসিরামের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টক্রমে পুত্র এত অল্প বয়সেই গ্রামের উচ্ছৃঙ্খল বালকবৃন্দের সহিত মিশিয়া সারাদিন মাঠে মাঠে, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, পাঠাদি গুরুতর বিষয়ে মোটেই মনোযোগ দিত না। মাতার কথায় সেই রুক্ষ স্বরে বালক বলিল—'মা হও তো কি হয়েছে?'

এবার জননীও একটু রুক্ষভাব ধারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষের অশ্রুবেগ সামলাইতে পারিলেন না। নসিরামও সুর সপ্তমে তুলিল। শেষে স্বেচ্ছাচার বালক মাতাকে গালি দিল।

মাতা কপালে হাত দিয়া বাটীর জীর্ণ দালানের উপর বসিয়া পড়িলেন। একে একে অতীতের অনেক সুখস্বপ্ন, ভবিষ্যতের অনেকগুলা ভগ্ন আশা তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহার হৃদয়টাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার সে ভগ্ন হৃদয়ের ভিতর হইতে একটি মৃদু স্বর বাহির হইল—'এমন ছেলে বেঁচে থাকার চেয়ে—'

বিধবা শিহরিয়া উঠিলেন। কি বলিতেছেন! হতভাগা ছেলে কথাগুলা শেষ করিয়া বলিল—'মরা ভাল! আচ্ছা কালই মরব!'

কথাগুলা যেন তাঁহার কর্ণে ভীমনাদ করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তাঁহার মজ্জায় মজ্জায় ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বশরীরে এক অনল প্রবাহ বহিতে লাগিল। তাঁহার অশ্রু শুকাইল, তাঁহার মৃত স্বামীও যেন একটু বিদ্রূপ ভরে তাঁহার দিকে চাহিল! কি সর্ব্বনাশ! এ নসিরাম যে

তাঁহার নাম রাখিবে! তাঁহার পুত্রকে—একমাত্র পুত্রকে—আজ সে ঈষৎ অবমানিতা হইয়া কি বলিয়া ফেলিল! বিধবার আবার মান অবমান কি? তিনি উঠিয়া বালকের হাত ধরিলেন। সে কোমল স্পর্শে আবার তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। তিনি পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইয়া দুঃখিনীর সম্বল অশ্রুধারায় তাহাকে স্নাত করিলেন। এবার হতভাগা নসিরাম কাঁদিল। সে বলিল—'মা এবার ভাল হব মা। চুপ কর মা।' কিন্তু মাতার অশ্রুস্রোত সহজে থামিল না।

(২)

রাত্রে ছেলেটিকে কোলের ভিতর লইয়া বিধবা সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। বালক নসিরামও স্বর্গসুখে ঘুমাইতেছিল, কত স্বপ্ন দেখিতেছিল। সন্ধ্যার সময় সে মাতার প্রাণে যে কষ্ট দিয়াছিল ঘুমের মধ্যেও তাহা স্মরণ করিয়া সে এক একবার চমকিয়া উঠিতেছিল।

প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছিল। কড় কড় শব্দে বাজ ডাকিল। বিধবা চমকিয়া উঠিলেন। সুপ্ত বালককে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। আবার বজ্র হানিল। একটা ভীষণ কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। ভীষণ বারি-গর্জ্জন! কি ভীষণ জন-কোলাহল। এত গরু, বাছুর, মেষ, মহিষ, কুকুর, ছাগল একত্র চিৎকার করিতেছে কেন! তবে কি দামোদর—

বিধবা শিহরিয়া উঠিলেন। গৃহের বাহির হইয়া দেখিলেন সর্ব্বনাশ! উষার অস্ফুট আলোকে রাশি রাশি লোক ছুটিতেছে। তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গনে জল ঢুকিয়াছে। গুরু গর্জ্জনে দামোদর অগ্রসর হইতেছে।

'নস্কু! নস্কু! নসি! সর্ব্বনাশ! আয় আয়!' ক্ষিপ্তের মত তিনি পুত্রের হাত ধরিয়া টানিলেন! পাগলের মত তিনি ছুটিতে লাগিলেন। সুপ্তোত্থিত নস্কুও মন্ত্রমুগ্ধের মত মাতার সহিত ছুটিল। তাঁহারা বাটি ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে পড়িলেন, তখন প্রায় মাঠে এক কোমর জল।

প্রতি মুহূর্ত্তে জল বাড়িতেছিল। দূরে দামোদর বিকট চিৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। দামোদরের গর্জ্জন অপেক্ষা ভীষণ গর্জ্জনে কে তাঁহার কর্ণে বলিতেছিল—'মরা ভাল! আচ্ছা কালই মরব!' বিধবার শীর্ণ শরীরে অসুরের বল আসিয়াছিল। তিনি সন্ধ্যার সময় অবিনয়ী পুত্রকে গালি দিয়াছিলেন, সে অভিশাপ ফলিতেছিল। কি পিশাচিনী জননী! তিনি কেমন করিয়া পুত্রকে সে অভিশাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন! তেত্রিশ কোটি দেবতার ভিতর কেহ কি তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না। কি নিষ্ঠুর

স্বামী! তিনি স্বর্গ হইতে দেখিতেছেন। তিনি নসুকে হাত ধরিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবেন না? প্রায় ত্রিশ চাল্লিশ হাত দূরে একটা আম বাগান। বিধবা সেই দিকে ছুটিতেছিলেন। নসিরামের প্রায় স্কন্ধ অবধি জল উঠিয়াছিল, তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

আমবাগানে পৌঁছিতে আর পাঁচ হাত মাত্র ব্যবধান আছে। তাঁহার কাঁধ অবধি জল আসিয়াছে। একটা গরু ভীষণ শব্দ করিতে করিতে তাঁহার পাশ দিয়া ভাসিয়া গেল। গ্রামের লোক সব অপর দিকে গিয়াছিল। আর তিন হাত! নারায়ণ, দুই হাত! জয় শঙ্কর!

আর এক হাত যাইতে পারিলে একটা আমগাছের ডাল ধরিতে পারেন। তাঁহার নাসিকা অবধি জল উঠিয়াছে। তিনি মুখ তুলিয়া নসুকে কাঁধে তুলিলেন। এইবার আমডালের নিচে আসিয়া তিনি দুই হাতে নসুকে তুলিয়া ধরিলেন। নসু ডাল ধরিল। বিধবা বুঝিলেন নসু আম্রশাখে ঝুলিতেছে। কি অপার আনন্দ! কি স্বর্গ সুখ! তিনি প্রাণ ভরিয়া একবার তাঁহার প্রাণের পুত্তলি নসুকে দেখিয়া লইলেন। নসুর উপরে স্মিতমুখে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী। কি শুভক্ষণ! তিনি পুত্রের জলমগ্ন পদদ্বয় একবার তুলিয়া ধরিলেন। নসু বৃক্ষশাখে উঠিয়া বসিল। 'উপরে যা'! মন্ত্রমুগ্ধের মত নসু আরও উপরে উঠিল। নিচে চাহিয়া সে মাতার দক্ষিণ হাতটি মাত্র দেখিতে পাইল। মাতা জলমগ্ন হইতেছেন, তাহাকে বাঁচাইয়া তাহার জননী চিরদিনের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া পলাইতেছেন, আপনার প্রাণ দিয়া তিনি তাঁহার মত অধম অকৃতজ্ঞ পুত্রকে নিরাপদে বৃক্ষশাখে তুলিয়া আপনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন, নিমেষের মধ্যে নসিরামের বালক হৃদয়ে এ সত্যটা প্রবেশ করিল। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সে 'মা মা' করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। কেবল ভীষণ শব্দ করিয়া মেঘমালা তাহার কথার উত্তর দিল। তাহার নিকট হইতে প্রায় পাঁচ হাত দূরে অপর একটা বৃক্ষের গাত্র হইতে কতকগুলা কালো চুল সরিয়া জলস্রোতে বেগে ভাসিয়া গেল। 'মা' 'মা' 'ওমা' 'মা' 'মাগো'! বালক তারস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল।

দামোদরের খরস্রোত তাহার কথার উত্তর দিল। কড় কড় শব্দ হইল! ক্ষণপ্রভালোকে তাহার রোরুদ্যমান কাতর ত্রস্ত, মুখখানা উদ্ভাসিত হইল। বালক সাহস করিয়া সে মত্ত জলস্রোতে লাফাইতে পারিল না। কেবল কাতরকণ্ঠে 'মা' 'মা' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

সাহিত্য-সমাচার।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন এম্-এ, বি-এল সম্পাদিত। এ নূতন মাসিক পত্রখানিতে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ভূমিকা' 'আলোক বায়ু স্বাস্থ্য' শীর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধদ্বয় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রবন্ধদ্বয় উপকারে আসিবে। 'আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়' ও 'হজরত মহম্মদ' নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধদ্বয়ও শিক্ষানবিশদিগের উপকার সাধন করিবে। 'পার্শী ধর্ম্ম ও সমাজ'ও ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধ। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে—কাহারও বুঝিবার কোনও অসুবিধা হইবে না। ছাত্রদিগের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা এই পত্রের উন্নতি কামনা করি।

সুমতি—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। ঢাকা হইতে প্রকাশিত। এ নূতন পত্রিকাখানি সংবাদপত্রের মত দেশের আধুনিক সমাজ ও রাজনীতি লইয়া গর্জ্জাইয়াছেন। মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য-চর্চ্চা করিলেই ভাল হয়। আমাদের আশঙ্কা কোন্ দিন সহযোগিনী আইনের পিচ্ছিল পন্থায় 'পা হড়কাইয়া' পড়েন। প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে সম্পাদক মহাশয়ের কৃতিত্ব দৃষ্ট হইল না।

সুহৃদ—প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত, বি-এল সম্পাদিত। যতীন্দ্রবাবু বাঙ্গলা সাহিত্যে পরিচিত। তাঁহার নূতন মাসিক পত্রে তিনি তাঁহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 'সুহৃদে'র প্রবন্ধগুলি নানা বিষয়ক এবং মনোরম। ইহার প্রথম পৃষ্ঠার রঙ্গিন ছবিখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা সহযোগীকে উন্নতি করিতে দেখিলে বিশেষ আনন্দিত হইব।

ব্যবসা ও বাণিজ্য—জ্যৈষ্ঠ। এই মাসিকখানির ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বাঙ্গালার মাসিক রাজ্যে যে দুই একখানি ব্যবসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আলোচ্য পত্রখানি শ্রেষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য। প্রথম বর্ষের পত্রে যে সকল ত্রুটি লক্ষিত হইত, সে সমস্ত দোষ এ বৎসরে সংশোধিত হইয়াছে। এ সংখ্যায় বাজে কথা খুব কম,—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজের কথায় কাগজখানি পূর্ণ। আলোচ্য সংখ্যার "গালা", "ইন্সিওরেন্স ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড" ও "পাণিফল" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি প্রয়োজনীয় ও সুখপাঠ্য।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ার এমনই গুণ যে, যে জিনিষটার যত আবশ্যক, সেই জিনিষটারই তত অভাব দেখা যায়; আর যে জিনিষের প্রয়োজন নাই, তাহারই প্রাচুর্য্যভারে পীড়িত ও অবসন্ন হইতে হয়। আমাদের দেশের মাসিক পত্রগুলি এই উক্তির উজ্জ্বল উদাহরণ। গল্প ও কবিতা সম্বলিত মাসিকের সংখ্যা এ দেশে এত

অধিক যে পাবিয়া উঠা যায় না, তথাপি এই শ্রেণীর কাগজ ছারপোকার মত নিত্যই জন্মাইতেছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক পত্র বঙ্গভাষায় একখানিও নাই। মাঝে মাঝে যে এক আধখানি বাহির হইতে দেখা যায়, তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু প্রায় এক সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে। এই বৎসর দুয়ের মধ্যে 'আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী পত্রিকা,' 'আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা,' 'চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান' প্রভৃতি কতকগুলি কাগজ বাহির হইতে দেখিলাম, কিন্তু একখানিও টিকিয়া নাই। কবিরাজ মহাশয়দিগের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই শ্লাঘার বিষয় নহে। তাঁহারা, শুনিতে পাই, পাঠকগণের রুচির দোষ দিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু তাঁহাদের এ কৈফিয়ৎ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ করি না। যে দেশে 'স্বাস্থ্য সমাচার' ও 'চিকিৎসা প্রকাশ' প্রভৃতি ডাক্তারগণের কাগজ জীবিত আছে,—উন্নতি লাভ করিতেছে, সে দেশের পাঠক বেচারীদের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? আমাদের মনে হয়, কবিরাজগণের কর্ত্তব্য বুদ্ধির অভাবই এ ব্যাধির মূল নিদান। নাম ও অর্থের দিকেই তাঁহাদের ঝোঁক বেশী। দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের গুণ প্রচার করা যে তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, একথা তাঁহাদের মস্তিষ্কে আদৌ উদিত হয় না। সেই জন্য, এই নূতন মাসিক পত্রের সম্পাদকের নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই, কাগজখানিকে যেন আমরা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাই। শুধু তাহাই নহে। আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্ব সকল যেন প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত হয়। নহিলে 'চরক' বা 'সুশ্রুতে'র স্থল বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাহার দুর্ব্বোধ বঙ্গানুবাদ দিয়া কাগজ ভরাইলে, দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন কালে উন্নতি হইবে না। ফাঁকি দিয়া অদ্যাবধি কোন মহৎ কার্য্যই সম্পাদিত হয় নাই।

কাজের লোক—ডিসেম্বর ১৯১২। এই মাসিক পত্রখানি দীর্ঘ সাত বৎসর কাল প্রকাশিত হইয়া নীরবে দেশের কাজ করিতেছে। ইহাতে গার্হস্থ্য-শিল্প ও নানাবিধ দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য পাঠকবর্গ ইহার পরীক্ষা করিতে পারেন। অল্পায়াসে নানারূপ অর্থাগমের পন্থাও ইহাতে প্রদর্শিত হয়। এতদ্ভিন্ন সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি, মুষ্টিযোগ, চয়ন প্রভৃতিতে পত্রখানি আরও জ্ঞানপ্রদ হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ পত্রখানি 'কাজের লোক' তৈয়ারী করিবার মহানুদ্দেশ্য লইয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, আমরা প্রীত হইলাম। আমরা ইহার বহুল প্রচার, দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি কামনা করি।



নানা কথা।

(বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত।)

প্রাচীন হিন্দুর আচার ব্যবহার ঃ—এক্ষণে আফ্রিকা, আমেরিকা, বা সাগর মধ্যস্থ বহুদূরস্থিত দ্বীপ-নিবাসী অশ্রুতনাম অসভ্য জাতিদিগের আচার ও ব্যবহার জানিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচার ব্যবহার বিষয় কিছুই জানি না। সপ্ততি বৎসর বয়স্ক সন্ধ্যা আহ্নিকপরায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেই মনে করি, পাণিনি, পাতঞ্জল, কপিল, গৌতম, কালিদাস, ভবভূতির সমকালিক লোকেরা এই চরিত্রেরই ছিলেন। অথচ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পূর্ব্বকালিক হিন্দুদিগের সহিত বরং আধুনিক ইউরোপীয় জাতিদিগের সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে, তথাপি এক্ষণকার হিন্দুদিগের সহিত সাদৃশ্য দেখা যাইবে না। সেদিন বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে আমাদের পূর্ব্বগামী হিন্দুগণ গোমাংস ভোজন করিতেন। পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্রবাবু আবার সেদিন যেরূপ শ্রীকৃষ্ণাদির উপভুক্ত পিকৃনিকের বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাতে যদুবীরগণকে সাহেব বলিতেই ইচ্ছা করে। বাস্তবিক, আধুনিক অবনতির পথারূঢ় নিস্তেজ হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার এবং প্রাচীন তেজস্বী, জাতিশ্রেষ্ঠ, আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার অবশ্য বিশেষ প্রভেদ বিশিষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ নাই, আমরা তাহার আলোচনায় পরাঙ্মুখ বলিয়াই সে প্রভেদ অনুভূত করিতে পারি না।

হিন্দু ধর্ম্মনীতি ঃ—নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যজাতির গৌরব পৃথিবীর কোন জাতির গৌরবের অপেক্ষা ন্যূন নহে। এমন কোন নৈতিক-তত্ত্ব কোন দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বা নীতিশাস্ত্রে নাই, যাহা প্রাচীন হিন্দুগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, উক্ত এবং প্রচারিত হয় নাই। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় ধর্ম্মনীতির প্রশংসা করিয়া দেশীয় ধর্ম্মনীতিকে অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ এবং অধর্ম্ম কলুষিত বিবেচনা করেন, তাঁহারা কেবল হিন্দুশাস্ত্রে অজ্ঞতা বশতই এরূপ করেন। যে দেশে এইরূপ পৃথিবী অতুল ধর্ম্মনীতি আবিষ্কৃত এবং প্রচারিত হইয়াছে সে দেশের লোক

যে এক্ষণে পাশ্চাত্যদিগের নিকট অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণিত, ইহার অপেক্ষা শোচনীয় কথা আর নাই।

বাঙ্গালীর ব্যায়াম শিক্ষা :—বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যায়াম শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালীর বিদ্যা বুদ্ধির অভাব নাই, বল ও সাহস হইলেই আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বল হইলেই সাহস হইবে। বলের পক্ষে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজনীয়। ব্যায়াম শিক্ষার পক্ষে সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের বালকেরা শারীরিক পরিশ্রম করে না, মানসিক পরিশ্রম করে—ইহাতে তাহারা রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় ব্যায়াম শিক্ষা।

আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্র :—আমরা সর্ব্বদাই মনে করি যে এক্ষণকার ইউরোপীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত বাঙ্গালী চিকিৎসকেরা যদি আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তবে কিছু উপকার হইতে পারে। প্রথম উপকার, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বিজ্ঞান-পারদর্শিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদ প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় উপকার, প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই কি? বলিতে পারি না; আমরা বিশেষজ্ঞ নহি। তবে দেখিতেছি, দেশী চিকিৎসা অদ্যাপি বিলাতী চিকিৎসার প্রতিযোগিনী হইয়া, প্রচলিত আছে—বিলাতী চিকিৎসার প্রচার সত্ত্বেও দেশী চিকিৎসার মান আজিও বজায় আছে—কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিত? দেশী ভূতত্ত্ব, দেশী জ্যোতিষ, দেশী গণিত, সকল প্রকারের দেশী বিজ্ঞান দেশী প্রাচীন ভাষা পর্য্যন্ত, বিলাতী বিজ্ঞান, বিলাতী ভাষার কাছে দাঁড়াইতে পারিতেছে না; কেবল দেশী দায় মীমাংসা শাস্ত্র, এবং দেশী চিকিৎসা শাস্ত্র অদ্যাপি প্রবল। কোন গুণ না থাকিলে কি এরূপ ঘটিতে পারে?

ভারতবর্ষে খৃষ্ট ধর্ম্ম :—ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে না কেন, তদ্বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু আমরা বলি, একটা কথা বলিলেই, যথোচিত হয়। ভারতে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র বিঘ্ন—"হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।" খ্রীষ্ট ধর্ম্মে এমন কি আছে যে তাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই? তবে কেন হিন্দু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জন্য সমাজ পরিত্যাগ করিবে? পাদরি সাহেবেরা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝেন না বলিয়া এত মাথা কুটিয়া মরেন। যেদিন বুঝিবেন সেইদিন আসামে গিয়া চায় চাস আরম্ভ করিবেন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল ঃ—মিল অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার কৃত ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্র এবং অর্থব্যবহারশাস্ত্র তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। ইহাতে তিনি যে কোন নূতন কথার উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু এতৎ সংক্রান্ত সমুদায় কথা এমন সুশৃঙ্খল করিয়া লিখিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিষয় এত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ না করিলে কাহারই উক্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইবেক না।

তিনি রাজ্যশাসন প্রণালী বিষয়ে যে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় যে, কিছুকাল পরে ইংলণ্ডে তাহা ফল ধারণ করিবে। তাঁহার পরামর্শ ইংলণ্ডীয়-দিগের প্রকৃতির উপযোগী বটে তথাপি অপর সাধারণে এখনও তাহার সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণ করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তিনি যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এখন সর্ব্বত্র সকলেই সেই পথানুসারী হইতেছে। মিল বলিয়াছেন যে, যেমন চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধ নিবারণের উপায় রাজা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ তাবৎ লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াও রাজার কর্ত্তব্য। তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে উত্তম অধম, ধনী দরিদ্র, ভদ্র অভদ্র সকলেই বিদ্যাভ্যাস করিবে; সর্ব্বত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইবে এবং ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। কাজে না হউক, মনে মনে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই এই সকল কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছেন।

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে মিল অনেকের যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়াছেন। এখন Absolutist বলিয়া কাহারও পরিচয় দিলে তাঁহার একপ্রকার নিন্দা করা হয়। এতাদৃশ সংস্কার বিস্তার করণ পক্ষে মিলের আয়াস যথেষ্ট ফললাভ করিয়াছে।

মিল শেষাবস্থায় সামাজিক ব্যবস্থা বিষয়ে ছুটী নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার মতে স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব যাহাতে উভয় জাতির শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সম্বন্ধ দূরীকৃত হয় মিল তাহার জন্য অতিশয় চেষ্টিত ছিলেন। পরিণামে ইহার কি হয় বলা যায় না, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় না যে, যে উদ্যম আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহসা ভঙ্গ হইবেক। এই বিষয়ক চিন্তাকালে আমাদিগের মনে হয় যেন মিল আপন স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁহার গাঢ় পত্নীভক্তি, কার্য্যে পর্য্যবসিত করণার্থ ব্রতস্বরূপ এই চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হয়েন।

এস্থলে একথা বলিলে তাঁহার মনের ভাব কতক প্রকাশ হইবেক যে, ফরাসি দেশে আভিন নামক নগরের এক গির্জার সমাধিক্ষেত্রে মিলের স্ত্রী সমাধিস্থ হয়েন এবং ঐ সমাধি সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন বলিয়া মিল তাহার নিকটবর্ত্তী একটা বাটী ক্রয় করেন। সেই বাটীতে এরিসি-পেলাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দ্বিতীয়; মিলের কল্পনা এই যে পৃথিবীর ভূমি সম্পত্তির উপস্বত্ব ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে; ইহার কিয়দংশ কেবলমাত্র সভ্যতার উন্নতিজনিত; তাহাতে কাহারও আয়াস বা অর্থব্যয় হয় না, কিন্তু কেবল কতিপয় ভূম্যধিকারীই তাহার ফলভোগী হয়েন। যদ্যপি উপস্বত্বের এই বর্দ্ধিত অংশ রাজহস্তে সমর্পিত হয়, তবে ক্রমশঃ রাজকরের লাঘব হইয়া রাজ্যস্থ তাবৎ লোকেই ইহার কিছু কিছু অংশ পাইতে পারেন। অতএব ইহার সদুপায় করা কর্ত্তব্য। মিল এই কার্য্যে অতি অল্পদিন হইল হস্তক্ষেপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে যে হঠাৎ আর কেহ ইহাতে প্রবর্ত্ত হইবেন, বোধ করি তাহার সম্ভাবনা অল্প।

মিল ও কোম্তে ঃ—মিল প্রথমাবস্থায় অনেক বিষয়ে কোম্তের সহিত একমত ছিলেন, কিন্তু পরিণামে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। আমরা মনে করি যে পরস্পরের বিবাদের স্থূল কথা এই যে,—

ব্যক্তিবিশেষ ও জনসমাজ এতদুভয় মধ্যে, মিলের মতে ব্যক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইবেক, নতুবা পৃথিবী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইবেক।

আর কোম্ৎ বলেন যে সহস্র চেষ্টা করিলেও মনুষ্যের স্বার্থানুরাগ পরহিতৈষিতা অপেক্ষা ক্ষুণ্ণ হইবেক না; ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য রক্ষার্থ যত্ন প্রয়োগ হইলে, সেই যত্নের দ্বারা সমাজের যে উন্নতি হইতে পারিত তাহার ব্যাঘাত হইবেক। অতএব স্বার্থানুরাগ কেবল দমন করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

মিল ও কোমতের ন্যায় মহোপাধ্যায়গণ যে সকল বিষয়ের ঐকমত্য সংস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাহার কোন পক্ষের মত সমর্থন করা সামান্য লোকের পক্ষে অবশ্যই অসাধ্য। সুতরাং মতদ্বয় মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ এবং কোন্‌টী নিকৃষ্ট তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করি যে মিল, কোমং দর্শন বিচার করিবার জন্য Auguste Comte and Positivism নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহাতে জনসমাজের কথঞ্চিৎ

ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা মিলের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তজ্জন্য মিলকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। অনেকে কোম্‌তের গ্রন্থ পাঠ করা দুরূহ বলিয়া মিলের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতের সার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহার পরিণাম কেবল এইমাত্র হয় যে যেমন কিছুদিন পূর্ব্বে খৃষ্টান মহাশয়েরা সকল কথা না বুঝিয়া কেবল হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ব্যঙ্গ করিতেই পটু হইতেন, মিলকৃত কোমৎ ভাষ্যের পাঠক মহাশয়েরাও তদ্রূপ কেবল ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন।

মিলের ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, কারণ তিনি নিজে তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেন নাই। ইহাতে তিনি নিন্দাভাজন হইয়াছেন কি না তদ্বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে। কিন্তু যদি তিনি স্বয়ং আপন প্রকৃত বিশ্বাস গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে অন্যের পক্ষে তাহার আন্দোলন করা বন্ধুর কার্য্য হইতে পারে না।

মিল ও ভারতবর্ষ :—আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাতে আমরা সমগ্র মানবজাতির সহিত ভ্রাতৃ সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া মিলের সহিত আমাদের আরো কিছু সম্পর্ক আছে। যৎকালে ভারতবর্ষ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল প্রথমতঃ ইষ্টইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরানী এবং পরিশেষে চিঠিপত্র পরীক্ষকের কার্য্য করিতেন। কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। কিম্বদন্তী আছে যে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক সন্ ১৮৫৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপি-রচনা-কার্য্যে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে যেরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত মিলের Liberty নামক পুস্তকোক্ত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হইবেক।

ভারতবর্ষের রাজকার্য্য মহারাণীর কর্ম্মচারিগণের হস্তে অর্পিত হইবার সময় মিলকে ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের মেম্বর হইতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু ঐ নূতন বন্দোবস্ত মিলের মতে অযৌক্তিক বলিয়া তিনি উক্তপদ গ্রহণ করেন নাই। তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে, মহারাণীকে এই কার্য্য হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য এক আবেদন করা হয়। কথিত আছে যে, মিল তাহার রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত আবেদনে লিখিত ছিল যে, ভারতবর্ষের ন্যায় রাজ্য পার্লিয়ামেণ্টের অধীন না হইয়া কোম্পানির অধীন থাকিলে ভারতবাসীদিগের

মঙ্গল হইবেক, নতুবা তাহারা ইংলণ্ডের দলাদলির আক্রোশে পড়িয়া নিতান্ত উৎপীড়িত হইবেক। তৎকালে এই কথার প্রতি কেহই তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই ; কিন্তু এখন ইহাকে তুচ্ছ করিতে পারে এমন লোক কে আছে ?

সমালোচনা ও বাঙ্গালী-লেখক :—আমরা সচরাচর বাঙ্গালা গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। তাহাতে লেখকদিগেরও অসুখ, আমাদিগেরও অসুখ। লেখকমাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে "আমার প্রণীত গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, অনিন্দনীয়, এবং রামায়ণ হইতে আজি পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।" সমালোচক যদি ইহার অন্যথা লেখেন, তবেই গ্রন্থকারের বিষম রাগ উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীমধ্যে যত দেশে যত গ্রন্থকার জন্মগ্রহণ করিয়া লোকপীড়া জন্মাইয়াছেন, তন্মধ্যে সাধারণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট। সুতরাং তাঁহাদিগের আমরা প্রশংসা করি না। অপ্রশংসা দেখিয়া, লেখক সম্প্রদায় আমাদের প্রতি রাগ করেন। সভ্য জাতীয়দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ রাগ হইলে, তিনি সে রাগ গায়ে মারেন ; দুই একজন ব্যাকুল গ্রন্থকার কদাচিৎ সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু বাঙ্গালির স্বভাব সেরূপ নহে। বাঙ্গালি অন্য যে কার্য্যে পরাঙ্মুখ হউক না কেন, কলহে কদাপি পরাঙ্মুখ নহে। সমালোচনায় অপ্রশংসা দেখিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে—প্রতিবাদ করিতে গেলে এ সম্প্রদায়ের লেখকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভদ্রলোকের ভাষা এবং ভদ্রলোকের ব্যবহার বর্জ্জনীয়। যেদেশে অল্পকাল হইল কবির লড়াই ভদ্রলোকের প্রধান আমোদ ছিল—যেদেশে অদ্যাপিও পাঁচালি প্রচলিত, যে দেশের লোক অশ্লীল গালিগালাজ ভিন্ন অন্য গালি জানে না, সে দেশের ক্রুদ্ধ লেখকেরা যে রাগের সময়ে আপন আপন শিক্ষা এবং সংসর্গের স্পষ্ট পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না তাহা সহজেই অনুমেয়। কখন কখন দেখিয়াছি যে মহা সম্ভ্রান্ত দেশমান্য ব্যক্তিও আপনার সম্মানের ক্রটি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, রাগান্ধ হইয়া ইতরের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছেন। কখন কখন দেখিয়াছি, রাগান্ধ লেখকেরা সমালোচনার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেও অক্ষম। যদি আমরা কোন পুস্তকান্তর্গত চর্ব্বিত চর্ব্বণকে ব্যঙ্গ করিয়া, "নূতন" বলিয়াছি, গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে, সত্যসত্যই তাঁহার কথাগুলিকে নূতন বলিয়াছি। যদি কোন গ্রন্থে দুই আর দুই চারি হয়, এমত কথা পাঠ করিয়া তাহা দুর্জ্ঞেয় বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছি, অমনি গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন যে আমার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সত্য সত্যই দুর্জ্ঞেয় বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

সুতরাং তিনি অধীর হইয়া প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন যে তাঁহার কথাগুলিন অতি প্রাচীন এবং সকলেরই জ্ঞানগোচর। কখন কখন দেখিয়াছি, কোন সামান্য অপরিচিত লেখক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, আমরা ঈর্ষাবশতই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিয়াছি। এ সকল রহস্যে বিশেষ আমোদপ্রাপ্ত হইয়া থাকি বটে, কিন্তু কতকগুলিন ভাল মানুষকে মনঃপীড়া দিয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের বিরাগভাজন হই, ইহা আমাদিগের বড় দুঃখ। অতএব বঙ্গীয় পুস্তক সমালোচনা আমাদিগের অপ্রীতিকর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত। কর্ত্তব্যানুরোধেই আমরা অনিচ্ছুক হইয়াও অপ্রশংসনীয় গ্রন্থের অপ্রশংসা করিয়া থাকি। আমাদের নিতান্ত কামনা যে প্রশংসনীয় গ্রন্থ আমাদের হাতে পড়ে, আমরা প্রশংসা করিয়া লেখক সমাজকে জানাই যে আমরা বিশ্বনিন্দুক নহি। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এবং বাঙ্গালাভাষার দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ গ্রন্থ অতি বিরল।*

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

বিদ্যাসাগর।†

তিনি যে অমৃতময়, বলিও না মৃত তাঁরে ;
কালজয়ী বিজয়ীরে কাল কি হরিতে পারে ?
দিন পক্ষ মাস বর্ষ ধ্বংস-লীলাবেশে ধায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম গন্ধ কালগর্ভে ল'য়ে যায় ;
প্রবল প্রবাহ তা'র মহতে প্রণাম করে,
জ্ঞানে সেথা চিদানন্দে কালাতীত কাল হরে ;
যে অনন্ত সৎ-চিৎ-আনন্দ-ত্রিধারাময়
পবিত্র সলিলস্রোতে ব্রহ্মাণ্ড প্রাণিত হয়,
সেই তীর্থবারি ওই হৃদয় ভরিয়া আছে ;
পরশি' পবিত্র হও, বস দেবতার কাছে ;
অলকনন্দার প্রায় পরম-আনন্দদায়ী
ওই হৃদয়ের স্রোত আর্ত্তকুল-অনুসারী ;
ওই শুন আর্ত্তদের আনন্দ-উৎসব-ধ্বনি—
কঠোর সংসারে তা'রা পেয়েছে পরশমণি।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র।

---

* বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" ব্যতীত এ সকল অভিমত অন্যত্র অপ্রাপ্য।—সংগ্রহকার।

† বাৎসরিক উপলক্ষে লিখিত।

দাস ম'শায়।

---

(১)

স্বর্গীয় দীননাথ রায় ছিলেন রাজসাহীর কোন এক রাজার দেওয়ান। তিনি 'এক কলমে' চল্লিশ বৎসর দেওয়ানী করিয়া রাজ-সরকারের যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল করিয়া লইয়াছিলেন। নিজেদের গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচ-সাত খানা গ্রামের তিনি মালিক এবং দেশের মধ্যে তিনি ধনে মানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভয় ভক্তি করিত। অর্থোপার্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে তিনি যেমন দ্বিধাশূন্য—অর্থব্যয়ে তেমনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে 'বার মাসে তের পার্ব্বণ' ছিল। শারদীয়া দুর্গাপূজা বিশেষ ধুমধামে সম্পন্ন হইত। যে সময় রায় মহাশয় রাজসাহী হইতে নৌকা করিয়া দেশে আসিতেন—আট দশ খানা লোকজন ও জিনিষ-পত্রে বোঝাই নৌকা যখন গ্রামের নদীর ঘাটে আসিয়া লাগিত তখন একটা মহা ব্যাপার পড়িয়া যাইত। গ্রামের ভদ্র-ইতর সকলে আসিয়া দেওয়ানজীকে সম্বর্দ্ধনা করিত। সে দিন পাঠশালার ছুটি হইত এবং নিষ্কর্ম্মা ছেলের দল নদীর ধারে আসিয়া বড় বড় পাগড়ী-বাঁধা লাঠিয়ালদের কৃষ্ণমূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। পূজার কয়দিন দেওয়ানজীর গৃহে অন্নসত্র হইত, গ্রামের লোকের ত কথাই নাই—সে ক'দিন দেশস্থ আত্মীয় স্বজন, প্রজা, আহূত অনাহূত ও রবাহূতে দেওয়ানজীর সুবৃহৎ বাড়ী কাকসমাকুলিত বটবৃক্ষের মত হইয়া উঠিত।

দেওয়ানজী অত্যন্ত দানশীল হইলেও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এক দিকে যেমন গরীবের মা-বাপ, দরিদ্রপ্রতিপালক ছিলেন—পক্ষান্তরে তাঁহার শাসন অত্যন্ত কঠোর ছিল—লোকে তাঁহাকে বাঘের মত ভয় করিত—এমন কি অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ও সাহস করিয়া তাঁহার কাছে ঘেঁসিত না। দেওয়ানজী দেশে আসিলে, দেশস্থ সকল আত্মীয় স্বজনই তাঁর সহিত দেখা করিতে আসিতেন—কিন্তু কাহাকেও বেশীক্ষণ তাঁর কাছে বসিয়া থাকিতে দেখি নাই এবং অনেককেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বাহির হইয়া আসিতে দেখা যাইত।

কেবলমাত্র গ্রামের বৃদ্ধ ভুবনদাস ওরফে দাস ম'শায় সর্ব্বদা বসিয়া দেওয়ানজীর সহিত গল্প করিত। গম্ভীরপ্রকৃতি দেওয়ানজী এই নিরক্ষর বৃদ্ধ কৈবর্ত্তের সঙ্গে এত কি গল্প করিতেন, ভাবিয়া লোকে অবাক্ হইত। সকালে সন্ধ্যায় তামাকু টানিতে টানিতে এই দুই বৃদ্ধের অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা চ'লত। তখন দেওয়ানজীর গুড়গুড়ি এবং দাস ম'শায়ের চিরসঙ্গী কলি-হুকা—এ দুটির ক্ষণমাত্র বিশ্রাম থাকিত না। দেওয়ানজীর প্রিয় ভৃত্য চৈতনা বলিত সে না কি মধ্যে মধ্যে দু'জনকে গুণ্ গুণ করিয়া গান করিতেও শুনিয়াছে।

ভুবন দাস এক অদ্ভুতপ্রকৃতি লোক ছিল এবং তাহার মেজাজকে গ্রামের ক্ষুদ্র ইতর সকলেই ভয় করিত। অন্যায় কথা বলিয়া বা অন্যায় কাজ করিয়া দাস মশায়ের কাছে কাহারও রক্ষা ছিল না—অনেক কঠোর কথা তাহাকে শুনিতে হইত—দাস মশায় ছোট বড় কাহাকেও বিশেষ খাতির করিত না। লোকে অসাক্ষাতে বলিত 'মাথা পাগলা'—কিন্তু সাক্ষাতে সকলকেই তাকে সম্মান করিয়া চলিতে হইত। জমীদারের কাছারী, মোড়লদের দাওয়া এবং 'দাদা ঠাকুরে'র চণ্ডীমণ্ডপ সর্ব্বত্রই দাস মশায়ের অবাধ গতি।—দেওয়ানজীর কৃপায় তা'র অন্নের অভাব ছিল না। সে সর্ব্বদা ঘুরিয়াই বেড়াইত—তার বাঁশের লাঠি এবং স-কলিকা কলি-হুকা দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। ভুবন দাসকে কেহ নাম ধরিয়া ডাকিত না, সকলেই 'দাস মশায়' বলিয়া সম্বোধন করিত। একবার নাকি দেওয়ানজীরই এক পুত্র তাহাকে 'ভুবন' বলিয়া ডাকিয়াছিল—ভুবন দাস অমনি গর্জ্জন করিয়া জমীদার-পুত্রকে যাহা বলিয়াছিল তাহার ফলে, ভবিষ্যতে সকলেই সাবধান হইয়া চলিত।

একবার কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পরই দেওয়ানজী বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ছুটি ফুরাইবার পূর্ব্বে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা গ্রামের দু'একজন যুবক মিলিয়া দাস মশায়ের সঙ্গে ভাব করিলাম। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম—দেওয়ানজীর সঙ্গে তার এত কি কথা হয়? এত লোক থাকিতে দাস মশায়ের সঙ্গেই তাঁর এত ভাব কেন? প্রশ্ন শুনিয়া দাস মশায় প্রথমে খুব এক প্রস্থ হাসিয়া লইল—তারপর বলিল—"নাতি, এসব তোমরা কি বুঝবে? দেওয়ানজী আর আমি এক সঙ্গে পাঠশালায় পড়তাম—তারপর তিনি যখন সখের যাত্রার দল খুলিলেন—সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা—তখন আমরা ছেলের দল লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দিন রাত্রি কেবল যাত্রার 'মহলা' দিতাম—আর রাস্তা-ঘাটে দেওয়ানজীর তৈরী গান গেয়ে বেড়াতাম।

এই সখের দলের জন্যে দেওয়ানজী কি কম টাকাটা খরচ করেছেন। তখন আমার বয়স ছিল পনের ষোল—আর, তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবে না, আমি তখন দেখতে খুব সুন্দর ছিলাম। দেওয়ানজী সাজতেন রাজা, আর আমি সাজতাম রাণী—দেখে লোকে অবাক হোত। তা' সে সব দিন কাল গেছে—সে দলের এখন আমরা দু'জনই বেঁচে আছি।" বলিয়া দাস মশায় হুঁকা টানিতে লাগিল। মনের আবেগে দাস মশায় এতক্ষণ হুঁকাকে অবহেলা করিয়াছিল—নতুবা এক সঙ্গে এতটা সময় কেহ তাহাকে হুক্কার বিরহ সহ্য করিতে দেখে নাই।

আমরা কিন্তু দাস মশায়কে সহজে ছাড়িলাম না—তার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া একটু আব্দার করিয়া বলিলাম—"দেওয়ানজীর একটা গান আমাদের শিখিয়ে দাও।" অনেক আপত্তির পর দাস মশায় একটা গান শুনাইয়া দিল, তার দুটো লাইন মাত্র মনে আছে—

"মন-পাখী পড়ে আছে তব রূপ-ফাঁদে
ভুলেছে চাতক মন হেরে কেশ কাদম্বিনী।"

গানটা শেষ করিয়া দাস মশায় বলিল—"আমার হাত ধরিয়া দেওয়ানজী যখন এই গান গাইতেন, তখন লোকের মাথা ঘুরিয়া যাইত।"

বৃদ্ধের রকম দেখিয়া আমরা অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম—দাস মশায়ের সাক্ষাতে হাসিলে কি আর রক্ষা ছিল!

(২)

দেওয়ানজী মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় এম, এ, বি, এল, হইলেন জমীদারীর মালিক। প্রমথ নাথ কলিকাতায় ওকালতি করিতেন। তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের লোক, অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং অবিচারে দান প্রভৃতি বাজে খরচের একান্ত বিরোধী। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী এবং প্রজাবর্গ স্বর্গীয় দেওয়ানজী ও তাঁহার শিক্ষিত পুত্রের চরিত্রের পার্থক্য অল্পদিনেই বেশ অনুভব করিতে লাগিল। প্রমথনাথ পূজা পার্ব্বণ পূর্ব্ববৎ বজায় রাখিলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্বের ন্যায় দেওয়ানজীর গৃহে আত্মীয় সমাগম এবং অকাতরে অন্নদান রহিল না। তিনি প্রজাদের স্পষ্ট বলিতেন—"দেখ, আমি আমার ন্যায্য প্রাপ্য ষোল আনা লইব, সওয়া ষোল আনাও চাহি না, আর পৌনে ষোল আনাও লইব না।" প্রজারা অল্পদিনের মধ্যেই 'কর্ত্তামহাশয়'কে স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

দেওয়ানজীর আমলে তাহারা টাকায় চার আনা 'মামুল' দিয়াছে, আবার কষ্টের সময় ষোল আনা মাপও পাইয়াছে। খাজনা বাকী ফেলিলে 'কর্ত্তাম'শায়' হাতে মারিতেন, কখনও ভাতে মারিতেন না। কিন্তু প্রমথনাথের আমলে বাকী খাজনার নালিশের তালিকা দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। খাজনা বা সুদের এক পয়সা কেহ মাপ পাইত না।

বিষয়-আসয় বুঝিয়া লইতে গিয়া প্রমথনাথ দেখিলেন যে, ভুবন দাসের বিস্তর টাকা খাজনা বাকী পড়িয়া আছে এবং প্রায় দশ পনের বিঘা জমী সে নিষ্কর ভোগ করিতেছে। সে নিয়মমত কিস্তি কিস্তি খাজনা ত দেয়ই না, তার উপর 'নগদী পাইক' গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দেয়। দেওয়ানজীর আমলে কেহ তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না। প্রমথনাথ কিন্তু একটা সামান্য চাষার এতটা বাড়াবাড়ির কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না—তা' হইলই বা সে কর্ত্তামহাশয়ের প্রিয়পাত্র। তবে তিনি দাসমহাশয়ের একটা খাতির রাখিলেন—নালিশের পূর্ব্বে তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

প্রমথনাথের প্রশ্নের উত্তরে দাসমশায় বলিল যে, গত দু'তিন বৎসর অজন্মা হওয়ায় সে খাজনা দিতে পারে নাই, তারপর স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয়ের কাল হওয়ায় তার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে আর নিজে কিছু দেখিতে পারে নাই, জোতদারেরা যা' দিয়াছে সে তাই পাইয়াছে। তাহাতে তার সম্বৎসরের খোরাকও হয় নাই। দেওয়ানজীর কথা বলিতে গিয়া বৃদ্ধ আর চোখের জল রাখিতে পারিল না—বলিল, "দেওয়ানজী গিয়াছেন এখন আমিও যেতে পারলে বাঁচি, কি সুখে আর সংসারে থাকব!"

প্রমথবাবু এ সকল অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে করিলেন, তাঁর কাছে এ সমস্ত বাজে ওজর মনে হইল, তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, "তোমার নামে বাকী খাজনার নালিশ হইবে।"

দাস মশায় আর সামলাইতে পারিল না, সে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল, বলিল—"তুমি দেওয়ানজীর কুপুত্র"। এই বলিয়া সে কাছারী ত্যাগ করিল, বুঝিল না সে আপনার কি সর্ব্বনাশ করিল!

(৩)

সেই দিনই ভুবন দাসের নামে বাকী খাজনার জন্য নালিশ রুজু করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নিষ্কর জমীর বাবদও নালিশ হইল। যথাসময়ে বাকী খাজনা মায় সুদ ও খরচার জন্য একতরফা ডিক্রি হইয়া গেল। ক্রমে নিষ্কর

জমীর বাবদ উচ্ছেদের মোকর্দ্দমায়ও জমীদার জয়লাভ করিলেন এবং যথারীতি ভুবনদাসকে 'উচ্ছেদ' করিয়া সে জমী অন্যকে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দাস-মশায় কোন মোকর্দ্দমাতেই জবাব দিল না। তার এই গর্ব্বিত ব্যবহারে প্রমথ-বাবুর জেদ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি শুধু দাসমশায়ের খাজনার জমী নিলাম করাইয়া ক্ষান্ত হইলেন না, ডিক্রির বাকী টাকার জন্য তিনি তাহার অস্থাবর ক্রোকের হুকুম আনাইলেন।

যেদিন অস্থাবর ক্রোকের জন্য নাজির আসিল, সেদিন স্বর্গীয় দেওয়ানজীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, সেই উপলক্ষে প্রমথবাবু কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়াছেন।

সেইদিন প্রাতে দাসমশায়ের অস্থাবর মাল ক্রোক হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর প্রমথবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া সমাগত ব্রাহ্মণদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন এবং কোর্টের নাজির ও নায়েবের কাছে ভুবন দাসের মাল ক্রোকের রিপোর্ট শুনিতেছিলেন। নায়েবের দাস মশায়ের উপর বিশেষ রাগ ছিল, কেন না এ পরগণার সকলেই তাহাকে মান্য করে, কেবল স্বর্গীয় কর্ত্তামহাশয়ের আদরে দাস মশায় তাহাকে কখন গ্রাহ্য করে নাই। তাই নায়েব দাস মশায়ের উদ্ধত ব্যবহারের অতিরঞ্জিত বর্ণনা এবং সঙ্গে সঙ্গে তা'র সমুচিত শাস্তির বিবরণ দিয়া নিজের গাত্রদাহ ও প্রভুর মনোরঞ্জন করিতেছিল। এমন সময় মলিনবেশে ভুবন দাস আসিয়া প্রমথবাবুর সামনে দাঁড়াইল—তার হাতে তার সেই চিরসঙ্গী কলি-হুকাটি এবং একগাছি রূপাবাঁধান বাঁশের লাঠি। অন্য কাহারো দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দাস মহাশয় প্রমথবাবুকে বলিল—"ছোটবাবু, (সে প্রমথবাবুকে বরাবরই ছোটবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত) তোমার মনের সাধ মিটেছে—কি কুল-প্রদীপ তুমি, তোমার বাবা যা' দিয়েছিলেন তুমি তাই কেড়ে নিলে! তা বেশ! আমি গরীব, তুমি বড় লোক—জমীদার,—আমাকে উচ্ছেদ করে তোমার খুব পৌরুষ বেড়েছে! খাজনা দিতে পারিনি আমার খাজনার জমী নিলেম করিয়েছ, ভাল কথা, কিন্তু আমার এ অপমান করালে কেন? আর এই নিষ্কর জমীগুলো—তুমি জানো এ জমী দেওয়ানজী আমাকে কেন দিয়েছিলেন—তা' কি করে জানবে? তুমি তখন ছ'মাসের ছেলে—হঠাৎ তোমার তড়্কা হ'তে আরম্ভ হো'ল—আশ্বিন মাস—ক'দিন হ'তে অনবরত ঝড়বৃষ্টি হ'চ্ছিল—চারিদিকে বানে দেশ ভেসে গিয়েছে, ঘরের বা'র হবার উপায় নেই, এমন সময় এই বিপদ! দেওয়ানজী বল্লেন, 'ভুবন এখনি সহরে গিয়ে ডাক্তার না আন্‌লে ত ছেলে বাঁচে না—কিন্তু কে যাবে?

এ দুর্য্যোগে এই সাত ক্রোশ রাস্তা হেঁটে গিয়ে কে ডাক্তার আন্‌বে? আমার ছেলে বুঝি বাঁচে না!' দেওয়ানজীর মুখ দেখিয়া আমার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল—আমি বল্লাম, 'কেন, আমি যাব।' তারপর কোমরে চাদর জড়িয়ে বার হ'লাম! সে কি দুর্য্যোগ! রাস্তায় জনমানব নেই, এক কোমর জল ভেঙ্গে আমি ৩।৪ ক্রোশ রাস্তা গেলাম, তারপর নদী—সে কি ভয়ঙ্কর তুফান, পারঘাটে নৌকো নেই—কি করি! 'দুর্গা' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, মা দুর্গা আমায় যেন হাতীর বল দিলেন, আমি ওপারে পৌঁছিলাম। তারপর বাঁধা রাস্তা, সেটুকু আমি ছুটে গিয়ে সহরে পৌঁছে, তখনি নৌকো ভাড়া করে, ডাক্তার ও ওষুদ নিয়ে রওনা হ'লাম। তা' ডাক্তার কি নড়তে চায়! কত টাকার লোভ দেখিয়ে তবে তাকে আনি! মাঝিদের ডবল ভাড়ার লোভ দিয়ে প্রাণপণ ক'রে আমরা সন্ধ্যার সময় এসে বাড়ী পৌঁছুলাম। আমাকে দেখে দেওয়ানজীর মুখে কথা বেরুল না—তিনি ছেলেবেলাকার মত আমার গলা জড়িয়ে ধর্‌লেন। তারপর তিন চার দিন যমে মানুষে টানাটানি ক'রে তুমি সেরে উঠলে, দেওয়ানজীর মুখে হাসি বেরুল, আমার সব কষ্ট সার্থক হ'ল! তিনি ডাক্তারকে পাঁচশ' টাকা বকসিস্ দিয়ে বিদেয় কর্‌লেন, আর আমাকে এই দশ বিঘে জমী নিষ্কর ক'রে দিলেন! আমার স্ত্রী পুত্র নেই, সংসারে কেউ নেই, আমি এত জমী নিয়ে কি কর্‌ব—বল্লাম—তা' কে শোনে—তখনি হুকুম হয়ে গেল—তবে কোন পাট্টা লেখা হলো না, কি দরকার! ছোট বাবু, এ সেই জমী! তোমার বাবা দিয়েছিলেন, তুমি কেড়ে নিলে,—তাতে আমার কোনো দুঃখু নেই, আমি ম'লে ত সবই তোমার হ'ত, আমার আর কে আছে! সেই দেবতার ছেলে তুমি—তোমার এই ব্যাভার! আর আমাকে তাই দেখতে হ'ল! কত পাপ না করেছি—তার এই সাজা—কিন্তু আর দেখ্‌ব না, এই তোমার গাঁ ছেড়ে চল্লাম, জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি! যেখানে রাম রাজত্বি দেখেছি, সেখানে এ অত্যাচার দেখ্‌তে পারব না! কিন্তু যাবার সময় একটা কথা বলে যাই—বাপের নামটা এমন করে ডুবিও না! আমার যা' কিছু ছিল, সবই রইল,—কেবল কর্ত্তার হাতের এ লাঠিগাছটি নিলাম—এটি প্রাণ ধরে কা'কেও দিতে পারব না।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ ভুবনদাস চলিয়া গেল—জমীদার ও তাঁহার পারিষদবর্গ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার।

নভোযুদ্ধ।

প্রথম যখন এরোপ্লেন (ব্যোমযান) আবিষ্কৃত হইল, মানুষ তখন সগু ভূমি হইতে আকাশে উঠিতে পাইয়া বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। অনেক সৌখীন বড়লোক প্রাণের মায়া ছাড়িয়া আকাশ-ভ্রমণের সাধ মিটাইয়া লইল। নিম্নে পঙ্কিল ধূমাচ্ছন্ন ধরণীকে ফেলিয়া মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় শূন্যপথে বিচরণ—এই সম্মোহিনী চিন্তা স্বভাবকবি মানবকে বড় মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু এই সকল প্রীতিকর কল্পনার পশ্চাতে যে ভয়ানক প্রলয়ঙ্করী শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা তখন কাহারও চিত্তে উদিত হয় নাই। ইহা দ্বারা মানব এক নূতন রাজ্য অধিকার করিতে চলিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের রাজ্যেরও যে অসীম ক্ষতির সম্ভাবনা,তাহা তখন সে উপলব্ধি করে নাই। সেই কথাই সুপ্রসিদ্ধ বিমানচারী Claude Grahame White সাহেব সম্প্রতি আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার উক্তির সারাংশ আমরা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

মানুষের নানাবিষয়ক পরিবর্ত্তনের সহিত তাহার সমর নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বারুদের আবিষ্কারে উহার প্রথম যুগান্তর ঘটিয়াছিল। এক্ষণে এরোপ্লেনের অভ্যুদয়ের সহিত সমর রীতির অপর এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। হ্যানিবলের (Hannibal) ন্যায় সেনানায়ক অষ্টারলিজ্ (Austerlitz) বা ওয়াটারলু (Waterloo) ক্ষেত্রে কিরূপ বিপদে পড়িতেন, তাহা আজ সহজেই অনুমেয়। আবার নেপোলিয়নের ন্যায় সমরকুশল ব্যক্তি অধুনাতন সময়ে কিরূপ পর্য্যুদস্ত হইতেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। সমুদায় রণকৌশল আজ এরোপ্লেনের নিকট পরাভূত—ত্রস্ত। শত শত হস্ত উচ্চে শত্রুবাহিনীর এরোপ্লেন ঘুরিতেছে, তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া কোনও গুপ্ত চাল চালিবার উপায় নাই। শুধু তাহাই নহে। সমরবাহিনী নিরুদ্বেগচিত্তে চলিয়াছে, এমন সময়ে আকাশ হইতে গুটী কয়েক বোমা পড়িয়া ব্যূহ ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল, হয়ত, বারুদের বস্তাগুলিকে ফাটাইয়া দিল। মেঘের আড়াল হইতে যুদ্ধ করায় স্বয়ং রামচন্দ্রই পারিয়া উঠেন নাই, সাধারণ মনুষ্য ভূমি হইতে কিরূপে ঐরূপ আক্রমণ রোধ করিবে?

আজকাল সত্য সত্যই এরূপ এরোপ্লেন-বাহিনী সজ্জিত হইতেছে। ফ্রান্স ও

জার্ম্মানী এ বিষয়ে খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সমর-বিভাগ হইতে অনেক এরোপ্লেন প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল পুষ্পকরথ আয়তনে ছোট, কিন্তু খুব মজবুত, আর তাহাদিগের পরিচালক যন্ত্র মোটরকারের যন্ত্রের ন্যায় সমধিক শক্তিশালী। এগুলি ঘণ্টায় ৬০ মাইল অনায়াসে পরিভ্রমণ করে অথচ একাদিক্রমে ৩।৪ ঘণ্টা শূন্যপথে বেড়াইতে সমর্থ। এগুলি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, সাধারণ কোনও প্রকার ঝঞ্ঝাবাতে ইহাদের সঞ্চরণের ব্যাঘাত হয় না। অধিকন্তু এই সকল গগনবিহারী সারথি এত দীর্ঘকাল এই ব্যোমযানের চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছে যে, তাহারা মরণের ভয় রাখে না—আকাশটা যেন নিজের দেশ করিয়া লইয়াছে। ইহাদের সামর্থ্যও কম নহে। যেখানে নিজের বসিবার ঠাঁই ছাড়িলে দাঁড়াইবার জায়গা নাই, এরূপ স্থানে একভাবে বসিয়া তাহারা সাগ্রহনেত্রে দূরবীক্ষণ-সাহায্যে শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। অথচ, তাহাদের সতত চেষ্টা—আত্মরক্ষা ও ততোধিক আত্ম-গোপন, এবং শত্রুদলও যাহাতে কোনওরূপে তাহাদের দৃষ্টি এড়াইতে না পারে অথবা কোনও কৃত্রিম লোকলস্কর খাড়া করিয়া নিজের গতিবিধি আবরণ না করে। শকুনির মত আকাশে বিচরণ করিয়াই তাহাদিগকে বিপক্ষের সৈন্যবল নিরূপণ করিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল সম্বাদ স্বপক্ষীয় সেনানায়ককে দিতে হইবে,—কোনওরূপ ভুলচুক্ হইলেই সর্ব্বনাশ! বস্তুতঃ এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সারথি শুধু শিক্ষার অভ্যাসের দ্বারা তৈয়ার করা যায় না—ইহারা একপ্রকার স্বভাবসিদ্ধ পুরুষ বলিলেই হয়! এইরূপ শক্তিশালী বহু লোক এখন ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে বিদ্যমান।

এই সকল এরোপ্লেন কিরূপ অদ্ভুত কর্ম্মক্ষম তাহার বিবরণ পাঠ করিলে, আর রামায়ণ বা মহাভারতকে একেবারেই কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না! হোয়াইট্ সাহেব বলিতেছেন, "মনে করুন, আপনি লণ্ডন সহরের এক হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষে দিব্য আরামে ঘুমাইতেছেন, এমন সময় সহসা ভীষণ বজ্রনির্ঘোষ ও সঙ্গে সঙ্গে দামিনীর আলোকমালায় গগন পরিপূরিত হইল। আপনার নিদ্রাভঙ্গ হইল—চক্ষু ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইল, আপনি ভাবিলেন বুঝি প্রলয় উপস্থিত! কিন্তু, ব্যাপার প্রলয় বটে, তবে ইংলণ্ডের পক্ষে। রাত্রির মধ্যে English Channel পার হইয়া ফ্রান্স কিংবা জার্ম্মানীর সমর-বিমান-সকল ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছে! কোটী কোটী টাকা খরচ করিয়া যে সকল Dreadnought সদ্য নির্ম্মিত হইল—তাহার প্রদর্শনী হইবে। দেশের লোক

সে দৃশ্য দেখিতে ছুটিয়া গেল—এমন সময় কোথা হইতে পূর্ব্বাকাশে মেঘের মত ভাসিতে ভাসিতে খানকয়েক এরোপ্লেন আসিয়া বড় সাধের, প্রজার শোণিত-নির্ম্মিত সমরপোতগুলি ধ্বংস করিয়া গেল! গগনমার্গে যাহারা বিচরণ করে, ধরার অঙ্ক হইতে তাহাদের সহিত যুঝা অসাধ্য। আকাশে কিছু ঘাঁটিতে ঘাঁটীতে প্রহরী নাই যে শত্রুর আগমন-সংবাদ দিবে।—শূন্যে দুর্গনির্ম্মাণ ঘোটকডিম্বের ন্যায় অলীক পদার্থনিচয়ের পর্য্যায়ভুক্ত। এরূপ ক্ষেত্রে এরোপ্লেনের যে অপ্রতিহত ক্ষমতা হইবেই, তাহা আর বিচিত্র কি?

তবে আশার কথা এই যে, রাজ্যের ভার যাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বপ্রথম ভূমি হইতে বিমান ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইল। সম্প্রতি যে ত্রিপোলী যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে ইটালীয় এরোপ্লেনগুলি সবিশেষ কাজে আসিয়াছিল। ঐ যুদ্ধে তুর্কীরা কামানের দ্বারা উক্ত বিমান ধ্বংস করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। অবশ্য তুর্কীদের কামানও আশানুরূপ উচ্চশ্রেণীর ছিল না। কিন্তু এরোপ্লেনের ধ্বংসের জন্য আজকাল যে সকল উর্দ্ধমুখ অশেষ শক্তিশালী কামান তৈয়ার হইয়াছে, তাহারাও কাজে লাগিবে কি না সন্দেহ। সন্দেহের প্রথম কারণ বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষার অভাব। এ পর্য্যন্ত ঘুড়ি কিম্বা বেলুন লইয়াই ঐ সকল কামানের কার্য্যকরী শক্তি পরীক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃত এরোপ্লেন ব্যবহৃত হয় নাই। দ্বিতীয় ক্ষিপ্রগতি এরোপ্লেনকে অব্যর্থ লক্ষ্য করিয়া গোলাগুলি নিক্ষেপ বড়ই দুঃসাধ্য। মোটের উপর, ভূমি হইতে এরোপ্লেনের সহিত লড়াই একপ্রকার অসম্ভব।

সুতরাং "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" নীতি-অনুসারে এখন এরোপ্লেন দ্বারা এরোপ্লেন-ধ্বংসের চেষ্টা হইতেছে। বিশালকায় সমরপোত ফাঁসাইবার জন্য যেরূপ ছোট ছোট টর্পেডো আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেইরূপ এরোপ্লেনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুদৃঢ় যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। শিক্ষিত শ্যেন পক্ষী যেরূপ বায়ুবেগে উড্ডীন হইয়া অন্যান্য পক্ষীকে নিহত করে, সেইরূপ এগুলিও সুদৃঢ় বর্ম্মাবৃত হইয়া গগনমার্গে বিচরণশীল ব্যোমযানের উদ্দেশে ধাবমান হইবে। এইরূপে বিপক্ষ-দলের "বায়ুবল" বিনষ্ট করিবার জন্য বহুশত ক্ষুদ্র এরোপ্লেন নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে।

অতএব ব্যাপারটা যে ক্রমশঃ কিরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে,

তাহাই লইয়া এখনকার রণনীতি-বিশারদগণ আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধ এখন আর সৈন্যে সৈন্যে নহে—কেবল জনকতক সুদক্ষ বিমানচারীর মধ্যে। যে দলের বিমাননিচয় বিপক্ষদলের এরোপ্লেন সকলকে ধ্বংস করিতে পারিবে—তাহারাই রণক্ষেত্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিবে। সমগ্র আকাশ তাহাদের একাধিকারভুক্ত—এরোপ্লেনের যে সকল সুবিধা সে সমুদায়ই তাহারা নিরুদ্বেগচিত্তে ভোগ করিবে। বস্তুতঃ, রাজ্যরক্ষার প্রধান বল দাঁড়াইবে—এরোপ্লেন।

এক এক দল এরোপ্লেন এক একজন সেনানায়কের হস্তে সমর্পিত। তাঁহারা নিজে ব্যোমযানে উঠিয়া শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি লক্ষ্য করিবেন। কোথাও বিশেষ তথ্য জানিবার প্রয়োজন—তৎক্ষণাৎ তুইখান এরোপ্লেন পাঠাইলেন। সুদূর গগনপ্রান্তে অরাতির বিমানসকল দেখা যাইতেছে। অধ্যক্ষ সদলবলে সেস্থানে যাইয়া সমরে ব্যাপৃত হইলেন। কি ভয়াবহ সমর! প্রত্যেক এরোপ্লেনে তুইজন অসমসাহসিক সৈন্য—একজন রথ চালাইতেছে—অন্যজন সেই এরোপ্লেনে বসিয়া কামান দ্বারা শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু বিপক্ষদলের একটী গোলা লাগিলেই মুহূর্ত্তমধ্যে এরোপ্লেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।—জাহাজ ধ্বংস হইলে তবু তক্তা কিম্বা পিপা অবলম্বন করিয়া ভাসা যায়—কিন্তু তুই মাইল উচ্চে স্থানভ্রষ্ট হইয়া যখন কেহ ভাঁটার মত ঘুরিতে ঘুরিতে ধরিত্রীর কোলে ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহাকে "সনাক্ত" করিবার আর উপায় পর্য্যন্ত রহিবে না। ঘণ্টা তুই যুদ্ধের পর—সব নিস্তব্ধ—বিপক্ষের বিমান-বাহিনী পর্য্যুদস্ত করিয়া বিজয়ী এরোপ্লেনগুলি নির্ভয়ে গগনপথে বিচরণ করিতে থাকিবে। সে পক্ষের সেনানায়ক সাফল্যলাভে কৃতনিশ্চয় হইলেন। ইহাই ভবিষ্যতের সমর! কার্য্যতঃ কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা অদ্যাবধি পরীক্ষিত হয় নাই, তবে যেরূপ অনুমান তাহাতে ব্যাপার যে অতি লোমহর্ষণ হইবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

শ্রীসুহাসচন্দ্র রায়।

জীব ও উদ্ভিদ।

পূর্ব্বে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থ সম্বন্ধে মানুষের যে ধারণা ছিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনার ফলে সে ধারণা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে বুঝিত যে উদ্ভিদ মাটিতে জন্মিয়া থাকে এবং যেস্থলে তাহাদের জন্ম হয় সেই স্থলেই তাহারা বাড়িতে থাকে। মানুষে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া দিতে পারে কিন্তু উদ্ভিদ নিজে চেতন পদার্থের মত এক স্থল হইতে অপর স্থলে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না। ইতস্ততঃ চলাফেরা করিবার শক্তিটা কেবল জীব জাতির বিশেষ গুণ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফলে আমাদের এ ধারণাটা এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন আকারের গতিহীন অনেক ছোট ছোট সামুদ্রিক বৃক্ষের শরীরের এক এক অংশ পৃথক হইয়া যায়। তখন সেই খণ্ডিত অংশ চুলের মত অবয়বের সাহায্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, বেশ মনোমত স্থানে উপনীত হইলে তবে সেখানে শিকড় গাড়িয়া আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। অনেক উদ্ভিদ আজন্ম কাল কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়। গাছের বীজের তো কথা নাই। আমাদের দেশের সিমূল তুলার বীজগুলা বায়ু-বক্ষে কত সুখে উড়িয়া কত স্থান ঘুরিয়া তবে একস্থলে মৃত্তিকা প্রোথিত হয়।

চেতন পদার্থ বা জীবও যে সকল সময় একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে তাহা নহে। অনেক সামুদ্রিক জীব যেস্থলে জন্মায় ঠিক বৃক্ষের মত সেই-স্থলেই বাড়িতে আরম্ভ করে। তাহারা চলৎশক্তি রহিত। প্রবাল বা কোরাল ও স্পঞ্জ (sponge) জাতীয় জীব ইহার উদাহরণ। আবার এমন জীব আছে যাহাদের জীবনের প্রথমাবস্থায় উদ্ভিদ বলিয়া মনে হয়, প্রৌঢ়ে তাহাদিগকে জীব বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

সাধারণ অজ্ঞ লোকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অতীত যুগের বিজ্ঞানবিদ-দিগের মধ্যে উদ্ভিদ ও জীব শরীরের যে বিশেষত্বের ধারণা ছিল এখনকার বিজ্ঞানানুশীলনের ফলে সে ভাবরাজ্যে একটা মস্ত বিপ্লব ঘটিয়াছে। জীব শরীরের পরিপাক করিবার যন্ত্রে একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের মুখ হইতে একটা সরু রাস্তা চলিয়া গিয়া শরীরের মধ্যে একটা গর্ত্তের সহিত সংযুক্ত হই-য়াছে। এই ভীষণ গর্ত্তের নাম জঠর। ইহাকে পূর্ণ রাখিবার জন্যই জীবের

এত উদ্যম, এত চেষ্টা। উদ্ভিদের শরীরে এরকম গর্ত্তের মত উদর নাই। তাহাদের পরিপাক করিবার প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের। অশ্বথ বৃক্ষ নিজ বিশাল দেহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য পৃথিবী হইতে যে উপায়ে উপকরণ সংগ্রহ করে আমাদের অতিকায় হস্তী নামক জীব সেরূপভাবে ভোজন করে না।

আধুনিক পণ্ডিতদিগের পর্য্যবেক্ষণ ফলে আমাদের এ ধারণাটা ভ্রমমূলাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। জীবকে স্থূল দ্রব্য ভোজন করিতে হয় বলিয়া সাধারণতঃ তাহার শরীরের মধ্যে একটা বিবর থাকে, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর এমন অনেক প্রকারের জীব আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের শরীরে উক্ত প্রকারের উদর বিবর মোটেই নাই। উদ্ভিদ জাতির সাধারণ আহার্য্য জল ও বায়ু। সুতরাং তাহাদের উদরের আবশ্যক নাই। কিন্তু অনেক স্থলে উদর বিশিষ্ট উদ্ভিদও উদ্ভিদবিদদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে; জীবের পরিপাক কার্য্যের একটা বিশেষত্ব আছে। তাহাদের শরীরের গ্রন্থি বিশেষ হইতে কতকগুলা পদার্থ নির্গত হয়। তাহা খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইলে, আহার্য্য পরিপক্ক হইয়া দেহ নির্ম্মাণ করে। মানুষের যকৃত হইতে ঐরূপ ভাবে হজমী রস নির্গত হয়। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে পরিপাক-যন্ত্রের এই প্রক্রিয়াটা জীবজাতির একচেটে। এখন কিন্তু দেখা গিয়াছে যে অনেক বৃক্ষ কেবল পাদপ নহে, তাহারা মাংসাশী। তাহাদের পাতায় চুলের মত সরু সরু গ্রন্থি থাকে। মানুষের যকৃতের গ্রন্থি হইতে যেমন হজমি (pancreating) রস নির্গত হয়, ইহাদের ভিতর হইতেও সেই রকম রস ক্ষরণ হয়।

জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদগণ অপর একটা পার্থক্য দেখিতেন। জীবগণ শ্বাসের সহিত শরীরের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট করে। তাহা হইতে তাহারা অম্লজানটুকু দেহের মধ্যে রাখিয়া কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বা দ্ব্যম্লঙ্গারজান বাষ্প টুকু নিঃশ্বাসের সহিত বাহির করিয়া দেয়। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে পাদপগণ ঐরূপ শ্বাস প্রশ্বাস করিতে অক্ষম। এক্ষণে কিন্তু জানা গিয়াছে যে তাহারা রাত্রে শরীর হইতে কার্ব্বন বা অঙ্গার ছাড়িয়া থাকে ও অম্লজান গ্রহণ করে। আর এক রকম শৈবাল, (fungus) জীবের মত সর্ব্বদাই অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্ব্বন ত্যাগ করিয়া থাকে।

লোকে ভুল করিয়া এত দিন মনে করিত যে বৃক্ষের স্নায়ু (nerve) নাই। জীবের শ্রেষ্ঠত্ব স্নায়ুতে। জীবের শরীররূপ যন্ত্র যত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ইহার স্নায়ুর কার্য্যও তত অধিক সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের শরীরের সর্ব্বত্র

স্নায়ু বিদ্যমান। বহির্জ্জগতের সকল সংবাদ ইহাদের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কে পঁহুছিতেছে শেষে এক অজ্ঞাত কার্য্যের দ্বারা সে সংবাদ আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে। আবার এই স্নায়ুর দ্বারা আমাদের মনের যত আজ্ঞা শরীরের কর্ম্মেন্দ্রিয়ে পঁহুছিতেছে। কতকগুলা স্নায়ু অভ্যাসবশতঃই আমাদের হিতসাধন করিতেছে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শের মধ্যে কোনওটিই উদ্ভিদের জানিবার উপায় নাই। অবশ্য ঠিক জীবের মত দেখিতে পাইবার, আস্বাদন করিবার, আঘ্রাণ করিবার শুনিবার শক্তি না থাকিলেও পাদপের যে স্পর্শানুভব আছে তাহা অনেক বৃক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। লজ্জাবতী লতা যখন আমাদের কঠোর স্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া যায় তখন তাহার দেহে স্পর্শেন্দ্রিয়ের এবং কর্ম্মঠ স্নায়ুর প্রক্রিয়া বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে যেটুকু সন্দেহ ছিল তাহা আমাদের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র দূর করিয়া দিয়াছেন। তাড়িত প্রবাহে জীবের শরীরের যেমন স্পন্দন হয়, উদ্ভিদ বপুতেও তেমনি স্পন্দন তিনি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

মানুষের চক্ষু যেমন আলোক ও আঁধারের পার্থক্য বুঝিতে পারে, গাছেরও সামান্য পরিমাণে আলোক ও আঁধার বুঝিবার শক্তি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সূর্য্যমুখী প্রভৃতি ফুলের এ শক্তি আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। জীব ও উদ্ভিদের, এমন কি, ব্যাধি প্রভৃতি অনেক সময় এক শ্রেণীর হইয়া থাকে।

উপরে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে একটা এমন অলঙ্ঘনীয় গণ্ডী নাই যাহা হইতে এতদুভয় জাতিকে একেবারে বিভিন্ন শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। একখণ্ড পাথরে ও একটা আম-গাছের শরীরের যে পার্থক্য, সে রকম একটা পার্থক্য জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে নাই। একটা খরগোসের শরীরে ও আইজাক নিউটনের দেহের গঠনে প্রাণতত্ত্ব-বিদগণ একটা সাদৃশ্য দেখিয়া থাকেন, সেরূপ সাদৃশ্য তাঁহারা এক টুকরা পাথরে ও মানুষে বা পাথরে ও গাছে দেখিতে পান না। কিন্তু আজ কাল তাঁহারা একটা গাছে ও একটা বনমানুষে একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইতে-ছেন। বাহির হইতে দেখিলে সে সাদৃশ্যের কথা শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু স্থির চিত্তে বিজ্ঞানবিদদিগের চক্ষে দেখিলে জগদীশ্বরের এ সৃষ্টি-মাধুর্য্যে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়।

এই বিস্ময়কর সাদৃশ্য হইতে একটা কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যেমন অতি নিকৃষ্ট জড়প্রায় জীব হইতে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের অভিব্যক্তি

হইয়াছে, সেইরূপ নিকৃষ্ট জাতীয় বৃক্ষ হইতে বড় বড় মহীরুহেরও সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের দ্বারা এক রকমের জীব হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া অপর শ্রেণীর জীবের অভিব্যক্তি হয়। ঠিক সেইরূপ পরিবর্ত্তন ও স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের দ্বারা এক শ্রেণীর বৃক্ষ হইতে অপর শ্রেণীর বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। অভিব্যক্তিবাদ প্রাণীজগতেও যেমন কার্য্য করে উদ্ভিদ জগতেও তেমনি কার্য্য করে।

আমরা দেখিয়াছি আমগাছে ও মানুষে নামমাত্র সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সমুদ্র শৈবাল ও স্পঞ্জের মধ্যে সাদৃশ্যটা কিছু অধিক। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর জীব ও উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে সাদৃশ্য অত্যল্প, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর জীবে ও নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদে কেবলমাত্র সাদৃশ্য কেন, ঘনিষ্ঠতা আছে। অতি নিম্নশ্রেণীর জীব ও উদ্ভিদে সাদৃশ্য এত বেশী যে অনেক সময় একটা 'যন্ত্রীকৃত' পদার্থ জীব কি উদ্ভিদ তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জীব হইতে বৃক্ষ বা বৃক্ষ হইতে জীবের উদ্ভব, সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি সম্ভবপর। যেমন অভিব্যক্তির ফলে নেকড়ে বাঘ হইতে কুকুরের সৃষ্টি হইয়াছে সেই রকম ভাবে খুব নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে খুব নিম্নশ্রেণীর জন্তুর সৃষ্টি আদৌ অসম্ভব নহে। একই আদিম কেলেগোলা (rock pigeon) পায়রা হইতে যেমন লক্কা ও গলাফুলা পায়রা সৃষ্টি হইয়া উভয়ে একেবারে বিভিন্ন আকার ধারণ করে, সেইরূপ একই পদার্থ হইতে স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের দ্বারা প্রায় সমদর্শন জেলিমৎস্য ও সমুদ্রের শৈবাল জন্মাইয়া ক্রমে পরস্পরের পার্থক্য বর্দ্ধিত করিয়া যখন তালগাছ ও গজরাজে পরিণত হইল তখন এতদুভয় জাতির জন্ম একই বংশে একথা শুনিয়া লোকের প্রথমে হাসি আসিবারই কথা। হাবড়া হইতে রেলের লাইন সিমলা পাহাড়েও গিয়াছে আবার সেতুবন্ধ রামেশ্বরেও গিয়াছে। এই রেল লাইনের হাওড়ার অংশটি না দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে সেতুবন্ধের লাইন এবং সিমলা লাইন একই স্থল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হাওড়া যদি জীব ও উদ্ভিদের জন্মস্থান হয় তাহা হইলে তাহারা হাওড়ার কিছু পশ্চিম অবধি একত্র ছিল। তাহার পর তাহাদের অভিব্যক্তি দুই দিকে ছুটিল। একদিকে মানুষের মত সম্পূর্ণাবয়ব জীবের সৃষ্টি হইল, অপর দিকে গোলাপ, দালিয়া প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। ইহাদের আদিম উৎপত্তির কাণ্ড এক, ক্রমশঃ শাখাগুলি বিভিন্ন দিকে ছুটিয়াছে।

পৃথিবীতে অগ্রে জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল না পূর্ব্বে উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছিল

সে তর্ক আমরা পরে করিব। উপরে আমরা জীব ও উদ্ভিদের 'কাঠামো'র সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছি। বলিয়াছি মনোযোগ দিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে এক হইতে অপরের উৎপত্তি। তবে জীব ও উদ্ভিদ বহুদিন হইতে বিভিন্ন পথে যাত্রা করিয়া পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়ের পার্থক্য সৃজন করিয়া তুলিয়াছে। আমি বাহ্যিক পার্থক্যের কথা বলিতেছি না। কতকগুলা আভ্যন্তরিক পার্থক্য দেখাইয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

ইহাদের প্রথম পার্থক্য জন্মপ্রথায়। দুই এক শ্রেণীর জন্তুকে কাটিলে আবার সেই সকল খণ্ডিত অংশ হইতে পূর্ণাবয়ব জন্তুর উৎপত্তি হয়। এ ব্যাপারটা জীব জগতে অতি অল্প। কিন্তু উদ্ভিদ জগতে একের দেহ হইতে পূর্ণাবয়ব অপর শরীর গঠিত হইবার ব্যবস্থা বড় অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যেমন 'কলুমে' আম খাইয়া রসনার পরিতৃপ্তি করি, সে রকম ভাবে 'কলুমে' ইলিস মাছ বা কলুমে পাঁটা খাইতে পাই না। উদ্ভিদের জন্মপ্রণালী দুই রকমের, জীবের জন্মপ্রণালী সাধারণতঃ এক প্রকারের।

ভোজন ব্যাপারে জীবে ও উদ্ভিদে একটা অলঙ্ঘনীয় পার্থক্য বর্ত্তমান আছে। আমরা যে রকমে ভোজন করি পাদপ সেরূপে ভোজন করে না। জীবন সংগ্রামে আমাদের দেহের যে অপচয় ঘটে তাহা পূরণ করা এবং দেহের পুষ্টিসাধন করাই আহারের উদ্দেশ্য। বৃক্ষকেও নিজ দেহের অপচয় পূরণ করিতে ও দেহের পুষ্টিসাধন করিতে হয়। কিন্তু বৃক্ষ অদৃশ্য পদার্থকে নিজ শরীর মধ্যে ভরিয়া তাহা দ্বারা নিজের দেহের গঠন করিতে পারে, জীব তাহা পারে না। জীবকে হয় গাছ খাইতে হয় না হয় উদ্ভিদ-খাদক জীব ধরিয়া খাইতে হয়। যদিও হাইড্রোজেন (জলযান) ও কার্ব্বন বা অঙ্গারের মিশ্রণে যে পদার্থ নির্ম্মিত হয় তাহার দ্বারা জীবের দেহের পুষ্টিসাধন হয়, জীব আহার করিয়া খাদ্য হইতে কেবল ঐ পদার্থ আহরণ করে মাত্র কিন্তু মানুষের দেহে এমন কোনও যন্ত্র নাই যাহা দ্বারা সে প্রকৃতির নিকট হইতে হাইড্রজেন, কার্ব্বন প্রভৃতি ধরিয়া নিজের শরীরের মধ্যে ঠিক ঐ পদার্থটি নির্ম্মাণ করিতে পারে। এ কারখানা বৃক্ষের দেহের মধ্যে আছে, জীবদেহে নাই। তাই প্রাণ ধারণের জন্য জীবকে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। উদ্ভিদ নিজের দেহের মধ্যে এই hydro-carbon বা উদঙ্গার নির্ম্মাণ করিয়া তাহা তাহার শরীরের cell এবং tissue-র মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে। জীব সেগুলিকে উদরস্থ করিয়া hydro-carbon বা উদঙ্গার দ্বারা নিজ দেহের কল্যাণ সাধন করে। আবার কোন কোন জীব উদ্ভিদ না খাইয়া

উদ্ভিদভোজী অপর জীবকে খাইয়া তাহার দেহে সঞ্চিত hydro-carbon নিজ শরীরে প্রবিষ্ট করে।

উদ্ভিদ কি শক্তির দ্বারা অদৃশ্য পদার্থ হইতে দেহ গঠিত করিতে পারে, অশরীরি (inorganic) পদার্থ হইতে শরীর নির্ম্মাণ করিতে পারে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। বৃক্ষ কিরূপে একার্য্য সাধিত করে সে প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানিকেরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে। বৃক্ষের শরীরের ভিতর chlorophyll নামক এক প্রকারের সবুজ বর্ণের পদার্থ আছে। ইহা উদ্ভিদের মেদমজ্জার সহিত মিশ্রিত আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ক্লোরোফিলের জন্যই গাছের পাতার রঙ্ সবুজ। উদ্ভিদ পদ বা শিকড় দ্বারা জল শুষিয়া নিজের দেহেতে তুলিতে পারে আর গাছের পাতায় শত শত মুখ আছে তাহাদের দ্বারা ইহারা বায়ু হইতে Carbonic acid gas বা দ্ব্যম্লঙ্গারজান বাষ্প টানিয়া দেহের মধ্যে পুরিতে পারে। কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসে এক ভাগ কার্ব্বন এবং দুই ভাগ অম্লজান বা অক্সিজেন আছে। আর জলেতে দুই ভাগ হাইড্রজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন আছে। গাছ পাতা দ্বারা কার্ব্বনিক এসিড টানিল এদিকে শিকড় দিয়া জল টানিল। এইবার ক্লোরোফিলের বিশেষ কার্য্য আরম্ভ হইল। যেমনি ক্লোরোফিলের উপর সূর্য্যালোক পতিত হয় অমনি ক্লোরোফিল যেন এক যাদুর বলে কার্ব্বনিক এসিডকে চূর্ণ করিয়া তাহার কার্ব্বন ও অক্সিজেনটুকু পৃথক করে এবং জলকে ভাঙ্গিয়া তাহার হাইড্রজন ও অক্সিজেনকে পৃথক করে। কার্ব্বনিক এসিড ও জল হইতে মুক্ত অক্সিজেন বৃক্ষের শরীর হইতে বাহির হইয়া যায় সেই মুক্ত কার্ব্বন ও হাইড্রজেন একত্র আবদ্ধ হইয়া hydro-carbon সৃষ্টি করিয়া ফেলে। এই hydro-carbon বৃক্ষের দেহ গঠন করে ও বৃক্ষের মধ্যে থাকিয়া যায়। শেষে তথা হইতে জীবদেহে প্রবেশ করে।

জীব হইতে পৃথক হইয়া গিয়াও উদ্ভিদ তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতার উপকার করিতে বিরত হয় না। কেবল নিজের শাখায় ফুল ফুটাইয়া, পাতায় শিশির বিন্দু ধরিয়া, বায়ু ক্রোড়ে নাচিয়া দুলিয়া বৃক্ষ জীবের দৃষ্টিসুখ সম্পাদন করে তাহা নহে। উদ্ভিদ আপনার জীবন দান করিয়া জীবের দেহের পুষ্টি সাধন করে। আমাদের অলিকুলও গুন গুন স্বরে গান গাহিয়া ফুলের মধু চুরি করিতে গিয়া অজ্ঞাতে এক ফুলের পরাগ অপর ফুলে মিশাইয়া দিয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করে। আমরা পরে সে কথা ভাল করিয়া বুঝাইব।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গেটম্যান্ ।*

লাইনের ধারে সে ঘরখানি। চারিদিকে দুএকটা তুলসী গাছ, দু'চারটা জবাগাছ সেই ছোট ঘরখানির শোভা সম্বর্দ্ধন করিত। তাহাতেই গেট্‌ম্যান্ জহরলাল বাস করিত। তাহার এই সংসারে আপনার বলিবার কেহ ছিল না। স্ত্রী একটী এক বৎসরের পুত্র রাখিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। এই পুত্রটী জহরের হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ, সমস্ত আদর ও সমস্ত যত্নের অধীশ্বর হইয়াছিল। রাত্রে যখন কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া বৃদ্ধ শয়ন করিত, তখন এই শিশুর স্নেহমাখা স্বর্গীয় মুখখানি তাহার মনে শান্তি আনিয়া দিত, তাহার দুঃখ শোক প্রশমিত করিত! যখন দারিদ্র্য আসিয়া তাহাকে কশাঘাত করিত, যখন শোকের তরঙ্গ তাহার উপর দিয়া বহিয়া যাইত, যখন পীড়া আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিত তখন সেই শিশুর সহাস্য সদাচঞ্চল মুখখানি তাহাকে সুখ দিত, শান্তি দিত, তাহার বিদ্রোহী মনকে সংযত করিত। এই শিশুটীতেই তাহার সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত আনন্দ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে সে ইহাকেও রাখিতে পারিল না। ভীষণ প্লেগ আসিয়া তাহাকে এ মরজগত হইতে অপসারিত করিল। সে স্বর্গের পুষ্প এই পাপভার প্রপীড়িত সংসারে ফুটিল না। পৃথিবীতে বৃদ্ধের এই একমাত্র বন্ধনও শিথিল হইয়া গেল।

শোকের ভীষণ আঘাতে বৃদ্ধ প্রথমে শয্যাশায়ী হইয়াছিল, ক্রমশঃ সে তাহার কাজকর্ম্ম দেখিতে লাগিল। সে তাহার দৈনন্দিন কাজকর্ম্মে অবহেলা করিত না বটে, কিন্তু তাহার কোন বিষয়ে আর তেমন উৎসাহ, আগ্রহ ছিল না। সে যেন নির্ব্বিকার হইয়াছিল। যখন কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া গৃহে ফিরিত, তখন তাহার হৃদয়তন্ত্রী কাহার জন্য বাজিয়া উঠিত, তাহার চক্ষু সেই চিরপরিচিত, অতি পুরাতন দৃশ্য দেখিতে ব্যগ্র হইত, তাহার কর্ণ কাহার অর্দ্ধোচ্চারিত মধুর কথা শুনিতে চাহিত। বৃদ্ধের আর কোনও বিষয়ে স্ফূর্ত্তি দেখা যাইত না।

(২)

"গেটম্যান্, ফুল দাও না?" অর্দ্ধস্ফুট স্বরে অনিন্দ্যসুন্দর একটী তিনবর্ষীয় শিশু কহিল—"গেটম্যান্ ফুল দাও না?" বালক স্থানীয় ডেপুটী বাবুর পুত্র। তাঁহার বাসা অতি নিকটেই ছিল। সে একটু সুবিধা পাইলেই বৃদ্ধের কুটীরে

---

* সত্যঘটনামূলক গল্প।

আসিয়া তাহাকে নানাপ্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। কিন্তু জহরলাল তাহাতে বিরক্ত হইত না। এই বালকের সুচারু কমনীয় আনন,ইহার সচঞ্চল চাহনী,ইহার আধ আধ কথোপকথন তাহাকে একটী শিশুর কথা মনে করাইয়া দিত। বৃদ্ধ এই বালককে তাহার তাপিত, ক্লিষ্ট হৃদয়ের সব স্নেহটুকু অর্পণ করিয়াছিল। সে আসিলে বৃদ্ধ তাহার সব কাজকর্ম্ম ফেলিয়া তাহাকে লইয়া বসিত। অপরাহ্নের স্নিগ্ধ হিল্লোল যখন তাহার কেশরাজি বিশৃঙ্খল করিত, তখন বৃদ্ধ সস্নেহে সেই কেশগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে যত্নবান হইত। বালক পুষ্পপ্রিয় ছিল বলিয়া, বৃদ্ধ দূরস্থিত উদ্যান হইতে প্রত্যহ রাশি রাশি ফুল আনিত। বালক যতক্ষণ তাহার কুটীরে থাকিত, ততক্ষণ বৃদ্ধ বেশ প্রফুল্ল থাকিত।

তাঁহার পুত্র যে একটা সামান্য গেট্‌ম্যানের কুটীরে গমন করে, ইহা আভিজাত্যগর্ব্বিতা ডেপুটী-গৃহিণী ভাল মনে করিতেন না। তিনি বালককে তথায় যাইতে নিষেধ করিতেন—কিন্তু সে অবোধ বালক যেখানে ভালবাসা পাইত, যেখানে তাহার মন আকৃষ্ট হইত, সেইখানে না যাইয়া সে থাকিতে পারিত না। যখন ডেপুটী-গৃহিণী ইহা জানিতে পারিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতেন। সে অপরাধীর মত নত মস্তকে ভর্ৎসনা সহ্য করিত, পুনরায় তথায় যাইবে না অঙ্গীকার করিত, কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হইলেই তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, সে মাতৃতিরস্কার বিস্মৃত হইত। ডেপুটী-গৃহিণী অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, বালককে দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে দিতেন না। সে পলায়নের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিল না। তাহার স্বভাবসুলভ চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহার সেই সুন্দর আননে আর হাস্যলহরী ক্রীড়া করিত না, সে সর্ব্বদা নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিত। তাহার মন সেই তুলসী জবা বৃক্ষ সুশোভিত কুটীরে যাইতে ব্যগ্র হইয়াছিল। সে মাতার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া পলাইতে পারিল না।

এদিকে বৃদ্ধ সকল কাজ শেষ করিয়া বসিয়া আছে—সেই বালকের অপেক্ষায়। তাহার দ্রুতপাদবিক্ষেপ শব্দ শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাপিও সেই শিশুর অমৃতময় কণ্ঠস্বরে তাহার কক্ষ মুখরিত হইল না—সে আসিল না। বৃদ্ধ চিন্তিত হইল—ভাবিল হয়ত তাহার দেহ অসুস্থ। সে ব্যস্ত হইয়া ডেপুটী-গৃহে গমন করিয়া মাতাঠাকুরাণীর কঠোর আদেশের কথা ভৃত্যবর্গের নিকট শুনিল। শুনিয়া সে মর্ম্মাহত হইল—বালকের

কি অপরাধ। বৃদ্ধত তাহার কোনও অনিষ্ট করে নাই। একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে ভগ্ন হৃদয়ে নিজের ক্ষুদ্র কুটীরে ফিরিল। তাহার পর তিনদিন চলিয়া গিয়াছে বৃদ্ধ বালকের সাক্ষাৎ লাভের আশায় ডেপুটী-গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু কোনদিন তাহার আশা ফলবতী হইত না। প্রত্যহই সে বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিত।

রাত্রি হইতে বালকের জ্বর হইয়াছে। জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বালকের কমনীয় শুভ্র মুখখানি জ্বরাতিশয্যে লোহিতাভ হইয়াছে। সে অস্থির হইয়া শয্যাপরে গড়াইতেছে। দিবাবসানে বালক প্রলাপ বকিতেছে—"গেটম্যানের কাছে যাব" পিতা ও মাতা তাহার শিয়রে বসিয়া আছেন, ও ঔষধ দিতেছেন। রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের দেহ শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। ঊষাগমনে বালকের দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপক্ষী নির্গত হইয়া অনন্তে মিশিয়া গেল। গৃহে উচ্চরোলে পিতামাতা ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ সে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিল, তাহার হৃদয় কি এক অজানা অমঙ্গলাশঙ্কায় ভরিয়া গেল, সে দ্রুত-পদে ডেপুটী-ভবনে আসিয়া বালকের মৃত্যু সংবাদ শুনিল। তাহার পর যখন উদীয়মান সূর্য্য প্রকৃতিকে গোলাপী পরিচ্ছদে আবৃত করিতেছিল, তখন সেই বৃদ্ধ কুটীর পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল!

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সম্রাট্ অশোকের সম্বন্ধ।*

জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, রাজকীয় সহানুভূতি বা আনুকূল্য ব্যতীত এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মই মানবজাতির জীবনের উপর স্থায়ি-প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। যে খ্রীষ্টধর্ম্ম অধুনা লূতাতন্তুর ন্যায় সমগ্র প্রাচ্য-প্রতীচ্যখণ্ডে বিস্তৃত হইয়াছে, সেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রসারতার মূলে আমরা রোম্-সম্রাটের অদম্য চেষ্টা, যত্ন ও সাহচর্য্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্মও সম্রাট্ অশোকের নিকট আপন বিস্তৃতি ও প্রসারতার জন্য অনেকাংশে ঋণী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সেই বিষয় আলোচিত হইবে।

---

* East and West নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত Asoka and Buddhism নামক প্রবন্ধাবলম্বনে এই প্রবন্ধটী লিখিত।

তবে যে কেবল সম্রাট্ অশোকের জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতময় বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা বলা সঙ্গত ও ইতিহাস-সম্মত নহে।

আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পর কিছুদিনের মধ্যেই শূদ্রেরা ধন ও জনবলে বলীয়ান হইয়া উঠে। তাহারা আর্য্যদিগের তুল্যাধিকার-লাভে চেষ্টিত হয়, কিন্তু হীন-বংশোদ্ভূত বলিয়া ব্রাহ্মণগণ তাহাদের চেষ্টা ও আশার পরিপন্থী হইয়া উঠেন। শূদ্রদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, আর্য্যগণ তাহাদের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বেদাদি শাস্ত্র-পাঠে তাহাদের অধিকার ছিল না। এক কথায়, আর্য্যগণ তাহাদিগকে ক্রীতদাস অপেক্ষাও হীন বলিয়া মনে করিতেন। কাজেই বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যবাদ তাহাদের চিত্ত সহজেই আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ, তাহারা ব্রাহ্মণগণের ভয়ে এই বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে সাহস করে নাই; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল,—সম্রাট্ অশোকের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী সম্রাট্ ও উত্তর ভারতের নৃপতিবৃন্দ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত তখন তাহারা নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

গৌতমের মৃত্যুর প্রায় দুই শত বৎসর পরে উত্তর ভারতে মৌর্য্যবংশের আবির্ভাব হয়। এই বংশের তৃতীয় সম্রাট্ অশোক সিংহাসনে অধিরোহণ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের কাল ২৭২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ধরা যাইতে পারে। কোন্ সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন, সে বিষয়ে মতভেদ আছে; তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত এই যে, সিংহাসনাধিরোহণের নবম বৎসর পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

বাল্যকালে সম্রাট্ অশোক নিতান্ত নৃশংস ছিলেন, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের পর তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার শেষ জীবনের মহৎ কার্য্য-কলাপ বাল্যজীবনের কলঙ্ক-কালিমা বিধৌত করিয়া দিয়াছে। ঐতিহাসিক কোপেনের মতে অশোক সার্লেমান বা সীজর অপেক্ষা যশস্বী। কারণ বহুজনের হৃদয়-মন্দিরে অশোকের পুণ্যস্মৃতি পূজিত; বহুলোকের কণ্ঠে তাঁহার সৎকীর্ত্তি কথা ধ্বনিত। কবির কথায় বলিলে বলা যায়;—

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।

সম্রাট্ অশোকের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তবে এই প্রসঙ্গে অশোকের রাজ্য-শাসন-প্রণালী প্রভৃতির কিছু পরিচয় প্রদান নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ মানবের কার্য্য-প্রণালী তাহার ব্যক্তিত্ব-টুকু বাহির করিয়া দেয়। অশোকের রাজত্ব অনেকাংশে প্রজাতন্ত্র ছিল। সমগ্র দেশ ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বিভক্ত ছিল। বিচার-বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা প্রতি কেন্দ্র-স্থলে থাকিতেন এবং তাঁহাদের কার্য্যাবলী পরিদর্শনের নিমিত্ত অন্যান্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। ইহা ভিন্ন প্রজা সাধারণের নৈতিক চরিত্রের উপর দৃষ্টি ও চরিত্রভ্রষ্ট লোকদিগকে দণ্ড দিবার জন্য আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত।

উল্লিখিত কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে রাজ্যকশ নামে কর্ম্মচারীরাই প্রজা সাধা-রণকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিশেষভাবে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা স্বাধীন-ভাবে আপন আপন ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিতেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটী ধর্ম্ম মহাসভার অধিবেশন হইত; সেই সভায় নিম্নলিখিতরূপ ধর্ম্মবাণী ঘোষণা করা হইত। যথা,—"আপন আপন প্রত্যেকেরই জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য; বন্ধু, বান্ধব, পরিচিত, আত্মীয়দিগকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির চক্ষে দেখা কর্ত্তব্য; ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে ভিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য; সমগ্র জীবের উপর অহিংসা কর্ত্তব্য এবং অমিতব্যয়িতা ও রূঢ়বাক্য পরিহার করা কর্ত্তব্য।"

অশোকের সময়ে রাজ্যশাসন ও সামরিক-বিভাগ এক একদল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিষৎ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। সামরিক কার্য্যাবলী সম্পাদনের ভার ত্রিশ জন সভ্য দ্বারা গঠিত একটি মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত ছিল। এই মণ্ডলী ও পরিষৎ আবার ছয়টী ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে বিভক্ত ছিল। রাজধানীর শাসনের জন্য আর একটি মণ্ডলী ছিল। তৃতীয় মণ্ডলী জন্ম ও মৃত্যুর বিবরণ লিখিয়া রাখিত। চতুর্থ মণ্ডলী বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী সম্পাদন করিত। পঞ্চম মণ্ডলী উৎপন্ন দ্রব্যের অনুসন্ধান করিত এবং ষষ্ঠ মণ্ডলী প্রজাবর্গের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ করস্বরূপ গ্রহণ করিত।

সৈন্যবিভাগে ষষ্ঠি সহস্র পদাতিক, ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল, এতদ্ভিন্ন সমর-রথ, হস্তী ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ ছিল। জল-বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা করিবার স্বতন্ত্র একটি বিভাগ ছিল এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করা হইত। অশোকের শাসনকালের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, কাথিবাড়ের (Kathiwar) শাসনকর্ত্তা "তুষপ" নামে একজন পারসী

ছিলেন। একজন বিদেশীকে শাসনকর্ত্তার নিয়োগ দ্বারা ন্যায়নিষ্ঠ অশোকের উদারতা ও দূরদর্শিতা প্রমাণিত হইতেছে।

ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যশিল্প মহারাজ অশোকের চেষ্টায় ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে অনেক পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। অশোকের পূর্ব্বে প্রস্তরখণ্ড কেবল গৃহাদি-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অশোকের শাসন-সময়ে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র (পাটনা) এবং বৌদ্ধবিহারসমূহও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। দুঃখ-সন্তাপপূর্ণ সংসারের আসক্তি-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায় ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে বসিয়া ভগবদারাধনা করণ বৌদ্ধধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায় সে সময়ে অনেকেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতগুহার সন্ধান করিত এবং তথায় প্রস্তরখণ্ডে সাধনোপযোগী ক্ষুদ্র আবাস নির্ম্মাণ করিত।

ধর্ম্ম সর্ব্বথা সুন্দর সুন্দর শিল্প-কারু-কার্য্যের উদ্ভাবক। বৌদ্ধধর্ম্ম, ভাস্কর্য্য-বিদ্যার ঔৎকর্ষের অনেক সহায়তা করিয়াছে। কতিপয় বৌদ্ধমূর্ত্তি-দর্শনে আমরা স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারি যে, ভারতবর্ষে স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্যবিদ্যার অনুশীলন গ্রীকের অনুকরণে হয় নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার ফার্গুসনও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন।

অশোকের নির্ম্মিত প্রস্তর-বিনির্ম্মিত অট্টালিকা এবং মর্ম্মর-মূর্ত্তিসমূহের অধিকাংশই ধূলায় পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু অশোক ভারতবাসীর জীবনে নৈতিক আচরণের যে এক মহৎ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি তাহাদের হৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ এই যে, তিনি সকল প্রকার মাংসভক্ষণ নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে কেহ মেষ বলিদান অথবা ভোজনের জন্য প্রাণিবধ না করে। কেহ যেন দৈনিক আহার্য্যের জন্য কুক্কুট অথবা মৃগটী পর্য্যন্ত বধ না করেন। অশোকের এই আদেশ প্রধানতঃ ক্ষত্রিয় ও পার্ব্বত্য-জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছিল। এই দ্বিবিধ জাতি ভিন্ন অন্যান্য জাতিরা তখন উদ্ভিদভোজী ছিলেন, তাঁহারা কেবলমাত্র কোন উৎসব-বিশেষে মাংস গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা অতি প্রাচীনকাল হইতে মাংসভোজী হওয়ায়, অশোকের ঈদৃশ আদেশ-পালনে তাঁহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া অশোকের এই আদেশ-পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ, সেই সময়ে প্রাণিবধ করা ব্রাহ্মণ্য

ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ ছিল। এক শত অশ্ব বধ করা মহাগৌরবের ও গুণের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। একশত অশ্বহত্যাকে স্বয়ং ঈশ্বরের সমকক্ষ বলিয়া মনে করা হইত। কাজেই অশোকের প্রাণিবধ নিষেধ-মূলক ঘোষণা প্রথমবার বিফল হয় কিন্তু দ্বিতীয়বার তিনি বহু বাধা-বিঘ্ন, বাদ-প্রতিবাদ অতিক্রম করিয়া স্বীয় ঘোষণাবাণী কার্য্যে পরিণত করেন। বুদ্ধদেব প্রাণিবধ নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অশোক শুধু প্রাণিবধ নয়, মাংস-ভক্ষণ পর্য্যন্ত নিষেধ করেন।

অনেকের বিশ্বাস, দেশের আর্থিক দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া অশোক প্রাণিবধ নিষেধ করেন; কারণ ভারতবর্ষ তখন এখনকার ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশ ছিল, এদেশের অধিকাংশ লোক তখন উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি তাহাদের জীবিকার্জ্জনের জন্য বৃষভের প্রয়োজনীয়তা ছিল; কাজেই যদি গো-বংশ বলিদান অথবা খাদ্যের জন্য বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে লোকে কি খাইয়া জীবন-ধারণ করিবে? অশ্ব ও হস্তী, আরোহণ এবং যুদ্ধের উপকরণসম্ভার-বহনের জন্য বিশেষ উপকারী জন্তু বলিয়া পরিগণিত ছিল, কাজেই অশোক নানাদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রাণি-বধ অথবা মাংসভক্ষণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

মাংসভক্ষণ নিষেধ করিয়া তিনি প্রজাসাধারণের মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য সাধন করিয়াছিলেন, ইহা কাহারও কাহারও অভিমত। আবার কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, ভক্ষ্যদ্রব্যের গুণাগুণ যে কেবল শরীরেই সঞ্চারিত হয়, তাহা নহে; পরন্তু ইহা মস্তিষ্কে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং আহার্য্যের গুণানুসারে মানুষেরও দৈহিক এবং মানসিক গুণাগুণের বিকাশ হয়। সুতরাং ভারতের ন্যায় সত্ব প্রধান দেশে তমঃ-গুণ বর্দ্ধক মাংস ভক্ষণ নিবারণ করিয়া অশোক সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দিলেও ইহা নিশ্চিত যে, অশোক ভারতের জাতীয় জীবনে এক মহা পরিবর্ত্তনের উন্মেষ করিয়াছিলেন। অধুনা যেরূপ কোমল ও করুণ-দৃষ্টিতে জীবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা অশোক ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। দৃষ্টির অগোচর কীট সমূহের প্রতি সতত কৃপাদৃষ্টি কতকটা অত্যধিক করুণার পরিচয় সন্দেহ নাই; অশোকও সম্ভবতঃ এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অশোক তাঁহার একটি ঘোষণা-বাণীতে জীবন্ত কোন কীট সমন্বিত তুষ পর্য্যন্ত পোড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অশোকের এই ঘোষণা-বাণী অনুসারে

এখনও জৈনসম্প্রদায় পাছে স্নান করিবার সময় কোন জলজ কীট মরিয়া যায়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে স্নান করে।

কেহ কেহ অশোককে ব্রাহ্মণ-দ্বেষী আখ্যায় আখ্যায়িত করেন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা ঠিক নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি সাধন যদিও তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তত্রাচ তিনি কাহাকেও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের জন্য বাধ্য করিতেন না। তাঁহার সপ্তম ঘোষণাবাক্যে তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, "সকলেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ বিষয়ে স্বাধীন।" বস্তুতঃ পক্ষে অশোকের শাসন সময়ের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মে কাহাকেও দীক্ষিত করিবার তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন, একথা পাওয়া যায় না। এমন কি অরণ্যের অর্দ্ধ-সভ্যজাতি পর্য্যন্ত অশোকের নিকট অন্যান্য সভ্য প্রজার ন্যায় বিবেচিত হইত।

মূক প্রাণিগণের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি, অশোকের হৃদয়ের অসাধারণ ও অসীম কারুণ্যের পরিচয়। অসহায়, রুগ্ন, ব্যাধিগ্রস্তদিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও আতপ-তাপ দগ্ধ, পথশ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্তদেহ পথিকের জন্য বিশ্রামাগার অশোকই সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত করেন। আজি পর্য্যন্তও অশোকের প্রবর্ত্তিত এই পুষ্করিণী-খনন, বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা, হিন্দু ও মুসলমানের নিকট মহাপুণ্য ও গৌরবজনক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায়, যে কারুণ্যপূর্ণ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য বুদ্ধদেব এবং সেই ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে প্রচারিত করার জন্য অশোক সমগ্র ভারতবাসীর নিকট চিরদিন স্মরণীয় থাকিবেন। তাঁহাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার প্রভাবে তাঁহারা ভারতের জাতীয় জীবনে এক মহাপরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

প্রাদেশিক জাতীয়তা।

মানুষ সামাজিক জীব। দল না বাঁধিয়া মানুষ কোনও কাজ করিতে পারে না। আদিম সমাজে মানব জাতির দল বাঁধিবার সূত্র ছিল পারিবারিক বন্ধন। রক্তের টান অনেকগুলা মানুষকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া দিত। তাহার পর

মানব সমাজে যতই বর্ব্বরতার ঘনান্ধকার অপসারিত হইতে লাগিল, মানুষের দল বাঁধিবার প্রবৃত্তিতে ততই স্বাধীনতা দেখা দিল। এক উপায়ে জগদীশ্বরকে যাহারা ডাকিতে লাগিল তাহাদের একটা সমাজ গঠিত হইল। যাহারা এক সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে লাগিল তাহাদের একটা বিভিন্ন দল সৃষ্টি হইল, যাহারা এক রাজার অধীনে বাস করিতে লাগিল তাহাদের মধ্যে নূতন বন্ধন সৃজিত হইল। এখন পাশ্চাত্য জগতের এমন অবস্থা হইয়াছে যে প্রত্যেক লোক তাহার জীবনের সাধ অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য, নিজের ব্যবসা বৃত্তিতে উন্নতি করিবার জন্য, আপনাপন কল্পনা কল্পিত আদর্শে জীবন যাপন করিবার জন্য মনের মতন লোক লইয়া সমিতি গঠন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত এরূপভাবে একটা সম্বন্ধ গড়িয়া লইয়া, পরস্পরের স্বার্থ এক করিয়া একটা দল বা জাতি গঠন করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যেই প্রথমে প্রতিভাত হয়। এই জাতীয়তা প্রাচীন গ্রীসে বড় অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। এইরূপে জাতি গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই গ্রীক জাতির স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বজাতিপ্রিয়তা আজিও ভুবনবিখ্যাত। এই জাতীয়তার আত্মম্ভরিতায় তাহারা ম্যারাথনে বিপুল পারস্য-বাহিনীর সহিত যুঝিতে সমর্থ হইয়াছিল, আপনাদের একপ্রাণতার দম্ভে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া শিল্প সাহিত্যের অনুশীলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জাতীয়তা গঠনের পূর্ণ স্বাধীনতা রোমক জাতি দেখাইয়াছিল। রমুলাস প্রতিষ্ঠিত "সপ্ত শৈল" নগরে নানা দিগ্দেশ হইতে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া স্বার্থ মিলাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রোমক ঈগলধ্বজা যেমন সহরের পর সহরের উপর উড্ডীন হইতে লাগিল, রোমক প্রজার সংখ্যাও তত বাড়িতে লাগিল। সকলের প্রাণে ঐ এক তারের ঝঙ্কার—"রোমের জয়।" আমাদের পৌত্তলিকতায় সে পুতুল পূজার ঐকান্তিকতা নাই। কেবল একটা নামমাহাত্ম্যে লোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া জলের মূল্যে উষ্ণ নর রক্ত বেচিয়াছিল, পৃথিবীতে একটা বিপুল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ভিনিস প্রভৃতি স্বাধীন নগর রাষ্ট্রও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐরূপে সকল শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন স্বার্থ এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহার পর ধীরে ধীরে ইয়ুরোপে ফ্রান্স, জার্ম্মানী, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে রাষ্ট্র গঠিত হইতে লাগিল। কালে তাহাদের প্রতাপ ইউরোপের ভূখণ্ড

ছাড়িয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। আমেরিকা নামক নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিল। আসিয়ার অনেক প্রদেশ উৎসাহ-সম্পন্ন পরাক্রান্ত ইউরোপীয়দিগের শাসনাধীন হইল। আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় সমৃদ্ধিশালী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল উন্নতির মূলে সেই জাতীয় একতা, জাতীয়তার মন্ত্রশক্তি, বিভিন্ন জাতির নামগৌরব নিহিত ছিল। ইংলণ্ডে ধর্ম্মমত লইয়া ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টগণ পরস্পরের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেছিল। এমন সময় ক্যাথলিক স্পেন ইংলণ্ড জয় করিবার জন্য এক বিপুল নৌবাহিনী পাঠাইয়া দিয়াছিল। তখন ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট সকল ইংরাজ গৃহবিবাদ, মান-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের কুমারী রাণী এলিজাবেথের জন্য প্রাণপণে যুঝিয়াছিল, সেই বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছিল। জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই তাহারা এরূপ উত্তেজনা, এরূপ শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল।

প্রতীচ্যের লোকের কল্পনাশক্তি পাশ্চাত্যের কর্ম্মবীর নরনারীর কল্পনাশক্তি অপেক্ষা প্রবল হইলেও তাহারা এ রকম কল্পিত দেবীর জন্য আপনাপন অসি নিষ্কোষিত করিয়া জনসমাজে কীর্ত্তি রাখিবার চেষ্টা করে নাই। হিন্দু আপনার সনাতন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বিধর্ম্মী যবনের হস্ত হইতে আপনাদের সাধ্বী স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, দেবমন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আফগানের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। "জয় ভারতের জয়"—এ গান আধুনিক। তখনকার যুদ্ধরব ছিল—হর হর মহাদেও—জয় একলিঙ্গ জিকা জয়।' 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!' এ মন্ত্র প্রাচীন হইলেও সেই জন্মভূমিরূপা দেবীর জন্য তত্রত্য সকল নরনারীর স্বার্থ এক সূত্রে বাঁধিয়া ভারতবর্ষ কোনকালে সমরে প্রবৃত্ত হয় নাই। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিত, অন্যান্য জাতি দূর হইতে তাহাদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। রাণা প্রতাপ চিতোরের জন্য যুদ্ধ করিতেন, অপর চিতোরবাসী ক্ষত্রিয়গণ রাণা প্রতাপের জন্য আপনাদের শোণিতে রণস্থল রঞ্জিত করিত।

জগতে মুসলমান অভ্যুত্থানের সময়ও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। আরবের সারাসেন জাতি পারস্ত জয় করিয়া পারস্যে তাহাদের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিল। তখন আরব্য ও পারস্যের অধিবাসীদিগের বিভিন্ন জাতীয়তা বিলুপ্ত হইল। উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে খলিফাদিগের বিজয়কেতন অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই—দীন দীন, আলি আলি—শব্দে ইস্‌লামের

জন্য যুদ্ধ করিতে লাগিল। যখন ইসলাম জগত বিভিন্ন নরপতির মধ্যে বিভক্ত হইয়া গেল তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতীয়তার সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু সে জাতীয়তার মধ্যে খৃষ্টান জগতের মত প্রাদেশিক জাতীয়তার লক্ষণ দেখা দিল না। ভারতবর্ষে বাহির হইতে অনেক মুসলমান আসিল, দেশের অনেক লোক নানা কারণে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব স্থাপিত হইল, এমন কি বিভিন্ন প্রদেশবাসী লোকদিগের মধ্যে ভাষার পার্থক্য জন্মিল, কিন্তু তবুও ভৌগোলিক গণ্ডীর সহিত জাতীয়তার গণ্ডী মিলিত হইল না। মুসলমান আপনাকে এক মুসলমান সাম্প্রদায়িক বন্ধন ব্যতীত অপর কোনও সামাজিক বন্ধনে বাঁধিতে পারিল না। হিন্দুও তাহাকে এক হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কল্পনা করিতে পারিল না। প্রাচ্যের লোক রাজনীতিক স্বার্থ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বার্থের পৃথক অস্তিত্ব তেমন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। রাজনীতিক ইষ্টের জন্য লোকে ধর্ম্মবিশ্বাস পৃথক রাখিয়া যে একটা নূতন সম্বন্ধ-সূত্রে আপনাকে বাঁধিতে পারে, এ ধারণাটা প্রাচ্যের লোক পাশ্চাত্যবাসীর মত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। এক ভূমিখণ্ডে বাস করিলে লোকের রাজনীতিক স্বার্থ যে এক হয় এবং এক প্রদেশের সকল অধিবাসী সম্মিলিত হইয়া নানা বিষয়ে আপনাদিগের ইষ্টসাধন করিতে পারে একথা আসিয়ার অধিবাসী তেমন বুঝিতে পারে নাই। এ শিক্ষাটা তাহাদের নূতন পাশ্চাত্য গুরুর নিকট হইতে ভারতবাসী এখনও লইতে পারে। কিন্তু তাহাদের সে প্রবৃত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ইংলণ্ডের লোক রাজনীতিক্ষেত্রে এক হইলেও অপর সমস্ত বিষয়ে তাহাদের সকলের স্বার্থ এক নহে। ধর্ম্ম হিসাবে দেখিতে গেলে তাহাদের খৃষ্টানদের মধ্যে নানা রকমের ধর্ম্মমত আছে, এক সম্প্রদায়ভুক্ত ইংরাজ অপরের সহিত উপাসনা করে না। ইংরাজ, স্কচ, আইরিসের পরস্পরের মধ্যে জাতীয় পার্থক্য তো আছেই। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ মোটেই খৃষ্টান নহে, ইহুদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত। কিন্তু তাহা বলিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে ইংরাজ আপনার প্রদেশের লোকের সহিত মিলিয়া অপর প্রদেশের লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বিরত হয় না। ইংলণ্ডের ক্যানাডা নামক উপনিবেশের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী ফরাসী বংশজাত। ইহাদের ভাষায় ও ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগের ভাষাতেও পার্থক্য আছে। ইহারা ঘরে ফরাসী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে, ক্যাথলিক গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করে। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহারা আপনাদের রাজনীতিক

সম্বন্ধের জন্য ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া থাকে না। যদি ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে কোনও দিন যুদ্ধ হয় তো ইহারা ইংরাজ ধ্বজা লইয়া লড়িবে। ইংলণ্ড ও ক্যানাডার কোনও মতভেদ হইলে,ক্যানাডার ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণ তাহাদের দেশীয় ফরাসী ঔপনিবেশিকদিগের সহিত একমত হইয়া ইংলণ্ডের সহিত কলহ করিবে।

তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্যে জাতীয়তার গণ্ডী ভূগোলের গণ্ডীর সহিত এক। অনেকে বলে ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। এখানে ঐরূপ ভাবে জাতীয়তার প্রসার হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস যাঁহাদের অভিমত উক্তরূপ তাঁহারা উত্তমরূপে ইতিহাস পাঠ করেন নাই। জার্ম্মান সাম্রাজ্যের ৪৭,০০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ৪৪,০০০,০০০ জার্ম্মান ভাষা কহিয়া থাকে ২৫,০০০,০০০ লোকের মাতৃভাষা পোল। ধর্ম্মহিসাবে জার্ম্মানিতে দুই সম্প্রদায় প্রটেষ্টাণ্ট আছে, ক্যাথলিক আছে, এবং ইহুদী আছে। এ সকল ভীষণ পার্থক্য সত্ত্বেও লুবেকের লোক ব্রিমেনের লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, লুবেকের সকল নরনারী একসঙ্গে স্বার্থ মিলাইয়া লুবেকের মঙ্গল সাধন করিতে যত্নবান। তথাকার পোল জাতীয় ব্যক্তি লুবেকের গণ্ডী পার হইয়া শেক্সনির পোলের সহিত স্বার্থ মিলাইতে চেষ্টা করে না। হাঙ্গারী রাজ্যে মাগির নামক এক অনার্য্য মোঙ্গলীয় জাতি আছে। হাঙ্গারীর লোক তাহাদিগকে বিজাতীয় ভাবে না, তাহারাও মনে ভাবে না যে তাহারা অনুগ্রহ করিয়া হাঙ্গেরীতে বাস করিতেছে। হাঙ্গেরির পোলজাতীয় ব্যক্তিগণও হাঙ্গেরির স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া জার্ম্মানির লোকদিগের দিকে তাকাইয়া থাকে না এবং অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরি রাসিয়া বা বুলগেরিয়ার ফিন জাতীয় লোকেরা নিজ নিজ প্রাদেশিক শুভাশুভ উপেক্ষা করিয়া পরস্পর পরস্পরকে একতার সূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করে না। দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক অংশ। তথায় ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, স্কচ, আইরিশ প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক বাস করে। তাহাদের মধ্যে নানাবিষয়ক পার্থক্য বিদ্যমান আছে, একথা বুঝিতে বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় না। এ সকল সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী একসূত্রে আপনাদের ভাগ্য বাঁধিয়াছে।

ইংরাজ আমাদের শিক্ষাগুরু। ইংরাজের নিকট হইতে আমরা জাতীয়তা বা ন্যাসানলিটি সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা পাইতেছি। কিন্তু আমরা তাহাদের চরিত্রের এ বিশেষত্বটুকু বুঝি না কেন? বাঙ্গালার হিন্দু অধিবাসী আপনাকে

বাঙ্গালী না ভাবিয়া কেবল হিন্দু ভাবে কেন? বাঙ্গালার মুসলমান আপনাকে বাঙ্গালী না ভাবিয়া অপরাপর প্রদেশের মুসলমানের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিয়া আলিগর, দিল্লি, লক্ষ্ণৌর দিকে তাকাইয়া থাকে। বাঙ্গালার এংলো ইণ্ডিয়ান খৃষ্টান আপনাকে বাঙ্গালী ভাবিতে চাহে না অথচ সে বেশ জানে যে, সে বিশুদ্ধ ইংরাজ ফরাসী বা পর্ত্তুগীজ নহে। সে একটা নূতন রকম সমিতি গঠন করিয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের এংলো ইণ্ডিয়নের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করে। যাহাদের সহিত তাহার স্বার্থ একসূত্রে আবদ্ধ, যাহাদের সহিত তাহাকে চিরদিন বাস করিতে হয়, সে তাহাদের সহিত মিলিতে চাহে না।

ইংরাজ নিজে প্রাদেশিকতা ও জাতীয়তা এক বলিয়া জানিলেও এদেশের গতিক বুঝিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রাদেশিক এবং ইম্পিরিয়ল ব্যবস্থাপক সভায় সাম্প্রদায়িক ভোটের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। মুসলমান-দিগের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালার সমুদায় অধিবাসী যদি বুঝিতে পারে যে, রাজনীতিক কাজের জন্য সে বাঙ্গালী মাত্র তাহা হইলে তাহাদেরও উন্নতি হয়, গবর্ণমেণ্টকেও বিব্রত হইতে হয় না। ধর্ম্মের জন্য হিন্দু, কাশী, গয়া, বৃন্দাবনের দিকে তাকাইয়া থাকুক, মুসলমান মক্কার পবিত্রতায় মতি রাখুক, খৃষ্টানের মতি বাইবেলে আবদ্ধ হউক। কিন্তু যে সকল বিষয়ে তাহারা স্বার্থ মিলাইতে পারে, সে সকল বিষয়ে যদি তাহারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে এক প্রদেশের লোক আপনাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতিযোগিতায় এবং এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশের লোকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমস্ত ভারতবর্ষের ইষ্ট সাধন করিতে পারে। একদেশে বাস করিয়া হিন্দু অপর দেশের হিন্দুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলে, মুসলমান হিন্দুর সহিত না মিশিলে এংলো ইণ্ডিয়ন আপনাকে হিন্দু ও মুসলমান হইতে শ্রেষ্ঠ ভাবিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শাসনকার্য্য দুরূহ হইয়া দাঁড়ায়, আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন-স্পৃহাও হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রাদেশিকতা না হইলে স্বায়ত্তশাসন হইতে পারে না। ভূগোলের গণ্ডীর সহিত জাতীয়তার গণ্ডী না মিলিলে জাতীয়তার বিকাশ হয় না। গুজরাটের অভাব-অভিযোগ বাঙ্গালার অভাব-অভিযোগের সহিত সমান নহে। বাঙ্গালা দেশে শিক্ষার প্রসার হইলে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেরই উন্নতি হইবে। বঙ্গপল্লীর পুষ্করিণীর সংস্কার হইলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই একটা অভাব দূরীভূত

হইবে। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাহার সুফল বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায় পাইবে। কিন্তু আমাদের কেমন একটা অভ্যাস যে আমরা এই ঘরের বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠায় মোটেই আগ্রহাতিশয্য না দেখাইয়া বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড়ের মহম্মদীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার শুভদিন দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়া আছি। ইউরোপীয়ান এরূপভাবে জীবন যাপন করে না বলিয়া সে সুখে আছে।

প্রাদেশিক জাতীয়তা কথাটা শ্রুতিকঠোর হইলেও উপরে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে ইহার স্পষ্ট অর্থবোধ হইবে। আমার বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের সকল লোক যদি আপনাপন স্বার্থ মিলাইয়া জাতীয়তা-গঠনের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। উহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে অথচ ঐ সকল সভার কার্য্য জটিল ও দুরূহ হইবে না। পৃথক সাম্প্রদায়িক ভোটের আবশ্যক হইবে না অথচ গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত লোকের সাহায্য পাইবে।

আমাদের সাহিত্যের তাহা হইলে বড় উন্নতি হইবে। বাঙ্গালা, হিন্দি, গুজরাটী, মারাট্টি প্রভৃতি ভাষাগুলির প্রতি লোকের একটু সুনজর পড়িবে। সম্মিলিত বাঙ্গালী জাতি গঠিত হইলে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলে দেশের ভাষার প্রতি একটু শ্রদ্ধা দেখাইবে। রাজদরবারে রাজভাষার প্রচলন থাকিবে। ক্রমে মিউনিসিপালিটি ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড প্রভৃতির সভায় আমাদের দুঃখিনী বঙ্গভাষা প্রবেশাধিকার পাইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

রাজা মজলিস্ রায়।

হরনাম সিংহ প্রণীত সা-আদত জাবেৎ নামক ইতিবৃত্তে রাজা মজলিস্ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইলিয়ট্ সাহেব উক্ত গ্রন্থের অন্যান্য অংশের সহিত এই অংশও অনুদিত করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি লাহোরবাসী সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতসম্রাট মহম্মদ সাহের মন্ত্রী কমরুদ্দিন খাঁর তিনি দেওয়ান ছিলেন। এত বড় উচ্চপদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা মজলিস্ রায় একেবারে নিরক্ষর না

হইলেও নিজ হস্তে একখানি পত্রও লিখিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার কর্ম্মচারিদিগের দ্বারা লেখাপড়ার কার্য্য সমস্তই সাধিত করিয়া লইতেন। একদিন তাঁহার প্রভু কমরুদ্দিন খাঁ রাজাকে আপনার সম্মুখে একখানি পত্র লিখিতে অনুমতি করেন। যখন বহু কষ্টে মজলিস্ রায় লিপি সমাধা করিলেন, তখন বিস্মিত মন্ত্রীমহাশয় বলিলেন—"রাজা সাহেব, এরূপ সুচারু হস্তলিপি সত্বেও আপনি হিন্দুস্থানের উজীরি পাইলেন কি রূপে?" প্রত্যুৎপন্নমতি রাজা উত্তর করিলেন—"জনাব, প্রভু,ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে বিদ্যারও দরকার হয় না বা শিল্পকুশলও হইতে হয় না। কথায় বলে, এক যব সৌভাগ্য একবোঝা বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"।

রাজা মজলিস্ রায় অত্যন্ত উদারহৃদয় ও দাতা ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে যত্নবান্ ছিলেন। দিল্লীর রাজপথ হইতে সন্ন্যাসী ফকির ডাকিয়া দারুণ শীতের সময় তিনি তাহাদিগকে শীতবস্ত্রাদি প্রদান করিতেন। দরিদ্রদিগের জন্য তাঁহার দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বার সর্ব্বদা অবারিত থাকিত।

রাজা মজলিস্ রায়ের অসীম প্রভুভক্তি ছিল। দুরন্ত নাদির সাহ দিল্লী দখল করিয়া অমাত্য কমরুদ্দিন খাঁর ধনরত্ন হস্তগত করিবার জন্য রাজা মজলিস্ রায়কে ধরিয়া তাঁহার প্রভুর গুপ্ত সম্পত্তির সন্ধান লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ রাজা তাঁহাকে বিনয়সহকারে বলিলেন—"সাহান সাহ,মন্ত্রী মহাশয় বড়ই বিলাসী ও অমিতব্যয়ী। রাত্রিদিন তিনি সুরার নেশায় বিভোর হইয়া থাকেন। তাঁহার যত্র আয় তত্র ব্যয়"। বলা বাহুল্য, নাদির সাহ সে কথায় তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাকে ভীতিপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া রাজা মজলিস্ রায় নিজকোষ হইতে এক ক্রোড় মুদ্রা ও নানা রত্ন আনিয়া পারস্যাধিপতির সম্মুখে ধরিলেন ও বলিলেন—"জাহাঁপানা, ইহাই আমার প্রভুর সম্পত্তি"। কিন্তু কতকগুলি হিন্দুস্থানী-বিভীষণ নাদির সাহকে যথার্থ কথা বলিয়া দিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নরশার্দ্দূল ব্রাহ্মণরাজাকে নির্য্যাতিত করিতে লাগিলেন। যখন দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণ তাঁহার এক কাণ কাটিয়া লইল, তখনও তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন না। শেষে অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া রাজা ছলনা করিয়া নাদিরের কতিপয় সৈন্যকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া আপনার উদরে ছুরিকাঘাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সহৃদয় মজলিস্ রায়ের শোকে দিল্লীসহরের সকলেই আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এমন কি নৃশংস নাদির সাহ তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শ্রীরামানুজ-চরিত।—স্বর্গীয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত শ্রীরামানুজচরিত, মূল্য দুই টাকা, ১২, ১৩ গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন, বাগবাজার কলিকাতা, উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে ব্রহ্মচারী কপিল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আচার্য্য রামানুজ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ দেশে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্ত তাঁহাকে এদেশের লোক তত চেনে না। কিন্তু তাঁহার জীবন, তাঁহার মত ও তাঁহার কার্য্যকলাপ আমাদের সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। অবৈদিক ধর্ম্মের বন্যায় পূর্ব্বে একবার দেশ প্লাবিত হইলে যেমন আচার্য্য শঙ্কর বৈদিক ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মানুসরণকারী হিন্দু সমাজের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন তদ্রূপ বেদানকূল ভক্তিপ্রধান সাধনমার্গ স্থাপন করিয়া আচার্য্য রামানুজ হিন্দু ভক্ত সমাজের রক্ষা-বিধান করিয়াছেন। অবতারগণের কার্য্যে যেমন জনসমাজের গতির পরিবর্ত্তন ঘটে, আচার্য্য রামানুজের কার্য্যে তদ্রূপ ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে যত ভক্ত-সম্প্রদায় বিদ্যমান, সকলই আচার্য্য রামানুজের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। আর আচার্য্যের কীর্ত্তি ব্যতিরেকে আচার্য্যের চরিত্রের প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তাহা হইলেও আমরা অনেক শিক্ষা করিতে পারি। যাহারা ভগবানের সেবা করিয়া, ভগবানকে ভালবাসিয়া বা ভগবানের প্রতি আত্মনির্ভর করিয়া সাধুভাবে জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করেন, আচার্য্য রামানুজ যে তাঁহাদের আদর্শ-স্থান অধিকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এদেশে পণ্ডিত ও সাধক-সমাজে আচার্য্যমতের প্রভাব বহুদিন হইতে প্রবেশলাভ করিলেও সাধারণে এই মহনীয় চরিত্রের কথা স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবে জানিতে পারেন। এই স্বামীজীই যখন উদ্বোধন নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজে বহুদিন থাকিয়া তথায় আচার্য্য-মতের সাধক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মিশিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া অতি যত্নে শ্রীরামানুজ চরিত্রটী সঙ্কলন করেন ও প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করিতে থাকেন। আচার্য্যদেবের জীবনচরিত গ্রন্থ দুই একখানি নহে, এবং তাহাদের মধ্যে ঘটনাবলী সম্বন্ধে মতভেদও প্রচুর দেখা যায়, এজন্য স্বর্গীয় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আমরা আজ তাঁহার এই অনুসন্ধানের ফল, উদ্বোধনের কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে পুস্তকাকারে লাভ করিয়াছি। গ্রন্থের বর্ণিত বিষয়ের প্রামাণিকতা ও পূর্ণতার কথা ছাড়িয়া দিয়া ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া দেখিলেও গ্রন্থখানি একটী অতি উপাদেয় হইয়াছে। সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া আচার্য্য-জীবনকে আদর্শ রাখিয়া শ্রদ্ধাসহকারে একজন সাধকপণ্ডিত গ্রন্থ লিখিতে বসিলে যাহা হয়, এ গ্রন্থখানিতে তাহাই পরিলক্ষিত হইবে।

পুস্তকের ভাষা সাধু, গ্রন্থের লক্ষীভূত ভাবের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। গ্রন্থের মুদ্রণ সুন্দর, কাগজ ও আবরণী সুন্দর ও সময়োপযোগী। মলাটটী প্রাচীন

ভক্তবৃন্দের আদরের জিনিস। ইহা আচার্য্য রামানুজের প্রাচীন চিত্র দেখিয়া রচিত এবং তদনুকরণে বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত।

এইগুলি পুস্তকের প্রকৃত পরিচয়। তবে স্থানে স্থানে দুই একটা ত্রুটী আছে; পুস্তকের ফুটনোটে আচার্য্য জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে মতভেদগুলি, তাঁহার আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁহার দার্শনিক মত ও সাধন প্রণালী সন্নিবেশিত করিলে ভাল হইত। ঐতিহাসিকতার প্রভাব পুস্তকে একটু থাকিলে ভাল হইত। অলৌকিক ঘটনাবলীর মধ্যে লৌকিক অংশটী বড়ই চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা। পরিশিষ্ট খণ্ড। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ প্রণীত। ১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিনোদলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ একটাকা। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ মন্দ নহে। ২৭০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমাদের মনে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের উদয় হইয়াছে। আনন্দের কারণ,—গ্রন্থকারের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাইয়া। আর দুঃখের কারণ,—গ্রন্থকার যেরূপ চিন্তাশীল ও সুপণ্ডিত, গ্রন্থখানি তেমন সুলিখিত হয় নাই। গ্রন্থের অনেক স্থলেই লেখকের বক্তব্য তেমন বিশদ হয় নাই। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠাতেই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"শারীর-বিজ্ঞান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞান এই দুই বিজ্ঞান লইয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং শারীর-বিজ্ঞান, ভৈষজ্য-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই বিজ্ঞানত্রয়ের সমষ্টি আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।" কথাটা আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। শারীর-বিজ্ঞান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞান লইয়াই যদি চিকিৎসা-বিজ্ঞান হয়, তাহা হইলে শারীর-বিজ্ঞান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের সহিত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পৃথক্ নাম করিয়া ঐ তিনটিকে আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের সমষ্টি বলার সার্থকতা কি? চিকিৎসা বিজ্ঞান বলিলেইত শারীর-বিজ্ঞান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞান উভয়ই বুঝাইয়া যায়। এরূপ ত্রুটি থাকিলেও আমরা এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছি। কারণ, কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় অন্যান্য কবিরাজ-লেখকগণের মত শুধুই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করেন নাই। গ্রন্থে জানিবার যোগ্য কথা যথেষ্ট আছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যে গঠিত, একথা এই গ্রন্থ পাঠে বেশ বুঝা যায়। তবে পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, গ্রন্থের বিষয় যেমন সুচিন্তিত, তেমন সুলিখিত নহে। বিলাতী চিকিৎসা গ্রন্থে যে লিপিনৈপুণ্য দেখা যায়, বুঝাইবার যে সুন্দর ভঙ্গী দৃষ্টি-গোচর হয়, এখনকার কবিরাজ মহাশয়গণ যদি সেই পথ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক জটিল রহস্য সাধারণের সুবোধ্য হইয়া উঠে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সাধারণ্যে আদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।



রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, বাঙ্গালোর।

Photo-Engraved & Printed by F. A. P. Syndicate, 147 Baranasi Ghose Street, Calcutta

জয়-পরাজয়।

"দেখ, রাজি?"

"নিশ্চয় রাজি।"

পেটি হইতে দুর্গাচরণ আমাকে দশটি টোটা বাহির করিয়া দিল। সে নিজেও দশটি টোটা লইল। দুইজনে দুইটি পাখীমারা বন্দুক লইয়া দুইদিকে চলিতে লাগিলাম।

কলিকাতায় অনেক ফুটবল, ক্রিকেট ও টেনিস খেলিতাম, বাইসিকেলের পাল্লা দিতাম, কোন কোন দিন গঙ্গায় সন্তরণ অভ্যাস করিতাম, কিন্তু ছুটিতে কয়দিন দুর্গাচরণের দেশে আসিয়া পাখী মারিয়া যে নূতন আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম, সে রকম সুখ কোনও ক্রীড়ায় পাই নাই। খালি হাতে মাঠের উপর দিয়া চলিবার সময় কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল গান গাহিয়া বা বিচিত্র পক্ষের গরিমা দেখাইয়া শান্ত মধুর ভাবে আমার যুবক-হৃদয় উৎফুল্ল করিত না, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু সেই মারাত্মক যন্ত্রটা হাতে করিয়া যখন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে নদী-বক্ষে দেখিতাম সরাল মরাল বা বালহাঁসের ঝাঁক মনের সুখে দলবদ্ধ হইয়া সন্তরণ করিতেছে, তখন প্রাণের মধ্যে কবিতার ঝঙ্কারের লেশমাত্র অনুভব করিতাম না। একটা পৈশাচিক ভাব আসিয়া প্রাণের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিত। চকিতে পেটি হইতে টোটা বাহির করিয়া বন্দুকে ভরিতাম, নিসানা করিতাম, ঘোড়া টিপিতাম। পাখার ঝটপট শব্দে, আর্ত্ত বিহঙ্গমের করুণ কাকলীতে, মুমূর্ষু পক্ষীর মৃত্যু-যন্ত্রণার ভীষণ ক্রন্দন-রোলে নির্জ্জন নদীকূল ভরিয়া উঠিত। আমরা ছুটিয়া গিয়া শিকার কুড়াইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতাম।

আজ দুর্গাচরণের সহিত বাজি হইয়াছিল যে, দশটি টোটা লইয়া কে কত বেশী পাখী মারিতে পারে। আমি এই সংহারকার্য্যে নূতন ব্রতী হইলেও, আমার গুরু দুর্গাচরণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বিরত হইলাম না। ভাবিলাম কিছু না পারি কতকগুলা ঘুঘু মারিয়া নিহত জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিব। প্রণয়ী ঘুঘুর দল সন্ধ্যার ঈষৎ পূর্ব্বে মাঠ ছাড়িয়া গাছের ঝোপে লুকাইতে

আরম্ভ করে। সুতরাং একটু আলো থাকিতে থাকিতে মাঠে ঘুরিয়া চারিটি টোটায় সাতটি ঘুঘু মারিলাম। বন্দুকের শব্দে পাখীর দল সব মাঠ ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। আমি বেগতিক দেখিয়া দ্রুতপদে নদীর ধারে গেলাম। কতক-গুলা কাদাখোঁচা ও চাহা মারিলাম। মোটের উপর নয়টি টোটায় পনেরটি পাখী আহত করিয়াছিলাম।

দুর্গাচরণ এ কার্য্য বাল্যাবধি করিতেছে, তাহার উপর সে নিজের গ্রামের বন-জঙ্গল খাল-বিল পুকুর-ডোবার সন্ধান বিলক্ষণ জানিত। সে যে এতক্ষণে আমার চেয়ে অনেক বেশী পাখী মারিয়াছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। বলা বাহুল্য, সে কল্পনাটা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হইতেছিল। নদীর ধারে ধারে বালুকারাশির উপর দিয়া সেই পঞ্চদশটি পাখীর শবদেহ ঘাড়ে করিয়া প্রায় দুই মাইল চলিলাম। মাঝে মাঝে এক একটা হটিং, টিট্টিভ, মাছরাঙ্গা, কাদা-খোঁচা প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাহাদের মারিলাম না। একবার একটা চাহার ঝাঁক উড়িয়া আসিতে দেখিলাম। একে উড়ো পাখী মারিবার উপযুক্ত লক্ষ্য ছিল না, তাহার উপর তাহারা একটু দূরে উড়িয়া গেল সুতরাং অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে প্রাণভিক্ষা দিলাম। ইতিমধ্যে নদীর পশ্চিম দিক হইতে বেশ একখানি কালো মেঘ ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছিল। 'পশ্চিমে মেঘ অমোঘ' হইলেও তখনও হাওয়া চলিতেছিল। বুঝিলাম বৃষ্টি হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

ঠিক নদীর বাঁকের মুখে এক সঙ্গে তিনটা কাদাখোঁচা পাইলাম। তাহা-দের এক লাইনে একটু পশ্চাতে একটা খঞ্জন পাখী লেজ নাড়িতেছিল। কালো মেঘটা সমস্ত আকাশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ভীম মূর্ত্তি নদীর জলে প্রতিফলিত হইয়া সেই স্বচ্ছ-জলপূর্ণ স্রোতস্বতীর জলরাশি মসীঘন বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। হাওয়া বন্ধ হইল। আমি সেই পক্ষিচতুষ্টয়কে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। ভাল করিয়া টিপ করিয়া বন্দুক ছাড়িতে পারিলে একসঙ্গে চারিটি পাখী মরিতে পারে তাহা বেশ বুঝিয়া ফেলিলাম। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নদীর পাড়ের ঢিপিতে প্রচ্ছন্ন হইলাম। ফুর্ ফুর্ করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিল। প্রকৃতি বড় গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। আমি কাল-বিলম্ব না করিয়া বন্দুকের ঘোড়া টিপিলাম। বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত মর্ম্মরভেদী একটা কাতর চীৎকারে চমকিত হইলাম। আকাশ ভাঙ্গিয়া মোটা মোটা ফোঁটা পড়িতে লাগিল। ছুটিয়া নদীর বাঁকের নিকট গিয়া দেখিলাম, ভয়বিহ্বলা

এক সুন্দরী বালিকা ঘাটের ধারে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। বৃষ্টির জল ঘাট হইতে শোণিতরাশি ধৌত করিয়া নদীতে ফেলিতেছে। একটি বর্ষীয়সী বালিকাকে ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে।

(২)

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। মত্ত প্রভঞ্জন বিশেষরূপে সেই কুটীরের শক্তি পরীক্ষা করিতেছিল। বালিকার জননীর কাতর আর্ত্তনাদ বৃষ্টির শব্দের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক একবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, আর এক একবার নিজের মূর্চ্ছিতা কন্যার প্রতি চাহিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিতেছিলেন—'উঃ! কি সর্ব্বনাশই কর্‌লে বাপু!' গল্পের রাজপুত্র যেমন তুলার দ্বারা কর্ণবিবর বন্ধ করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি পরিপূর্ণ প্রাঙ্গণের উপর দিয়া চলিয়াছিল, নিজদেহ প্রস্তরময় হইয়া যাইবার ভয়ে কোনও রূপ শব্দে কর্ণপাত করে নাই, আমিও তেমনি আর্দ্রবসনে কম্পিতহস্তে শঙ্কিত হৃদয়ে কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিঃশব্দে আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আহত বালিকার ক্ষতস্থান বন্ধন করিতেছিলাম। আমার মানসিক অবস্থাটা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ। রঘুকুলবধূ সীতাদেবীর মত আমি মনে মনে বারম্বার পৃথিবীকে দ্বিখণ্ড হইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিষ্ঠুরা ধরিত্রী আমার কথা মোটেই গ্রাহ্য করেন নাই।

বাহিরে বৃষ্টির বেগ একটু প্রশমিত হইল। বালিকা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। তাহার সেই শঙ্কা-পীড়িত কাতর চক্ষুর ভাষা আমি ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। আমার চক্ষুর সহিত বালিকার চক্ষু মিলিত হইবামাত্র সে চক্ষু মুদিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—মা।

তাহার মাতা তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গেল। আমি তাহার পিতাকে বলিলাম—"এবার আমি ছুটে ডাক্তার ডেকে আনি। মাঠের উপর দিয়ে গেলে দশ মিনিটে আমি পৌঁছে যাব।"

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকাইলেন। একবার বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তখনও বেশ বৃষ্টি পড়িতেছিল।

আমি বলিলাম—"জল কমে গেছে, আমি যাই। আমার বন্দুকটা এখানে থাক্।"

তাহাদের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আমি মাঠের পিচ্ছিল আইলের উপর দিয়া ছুটিতে লাগিলাম। জীবনে এরূপ বিপদে কখনও পড়ি নাই।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে যখন ডাক্তার বাবুকে ও দুর্গাচরণকে লইয়া ব্রাহ্মণের বাটিতে ফিরিলাম, তখন মনের ভারটা ক্ষণিকের জন্য অপসারিত হইল; কিন্তু বালিকাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া যখন চিকিৎসক মহাশয় গোপনে আমাদিগকে বলিলেন যে, জীবনের কোনও আশঙ্কা না থাকিলেও বালিকার পক্ষে আজীবন খঞ্জ হইয়া থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, তখন এক দুর্ব্বিষহ যাতনায় দগ্ধ হইতে লাগিলাম। ভাবিলাম কুক্ষণেই বন্দুক ছুঁড়িতে শিখিয়াছিলাম। মনে মনে শপথ করিলাম যে, জীবনে কখনও আর বন্দুক স্পর্শ করিব না।

(৩)

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা চিকিৎসকের সহিত নবকুমার বাবুর কুটীরে যাওয়া একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া উঠিল। বালিকা ইন্দুমতী দিন দিন সারিতেছিল। কিন্তু সে একেবারে নিখুঁতভাবে সারিয়া উঠিবে কি না সে বিষয়ে এক পক্ষের মধ্যেও ডাক্তারবাবু কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। আমার উপর এ ব্রাহ্মণ-পরিবারের বিতৃষ্ণা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আমার সঙ্গে নবকুমার বাবু বা তাঁহার স্ত্রী কেহ বাক্যালাপ করিতেন না, অথচ প্রত্যহ আমাকে শুনাইয়া ডাক্তারবাবুর নিকট আমার উদ্দেশে অনেক রূঢ়কথা বলিতেন। কেবল দুর্গাচরণের পিতা দেশের জমিদার বলিয়া এ ব্যাপার পুলিসের হস্তে অর্পিত হয় নাই।

একদিন আমার বন্ধু দুর্গাচরণ হাসিয়া বলিল—"তুমি আর কি করতে ওখানে যাও?"

আমি বলিলাম—"আমার মনের অবস্থা তো বুঝেছ? নিজে বিপদে পড়লাম, তোমাদের বিপদে ফেললাম আর ব্রাহ্মণ নবকুমার বাবুর তো—"

দুর্গাচরণ বলিল—"পাগল হয়েছ? যার অদৃষ্টে যা আছে তা' হ'বে। মেয়েটার কপালে আছে খোঁড়া হ'বে—"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"ছিঃ ছিঃ! অমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী কুমারী আমি অতি অল্পই দেখেছি। আমার দোষে বেচারী আজন্মকাল—"

দুর্গাচরণ বলিল—"নবকুমার বাবুর প্রধান দুঃখ কি জান? অর্থাভাবে সে অত সুন্দরী মেয়ের বিবাহ দিতে পারেনি। ইন্দুর বয়সও প্রায় চৌদ্দ বৎসর হ'য়েছে।"

আমি বলিলাম—"তা হ'বে। উঃ! বাস্তবিক, কথাটা বড় খারাপ। তার

উপর যদি আজন্মকাল তার পায়ের কসুর থেকে যায় তা' হ'লে বেচারীর পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে।"

দুর্গাচরণ উত্তরে বলিল যে, এ সকল ভাবিয়া তাহার পিতা নবকুমারবাবুকে কন্যার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ অনেক অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তাহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। অথচ আমি অবিমৃষ্যকারিতার ফলে একসঙ্গে এত লোককে বিব্রত করিয়া বসিলাম, ইহা ভাবিয়া বড়ই মর্ম্মপীড়িত হইলাম। এদিকে পিতা বাটী যাইবার জন্য ঘন ঘন পত্র লিখিতেছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া পত্র লিখিলাম। যাহাতে তিনি এই ব্রাহ্মণ কন্যার জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করেন, সে বিষয়েও পিতাকে যথেষ্ট অনুরোধ করিলাম। আমার পিতা, সহৃদয়, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল বলিয়া যথেষ্ট খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে একটি ব্রাহ্মণ-পরিবার বিপন্ন, এ কথা শুনিলে তিনি তাঁহাকে অকাতরে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না, তাহা আমি জানিতাম।

(৪)

অভ্যাসমত ডাক্তারবাবুর সহিত রোগিনীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। নবকুমার বাবু কার্য্যগতিকে ভিন্নগ্রামে গিয়াছিলেন, ইন্দুমতীর মাতা বোধ হয় ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। আজ ইন্দু অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। সে পিঠে কতকগুলা বালিস দিয়া পদদ্বয় একটা বালিশের উপর রাখিয়া বসিয়া ছিল। তাহার হাতে একখানা পুস্তক ছিল। তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বেশ বোধ হইতেছিল যে, আজ সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ।

আমাকে দেখিলেই সে মুখ ফিরাইয়া লইত। আমার প্রতিদিন ইচ্ছা হইত যে, একবার তাহাকে বুঝাইয়া বলি,—তাহার এ যাতনা-ভোগ দৈববিড়ম্বনায় হইতেছিল। কিন্তু তাহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের মুখের অকৃত্রিম বিরক্তির ভাব দেখিলে আমি বলহীন হইতাম। আজ সাহসে ভর করিয়া তাহাকে বলিলাম—"তুমি পড়িতে পার? ওটা কি বই?"

বালিকা ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া পুস্তকখানা আপনার বাম পার্শ্বে রাখিল। আমি কুড়াইয়া লইয়া দেখিলাম, সেখানি বটতলা হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

আমি বলিলাম—"দেখ, আমার উপর তোমার রাগ হ'বার কথা। কিন্তু"—

ডাক্তারবাবু হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু বাস্তবিক তোমার কোনও দোষ নাই।"

তিনি তাহার পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"কি বল ইন্দুমতী ?"

ইন্দুমতী একটি গভীর বেদনা-ব্যঞ্জক 'উঃ' শব্দ করিয়া ডাক্তারবাবুর হাত ধরিল। ব্যাণ্ডেজ খুলিতে তাহার ক্ষত স্থানে সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তথায় একটু গরম জল দিয়া বলিলেন—"আমার হাত ধর্‌লেই বীরেন্দ্রবাবুকে তোমার হাত ধর্‌তে বল্‌ব। স্থির হ'য়ে থাক।"

আমার নামোচ্চারণে সে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি একটু হাসিলাম। ইন্দুমতী মুখ ফিরাইয়া লইল।

আমি আবার তাহাকে বুঝাইতে লাগিলাম। আমি নদীর বাঁকে কেবল কয়টা পাখী দেখিয়াছিলাম। ওখানে ঘাট আছে বা ঘাটে মানুষ আছে তাহা মোটেই জানিতাম না। তাহার বিপদে আমি বিশেষ দুঃখিত। বালিকা নীরবে সকল কথা শুনিল। আমার কথার কোনও প্রত্যুত্তর দিল না। সে ধীরে ধীরে ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"ডাক্তারবাবু! সত্যি সত্যি কি আমি খোঁড়া হ'ব ?"

ডাক্তারবাবু তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সে বলিল—"আমি জানি, যা কপালে থাকে—"

আমি বলিলাম—"এর চেয়ে বন্দুকের গুলিগুলা আমার নিজের শরীরে লাগ্‌লে ভাল হ'ত। কি কুকার্য্যই করেছি!"

বালিকা ধীরে ধীরে আবার বলিল—"যার যা' কপালে আছে তা' হবেই।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"হ্যাঁ। আপনার দোষ কি ? আপনি যথেষ্ট করিয়াছেন। কি বল ইন্দু ?"

বালিকা খুব মৃদুস্বরে বলিল—"হ্যাঁ।"

দুর্গাচরণের বাটিতে ফিরিয়া দেখিলাম—আমার পিতা তাহার পিতার সহিত গল্প করিতেছেন এবং তাঁহার সহিত আমাদের কলিকাতার ডাক্তার অবিনাশবাবু আসিয়াছেন।

(৫)

বন্ধু বলিল—"মিছিমিছি মন খারাপ করায় লাভ কি ?"

আমি তাহাকে বুঝাইলাম যে, তাহাদের দেশে আসিয়া এত আদর-অভ্যর্থনা পাইয়াও একটু কুবুদ্ধির দোষে সকলকে যে যন্ত্রণা দিলাম, তাহাতে মনের অবস্থা ভাল থাকিতে পারে না। দুর্গাচরণ মোটেই সে কথা স্বীকার করিল না। সে বলিল,—'বাড়ী যাচ্ছ যাও, কিন্তু আবার আমাদের দেশে আসতে হ'বে।'

আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।

সে বলিল—"গোলমালে একটা বিষয় ভুল হ'য়ে গেছে। আমাদের সেদিনের বাজির কি হ'ল ?"

আমি সেদিনের কথা আলোচনা করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। তাহার পূর্ব্বে অনেকবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে,আমার জীবনে সে দিনটা না থাকিলে অনেক লোকের পক্ষে ভাল হইত। বন্ধু দুর্গাচরণ কিন্তু সে লোমহর্ষণ ব্যাপার-টাকে অদৃষ্টবাদের দোহাই দিয়া এক বিভিন্ন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শেষে তাহার আগ্রহাতিশয্যে অগত্যা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কয়টা জীবহত্যা করিয়াছিল। সে বলিল,—"আমি ১৯টা পাখী মেরেছিলাম। তুমি কটা মেরেছিলে ?"

আমি নয়টা টোটায় পনেরটা পাখি মারিয়াছিলাম। শেষের সেই অশুভ গুলিতে কোনও পাখী মারিয়াছিলাম কি না বলিতে পারিলাম না।

দুর্গাচরণ একটু হাসিয়া বলিল—"গুলিটা তো নিষ্ফল যায় নি ?"

এবার আমি বিরক্ত হইলাম। তাহার মত বন্ধু যে এ রকম নিষ্ঠুরভাবে আমাকে পরিহাস করিতে পারে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম—"ছিঃ ছিঃ, আমার একটা দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমার মত বন্ধু যে বিদ্রূপ করবে তা ভাবি নি।"

সে বলিল—"বিদ্রূপ কি ? জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ কর্‌ছি। আমার হার। সেদিনকার বাজি তুমিই জিতেছ।"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"ছিঃ! ছিঃ!"

এবার সে একটু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ কেন ? আমি ঘরে ১৯টা মরা পাখী আনলাম আর তুমি—"

আমি বলিলাম—"আমি একটাও পাখী আনি নি, সেগুলা নদীর ধারে ফেলে এসেছিলাম।"

সে বলিল—"বেশ! তোমার বাবা কি করেছেন জান ?"

পিতা কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না।

দুর্গাচরণ বলিল—"তিনি তোমার কি শাস্তি দিয়েছেন জান ?"

আমি তাহাও জানিতাম না।

সে বলিল—"তিনি স্থির করেছেন যে ইন্দুমতীকে ঘরে নিয়ে যাবেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন ? কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য ?"

সে আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"ন্যাকা! চিকিৎসার জন্য! পুত্রবধূ ক'রে, তোমার সহিত বিয়ে দিয়ে!"

তাহার কথায় আমি বিস্মিত হইলাম। মনে মনে ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনী সম্বন্ধে লোকে কত রকম কল্পনা করিয়া থাকে। একটি অঙ্গহীন জীবন সঙ্গিনী হইবে শুনিয়া প্রথমেই হৃদয়টা ক্ষণিকের জন্য শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তখনই হৃদয়কে সংযত করিয়া লইলাম। ইন্দুমতীর শারদ ইন্দুসদৃশ মুখখানি ভাবিয়া নহে,—নিজের কর্ত্তব্যপথ ভাবিয়া, পিতার ন্যায়বিচারের প্রশংসা করিয়া। হৃদয় হইতে যেন একটা বিষম বোঝা নামিয়া গেল।

দুর্গাচরণ বলিল—"বিকলাঙ্গ কুমারীকে বধূ করিতে আমার পিতা তোমার পিতাকে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অচল, অটল। তাঁহার মতে তোমার দোষের জন্য তোমারই প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। নবকুমারবাবু তোমার পিতার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছেন।"

আমি এ সংবাদে পরিতুষ্ট হইলাম। বন্ধু আবার হিসাব করিতে লাগিল—"তা হ'লে আমি আনিলাম ১৯টা মরা পাখী, আর তুমি টুব্‌টুকে—"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"খোঁড়া।"

বন্ধু বলিলেন—"আজ এই মাত্র তোমাদের ডাক্তার অবিনাশবাবু বলিলেন যে ইন্দুর পায়ে কোনও দোষ থাকবে না।"

আমি সগর্ব্বে বলিলাম—"তবে আমার সম্পূর্ণ জয়।

দুর্গাচরণ পকেট হইতে বাজির টাকাটি আমার হস্তে অর্পণ করিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

ব্যথিত।*

(১)

পথশ্রান্ত ধূলিধূসরিত মেজর কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিল। অপর পারে তাহাদের দুর্গ—সেনাপতির আগমন-প্রতীক্ষা করিয়া তাহাকে সেই দুর্গ রক্ষা করিতে হইবে। এখন নদী পার হইলেই দুর্গে

* অনূদিত।

প্রবেশ করা যায় ;—কিন্তু, কোথায় কোন্‌দিকে বুয়রশত্রু লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে এবং নদীপারের সময় সেই শত্রুর গুলি-বর্ষণ নিষ্ফল না হইলে নদী-গর্ভেই যে তাহার সকল দায়িত্বের অবসান হইবে—এ চিন্তা বীরের হৃদয়ে অধিক-ক্ষণ স্থান পায় নাই! মেজর সাঁতার দিয়া নদী পার হইল। কাপ্তেন দুর্গপ্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া উৎফুল্লহৃদয়ে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

কাপ্তেন কহিল, "এখন আমরা চারজন হ'লাম। আমাদের সৈন্যসংখ্যা মোট সাড়ে তিনশত মাত্র। বুয়রেরা কিন্তু আমাদের পাঁচগুণ, তার উপর তাদের সৈন্যসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্চে! এ অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন?"

মেজর বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "দুর্গরক্ষা করাই আমাদের কর্ত্তব্য! অন্ততঃ জেনারেলের আগমন-প্রতীক্ষাও করতে হবে। পনর দিনের মধ্যেই তিনি বলেছেন, আমাদের সাহায্যার্থ এখানে পৌছিতে পারবেন।"

"বেশ,তাই হোক!" কাপ্তেন অতি বিনীতভাবে এই বলিয়া তাঁহাকে তাহা-দের আবাস-স্থানে লইয়া গেল। প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটি অপরিস্কৃত কামরা তাহাদের বাসস্থান। কাঠের কয়েকটা ভাঙ্গা বাক্স, বসিবার চেয়ার ও খাদ্যসামগ্রী রাখিবার টেবিলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। সে দিন বড়দিন। অতি সামান্য পান-ভোজনের আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল, এই আনন্দ-উৎসবের দিনে কাপ্তেন প্রস্তাব করিল, "আজিকার এই শুভক্ষণে যাহারা দেশের অঙ্কে নিরাপদে অবস্থান করিতেছে, ভগবান তাহাদের মঙ্গল করুন!"

সকলেই সে প্রস্তাব আনন্দের সহিত সমর্থন করিল। কাপ্তেন পুনরায় বলিল, "আর প্রত্যেক সৈন্যের সহধর্ম্মিণী যেন আমাদের পূজনীয়া এই মেজর-পত্নীর আদর্শে অনুপ্রাণিতা হন্!"

মেজর সহসা ফিরিয়া চাহিল—যাহাকে সে শত ক্রোশ দূরে ইংলণ্ডে অবস্থিত মনে করিতেছিল—দেখিল সে তাহার পার্শ্বে দ্বারের নিকট স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহারি প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। কাপ্তেন কহিল, "এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইনি এখানে এসেছেন। আপনাকে যখন নদী পার হ'তে দেখলাম, তখনি আমরা ইচ্ছে করেছিলাম যে, আপনাকে একেবারে অবাক্ করে দেব,—কিন্তু, ইনি তাতে সম্মত হলেন না।"

অন্য সকলের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে মেজর আপনার স্ত্রীকে লইয়া স্বীয় আবাসের দিকে চলিয়া গেল।

(২)

মেজর দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "যাই হোক, এতো তোমার থাক্‌বার মত স্থান নয়! আমাদের কখন কি হয়, কিছু ঠিক নেই! এখনি বুয়রেরা ভীমবেগে আক্রমণ কর্‌তে পারে, কিম্বা কিছুকাল আমাদের এ অবস্থায় রেখে অনাহারেও মারিতে পারে। এখানে তুমি এলে কেন? একি তোমার থাকবার ঠাঁই?"

মেজর-পত্নী স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি এলাম কেন! আমার থাক্‌বার স্থান এ নয়! স্বামীর কাছে স্ত্রীর যদি স্থান না হয়, তবে সে কোথায় থাক্‌বে বল! মনে করো না, আমার জন্য তোমাকে কোনওরূপে বিব্রত হ'তে হ'বে! আমি তোমার কর্ত্তব্যে বিঘ্ন উৎপাদন কর্‌তে আসি নি! এ দুর্গের তুমি এখন অধ্যক্ষ—যুদ্ধের সময় যখন রণবেশে রণোন্মত্ত হ'বে, তখন মনে ক'রো আমি ইংলণ্ডে আছি! আমার জন্য তুমি তিলমাত্রও ব্যাকুল হয়ো না!"

মেজরের জীবনে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। স্ত্রীর এই কথায় সে যেন জগৎকে নূতন চক্ষে দেখিল! আনন্দে, উদ্বেলহৃদয়ে বড়দিনটা সে সৈন্যসকল লইয়া মহোৎসবে কাটাইয়া দিল!

(৩)

দুইমাস পূর্ণ হইয়া গেল—বুয়রদিগের গোলা ব্যতীত বহির্জগৎ হ'তে আর কোনও কিছু তাহাদের দুর্গাভ্যন্তরে পৌঁছে নাই। কোথায় বা সাহায্য, কোথায় বা জেনারেলের আগমন-সম্বাদ! মধ্যে মধ্যে বজ্রনির্ঘোষের সহিত গোলা আসিয়া পড়িতেছে—গৃহ, দ্বার চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে, অশ্ব মরিতেছে, সেথায় অবস্থিত সৈন্যের দেহ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া স্তূপীকৃত ভগ্নগৃহের সহিত প্রোথিত হইয়া যাইতেছে। বৃটিশ সৈন্য তথাপি অচল, অটল—আত্মরক্ষা ও দুর্গরক্ষায় তখনও কায়মনে নিযুক্ত!

মেজর নির্ভীকচিত্তে দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। সেদিন বৈকালে প্রাচীরের উপর আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া মেজর চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহসা কহিয়া উঠিল, "বিপদ! এখনি বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা! প্রাচীরের নীচে অতি দ্রুত গিয়ে তুমি আশ্রয় লও! বুয়রেরা আমাদের দেখেছে, এখনি আমাদের উপর গোলা নিক্ষেপ কর্‌বে!"

মেজর-পত্নী যাইবার সময় হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি সেনাধ্যক্ষ—আজ্ঞাপালন কর্‌তেই হ'বে! কিন্তু ভয় তো আমার জন্য নয়—বুয়রদের লক্ষ্য তোমারই উপর!"

সেই মধুর হাসির রেখাটি তখনও তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া রহিয়াছে, স্বামীর প্রতি সে আর একবার সেইভাবে চাহিয়া যখন আশ্রয়-ভূমির দিকে যাইবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় সহসা তাহার ললাটে গুলি বিদ্ধ হইল। গভীর আর্ত্তনাদ করিয়া মেজর-পত্নী ধরাশায়িনী হইল। মেজর নক্ষত্রবেগে যাইয়া তাহাকে স্বীয় অঙ্কে তুলিয়া প্রাচীর-নিম্নে লইয়া গেল।

মেজর-পত্নী রুদ্ধকণ্ঠে শেষ কথা কহিল, "কাতর হইও না! প্রিয়তম! বিদায়—"

ডাক্তার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মেজর-পত্নীকে বাঁচাইতে পারিল না। সে অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক একটা গুলি বাহির করিল, মেজর তৎক্ষণাৎ তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া আপনার পকেটে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিল এবং ডাক্তারের হস্তে আপনার মুমূর্ষু পত্নীকে রাখিয়া দুর্গরক্ষার্থ প্রাচীরের ধারে চলিয়া গেল।

(৪)

আজ মেজর-পত্নীকে কবর দেওয়া হইবে। শুধু আজিকার এই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য বুয়রদিগের সহিত ইংরাজের শান্তি স্থাপন করা হইয়াছে। জনকয়েক বুয়রও এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিবার জন্য আসিয়াছে। মেজর ধীর ও গম্ভীর—কাহারও সহিত কোনও কথা নাই—শবের নিকট বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি যেন অবস্থিত! কিন্তু, সেই জলদ-গম্ভীর মুখে, সেই হতাশ-দৃষ্টির মধ্যে, শোকে কম্পমান অধরোষ্ঠের পার্শ্বে যেন একটা ক্ষণপ্রভার জ্বালাময়ী তেজ প্রতিহিংসা-রূপে মধ্যে মধ্যে স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল। বুয়রদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মেজরের নিকট যাইয়া অতি করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "মশায়, এই মহিলাটি কি গত কল্য হত হয়েছেন? কি প্রকারের গুলিতে এ দুর্ঘটনা ঘটিল তা কি জান্‌তে পারি?"

মেজর কোনও কথা না কহিয়া নিজের পকেট হইতে সেই গুলিটা বাহির করিয়া বৃদ্ধ বুয়রের হস্তে দিল।

বুয়র উহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, "দৈবক্রমে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে! বড়ই পরিতাপের বিষয়! কিন্তু নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি, মহিলার প্রতি এগুলি লক্ষ্য করা হয় নি!"

মেজর দৃঢ়স্বরে কহিল, "হ'তে পারে;—কিন্তু কাল আমি তখনি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এই যুদ্ধশেষে আমার স্ত্রীর হত্যাকারীর সন্ধান না লয়ে আমি তিল-মাত্রও বিশ্রাম কর্‌ব না!

বুয়র গুলিটা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "কারণ ?"

"প্রতিহিংসা! প্রতিশোধ! তাহাকে হত্যা—"মেজর আর কহিতে পারিল না।

বুয়র কহিল, "যুদ্ধশেষে আপনি সে হত্যাকারীর সাক্ষাৎ পাবেন। এই দুর্গের ঠিক পশ্চিমে এক ক্রোশ দূরে একটা ক্ষুদ্র বাগানের মধ্যে এক ক্ষুদ্র কুটীর আছে—সেইখানে গেলেই তাকে পাবেন।"

মেজর ব্যগ্রভাবে বলিল, "আপনি তাকে দেখিয়ে দেবেন ?"

"নিশ্চয়! অবশ্য, আপনারা উভয়েই যদি যুদ্ধান্তে জীবিত থাকেন! আপনি সেই কুটীরে যাবেন তো ?"

"নিশ্চয়ই—যদি জীবিত থাকি!"

মেজরকে অভিবাদন পূর্ব্বক বুয়র চলিয়া গেল।

(৫)

ইংরাজ জয়লাভ করিয়াছে। মেজর গৌরবের সহিত দুর্গ ত্যাগ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে অন্য দুর্গে পাঠাইয়া দিল এবং সে স্বয়ং সেই নির্দ্দিষ্ট বুয়রের কুটীরের দিকে অগ্রসর হইল। কুটীরের দ্বারের নিকট পৌছিবা মাত্র বৃদ্ধ বুয়র আসিয়া তাহাকে সাদরে ভিতরে লইয়া গেল। মেজর প্রথমতঃ সেই ক্ষুদ্র বাগান ও কুটীর ইংরাজ-অধিকৃত মনে করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে কিছু ইতস্ততঃ করিতেছিল,—কিন্তু বুয়রকে দেখিয়া তাহার সে ভ্রম দূর হইয়াছিল। বুয়রও তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিল, "আপনার সঙ্কুচিত হ'বার কোনও কারণ নেই। অবশ্য এই কয় সপ্তাহেই আমার শরীরের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে বটে,—কিন্তু আমিই ইতিপূর্ব্বে—বোধ হয় আমাকে এখন চিনতে পেরেছেন—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিলাম যে, আপনার স্ত্রীর হত্যাকারীকে আমি দেখিয়ে দিব। সে হত্যাকারী আপনারই সাম্‌নে এখন দণ্ডায়মান।"

মেজর উত্তমরূপে একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল,পরে বলিল, "উত্তম, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে ?"

"নিশ্চয়—কোনও চিন্তা নাই! আপনি নির্ব্বিঘ্নে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করুন! এখানে আপনাকে বাধা দিবার কেহ নাই! আমি আপনার জন্যই এখানে এ কয়দিন অপেক্ষা করেছি।"

মেজর কিয়ংক্ষণ মৌন রহিয়া অধর দংশন করিতে করিতে আপনার পকেট হইতে দুইটা রিভলভার বাহির করিয়া বলিল, "যেটা হয় আপনি পছন্দ করে গ্রহণ করুন! দুইই গুলিভরা ও এক প্রকারের জিনিষ। আপনার যেটা ইচ্ছা বেছে নিন!"

কথা শুনিয়া বুয়র অতি প্রশান্তভাবে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, "একজনের পালাতেই এ অভিনয়ের সমাপ্তি—সে পালা—আপনারই!"

মেজর বিরক্তির সহিত কহিল, "এখনও চিন্তা করুন! আমি এখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; প্রতিহিংসা—প্রতিশোধ আমাকে লইতেই হইবে!"

"তাতো জানি! আর আপনারই বা অপরাধ কি!"

মেজর কর্কশকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"এখনো বলছি যুদ্ধ করুন—নতুবা আপনার মৃত্যু নিশ্চিত!"

"সেজন্য আমি ভীত বা কাতর নহি, মেজর!"

"তবে প্রস্তুত হোন!"

বৃদ্ধ বুয়র স্থির হইয়া মেজরের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং উন্মুক্ত বাতায়নের বহির্ভাগে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "মেজর! ঐ দেখ কবর-শ্রেণী—ও কি জান—ওইখানে আমার দুইটি প্রাণাধিক সন্তান আছে, তারি পার্শ্বে, ঐ যে ঐখানে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আছে! ব্যাপার কি জান—এই যুদ্ধের আরম্ভের সময়, আমি তখন বাড়ী নেই—সেই সময় একদল কাফের এসে আমার ঘর বাড়ী লুঠ ক'রে, আমার সর্ব্বস্ব লুঠ ক'রে, আমার বুকে আগুন জ্বেলে রেখে গেছে! সে আগুন—বন্ধুবর! আজ তুমি নির্ব্বাপিত কর! আমি গিয়ে তাদের সঙ্গে একবার মিলিত হ'য়ে বাঁচি!"

বুয়র যখন উক্ত কথাগুলি বলিতেছিল, মেজর তখন রিভলভার লইয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইবামাত্র, সে সহসা রিভলভারটা টেবিলে রাখিয়া কহিল, "এই দেশ কি আপনার মাতৃভূমি?"

ঈষৎ অবজ্ঞার সহিত বুয়র উত্তর করিল, "না, না—আমি ইংরাজ। তবে বাল্যকালেই জন্মভূমির অঙ্ক হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, উপস্থিত এ দেশেরই আমাকে অধিবাসী হ'তে হয়েছে!"

"তা হলেই আপনি বুয়র—আর বুয়র বলেই আমার স্ত্রীর হত্যাকারী!"

মেজর কাঁপিতে লাগিল, রিভলভার লইয়া পুনরায় তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া বলিল, "একজনের মৃত্যু আজ নিশ্চিত! একজনের জ্বালার আজ অবসান! আসুন!"

বুয়র ধীরে ধীরে কহিল, "আমি প্রস্তুত—তুমি লক্ষ্য কর! আজ তোমার পালা! মেজর, বন্দুকের আওয়াজ আমার কানে এখন সঙ্গীতের মত সুমিষ্ট; ইংরাজ বীরের মত অব্যর্থ লক্ষ্যের দ্বারা তোমার বন্দুকের শেষ সঙ্গীত একবার শুনাও!"

মেজর দৃঢ়মুষ্টিতে রিভলভার লইয়া লক্ষ্য করিল—আবার হাত নামাইয়া সেই কবরশ্রেণীর প্রতি চাহিল—উর্দ্ধমুখে নিমেষের জন্য কি একটা ভাবিয়া লইল !—এবার বুয়রের ললাট লক্ষ্য করিয়া রিভলভার ধরিল, ঘোড়া টিপিতে যাইয়া সহসা রিভলভারটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বুয়রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল. "ভাই, দেখছি, তোমার ও আমার স্ত্রী এখন এরূপ প্রতিহিংসার বিরোধী ! ওই শোন, তাঁরা ওই আকাশ হ'তে আমায় নিষেধ কর্‌ছেন !"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

কালো যোগেশ।

আমার বর্ণ ঠিক গোলাপ ফুলের মত টুক্‌টুকে না হইলেও আমি কাক, কোকিল বা লিখিবার কালীর মত এমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিলাম না, যাহাতে আমার নামের পূর্ব্বে 'কাল' কথাটা মৌরসী পাট্টা লইয়া খুঁটি গাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে। আমারও পিতামাতা আদর করিয়া আমার নামকরণ করিয়াছিলেন যোগেশ, আমার সহপাঠীর পিতামাতাও তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'যোগেশ'। কিন্তু শিবপুর কলেজে যোগেশচন্দ্র রায় বলিলে আমাকে না বুঝাইয়া তাহাকে বুঝাইবে কেন, ইহার কারণ আমি খুঁজিয়া পাইতাম না। ছেলেরা সকলে তাহাকে যোগেশ বলিত আর আমাকে 'কালো যোগেশ' বলিত। কতকগুলা নীচান্তঃকরণ অবিনয়ী ছোকরা আবার আমার প্রকৃত নামটা ছাড়িয়া দিয়া মাঝে মাঝে আমায় কেবল 'কাল' বলিয়া সম্বোধন করিত। প্রথম প্রথম আমি একটু কুপিত হইলে তাহারা বলিত—"হ্যাঁ, তাওতো বটে। না আর আমরা তোমাকে 'কালো যোগেশ' বলব না, তোমাকে 'মুক্কো যোগেশ' বলব।" ভালরে ভাল ! এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ ক'ব কার। আমি বুঝিলাম 'মুক্কো যোগেশ' অপেক্ষা 'কালো যোগেশ' প্রভৃত ইজ্জতসম্পন্ন ভদ্রলোক। সুতরাং তাহাদের কথায় আর প্রকাশ্যে ক্রোধ দেখাইতাম না।

আমার উপর সহপাঠীদিগের বিতৃষ্ণার মাত্রাটা যত অধিক হইতে লাগিল, যোগেশের উপর ঠিক সেই মাত্রায় একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। যোগেশ শিবপুরের পাঠার্থীদিগের মধ্যে ক্রমশঃ

এত বেশী প্রিয় হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল যে, তাহারা সকলে পালা করিয়া রাত্রিতে তাহার জন্য ছবি আঁকিয়া দিত; কারখানায় তাহার জন্য কাজ করিয়া দিত। সে বেশ গান গাহিতে পারিত। সন্ধ্যার পর আমাদের ক্ষণিক বিশ্রামের সময় ছেলেরা সব খরবাহিনী জাহ্নবী-তীরে ঘাসের উপর ছোট ছোট দল বাঁধিয়া শুইয়া থাকিত, সেই সময়ে যোগেশ একটা না একটা দলে গান গাহিয়া সকলের নিকট প্রীতিভাজন হইত। তাহারা তাহাকে এত ভালবাসিতে আরম্ভ করিল যে, আমার সহিত তাহার নামের একতাটা যেন আমার ভীষণ অপরাধের সাক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। একদিন অন্ধকারে আমি আপন মনে গঙ্গার তীরের পাকা রাস্তার উপর দিয়া যাইতেছিলাম, নদীর তীর হইতে কতকগুলা ছোকরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কে হে, যোগেশ না কি? যোগেশ! যোগেশ!"

আমি অপরাধের মধ্যে বলিলাম—"হ্যাঁ, আমি। কেন?"

আমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া সেই নির্লজ্জ যুবকদল এমন অসভ্য বর্ব্বরের মত কলহাস্য করিয়া উঠিল যে, আমার সর্ব্বশরীরের ভিতর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। একজন রসিকতা করিয়া আবার বলিয়া উঠিল—"আরে কেও 'কাল' না কি? না কালমাণিক! তোমায় খুঁজিনি, যোগেশকে খুঁজছি।"

আমি ধীরে ধীরে আমার নির্জ্জন কক্ষে গিয়া প্রায় দশ মিনিট স্থির হইয়া বসিলাম। শেষে মনে মনে বলিলাম, যে শেষ কালে হাসিতে পারে তাহার হাসিই মধুর। আমি লেখাপড়ায় এই সমস্ত বর্ব্বরদের উপরে উঠিব। দেখিব,—ইহারা আমায় কতদিন এরূপ ভাবে অবমানিত করিয়া রাখিতে পারে।

(২)

বৎসরের শেষে আমি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া অনেক পুস্তকাদি উপহার পাইলাম। কিন্তু তাহাতে আমার সুখ হইল না। আমার সুখ হইল যোগেশের দুর্ভাগ্যে। সে সমস্ত বৎসর ধরিয়া ফুলে ফুলে মধু খাইয়া লোকের আদর-যত্নে দিন কাটাইয়াছিল, সুতরাং পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইল। ভাবিলাম,—এইবার শিবপুরের ছোকরার দল একটু সংযত হইবে, বুঝিবে তাহাদের বন্ধুত্বের পরিণামে তাহাদের যোগেশের কি দুর্দ্দশা হইল, আর তাহাদের সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হইয়া আমারই বা কিরূপ পরীক্ষা-ফল হইল। কিন্তু নির্লজ্জ যুবকবৃন্দ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। যোগেশও দুঃখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। ইহাতে আমার বেদনাটা যেন বাড়িতে লাগিল। তাহাদের থিয়েটারের দলে যোগেশ প্রমীলা সাজিয়া ভয়ঙ্কর প্রশংসা লাভ করিল।

যেদিন আমি পরীক্ষায় পারদর্শিতার জন্য কলেজে উপহার পাইলাম, সেদিন যোগেশ থিয়েটার করিয়া এমন কি শিক্ষকদিগের নিকট হইতে অবধি বাহবা পাইতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম,—ব্যাপারটা তো মন্দ নয়। আজকের দিনের তো দেখছি নায়ক সেই হতভাগ্য কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন যোগেশচন্দ্র। আর এক বৎসর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে তাহাকে শিবপুর হইতে বিদায় লইতে হইবে। আচ্ছা দেখি বৎসরের শেষে কি হয়। আর এক বৎসর পরে যে তাহাকে শিবপুরে দেখিতে পাইব না, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। কোন প্রকারে কষ্ট ও অবমাননা সহ্য করিয়া একটা বৎসর শিবপুরে থাকিতে পারিলে এ কণ্টক দূর হইবে, –তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম।

যোগেশের বন্ধুবান্ধব আমাকে অবমানিত করিত বটে, কিন্তু নীচাশয় যোগেশ-চন্দ্র আমাকে সম্মুখে কোনও দিন কোনও অবমাননাসূচক কথাবার্ত্তা বলিত না। তাহাতে তাহার উপর আমার বিদ্বেষটা আরও বর্দ্ধিত হইত। সে যদি প্রকাশ্য-ভাবে আমার সহিত শত্রুতা করিত, তাহা হইলে আমি তাহাকে দুইটা অম্লমধুর বুলি শুনাইয়া অনেক পরিমাণে প্রাণের জ্বালা নিভাইতে পারিতাম। তাহার পর সে যখন ক্লাশ উঠিতে পারিল না, তখন যদি প্রকাশ্যভাবে সে কিম্বা তাহার অনুরক্ত ছোকরার দল দুঃখ প্রকাশ করিত, তাহা হইলেও আমার প্রাণে একটু শান্তি হইত। বুঝিতাম যে শত্রুপক্ষ কষ্ট পাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কথাবার্ত্তা ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইত যেন তাহারা জন্মাবধি ভগবানের নিকট বর চাহিতেছিল যে, যেন যোগেশ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে না পারে।

সেদিন রবিবার। দুপুর বেলা আমাদের যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইবার অনুমতি ছিল। আমি বোটানিক্যাল গার্ডেনের 'পাম এভেনিউ'তে বেড়াইতেছিলাম। একেবারে গঙ্গার ধার হইতে কিড্ সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভ অবধি দু'সারি তালজাতীয় বৃক্ষের সারি চলিয়া গিয়াছে, পার্শ্বের ময়দানে একদল সাহেব মেম বসিয়া উচ্চ হাস্য করিতেছিল ও চা, কেক প্রভৃতি ধ্বংস করিতেছিল, চারিদিক হইতে নানাজাতীয় পক্ষীর কাকলী বায়ুবক্ষে ছুটাছুটি করিতে করিতে আমার প্রাণে আমার মাতৃভূমির স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। এমন সময় পাশের একটা ঝোপ হইতে যোগেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। একমাত্র যোগেশচন্দ্র কেবল আমার নাম করিয়া ডাকিত। সে আমাকে বলিল,—"কি হে যোগেশচন্দ্র যে, একেলা ঠিক দুপুর বেলা বাগানে কি করছ ?"

আমি একটু শ্লেষপূর্ণ স্বরে বলিলাম—"আমিতো চিরদিনই একেলা থাকি। তোমার সব দলবল গেল কোথা?"

সে বলিল—"আর ভাই দলবল। দলবলেই আমায় খেলে। বুঝছতো, এ দুর্দ্দশা কেবল দলেরই জন্যে। তুমি একেলা থেকে কেমন—"

আমাদের পশ্চাতে একসঙ্গে তিন চারিজনের অট্টহাস্যের রোল উঠিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম আমাদেরই কয়েকজন সহপাঠী। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—"বা! তুই স্যাঙাতে মিলেছে ভাল। কিরে যোগেশ, কালোর সঙ্গে কি পরামর্শ করছিলি?"

ইতিমধ্যে সে তাহাদের দলে গিয়া মিশিয়াছিল। সে আমাকে শুনাইয়া তাহার বন্ধুকে বলিল—"ছিঃ ছিঃ, কেন ভদ্রলোককে 'কালো' বলে অপমান করিস?"

যোগেশের কৃত্রিম আত্মগ্লানিতে আমার প্রাণে যেটুকু সুখের সঞ্চার হইয়াছিল তাহার এই কথাটায় আমাকে সেই পরিমাণে নিরাশ হইতে হইল। আমার প্রাণ চাহিতেছিল যোগেশের দুঃখ—সুতরাং যোগেশ একটু দুঃখিত হইয়াছে, অনুতাপ করিতেছে এ ধারণায় বেশ সুখ হইতেছিল, কিন্তু তাহার সেই সহানুভূতি আমাকে শতবৃশ্চিক-দংশনের যন্ত্রণা দান করিল। কি স্পর্দ্ধা!

(৩)

সাতদিন একাধিক্রমে জ্বর ভোগ করিতেছিলাম। একাকী রুগ্নশয্যায় শুইয়া জ্বরের যন্ত্রণা ভোগ করিতাম আর পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ পাইবার জন্য প্রাণটা সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকিত। কলেজের সহপাঠিগণ কেহ ভুলিয়াও একবার আমার রুগ্নশয্যার দিকে আসিত না। বাহিরে তাহারা আনন্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে শব্দ আমার হাঁসপাতালে পঁহুছিত। একদিন ঠিক আমার গৃহের বারান্দায় একটি ছাত্র বলিল—"কালো যোগেশ এখনও সারেনি? তার কি হ'য়েছে?"

যোগেশ বলিল—"তা ত' জানিনি। আয় না দেখে আসি।"

তাহার প্রত্যুত্তরে অপর ছাত্রটি কি বলিল শুনিতে পাইলাম না।

পরক্ষণেই যোগেশ সেই ঘরে আসিল। বলা বাহুল্য, তাহাকে দেখিয়া আমি মোটেই সন্তুষ্ট হইলাম না। আমি দিনরাত খাটিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম আর সে দিনরাত আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বেশ পরিপাটি রকমের বেশভূষা করিয়া সুস্থ সবল দেহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বিধির এ বিধানটা আমার পক্ষে বড় কঠোর বলিয়া বোধ হইতেছিল। আমি শয্যাগত হইয়া পৃথিবীতে কাহারও মুখে একটা সহানুভূতির কথা শুনিতে পাই নাই অথচ সে নিরোগ শরীরে আমাদের সেই ক্ষুদ্র সংসারের আদরযত্নে মনের সুখে বাস করিতেছিল ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের কারণ কি হইতে পারে? তাহার উপর আমার ঈর্ষার ভাব কিছু কমিল না। কাজেই সে যখন জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন আছ?' তখন তাহাকে একটা 'মন্দ নয়' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম। সে আরও দুই একটা কথা কহিবার চেষ্টা করিল। আমি ঘুমের ভাণ করিয়া চক্ষু মুদিলাম। একটু বসিয়া যোগেশ গৃহ হইতে বাহির হইল। সে যে কোমল কথার ছলে আমার বিপদের সময় আমায় উপহাস করিতে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না।

(৪)

আমি কৃশ দেহে একটু একটু বেড়াইতে পারিতাম। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের বাসস্থানের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বরষা-স্ফীত জাহ্নবীর উপর একখানি জেলে ডিঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিলাম। ষ্টীমারের তরঙ্গে পড়িয়া ক্ষুদ্র তরীখানি হাবুডুবু খাইতেছিল, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল তাহার একমাত্র আরোহীকে লইয়া সে গঙ্গার গর্ভে স্থান পাইবে। নাবিক এক হাতে ছোট একটি হুঁকা ধরিয়া তামাক টানিতেছিল আর এক হাতে ও এক পায়ে নৌকার একমাত্র দাঁড় বাহিতেছিল। মত্ত তরঙ্গকে সে ভ্রুক্ষেপ করিতেছিল বলিয়া বোধ হয় নাই।

আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকায় যোগেশ থাকিত। হঠাৎ তাহাদের 'ব্যারা'কে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এক সঙ্গে দশ বার জন যুবক ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমাদের বারান্দা হইতে একজন উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? একজন বলিল—'যোগেশের কলেরা হয়েছে'। অমনি আমাদের ব্যারাক হইতে দলে দলে ছাত্রেরা ছুটিল। তাহাদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া আমার গাত্রদাহ উপস্থিত হইল।

সমস্ত দিন ঐ ভাবে চলিল। কেহ কলিকাতা হইতে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল, কেহ রোগীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কেহ ছুটাছুটি করিয়া সংবাদ লইয়া ফিরিতে লাগিল। একজন যোগেশের পিতাকে টেলিগ্রাফ করিবার জন্য ছুটিল। সকলের মুখে চিন্তার রেখা, সকলেরই যেন আপন অনুজের পীড়া হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্র সাহায্যমত চাঁদা দিয়া একটা তহবিল

সৃষ্টি করিল। তাহা হইতে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বরফ আসিতে লাগিল। যাহাদের বাইসিকেল ছিল তাহাদের উপর কলিকাতায় ছুটাছুটি করিবার ভার পড়িল।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার নিকট যেন বিষ বোধ হইতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর বাড়াবাড়ি! কি বিষম গোলোযোগ! পৃথিবীতে কাহার না রোগ হয়? রোগীর শুশ্রূষা করা কিছু অন্যায় কার্য্য নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া সমস্ত কলেজ মিলিয়া একজনের জন্য এরূপ হুড়াহুড়ি, এরূপ ভালবাসার ভণ্ডামির অভিনয় করাটা একেবারে দূষণীয় সে বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। তাহার উপর আমার সেই নির্জ্জন বন্ধুহীন অবস্থায় জ্বরভোগ করিবার সময়টা মনে পড়িল। তাহাদের এই স্বার্থশূন্য পরার্থপরতা সে সময় কোথা ছিল? কৈ কেহ তো একবার আমাকে একটা মিষ্ট কথাও বলে নাই! কেবল তাহাদের ভালবাসার 'কেন্দ্রস্থল আদুরে গোপাল যোগেশচন্দ্র একবার আমার বিপদে পরিহাস করিতে আসিয়াছিল মাত্র।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখনও যোগেশের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না। বন্ধুবর্গের মুখে ভয়ের চিহ্ন থাকিলেও মোটেই অবসাদের চিহ্ন ছিল না। আমার মনে হইতেছিল যে, যোগেশ কিছু বেশী দিন রোগ ভোগ করিলে দেখিব স্বেচ্ছাসেবকের দল কি করে! কতদিন এইরূপে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগীর পরিচর্য্যা করে!

তখন প্রায় রাত্রি আটটা। আমার গৃহের দুইটি যুবক ফিরিয়া আসিল। একজন মাথায় হাত দিয়া বসিল। অপরটি বলিল,—'সব ফুরায়, ছোঁড়া আর বাঁচে না'। আমার প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল। যুবক দুইটি বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি কালবিলম্ব না করিয়া যোগেশের গৃহের দিকে ছুটিলাম। স্বেচ্ছাসেবকের দলের ছুটাছুটি বন্ধ হইয়াছিল। কি যেন একটা মন্ত্রের বলে আমার হৃদয় হইতে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল। সেই ক্ষণিক মোহের বশে যোগেশের মিষ্ট কথাগুলা যেন কানে বাজিতে লাগিল। আমার রোগশয্যায় সেই কেবল আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তবে কি তাহার হৃদয়টা বাস্তবিক উচ্চদরের? একবার মনে হইল তাহা না হইলে এত লোক নিঃস্বার্থভাবে তাহার জন্য এমন কাতর হইবে কেন?

আমি তাহার দ্বারের নিকট গিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কি খবর?

সে বলিল—"তুমি নিজে রোগী, ঘরে যাও। যোগেশ আমাদের ফাঁকি—"

যুবক আর বলিতে পারিল না। আমার গলা ধরিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। আমার চক্ষু ফাটিয়া এবার জল পড়িল।

(৫)

মৃত্যুর দ্বারে যদিও ক্ষণিক দুর্ব্বলতা আসিয়া আমাকে অভিভূত করিয়াছিল, যোগেশের মৃত্যুর পর আমি স্থির হইয়া বুঝিয়াছিলাম যে মৃত্যুটা অবশ্যম্ভাবী, তাহার জন্য এত শোক করা বৃথা। পরদিন যখন যোগেশের পিতাকে ঘিরিয়া ছাত্রেরা তাঁহার নিকট যোগেশ-সম্বন্ধে মিথ্যা কথা কহিতে আরম্ভ করিল, তখন আমার বড় রাগ হইল। সে তাহাদের বন্ধু ছিল অবশ্য তাহারা তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে পারিত কিন্তু সে যখন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছিল তখন তাহাদের পক্ষে একথা বলা ভাল হয় নাই যে, সে কেবল পড়াশুনা লইয়াই থাকিত। তাহার পিতার হৃদয়ে অবশ্য এ কথাগুলায় ক্ষণিক শান্তি আসিতেছিল কিন্তু আবার মাঝে মাঝে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেছিলেন। তখন আবার সকলের চক্ষু আর্দ্র হইতেছিল। যোগেশের পিতা বলিলেন—"এ বিপদে আমার এই সান্ত্বনা যে আমার পুত্র আপনাদের নিকট থেকে এত স্নেহ পেত।"

অমনি সকলে তাহার মহানুভবতার এক একটা গল্প শুনাইয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

তিনি বলিলেন—"ছেলে লেখাপড়া ক'রে পীড়িত হয়েছিল, দুঃখের সময় সে কথাটাও ভাল। কিন্তু—"

এবার তিনি বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন—"কিন্তু আমি কি ক'রে তার মাকে বুঝাইব! ওঃ বাবারে—"

আমার স্নেহময়ী মাতার মুখ মনে পড়িল। আমার নিজের পিতাকে স্মরণ করিলাম। একটা স্বর্গীয় ভাব আসিয়া আমার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিল। ধন্য রোদন! কি করিলে তাঁহার মনে সামান্য সান্ত্বনা দেওয়া যাইতে পারে? বুঝিলাম কেবল পুত্রের গুণের কথায় তাঁহার হৃদয়টা একটু উৎফুল্ল হয়! আমি চোখ মুছিতে মুছিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—"আপনি যোগেশের প্রাইজের বহিগুলা দেখেন নাই?"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কই, তাত সে আমায় বলে নি।"

আমি বলিলাম—"বাঃ, সে গত পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আমি আনছি।"

সকলে আমার দিকে চাহিল। সহপাঠীরা আমার কৌশলটা বুঝিয়া ফেলিল। আমি ছুটিয়া গিয়া আমার প্রাইজের বহিগুলা আনিলাম।

পুত্রশোকাতুর পিতা সেই উপঢৌকনগুলায় বারম্বার যোগেশচন্দ্র রায়ের নাম পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইলেন। তিনি পুস্তকগুলাকে বুকে ধরিয়া আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন—"এ দারুণ শোকে এগুলাও কতক শান্তি দিবে। হাঃ বিধাতঃ"।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

উকিলের ভাগ্য।

আমি ছোটআদালতের উকিল। নাম ছোটআদালত হইলে কি হয় আদালত কিন্তু খুব বড়। তাহার প্রমাণ, আদালতে মামলার আর শামলার সংখ্যা করা যায় না। আমার মত খুদীরাম এ আদালতে অনেক আছেন। আমার অবস্থা তবুও ভাল—যেমন করিয়া হউক, মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা রোজগার করি; কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁহাদের আদালতের উপার্জ্জন হইতে দুই বেলার ট্রামভাড়ার পয়সাও জোটে না। তাঁহাদের কষ্টের আর অবধি নাই।

ভদ্রলোকের ছেলে—কেহ বা এম-এ, বি-এল,—কেহ বা শুধু বি-এল—সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা—সকলেই কলেজে পড়িবার সময়, কত উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায় আজ তাঁহাদের অনেকেরই ছোট-আদালতে বসিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত মিলে না। এখানে বসিবার স্থান মিলার চেয়ে একটা চাকুরি লাভ করা সহজ!

কতজনের কত দুঃখের কাহিনী প্রতিদিন শুনি। শুনিতে শুনিতে কতদিন চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসে। নিজের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করি। কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, কত অভাব, কত নির্য্যাতন যে আমি সহ্য করিয়াছি তাহার বিবরণ দিতে গেলে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতেও কুলায় না। একদিনের একটা কথা আজ নিবেদন করিব, তাহা হইতেই আমাদের মত উকীলের দুর্ব্বহ জীবনের কাহিনী সকলে বুঝিতে পারিবেন।

বি-এল, পাশের পর প্রায় তিন বৎসর স্কুলমাষ্টারী করি। পিতা সামান্য কিছু জমীজমা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার আয়ে সংসার চলিতে পারিত কিন্তু আমার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় তাহা হইতে নির্ব্বাহ হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। সংসারে খাইবার লোক নিতান্ত কম ছিল না। পিতা যখন মারা যান, তখন আমি বি-এ, ক্লাসে পড়ি; কিন্তু তখনই আমার বিবাহ হইয়াছিল শুধু— বিবাহ কেন, একটী পৌত্রীর মুখ দর্শন করিয়া পিতা ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুতরাং আমার উপর যখন সংসারের ভার পড়িল, তখন দেখিলাম, খাইবার লোক পাঁচটি—বিধবা পিসীমাতা, মাতাঠাকুরাণী, আমার স্ত্রী, আমার কন্যা এবং স্বয়ং আমি; কিন্তু আনিবার লোক কেহই নাই—আমি কলেজের ছাত্র।

মাতাকে বলিলাম পড়াশুনার ব্যয় চলিবার যখন কোনই সম্ভাবনা নাই, তখন লেখাপড়া শিক্ষা করিবার আশা ত্যাগ করিয়া, কাজকর্ম্মের অনুসন্ধান করি। মা, পিসীমা, এমন কি আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত কেহই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন স্থির হইল, আমাদের যে সামান্য জমিজমা আছে, তাহা বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করা হউক এবং সেই টাকায় আমার পড়ার খরচ চলুক। তিন চার বৎসরের মধ্যে ওকালতী পাস করিয়া যখন ব্যবসায় আরম্ভ করিব, তখন মায় সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া বন্ধকী জমাজমী খালাস করিতে কয়দিন লাগিবে? মা, পিসীমা, যাহা বুঝিলেন, ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল হইয়া আমিও তখন তাহাই বুঝিলাম।

তাহার পর এই দুই বৎসর ছোটআদালতে ওকালতী করিতেছি। বন্ধকী জমাজমি খালাস করা দূরে থাকুক, এই দুই বৎসরে পৈত্রিক ভদ্রাসনখানি পর্য্যন্ত যে বন্ধক পড়ে নাই, ইহাই আমার সৌভাগ্য। মেয়েটী কিন্তু আট বৎসরের হইয়াছে। ভগবানের অসীম অনুগ্রহে আমার আর সন্তানাদি হয় নাই।

প্রায় তিন বৎসর মাষ্টারী করিয়া নিজের বাসা খরচ ও সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই। পঞ্চাশ টাকা বেতনে হেড্‌মাষ্টারী করিতাম। মফস্বলের হেড্‌মাষ্টার একজন পদস্থব্যক্তি; সেই পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য একটি চাকর ও একটী ব্রাহ্মণ রাখিয়া মাসিক ৩০৲ বাসা খরচই করিতে হইত। দশটী টাকা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতাম, আর দশটী টাকা ভবিষ্যৎ ওকালতীর মূলধন বলিয়া সঞ্চয় করিতাম;—বন্ধক খালাশ করিব কি দিয়া?

যখন কলিকাতায় ওকালতী করিতে আসিলাম, তখন আমার পুঁজি পৌনে দুইশত টাকা। একটী স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিলে, এ টাকায় তিন চারি মাসের অধিক চলিতে পারে না। আর এই তিন চার মাসে যে ত্রিশটী টাকা রোজগার করিতে পারিব তাহারও কোনও সম্ভাবনা দেখিলাম না। সুতরাং একটা মেসে থাকিয়াই প্রায় দেড়বৎসর কাটাইলাম। আমি বলিতেছি, "তোমরা বিশ্বাস কর। এই দেড় বৎসরে আমার ওকালতীর আয় হইয়াছিল ২৯৫/১০।"

অবশেষে স্থির করিলাম যাহা থাকে অদৃষ্টে ডুবেছি না ডুবিতে আছি মেসে আর থাকিব না। দুই চারিজন শুভানুধ্যায়ী উকিলও বলিলেন, মেসে থাকিয়া কোনও দিনও আমার পসার হইবে না। তখন মাসিক ১৮৲ টাকা ভাড়ায় শ্যামবাজারে একখানি ছোট একতালা বাড়ী লইলাম। বাড়ী হইতে সকলকে কলিকাতায় লইয়া আসিলাম। গ্রামে আমার একজন প্রতিবেশী আমার সেই সামান্য জমাজমীটুকুর দেখিবার ভার লইলেন এবং মাসে মাসে পঁচিশটি টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মাষ্টারীর মূলধনের চল্লিশটী টাকা তখনও অবশিষ্ট ছিল।

যেমন করিয়া হউক মাসে ষাট টাকার কমে কলিকাতায় সংসার চলে না। বাসায় ব্রাহ্মণ দূরের কথা একটী ঝিও রাখিলাম না। তবুও ত মাস গেলে পঁয়ত্রিশটী টাকা রোজগার করাত চাই। তখন প্রাণপণ শক্তিতে খাটিতে আরম্ভ করিলাম। কোনও মাসের খরচ কুলাইয়া যায়, কোনও মাসে অকুলান পড়ে। বাড়ী ভাড়া জমিয়া যায়।

এমন অবস্থায় একদিন কাছারী যাইবার সময় বাক্স খুলিয়া দেখি একটী পয়সাও নাই। পূর্ব্বদিন যে আটআনা পয়সা ছিল, গৃহিণী তাহা খরচ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল আমার চাপকানের পকেটে যে মণিব্যাগটী থাকে তাহাতে টাকাটা সিকেটা নিশ্চয়ই আছে। আমি কাছারীর পোষাক পরিয়া যখন বাক্স হইতে সেই আধুলিটি বাহির করিতে গেলাম, তখন গৃহিণী বলিলেন যে তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। জানিতাম মণিব্যাগে কিছুই নাই তবুও ব্যাগটী খুলিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলাম। স্ত্রীর নিকট কিছু পয়সা চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে তাঁহার কাছে একটী আধলাও নাই। সত্যসত্যই তাঁহার কাছে কিছুই ছিল না। তখন কি করি! শ্যামবাজার হইতে পদব্রজে ছোট-আদালতে সেই শ্রাবণ মাসের দিনে যাওয়া তো সহজ কথা নহে—অসম্ভব বলিলেই

হয়। আমার স্ত্রী তখন অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া, আমার কন্যার পুতুলের বাক্সের এক প্রান্ত হইতে একটী নূতন চকচকে দুয়ানী বাহির করিলেন। সেই দুয়ানীটি সম্বল করিয়া ছোটআদালতের উকিল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঘোষ বি, এল, মহাশয় কাছারীতে চলিলেন। ছয়টী পয়সা ট্রামভাড়া দিয়া অবশিষ্ট দুইটী পয়সা মণিব্যাগে গচ্ছিত রাখিয়া আদালতে পৌছিলাম। বেলা এগারটা বাজিতে না বাজিতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। তাহার পর বৃষ্টি। সে বৃষ্টি কি আর থামে! অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি বুঝিলাম অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। এই বাদলার দিনে একটী পয়সা পাইবারও সম্ভাবনা দেখিলাম না।

চারিটার সময় আরও ভাল করিয়া আকাশে মেঘ জমিতে লাগিল। আকাশের গতিক ভাল নহে দেখিয়া সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে আদালত জনশূন্য হইতে লাগিল—আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সম্বল দুইটি পয়সা, যাইতে হইবে সেই সুদূর শ্যামবাজারের বাসা-বাড়ীতে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে, জলে ভিজিয়া না হয় বাসায় গেলাম, কিন্তু বাসায় পৌছিয়াই যদি শুনি যে ঘরে তৈল নাই বা কয়লা নাই, তাহা হইলে কি হইবে? সম্বলের মধ্যে ত কন্যার পুতুলের বাক্স হইতে দুয়ানীর দুইটী পয়সা। আদালত প্রায় জনশূন্য। উকিলদিগের বসিবার যে ঘরে আমি বসিয়া আছি, সেই ঘরে একজন বড় উকিলের একটী মুহুরী ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। বেচারীর হাতে অনেক কাজ ছিল, তাই সে এত বিলম্ব করিতেছিল।

আমাকে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সেই মুহুরীটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমেশবাবু আপনি যে এখনও বসিয়া আছেন? কাহারও আসিবার কথা আছে কি?" আমি বলিলাম "হাঁ, একজন বড় মক্কেলের আসিবার কথা আছে।"

মুহুরী বলিল—"এই বৃষ্টিতে আসিবেন এমন মক্কেল কে?"

আমি বলিলাম, "যম।"

প্রৌঢ়বয়স্ক মুহুরীটি আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার সেই সময়ের ভাব দেখিয়া আমি আর কোনও কথা গোপন করিতে পারিলাম না। আমি আমার দুর্দ্দশার কথা সেই মুহুরীর নিকট আদ্যোপান্ত বলিলাম। শুনিয়া সত্য-সত্যই তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। "রমেশবাবু আপনি যে এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, একথাত বুঝিতে পারি নাই।"—এই বলিয়াই সে নীরব হইল।

দশমিনিটের মধ্যেই তাহার কাগজ পত্র সমস্ত গোছাইয়া সে বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আমি তখনও বসিয়া আছি। সে তখন আমার নিকট আসিয়া অতি ধীরে ধীরে, অতি কাতরকণ্ঠে বলিল, "রমেশবাবু, কিছু মনে করিবেন না—এই পাঁচটী টাকা লইয়া যান। ইহা আমি আপনাকে ধার দিলাম, আপনি যখন পারেন শোধ করিবেন। কত জুনিয়ার উকিলের পশার আমি করিয়া দিলাম, কৈ আপনিত একদিনও আমাকে কিছু বলেন নাই! তা যাক্, কাল থেকে যা'তে আপনি রোজই এক আধটা কাজ পান তাহা আমি করিব।"

রমানাথ মুহুরীর এই কথা শুনিয়া আমি তাহার দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিলাম। আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। আমার মনে হইল, "ভগবান আমার প্রতি কৃপা করিয়াই আজ এই বড় দুর্দ্দিনে রমানাথকে আনিয়া দিলেন।"

রমানাথ তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে। আমি এখন প্রতিদিনই কিছু না কিছু পাই; কিন্তু আমার মত অনেকে আছেন, অনেকেরই এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়—কিন্তু ছোট আদালতে ত বেশী রমানাথ নাই!

শ্রীজলধর সেন।

ঋণ-পরিশোধ।

মহেন্দ্রবাবুর বৈষয়িক অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বাজারে তাঁহার দেনা ২৫০০০৲ টাকার কম হইবে না। অথচ একখানি পুরাতন খাট, একটি সোণার ঘড়ি ও চেন, এক জোড়া পুরাতন হণ্টিং জুতা, এককেতা পাঁচ টাকার নোট, এবং নগদ ২॥৶ তাঁহার কেবল মাত্র সম্পত্তি ছিল। কিন্তু এরূপ হীন অবস্থায় ভদ্র লোকের মন যেরূপ মলিন এবং চিন্তা পীড়িত থাকে, মহেন্দ্রবাবুর তদ্রূপ ছিল না। তিনি প্রত্যহ সাবান ব্যবহার করিতেন, সযত্নে কেশ-বিন্যাস করিতেন, আহারের কোনরূপ ত্রুটি বা কষ্ট না হয়, তজ্জন্য প্রত্যহ প্রাতে নিজেই বাজার করিতেন এবং আহারান্তে গাঢ় নিদ্রায় দিবস ও রাত্রির অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার অবস্থা এবং আচরণ-সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি

বলিতেন, "ভায়া, ভেবে চিন্তে কি হ'বে বলত? আমি কম ঘুমুলে কি আমার দেনা শোধ হবে?" আর আমি কেনইবা ভাব্‌তে যাব? আমার এমন কোনও সম্পত্তি নাই, যাহা খাজনার দায়ে লাট্‌বন্দি হতে যাচ্ছে। সমন, ওয়ারেণ্ট, ডিক্রি কি নীলাম, আমি কিছুই ভয় করি না। তোমরা কেন আমার জন্য দুঃখ কর্‌ছ? যাহারা আমার মহাজন এবং পাওনাদার তাহারাই প্রকৃতপক্ষে দয়ার পাত্র।"

একদিন তাঁহার প্রধান প্রধান পাওনাদারগণ কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ জন্য এক সভা আহ্বান করিল। মহেন্দ্রবাবুও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। যখন পাওনাদারগণ তাঁহাকে "জুয়াচোর," "ঠগ", "কাপুরুষ" প্রভৃতি কুৎসিত ভাষায় গালি দিতেছিল, তখন মহেন্দ্রবাবু ধীর এবং সহাস্যমুখে তাঁহার গোঁফজোড়াটিতে তা' দিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ওয়াচ এবং চেনটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পরিষ্কার করিতেছিলেন। এই সভায় একজন পাওনাদারের পক্ষে তাহার এটর্ণি উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহেন্দ্রবাবুকে তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে মহেন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি আপনাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত; কিন্তু যাহা আমার শক্তির অতীত, তৎসম্বন্ধে আমার কিছুই বক্তব্য থাকিতে পারে না। আপনাদের যাহা অভিরুচি করিতে পারেন।" এই বলিয়া মহেন্দ্রবাবু পুনরায় আসন গ্রহণ করিবা মাত্র, "আমরা তোমাকে জেলে দিব," "আমরা তোমাকে দেউলিয়া করাইব" ইত্যাদি বলিয়া পাওনাদারগণ সভাস্থল কাঁপাইয়া তুলিল এবং অনেক তর্কবিতর্কের পরও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল।

যখন মহেন্দ্রবাবু দেখিলেন ঘরে অপর কেহই নাই, তখন তিনি একটী সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া কোচে আসিয়া উপবেশন করিলেন। সিগারেটটি নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই উপরিউক্ত এটর্ণিবাবু মহেন্দ্রবাবুর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "মহেন্দ্রবাবু, আপনার সহিত একটু বিশেষ গোপনীয় পরামর্শ আছে—আপনার এখন একটু অবকাশ হ'বে কি?"

"কেন হবে না? কি জান্‌তে চান বলুন।"

"দেখুন আমি যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি, তা'তে আমাদের উভয়েরই বিশেষ স্বার্থ আছে। বিশেষতঃ আপনার ন্যায় কৃতবিদ্য এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিকে এরূপ ঋণজালে জড়িত দেখে আমি বড়ই দুঃখিত।"

"কি করিব বলুন! এ জীবনে যে কখনও দেনা শোধ করিতে পারিব, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও সম্ভাবনা দেখি না।"

"আমি কিন্তু তদ্রূপ মনে করি না। আপনি এখনও যুবক।"

"আমার বয়স আটত্রিশ।"

"আটত্রিশ বৎসর কিছুই নয়। তদ্ভিন্ন আপনি সুশ্রী, সদ্বংশজ, মিষ্টভাষী ও বহুদর্শী। এক কথায়, স্ত্রীলোক-সমাজে আপনার মত লোকেরই পসার হয়ে থাকে। তাই বলছিলুম্ কি মহেন্দ্রবাবু, কলিকাতায় ত অনেক শ্রেণীর স্ত্রীলোকই আছেন, আপনি কেন কোন সম্পত্তিশালিনী স্ত্রীলোককে বিবাহ করুন না?"

মহেন্দ্রবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমিও যে একথা একেবারে ভাবি নাই তা নয়। কিন্তু বাজারে নেমে দেখ্‌লুম যে, তাহাদের সমকক্ষ ধনী ভিন্ন গরীবের সহিত তাহাদের একটীরও বিবাহ হচ্ছে না। অনেক খুঁজে দেখ্‌লে হয়ত কুৎসিতের ভিতর একটী আধটী জুটলেও বা জুটতে পারে। কিন্তু কুৎসিতের উপরে, বল্‌তে কি, আমার বড়ই কেমন একটা অশ্রদ্ধা!"

"সেত স্বাভাবিক কথা; তবে কিনা আমাদের ঠিক্ যেমনটী দরকার তেমনটী পেতে হলে, সামাজিক গোঁড়ামিটা ছেড়ে উদারপন্থীদের ভিতর দেখ্‌তে হয়। তাহলে দুকূলই বজায় থাকে অর্থাৎ কনেটি মনের মত হয়, আর সেই সঙ্গে অগাধ সম্পত্তিও এসে মুটোর ভিতর পড়ে। কেমন, আপনার তাতে কোন অমত নেই ত?"

"বিন্দুমাত্রও না। বল্‌তে কি সুধু আজ বলে নয়, আমি হিন্দুসমাজে আছি বটে, কিন্তু ভাবে, চিন্তায়, বিশ্বাসে এবং আচার-ব্যবহারে আমি খৃষ্টানের অধিক। তবে একটা বিষয় আপনাকে বলে রাখা উচিত, বয়সটা পঁচিশের বেশী না হয়।"

"আমি যাহার বিষয় বল্‌তে যাচ্ছিলুম্, তাহার বয়স পঁচিশের অনেক কম।"

"সত্যি নাকি? বাঃ—কিন্তু ধাত্রী নয়ত?"

"তিনি একজন বিলাত প্রত্যাগত কলিকাতার গণ্যমান্য জমিদারের একমাত্র কুমারী কন্যা এবং নগদ ছয় লক্ষ টাকার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।"

"বলেন কি!"

"কেন আপনি সনাতনবাবুকে জান্‌তেন না? তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার নামে 'সুশীলা-হাঁস্‌পাতাল' স্থাপন করেছিলেন? আজ প্রায় এক বৎসর হ'ল, তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা অমিতাকে রাখিয়া পরলোক গমন করেছেন। এখন অমিতাই তাঁহার বিপুল অর্থের একমাত্র ওয়ারিশ।"

মহেন্দ্রবাবু আনন্দ-বিস্ফারিতনেত্রে এটর্ণির কথাগুলি শুনিতেছিলেন। যেন হাঁ করিয়া গিলিতেছিলেন; পরে বলিলেন, "আপনাকে বাধা দিবার আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু—তার অভিভাবকগণ এ বিবাহে সম্মত হবেন কেন?"

"অমিতার অভিভাবক সে নিজেই। তাহার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিবার কেহ নেই। তবে এই বিষয়ের ভাবী উত্তরাধিকারী সনাতনবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন বাবু সেই বাড়ীতেই থাকেন। তিনি বড়ই স্বার্থপর এবং লোভী। যাহাতে অমিতার বিবাহদ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর না হয়, তজ্জন্য তিনি বিবাহার্থী যুবকগণকে বড়ই অপমানিত করেন। কাজেই বাধ্য হয়ে তাদের সমস্ত আশা ছেড়ে দিতে হয়।"

"তবে আমি কি প্রকারে সেই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করব?"

"এবিষয়ে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহ নাই। কারণ, কোনও অপমান বা বাধাবিঘ্ন আপনার মনকে বিচলিত করতে পারে না। একাজে হাত দিলে আপনি যে কৃতকার্য্য হবেন, তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

"সে কথা ঠিক্ বটে। কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহ হচ্চে যে এতে আপনার কি স্বার্থ আছে? কেন না সব বিষয় ভাল করে বুঝে কাজে হাত দেওয়া উচিত।"

"আমার স্বার্থ? আমার মক্কেল রামেশ্বরবাবুর নিকট আপনি ১৫০০০৲ টাকা ধারেন। টাকা আদায় হলে তিনি আমাকে ৭৫০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত আছেন। আর আপনি কৃতকার্য্য হলে, আপনার নিকট হ'তেও আমি পুরস্কার প্রত্যাশা না করি এমন নহে।"

"নিশ্চয়ই, অবশ্যই, সেত উচিত কথাই। তবে আজ থেকেই কি—শুভস্য শীঘ্রং।"

"না; আজ সুবিধা হবে না। কাল ২টার সময় আপনি আমার আফিসে যাবেন। অমিতা কাল ২টার সময় আমার আফিসে একটা এফিডেভিড্ করতে আসবে। সেইখানে আপনাকে প্রথম আলাপ করে নিতে হবে। আমি এখন চল্লুম। কিন্তু এ সব কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানতে পারে।" এই বলিয়া এটর্ণিবাবু উঠিলেন। "আপনি কি আমাকে ছেলেমানুষ মনে কচ্ছেন" এই বলিতে বলিতে মহেন্দ্রবাবু তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন।

পরদিন ঠিক্ ২টার সময় মহেন্দ্রবাবু হেষ্টিং ষ্ট্রীটস্থ এটর্ণিবাবুর আফিসে উপস্থিত হইলেন। "এটর্ণিবাবু একটি মামলার 'ব্রিফ্' নিয়া ব্যস্ত আছেন।

আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে বলেছেন" বলিয়া একজন কেরাণী মহেন্দ্র-বাবুকে 'প্রাইভেট রুমে' লইয়া গেল। মহেন্দ্রবাবু চেয়ারে বসিয়া, একখানি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ অন্যমনস্কভাবে দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই নানাবিধ এসেন্সের সুমধুর গন্ধে হঠাৎ গৃহদ্বার আমোদিত হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রবাবু চমকিত এবং বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন, উপরিউক্ত কেরাণীবাবু তাহার "ভাবী অর্দ্ধাঙ্গিনীকে" একখানি চেয়ারে বসিতে বলিয়া বহির্গত হইয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু দেখিলেন, তাঁহার ভাবী পত্নীর নিষ্কলঙ্ক মসিরাশি পাউডারের নিবিড় পর্দ্দার ভিতর দিয়াও অবাধে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। দৃষ্টিশক্তি পরিমিত, ক্ষুদ্রায়তন আঁখিদ্বয় নিরাপদে পিন্‌সনেজ চসমার এবং কোটরাভ্যন্তরে লুক্কায়িত—এসেন্সসিক্ত অলীক অলকরাশি মস্তকাবরণের চারিধারে বৈদ্যুতিক পাখার তালে তালে অপূর্ব্ব নৃত্য করিতেছে। আর গুরুভার-পীড়িত চেয়ারখানি নতমুখে মা বসুন্ধরার নিকট স্বীয় দুরদৃষ্ট জ্ঞাপন করিতেছে। মহেন্দ্রবাবু বয়সের পরিমাণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ত্রিশের কম কিছুতেই নয়। তখন নগদ ছয় লক্ষ টাকার কথা মনে হইল। তিনি লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

"আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। আমি প্রথম চিন্তে পারি নি। সনাতন-বাবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁর উপকার জীবনেও ভুল্‌তে পারব না।"

"তবে আপনি আমার পিতাকে জান্‌তেন? কিন্তু আপনাকে কখনও দেখেছি বলেত আমাব মনে হচ্ছে না।"

"সনাতনবাবুর চা'র কারবারে আমি বিশেষ ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেম। তাঁ'র আকস্মিক মৃত্যুতে আমি বড়ই দুঃখিত। ইচ্ছা ছিল, সেই সময়ে আপনাকে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে চিঠি লিখ্‌ব। কিন্তু নিতান্ত অপরিচিতের পক্ষে এরূপ চিঠি লেখা ধৃষ্টতা মনে হতে পারে, সেই ভয়ে লিখি নাই। যাহ'ক অদ্য আপনার সহিত এরূপ অকস্মাৎ পরিচয় হওয়ায়, আমি বড়ই সুখী হলেম।"

"আমিও আজ আপনার মুখে আমার স্বর্গগত পিতার নাম এবং সুখ্যাতি শুনে বড়ই আনন্দিত এবং চরিতার্থ হলেম।"

"আপনার পিতার ন্যায় মহৎ এবং উদার-হৃদয় সহস্রের ভিতরে একজনও মিলে কি না সন্দেহ। তিনি যে কত মহৎ কার্য্য করে গেছেন, কত লোকের যে উপকার করেছেন, অনেকেই জানেন না। আমি অন্য একদিন আপনাকে সে সকল বিষয় বল্‌ব।"

"সে কি ? আপনি আজ আমাদের বাড়ী যাবেন না ? আমার পিতার বিষয় শুনতে আমার বড়ই আগ্রহ হচ্ছে। আমার ওখানে আজ আপনার আহারের নিমন্ত্রণ। অনুগ্রহ করে যেতে ভুল্‌বেন না!" আজ আমি আসি, 'গুড্‌ডে' এই বলিয়া ভাবী পত্নী গাত্রোত্থান করিলেন। মহেন্দ্রবাবু তাঁহাকে দ্বার অবধি পৌঁছে দিলেন।

অতঃপর এটর্ণি বাবুর সহিত মহেন্দ্রবাবুর সাক্ষাৎ হইলে এটর্ণিবাবু বলিলেন, "সাবাস্ মহেন্দ্রবাবু! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখ্‌তে হলে অনেক ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। কেন না খগেনবাবু বড়ই হুঁসিয়ার লোক।"

"খগেনবাবু যতই কেন হুঁসিয়ার হোন না, আমাকে কিছুতেই ছয়লক্ষ টাকা হইতে বঞ্চিত কর্‌তে পার্‌বেন না," এই বলিয়া মহেন্দ্রবাবু বিদায় হইলেন।

মহেন্দ্রবাবু ঠিকই বলিয়াছিলেন। খগেনবাবুর বিরক্তি, আপত্তি, গালাগালি এবং অপমানকে অবিচলিতভাবে এবং সহাস্যবদনে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অমিতার হৃদয়রাজ্যে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে অমিতার সহিত প্রথম সাক্ষাতের তিন মাসের মধ্যে, নগদ ছয় লক্ষ টাকা সহ অমিতাকে বিবাহ করিলেন।

অমিতা মহেন্দ্রবাবুর দেনা পরিশোধ করিল বটে, কিন্তু অধিক দিন এই বিপুল অর্থ ভোগ করিতে পারিল না।

একদিন মহেন্দ্রবাবু বৃহৎ লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া চুরুট খাইতেছিলেন, এমন সময় খগেনবাবু হঠাৎ উত্তেজিত অবস্থায় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রবাবু তাহাতে বিরক্ত না হইয়া, করমর্দ্দনার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু খগেনবাবু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন "আমি একটা দলিল আপনাকে দেখাতে এনেছি। দেখুন্ এতে কি আছে।"

"আপনিই বলুন্ না, আপনি কি দেখাতে এসেছেন ?"

"ইহা হচ্ছে আমার পিতৃব্য ৺সনাতনবাবুর শেষ উইল; তাঁহার ড্রয়ারের ভিতরে কাল হঠাৎ পাওয়া গেছে। আপনি শুনতে ইচ্ছা করেন কি ?"

"শুনতে আর কি বাধা আছে; না—আপনিই পড়ুন না।"

উইলের পঁচিশ দফায় এই আছে "যদি আমার মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যে, অমিতা বিবাহ করে, তবে অমিতা বিবাহের সময় ৩০,০০০৲ টাকা নগদ পাইবে এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে জলপানি পাইবে। আর আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্রনাথ পাইবেক।"

"আপনি কিরূপে জানলেন যে ইহা জাল উইল নয় ?"

আমি আমার পিতৃব্যের এটর্ণি শ্রীযুক্ত——বাবুকে এই উইল্ দেখাইয়াছি। তিনি বলেছেন, ইহা সনাতনবাবুরই দস্তখৎ এবং এই উইল্ই তাঁর শেষ উইল। অতঃপর, "আমি আপনার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত" বলিয়াই খগেনবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

এবার মহেন্দ্রবাবু যথার্থই বিচলিত হইলেন। চুরুট তাঁহার হস্ত হইতে অলক্ষ্যে পড়িয়া গেল। নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল "হয়তঃ এই উইলের বিষয় খগেনবাবু পূর্ব্বেই জানিতেন এবং এই এটর্ণি বাবু খগেনবাবুরই 'গুপ্তচর' হইবেন।"

এদিকে যখন এই সকল চিন্তা মহেন্দ্রবাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল, তখন এটর্ণিবাবুর আফিস্ হ'তে দুখানি চেক্ ব্যাঙ্কে প্রেরিত হইল। একখানি তাহার মক্কেল-প্রদত্ত—৭৫০০ টাকার এবং অপরখানি ৫০,০০০ টাকার। শেষোক্ত চেকে দস্তখৎ ছিল——"খগেন্দ্রনাথ রায়"। *

শ্রীমনোমোহন ধর।

বিমাতা।

(১)

গঙ্গা যমুনা দুটী বোন্। এক বৃন্তে দুটী ফুলের মত তাহারা ফুটিতেছিল; এক মাতৃ-অঙ্কে দুইটী ক্ষুদ্র নির্ম্মল অনাবিল স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছিল। এইরূপে গঙ্গা একাদশ বর্ষ আর যমুনা নবম বর্ষ অতিবাহিত করিল! অকস্মাৎ নিয়তি-চক্রের আবর্ত্তন তাহাদের জীবন-পথের গতি পরিবর্ত্তিত করিল—কঠোর কাল তাহাদিগকে মাতৃহীনা করিয়া দিল! উভয়েরই তখন বেশ জ্ঞান হইয়াছিল—তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁখি-জলের বান ডাকাইল—ধরাতল অভিষিক্ত করিল! পত্নীর অকালমৃত্যুতে শৈলেশচন্দ্রের হৃদয়ে যে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সেই দারুণ আঘাত কেন্দ্রীভূত হইয়া কল্পনার সহায়তায় কাব্য-কবিতাতে স্ব-রূপ প্রকাশ করিল! বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলের নিকটই তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন না, অকপটে

---

* ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।

এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—বলিলেন, মেয়ে দু'টীকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিবেন, স্বর্গগতা সতীর স্মৃতিটুকু বুকে ধরিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিবেন। সকলে ভাবিল বুঝি হইবে বা তাহাই—নহিলে এত কাব্য-প্রস্রবণ কেন ?

(২)

পত্নী-বিয়োগের ৩।৪ মাস মধ্যে শৈলেশচন্দ্র বুঝিলেন যে তাঁহার বড় কষ্ট! রোগ-শয্যায় পরিচর্য্যা করিতে, অবসাদে শান্তি দিতে, মাতৃহীনা গঙ্গাযমুনার যত্ন করিতে দ্বিতীয় পত্নী-গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আত্মীয়-স্বজনের মুখের এই কথাগুলি যে শৈলেশচন্দ্র একদিন নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া খণ্ডন করিয়াছিলেন,এখন নিজেই তিনি সে কথার সার্থকতা বুঝিলেন। চতুর্দ্দিকে ঘটক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পাত্রী জুটিল। পত্নী-বিয়োগের পঞ্চম মাসে শৈলেশ-চন্দ্র পুনরায় পত্নীলাভ করিলেন! গঙ্গা যমুনা 'নূতন মা' পাইল।

গঙ্গা নিতান্ত বালিকা নহে—সে বুঝিল, যে স্নেহময়ী মাতা তাহারা হারাই-য়াছে, এ জীবনে তাহা আর পাইবার নহে। তাহারা 'নূতন মা'র নিকট নূতন ব্যবহার আশা করিতেছিল।

(৩)

মহামায়া শৈলেশচন্দ্রের পত্নীরূপে তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হইয়া অবধি তিলে তিলে শৈলেশচন্দ্রকে বশীভূত করিয়া লইতেছিল। গঙ্গা যমুনাকে সে এত অধিক স্নেহ যত্ন করিত, এত অধিক আদর করিত, ভালবাসিত, যে অল্পকাল মধ্যেই বালিকা দু'টী ভুলিল যে, তাহারা মাতৃহীনা। গ্রামস্থ সকলেই মহামায়াকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পত্নীর এই অত্যধিক যশোলাভে শৈলেশচন্দ্রের হৃদয় ভরিয়া উঠিল, ফলে ধীরে ধীরে তিনি মহামায়ার অঞ্চলের নিধি হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

শৈলেশচন্দ্র খুব কৃপণ। তাঁহার পিতা ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষরূপে কাজ করিয়া অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন—শৈলেশচন্দ্র সেই কষ্টোপার্জ্জিত টাকার কদরটি বেশ বুঝিয়াছিলেন—তাই তাঁহার হাত হইতে একটা পয়সা অপব্যয় হইতে কেহ কখনও দেখে নাই। অগাধ অর্থের মালিক হইলেও তিনি সামান্য গৃহস্থের মত দীনভাবে জীবনযাপন করিতেন। শোকের প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রথম পত্নী-বিয়োগে কাব্য ছাপাইয়া একবার মাত্র জীবনে তিনি অনেকগুলি টাকা অপব্যয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাই প্রথম ও শেষ।

মহামায়া একদিন কথাপ্রসঙ্গে শৈলেশচন্দ্রকে বলিল,—"দেখ্‌তে দেখ্‌তে

গঙ্গা-যমুনার বয়স বেড়ে উঠ্‌ল, এইবার দু'টী পাত্র দেখে এদের বিয়ে দেবার জোগাড় দেখ।"

শৈলেশচন্দ্র বলিলেন—দেখ, কথাটা ঠিক বলেছ—আমিও একদিন ঐ কথা ভাব্‌ছিলুম, কিন্তু যে দিন কাল পড়েছে তা'তে মেয়ে দু'টীকে ভাল ক'রে পাত্রস্থ করতে হ'লে অন্তত: ৩।৪ হাজার টাকা ব্যয় হবে।

মহামায়া—তা হ'বে ব'লে কি আর তুমি এদের বিয়ে দেবে না ?

শৈলেশচন্দ্র—বিয়ে ত দিতেই হবে, কিন্তু ভাব্‌ছি টাকা জোগাড় করি কি ক'রে।

মহামায়া—শুনেছি তোমার ত অনেক টাকা আছে!

শৈলেশচন্দ্র—রাম, রাম, নারায়ণ! আমার আবার টাকা আছে! তা হ'লে কি তুমি জান্‌তে না! কোনও রকমে কষ্টে দিনযাপন হচ্ছে মাত্র। দেখ, আমি মনে মনে একটা কথা ভাবছিলুম। আচ্ছা, আমাদের গ্রামেই গঙ্গার বিয়ে দিলে হয় না ?

মহা—হয় না আবার! খুব ভালই ত হয়। গঙ্গা কাছে থাক্‌বে, যখন ইচ্ছে দেখ্‌তে পার্‌বে। এর চেয়ে সুবিধা কি আর হয়? কিন্তু ভাল পাত্র আছে কি ?

শৈলেশচন্দ্র—আছে বৈকি! ঐ চাটুর্য্যেদের রমানাথ।

মহা—ও মা সর্ব্বনাশ! ঐ তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, বুড়ো মিন্সে—ওর সঙ্গে সোণার কলি গঙ্গার বিয়ে! ছিঃ ছিঃ, তুমি এ কথা মুখে আনলে কি করে ?

শৈলেশচন্দ্র—না, না এই কথার কথাটা বল্‌ছিলুম—তা হ'লে অনেক কম খরচায় হ'ত! আর—বুড়ো হওয়ার কথা বল্‌ছ? তা'তে কি আসে যায়! অজস্র টাকা তার—কখনও খাবার পর্‌বার কষ্ট পাবে না! আর এক কথা, এই দেখনা তোমাকে কি আর আমি দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করিনি! তোমার বাপ মা কি আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেন নি ?

মহা—ওগো ও যে আমার ঠাকুরদার বয়িসি। ওর চেয়ে মেয়েটার হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দাও না কেন ?

(৪)

শৈলেশচন্দ্র বরাবর একগুঁয়ে। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না। রমানাথের সহিত গঙ্গার পরিণয়-প্রস্তাব প্রত্যহ প্রোক্তরূপ

প্রবল বাধা পাওয়ায় শৈলেশচন্দ্রের জেদ শত গুণে বাড়িয়া উঠিল। কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া রমানাথের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব পাঠাইলেন। বিয়ে-পাগ্‌লা রমানাথের আনন্দ আর ধরে না। সে তদ্দণ্ডেই স্বীয় সম্পূর্ণ অভিমত জ্ঞাপন করিল এবং বলিল—"ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সে এক কপর্দ্দকও লইবে না।" শৈলেশচন্দ্রের হৃদয়টা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, বলিলেন—সাধু রমানাথ, সাধু!

গ্রামের সকল অধিবাসীই শৈলেশচন্দ্রের এই বিবাহ-উদ্যোগে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইল—অমন লক্ষ্মীর মত সুন্দরী মেয়েটি কোথায় রাজার ঘরে পড়িবে—রাজপুত্রের সহিত বিবাহ হইবে, তার পরিবর্ত্তে একি!

লোকমুখে এই কথা শুনিয়া শৈলেশচন্দ্র বলিলেন—"ব্যাটারা ঐ রকম লম্বা লম্বা বচন ঝাড়্‌তে পারে। দিক্‌ না একটা পাত্র জুটিয়ে, দেখি যোগ্যতাটা। কথায় বলে, মার চেয়ে দরদ বেশী তাকে বলে ডা'ন।"

দুর্ম্মুখ শৈলেশচন্দ্রকে কেহ আর প্রকাশ্যে কোনও কথা বলিল না। সকলে বুঝিল, এটা মহামায়ার চক্রান্ত। সে লোক-দেখানো মেয়ে দুটোকে ভালবাসে; কিসে পয়সা খরচ কম হয়—আর মেয়ে দুটোও নজর-ছাড়া হয়, ভেতরে ভেতরে তার এই চেষ্টা!

লোকের এই অযাচিত টিপ্পনীতে মহামায়া কখনও নীরব থাকিত, কখনও বা উপেক্ষার হাসি হাসিত।

(৫)

বিবাহের চেষ্টা সজোরে চলিতে লাগিল। ফাল্গুন মাসে রমানাথের সহিত গঙ্গার বিবাহ ধার্য্য হইল! চতুর্দ্দিক হইতে লোকে ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল। গঙ্গার মাতুলালয়ের কেহই আসিলেন না। গঙ্গার পরিণাম ভাবিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন মাত্র। আর গঙ্গা?

তাহার বিকচ কমল সদৃশ মুখখানি বিষাদভরে অবনত। এই বিবাহ সম্বন্ধই কৈশোর অবস্থায় তাহাকে বার্দ্ধক্যের চিন্তাক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সে একেলা থাকিলেই কি ভাবে, যমুনা থাকিলে তাহার গলা জড়াইয়া কাঁদে!

বুদ্ধিমতী মহামায়া গঙ্গার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কিন্তু গঙ্গা তাহার নিকট থাকিতে চাহে না, দূরে পলাইতে চায়। আগে 'নূতন মা'কে সে ভ্রমবশতঃ কতই না ভাল বাসিয়াছে—আর সেই 'নূতন মা' তাহার পিতাকে কুপরামর্শ দিয়া আজ কি না তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইতেছে! বিমাতা

যে এইরূপই হয়! আর মহামায়া? সে কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না, এক মনে সহাস্য বদনে বিবাহের উদ্যোগে ব্যস্ত! লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত,—"বরাত যেখানে বিবাহ ত সেইখানেই হ'বে। মানুষের হাত কি? খোদার উপর খোদকারি কি চলে মা!"

(৬)

আজ বিবাহ। বৃদ্ধ রমানাথ তুষার-শুভ্র কেশরাশী কলপ দিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। সযত্নে সোণা বাঁধান দন্তগুলি দন্তপাটীতে সংযুক্ত করিয়াছেন। গুম্ফগুলি ছোট ছোট করিয়া ছাঁটিয়া নব্য ছোক্‌রা সাজিয়া বসিয়াছেন—অতঃপর তাহাকে দেখিলে কেহ বলিবে না সে পঞ্চান্ন বৎসরের রমানাথ! ঠিক সন্ধ্যার সময় পুরোহিত ব্রাহ্মণ, নাপিত ও তিনজন বরযাত্রী লইয়া 'নব নটবর' রমানাথ পাল্কী চড়িয়া যাত্রা করিলেন। গ্রাম্য-পথের কতকগুলি দুষ্ট ছোকরা তাহার পাল্কীর উপর ইষ্টক নিক্ষেপ করিল। প্রত্যেক বাটীর পুরাঙ্গনাগণ শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে গ্রামখানি সজাগ করিয়া তুলিতে লাগিল। রমানাথ প্রমাদ গণিল! এত লোকের ত বিবাহ হয়—কই এমন গ্রামশুদ্ধ লোক ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে না, কেহই ত বর-যানে ইষ্টক নিক্ষেপ করে না। প্রত্যেক বাটী হইতেই ত হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত করে না—এগুলির অর্থ কি বিদ্রূপ নহে? এই ভুটের শ্বশুর বাড়ী। চিনে রাখলুম, এই বাড়ীর ভেতর থেকে শাঁক বাজ্‌লো, ছাত হ'তে ইট্ পড়লো—বিয়ে হয়ে যাক্, কাল থেকে সব বুঝ্‌তে আরম্ভ কর্‌বো। এই মাণিক নেউগীর বাড়ী চিনে রাখ্‌লুম—এই দেশো গাইয়ের বাড়ী, এই দেবীদা'র বাড়ী, এই অমূল্য সেনের বাড়ী, এই চন্দড় শালার বাড়ী, এই পেসাদে মুখ্‌পোড়ার বাড়ী, এই সরোজ বৌদি'র বাপের বাড়ী, এই উপ্‌নে ডুগীর বাড়ী, এই তিলুর বাড়ী—এই—এই—এই—সব কাল হবে! বুঝে নেব! বুঝে নেব!

বর পৌছিল! হুলুধ্বনি—আবার সেই ধ্বনি! এরাও ঠাট্টা আরম্ভ কর্‌লে নাকি? না—না, এটা যে দস্তুর! বরকে সভায় উপস্থিত করা হইল এবং লাল মখমল-মণ্ডিত, দীপমালা-শোভিত, ফুলমালা-আবৃত বরাসনে বসান হইল।

আবার উলুধ্বনি—আবার শঙ্খধ্বনি—রমানাথের কর্ণ বধির! তাহার চিন্তা—এগুলি বিদ্রূপ নহে ত!

(৭)

সমবেত ব্রাহ্মণ ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দের নিকট বরকে পাত্রস্থ করিবার জন্য শৈলেশচন্দ্র করযোড়ে অনুমতি ভিক্ষা করিলেন! সকলেই শুভস্য শীঘ্রং এই মত জ্ঞাপন করিলেন।

এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, বহির্ব্বাটীতেই রমানাথকে কন্যাসম্প্রদান করা হইতেছিল। গ্রাম্য-মহিলাবৃন্দ বিবাহ দেখিতে আসিবেন বলিয়া অন্দরের প্রাঙ্গণগুলি তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, তোতাপাখীর মত শৈলেশচন্দ্র ও রমানাথ আবৃত্তি করিতেছেন—রমানাথ শুনিল,অন্দরের মধ্য হইতেও কে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে! এইবার তাহার আপাদমস্তকে ক্রোধ ও ঘৃণা বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত ছুটিতে লাগিল। রমানাথ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"আমি বিয়ে কর্‌বো না, উঠ্‌লুম্।"

শৈলেশচন্দ্র গলবস্ত্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কর কি, কর কি! কি হয়েছে, ব্যাপার কি!"

ক্রোধান্ধ রমানাথ ভাবী শ্বশুরকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"হবে আর কি? রাস্তায় ঠাট্টা, ইট, উলু—এখানেও তাই। আমি চল্‌লুম।"

শৈলেশচন্দ্র—"ছিঃ ছিঃ ও কথা কি বল্‌তে আছে বাবাজি! এখানে তোমায় ঠাট্টা করবার লোক কে আছে বল দেখি! আমার বাড়ীতে কোনও আত্মীয়ই নিমন্ত্রণ-রক্ষা করতে আসেন নাই—তুমি সুপণ্ডিত সৎপাত্র বলে তোমাকেই কন্যাসম্প্রদান কর্‌তে চাই।" এইরূপ নানা কথায়, সান্ত্বনায় তাহার ক্রোধ প্রশমিত করিয়া কন্যাকে উপস্থিত করিলেন।

অবগুণ্ঠিতা কন্যাকে সাতপাক ঘুরাইয়া বরের সহিত শুভদৃষ্টি করিবার সময় —'ভূত, প্রেত, রাম' বলিয়া 'নব নটবর' রমানাথ মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইল। কন্যা ছুটিয়া অন্দরে পলাইল!

(৮)

পুরোহিত, নাপিত, শৈলেশচন্দ্র প্রভৃতি সকলে বরের চৈতন্য-সম্পাদনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিয়া "বাবারে ভূত" এই বলিয়া পুনরায় সে অচেতন হইল। পুরোহিত বেগতিক দেখিয়া পৈতা ধারণ পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে ওঙ্কার ধ্বনি ও গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। এইবার বরের পূর্ণ চৈতন্য লাভ হইল।

শৈলেশচন্দ্র তখন রমানাথের নিকট গিয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। রমানাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কি বাবা নিজের মেয়ের সঙ্গে বলে একটা ভূতের সঙ্গে আমার বিবাহ দেওয়া হচ্ছেল ?" সাশ্চর্য্যে শৈলেশচন্দ্র বলিলেন—"কি রকম, ব্যাপার কি ?"

ক্রুদ্ধ রমানাথ বলিল—"জানেন না, ন্যাকা—আমি যেন ওঁর মেয়েকে দেখিনি! জলজ্যান্ত ভূতকে পাকড়াও কর্‌লে কোথা থেকে বাবা!"

লজ্জায় অপমানে ক্রোধে শৈলেশচন্দ্র ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিলেন। কি মূর্খের আর পাগলের সহিত তিনি নিজ কন্যার বিবাহ দিতেছেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল! কেন তিনি দু'খানা কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইয়া একটী সৎপাত্রে কন্যার বিবাহ দিলেন না—কেন পিতা হইয়া পিশাচের অধিক ব্যবহার করিলেন! টাকা? টাকা কিসের জন্য? অনুতাপের শত বৃশ্চিক দংশন তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। কোনও কথা না বলিয়া অতি বিষণ্ণ মনে অন্দরে প্রবেশ করিলেন!

পুরোহিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল—"দেখ, এও কি একটা কথা! নিশ্চয় তোমার কোনও মৃত ব্যক্তির কথা মনে হয়েছিল, না হয় কোনও দুষ্ট আত্মা হিংসাবশে এসে কন্যার উপর আবিষ্ট হয়েছিল—নইলে এও কি একটা কথা, এতে কি আর শৈলেশবাবুর মত মহাশয় লোককে দোষ দেওয়া যায়?"

রমানাথ—"নিশ্চয়ই এরা কোনও অপঘাতে মরা আত্মাকে নামিয়েছে!"

পুরোহিত—"তাতে এঁদের লাভ?"

রমানাথ—মজা দেখা!

(৯)

শৈলেশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বাহিরে এসে রমানাথের হাত ধরে বলিলেন—"ভায়া এস"।

রমানাথ এরূপ ভ্রাতৃসম্বোধনে বিরক্ত হইয়া বলিল, "কোথায় যাব?"

শৈলেশচন্দ্র পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'এস না দাদা একবার বাড়ীর ভেতরই এস না।'

নাপিত, পুরোহিত, বরযাত্রীরা অবাক হইয়া রহিল। সকলেই—ভিতরে কি একটা রহস্য আছে মনে করিয়া কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল! একখানি কক্ষে সকলকে বসাইয়া শৈলেশচন্দ্র রমানাথের হস্তে বাঁধান ছঁকাটী দিল। রমানাথ ভাবিল, শ্বশুর হইয়া এ কি!

এমন সময়ে দুইটী সুন্দর যুবক আসিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে এবং রমানাথকে প্রণাম করিল। ইহাদের একজন অন্যের কর্ণে অস্ফুটস্বরে বলিল—"সুশীল তোমার ওসমান্।"

সুশীল বলিল —"চুপ"।

শৈলেশচন্দ্র বলিলেন—"আপনারা—আপন্—তোমরা ?"

কক্ষের বাহির হইতে পরিচারিকা বলিল—"গিন্নি মা বলিতেছেন, তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। এই দু'জন আমাদের জামাই।"

শৈলেশচন্দ্র সাশ্চর্য্যে বলিলেন—"এ্যাঁ, আমাদের জামাই !"

ঝি বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার জামাই, দুইজনের বড়টী সুশীলের সহিত গঙ্গার, আর ছোটটী মহিমের সহিত যমুনার আজ বিয়ে হয়েছে।"

শৈলেশচন্দ্র—বটে ! বটে !

"আপনি গিন্নিমা'র কথা না শুনে রমানাথবাবুর সঙ্গে গঙ্গার বিয়ে দিতেছিলেন তাই তিনি নিজের গহনাগুলি যৌতুক দিয়া এই দুইটি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ-তনয়ের সঙ্গে আজ শুভলগ্নে পাশের দেবীবাবুর বাড়ীতে বিবাহ দিয়েছেন। সুশীল শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারি পড়ে, মহিম আইন পড়ে। বরকর্ত্তারা ও বাড়ীতে আছেন। মামা কন্যাসম্প্রদান করেছেন।"

শৈলেশচন্দ্রের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল—নূতন জামাতাদ্বয়কে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—আনন্দে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

ঝি পুনরায় আরম্ভ করিল—"আর যার সঙ্গে রমানাথবাবুর বিয়ে হচ্ছিল তিনি ওঁরই স্ত্রী। বানে ভেসে গিয়ে আমাদের গঙ্গা যমুনার মামার বাড়ীতে আশ্রয় পান, গিন্নি মা সে সংবাদ জানতে পারেন এবং তাঁহারই অনুরোধে আজিকার এই বিবাহ-অভিনয়ে তিনি যোগদান করেন !"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ও গৃহদ্বার উল্লম্ফন করিয়া রমানাথ বলিল—"বটে, বটে, আমার মোক্ষদাসুন্দরী আজও বেঁচে আছে ?"

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

গল্প-গুচ্ছ।

দুধ-কলা।

পেন্সনভোগী রমণীবাবু দেশের ও দশের উপকার সাধনে বদ্ধপরিকর। একদিন ঠিক দুপুরবেলা আপনার বাগানের বারান্দার উপর আরাম-চৌকীতে বসিয়া রমণীবাবু দেখিলেন, তিনটী বালক লোভলোলুপ দৃষ্টিতে তাঁহার কদলী বৃক্ষের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বালকেরা স্কুল পলাইয়া যে ফল চুরি করিবার জন্য ঘুরিতেছে একথা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। অভাবে ইহাদের স্বভাব নষ্ট হইতেছে ভাবিয়া রমণীবাবু তাহাদের সসম্ভ্রমে বাগানে ডাকাইয়া সুপক্ক রম্ভা দুগ্ধ-সংযোগে খাওয়াইয়া পরিতুষ্ট করিলেন। তাঁহার মনে অনুমাত্র সন্দেহ রহিল না যে বালকেরা তাঁহার ব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়াছে এবং যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছে; অতঃপর ভবিষ্যতে তাহারা পরের বাগান হইতে ফলাদি অপহরণ করিবে না। তাই তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—দেখ দেখি বাপ সকল। যদি আমার হাত থেকে না খেয়ে তোমরা আমার বাগান থেকে কলা চুরি ক'রে খেতে তা'হলে কি তোমাদের মনে এমন সুখ হ'ত?

বালকত্রয় সমস্বরে বলিল—'না মশায়'।

বিজয়ী বীরের ন্যায় রমণীবাবু বলিলেন—"কেন বল দেখি?"

তখন প্রথম বালক বলিল—'আজ্ঞে তা হ'লে তো আর দুধ পেতাম না'।

রমণীবাবু বিস্মিত হইলেন।

পূজার পোষাক।

শ্যামবাবু পূজার জন্য পোষাক খরিদ করিতে গিয়া দরজীকে পোষাকের মাপ দিয়া বলিলেন—দেখ বাবু এখন তোমাকে সত্য বলি। এ পোষাকের দাম কিন্তু ১লা পৌষের পূর্ব্বে দিতে পারব না। এতে তোমার কিছু আপত্তি নাই ত?

'আজ্ঞে কিছু না। তাই দেবেন।'

শ্যামবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—তুমি বেশ লোক। আচ্ছা, এ পোষাক তৈয়ারি হ'বে কবে?

মাথা চুলকাইয়া দরজী বলিল—আজ্ঞে ২রা পৌষ।

পূজার বাজার।

সতীশবাবু কাপড়ের দোকানে পূজার বাজার করিতে গিয়াছিলেন। দোকানদার তাঁহার আদেশমত তাঁহাকে নানা রকমের কাপড় দেখাইলেন। সতীশবাবু বলিলেন—আমাকে যা' দেখাবা'র সবই দেখান হ'ল?

দোকানদার বলিল—আজ্ঞে না। একটা জিনিস বাকি।

সতীশবাবু বলিলেন—তবে শীঘ্র কর। আমাকে এখনি যেতে হ'বে।

দোকানদার খাতা বাহির করিয়া সতীশবাবুর নিকট হইতে তাহার পাওনার হিসাবটা দেখাইল। সতীশবাবু দ্রুত দোকান ত্যাগ করিলেন।

নিরেট বোকা।

সদাগরী আফিসের বড়বাবু এপ্রেন্টিস ছোকরার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। চসমা নামাইয়া বড়বাবু বলিলেন—বাপু এ আফিসের বড়বাবু কে? তুমি না আমি?

"আজ্ঞে আপনি।"

"তুমি যদি বড়বাবু নও তো অমন নিরেট বোকার মত কথা কহিছ কেন?"

বালক বালিকা অৰ্দ্ধমূল্য।

নদেরচাঁদ পাকড়াশীর ধারণা ছিল যে সভ্য জগতে দান বিক্রয় প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া দুই একটা অৰ্দ্ধমূল্যে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে সন্তুষ্টচিত্তে পূজার বাজারে অনেক সস্তা দ্রব্য ক্রয় করিল। শেষে একটা বায়স্কোপের তাম্বুর বাহিরে নদেরচাঁদ পড়িল—"বালক বালিকা অৰ্দ্ধমূল্য।" তখন নদেরচাঁদ মনে মনে বলিল—'হঃ রে সহর কলকাতা! এ ঠাঁই সবই বিক্রী হয়। ছাওয়াল গুলারেও লোকে বেইচে খায়। হঃ রে সহর কলকাতা!"

প্রতিহিংসা।

বিলাতের গ্রাম্যপথে জোন্স ও তাহার পত্নী সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছিল। এমন সময় প্যাঁক প্যাঁক করিয়া মোটর গাড়ির ভেঁপু বাজিল। জোন্স কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে মোটর গাড়ি তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। মোটর চালক ভদ্রবংশীয় যুবক। সে তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া মুমূর্ষু জোন্সের নিকট গিয়া বলিল—আমায় ক্ষমা কর। আমি কি কোন রকমে তোমার ক্ষতি পূরণ করিতে পারি?

জোন্স বলিল—তা পার। তোমার বিবাহ হয়েছে?

যুবক বলিল—না।

"কাহারও সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে?"

"না"।

"দেখ, তোমার জন্যেই আমার স্ত্রী বিধবা হল। প্রতিশ্রুত হও যে তুমি তা'কে বিবাহ করবে?"

উন্নত হৃদয় যুবক বলিল—বেশ তাই হ'বে, আমি যতদিন বাঁচব তাকে যত্ন করব।

এবার সন্তুষ্টচিত্তে জোন্স চক্ষু মুদিল। তাহার বড় আনন্দ হইল। সে মনে মনে বলিল—আমার এই দুর্দ্দান্ত মুখরা স্ত্রীকে সে বিবাহ করিবে! হা! হা! হা! ভীষণ প্রতিহিংসা!

পলাতক।

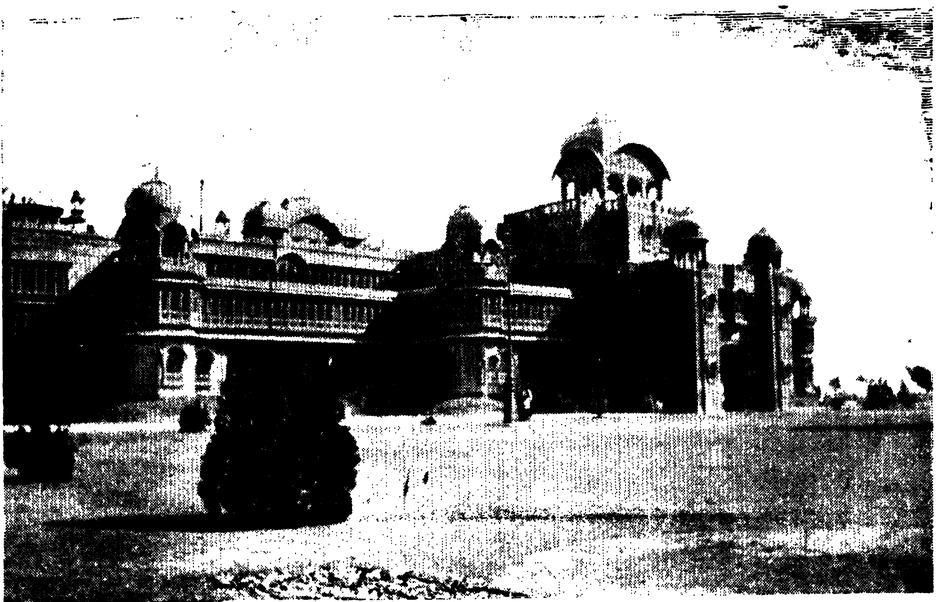
সিধু স্কুল পলাইয়াছিল। তাহার পরদিন বেত্রহস্তে শিক্ষক যখন তাহার নিকট আসিলেন তখন সে কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে একখানি পত্র দিল। পত্রে তাহার পিতা লিখিয়াছিলেন।

"মান্যবরেষু

সিধু কাল বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিল না, তজ্জন্য তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

সে কাল স্কুল পলাইয়াছিল। যে ছাত্রটির সহিত সে পলাইয়াছিল তাহার সহিত বিবাদ হওয়ায় সে সিধুকে খুব মারিয়াছে। তাহারা একজন কাবুলিওয়ালাকে 'বেইমান' বলিয়াছিল বলিয়া সেও উহাদিগকে খুব পিটিয়াছে। একটা ঠিকা গাড়ির পিছনে চড়িয়াও সে এক ঘা চাবুক খাইয়াছে। তাহারা একটা স্ত্রীলোকের বিড়ালকে বেত মারিয়াছিল বলিয়া মাঠকোটার উপর হইতে স্ত্রীলোকটা তাহাদের মাথার উপর ভাতের হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার পর বাটীতে আসিলে তাহার জননী তাহাকে মারিয়াছেন, আমিও ঘা কতক পিটিয়াছি এবং সে তাহার মাতার মুখের উপর চোপা করিয়াছিল বলিয়া আমার বড় ছেলে তাহাকে প্রহার করিয়াছে। আশা করি সিধু ভবিষ্যতে আর পলাতক হইবে না।"

পূজার সংখ্যা বলিয়া এবার "অর্চ্চনা"র কেবল গল্প দেওয়া হইল।—সম্পাদক।



লালগড় প্রাসাদ, বিকানীর।

Photo-Engraved & Printed by F. A. P. Syndicate, 117 Baranasi Ghose Street, Calcutta.

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(খিদিরপুর ও আলিপুর)

বর্ত্তমান খিদিরপুর ও তাহার আশে পাশের অনেক স্থানের সহিত, পুরাণো ইতিহাসের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে। সে পুরাতন কথাগুলি 'অর্চ্চনা'র পাঠকদের শুনিয়া রাখা উচিত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আমলের অনেক ঘটনার সহিত খিদিরপুর ও আলিপুরের নাম বিজড়িত।

আজকাল যে কাটা গঙ্গা খিদিরপুরের পার্শ্ববাহিনী হইয়া ভবানীপুর ছাড়াইয়া কালীঘাটে গিয়াছে, তাহার সবটা কাটা গঙ্গা নহে। কালীঘাটের নিকটস্থ গঙ্গাটী আদি গঙ্গা নামেই পরিচিত।

জিরাটের পুলের নীচে হইতে ভাগীরথী পর্য্যন্ত সমস্ত নালাটী নূতন করিয়া কাটা হয়। ইহাই "টলিস্ নালা" নামে পরিচিত। আগে ইহা Gobindpur Creek বলিয়া বিখ্যাত ছিল। খিদিরপুরের পুলের কাছে, সর্ম্মানের বাড়ী। এই সর্ম্মান, সম্রাট ফরকসিয়ারের দরবারে ইংরাজ পক্ষের দূতরূপে যান। এই নদীর উপর আগে যে পুলটী ছিল তাহা Surman's Bridge নামে খ্যাত। গোবিন্দপুর ক্রীক ভাগীরথীর অংশ হইলেও মজিয়া গিয়াছিল। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন টলি, তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস সাহেবের ও তাঁহার কৌন্সিলের অনুমতি লইয়া, সুন্দরবন পর্য্যন্ত একটী খাল খনন করান। এই ব্যাপারে কাপ্তেন সাহেবের প্রচুর অর্থব্যয় হয়। কিন্তু খিদিরপুর হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত অন্তর্বাণিজ্যের পথটাও খুলিয়া যায়। খাল-খননের জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহা তুলিবার জন্য টলি সাহেব তাঁহার নিজের নামে গঙ্গার ধারে একটী বাজার স্থাপন করেন। এই বাজার এখনও টলি সাহেবের কীর্ত্তি রক্ষা করিতেছে। ইহাই "টালিগঞ্জের বাজার" বলিয়া এখনও জনসাধারণে পরিচিত।

কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাসের ঘুণ, মার্শমান সাহেব বলেন,—আজকাল যে গঙ্গা মেটেবুরুজের সন্নিকটস্থ বিশপস্ কালেজের পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহাই সেকালে টালিনালা পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। পরে খুব সংকীর্ণ হইয়া

পড়ায়, টলি সাহেব ইহা নূতন ভাবে কাটাইয়া দেন। যাহাই হউক না কেন, টলিস্ নালার একাংশ যে কাটা গঙ্গা, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

কাপ্তেন টলি সাহেব এই খালটী কাটাইবার পর দেনদার হইয়া পড়েন। সে দেনা শোধের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া,তিনি নিজের নামে একটী গঞ্জ বা বাজার প্রতিষ্ঠা করেন, একথা আগে বলিয়াছি। এই নবস্থাপিত বাজারের তোলা হইতে অনেক টাকা আদায় হইতে লাগিল। ধরিতে গেলে ইহা একটী ক্ষুদ্র বাজার ছিল না। "গঞ্জ" বলিয়াই ইহা আজও সাধারণে পরিচিত। এখানে ধান চাল, ও অন্যান্য শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমদানী রপ্তানীর জন্য জমা হইত—এজন্য টোলের ও তোলার আয়ও বেশী হইত। ইহা ছাড়া, যে সকল নৌকা, সালতি, বা মালের কিস্তি, তাঁহার "নূতন-কাটানো" গঙ্গার উপর দিয়া আসিত, তাহা হইতে প্রচুর "টোল" আদায় হইত। টালিগঞ্জে একটী মস্ত "টোলঘাটা" বা "কুতঘাটা" ছিল। কেহ কেহ বলেন—"টোলগঞ্জ" হইতে "টালিগঞ্জের" নামের উদ্ভব। কিন্তু সোজা পথ থাকিতে, আমরা বাঁকাপথে গিয়া প্রত্নতত্ত্বের কচ্‌কচি করিতে চাহি না। "টোলের" সহিত এ গঞ্জের নামকরণের কোন সম্পর্কই নাই। কাপ্তেন টলির নামেই ইহার নামকরণ হইয়াছে। ধরিতে গেলে, টলি সাহেবের খনিত এই খালের জন্যই, আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে নদীপথে অনেক মালামাল আমদানী রপ্তানী হয়। আকড়া বারুদখানা হইতে ইট স্থরকী, মগরা হইতে বালী,বৈগুবাটী হইতে আনাজ তরীতরকারী ও আলু প্রভৃতি খিদিরপুরের গঞ্জে আসে। বর্ত্তমান কালের "মাজুকোলি" বা "অর্ফানগঞ্জ" বাজারটী যাঁহারা দেখিয়াছেন—তাঁহারাই বুঝিবেন, খিদিরপুরের বাজারটী কত বড়। এই খালের দৌলতে ভবানীপুর, কালীঘাট, চেতলা, টালিগঞ্জ আজও জম্‌জমাট। ধরিতে গেলে টলি সাহেব একালের ভগীরথ বিশেষ ছিলেন। তাঁহার কাটিগঙ্গা আজও "টলিস্ নালা" নাম প্রচার করিতেছে।

টালি সাহেব আলিপুরে বাস করিতেন। বর্ত্তমান বেলভেডিয়ার প্রাসাদের পুরাতন কথা আমরা ভবিষ্যতে বলিব। কিন্তু যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে ইহা "প্রাসাদ" ছিল না। কয়েকটী দ্বিতল বাটী ইহার আশে পাশে ছিল। এই বাটীগুলির একটী বাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত কর্ণেল টলি বাস করিতেন। বাড়ীটি বর্ত্তমান বেলভেডিয়ার প্রাসাদের খুব সান্নিধ্যেই ছিল। কারণ, আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের পুরাতন সেরেস্তা হইতে

জানিতে পারি—"হেষ্টিংসের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহত হইবার পর, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস, এই কর্ণেল টলির বাটীতেই সর্ব্বপ্রথমে রক্তাপ্লুত অবস্থায় আনীত হন। এই বাটীতেই তিনি (First Aid) বা আহত-স্থানের "প্রাথমিক চিকিৎসা"র অধীন হইয়াছিলেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিস সাহেবের মধ্যে কিজন্য দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ঘটে, তাহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিতে গেলে 'অর্চ্চনা'র ক্ষুদ্র কলেবরে কুলাইবে না। তবে যাঁহারা এ সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই দীন লেখক-প্রণীত "ধ্বংসতরু" বা "Tree of Destruction" নামক প্রবন্ধটী পড়িয়া দেখুন। এই প্রবন্ধটী কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে—পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত সেকালের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমে এই প্রবন্ধটী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রচার" পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়। বঙ্কিম-চন্দ্রের জামাতা আমার প্রিয়সুহৃৎ ও সোদরপ্রতিম স্বর্গীয় রাখালবাবু, প্রবন্ধটী কম্পোজ পর্য্যন্ত করাইয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই বৎসর প্রচারের "ধ্বংস" হওয়ায়, "ধ্বংসতরু" তাহাতে প্রকাশিত হয় নাই। 'ভারতী'তেই হইয়াছিল। এত কথা বলিবার কারণ এই, প্রবন্ধটী অতি দীর্ঘ ও এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের নানাবিধ জ্ঞাতব্য ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময়ে প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ সিবিলিয়ান্ মিঃ হেনরী বেভারিজ সাহেবও তাঁহার বিখ্যাত "নন্দকুমার" প্রবন্ধের সূত্র-রচনা করিতেছিলেন। বেভারিজ সাহেব তখন আলিপুরের "দিলখুসী" নামক কুঠীতে থাকিতেন। তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। একদিন প্রভাতে আমরা উভয়ে "হেষ্টিংস হাউস" ও "ট্রি অব্ ডিস্ট্রাকসান" দেখিতে যাই। বেভারিজ সাহেব অতীত ঘটনার সহিত মিলাইয়া,স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, আলিপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের দেবদারু কটকটীকেই হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। এই ঘটনার ত্রিশ বৎসর পরে, লর্ড কর্জ্জন এই স্থানটীকে "Duel Avenue" বলিয়া সনাক্ত করিয়া, সেখানে একখানি সাইন্ বোর্ড মারিয়া দিয়াছেন। প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে যথেষ্ট চেষ্টা চরিত্র করিতে হইয়াছিল বলিয়াই, আমরা অতীতের স্মৃতি উল্টাইয়া দুই চারিটা কথা বলিলাম। পাঠক যেন মনে না ভাবেন, বঙ্কিমবাবু বা বেভারিজ সাহেবের নাম করিয়া একটু বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিতেছি। হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের মূলকারণ, কান্তবাবু আর মহারাজ নন্দকুমার। নন্দকুমার সেই সময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত কৌন্সিলের সদস্য-

গণের নিকট, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণের অভিযোগ আনেন। ফ্রান্সিস্ ও ক্লেভারিং হেষ্টিংসের বিপক্ষে। বারওয়েল ও মনসন, হেষ্টিংসের স্বপক্ষে। এই ব্যাপার লইয়া সে কালের লাট-কৌন্সিলে একটা ভয়ানক হুল-স্থূল উপস্থিত হয়।

সভা মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া বাক্‌বিতণ্ডার সময়, একদিন ফ্রান্সিস্ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কতকগুলি অপমানকর ও গ্লানিসূচক মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহা হইতেই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। হেষ্টিংস আত্মসম্মান-রক্ষার্থ ফ্রান্সিসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। সেকালে এইরূপ "ডুয়েল" দ্বারা সম্মান রক্ষা করা হইত। এই যুদ্ধে ফ্রান্সিস সাহেব আহত হন। তিনি আহত হইবার পরই, কাপ্তেন টলির বাড়ীতে আনীত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

হেষ্টিংস যুগের অনেক কথা, নন্দকুমারের সম্বন্ধে অনেক কথার অতি বিশদ-ভাবে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা এই সংক্ষিপ্ত স্থানে নিতান্ত অসম্ভব।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও নন্দকুমার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা, মহাত্মা বেভারিজই করিয়াছিলেন। তিনিই ইহার প্রথম সূত্রপাত করেন। বাঙ্গালার ইতিহাসের কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় পরিচ্ছেদ বেভারিজের অক্লান্ত পরিশ্রম-প্রসূত। বেভারিজের সময় হইতেই, নন্দকুমার ও মুরশীদাবাদী যুগের ইতিহাসের আলোচনা আরম্ভ হয়। সে আজ বিশ পঁচিশ বৎসরের কথা। সে কথাগুলি বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগের অনেকে হয়তঃ তাহা জানেন না। আর আমিও সেগুলি বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

আমার যতদূর মনে আছে, নন্দকুমার-সম্বন্ধে ইং ১৮৭৫ সালের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বা ইংরাজীতে আর কেহ কিছুই বিশদভাবে স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে আলোচনা করেন নাই।। মৎগুরুদেব মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, সঞ্জীববাবু সম্পাদিত সেকালের বঙ্গদর্শনে "নন্দকুমার"-সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখেন। আমার যতদূর মনে আছে, তাহাতে এই প্রবন্ধটাই বঙ্গসাহিত্যে নন্দকুমার-সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ। ইহার পর সিবিলিয়ান ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ বেভারিজ সাহেব "কলিকাতা-রিভিউ" নামক এক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রে ইং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে "Warren Hastings in Lower Bengal" বলিয়া একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে হেষ্টিংস ও স্যর ইলাইজা ইম্পির বিরুদ্ধে ও মহারাজ নন্দকুমারের স্বপক্ষে কতকগুলি মন্তব্য ছিল।

স্যর জেমস্, ফিট্‌জেমস্ ষ্টিফেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের Law Member ছিলেন। যখন বেভারিজের এ প্রবন্ধ রচিত হয় তখন তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে অবসর লইয়া বিলাতে উচ্চরাজপদে নিযুক্ত। তিনি মিঃ বেভারিজের এই প্রবন্ধ পড়িয়া ইম্পির পক্ষে ব্রিফ্ গ্রহণ করেন। অতীতকালের Brother Judgeকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের যে সমস্ত কাগজপত্র ছিল, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া পরিশেষে দুই খণ্ড পুস্তক বিলাতেই বাহির করেন। এই পুস্তক এখনও বর্ত্তমান। পুস্তকখানির নাম The Story of Nuncomer and Impey. এই পুস্তকে বেভারিজ সাহেবের উপর স্যর জেমস কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রকাশ করেন। সে মন্তব্যগুলি অনেকটা ব্যক্তিগত। ষ্টিফেন সাহেব একথাও বলিয়াছিলেন—"নন্দকুমার সম্বন্ধে মেকলের পর যাঁহারা কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ হেন্‌রি বেভারিজ আই, সি, এস একজন। বিলাতী আইন (English Law) সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা খুব কম!"

এই কথাতেই আগুন ধরিয়া যায়। বেভারিজ সাহেব, স্যর জেমস্ ষ্টিফেনের এই মন্তব্যে ভয়ানক মর্ম্মাহত হন। তিনি নন্দকুমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার পুনরালোচনায় যখন বুঝিলেন—যে তিনিই অভ্রান্ত, তখন তিনি স্যার জেম্‌সের পুস্তকের ঘটনাগত ভুলগুলি বাহির করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এইজন্য তিনি "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে History of a Judicial murder বলিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির করেন। ইহাই ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে "Trial of Maharaja Nundakumar" বলিয়া সাধারণে প্রচারিত হয়। এই পুস্তকের মূল্য হইয়াছিল দশ টাকা।

বেভারিজ সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, নন্দকুমার সম্বন্ধে অভ্রান্ত তথ্য-সংগ্রহের জন্য, হাইকোর্টের সেরেস্তার সহায়তা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে Sir Richard Couch Kt. চিফ্-জষ্টিস ছিলেন। কাউচ্ সাহেবের সহিত, বেভারিজ সাহেবের খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনি কাউচ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল মোকদ্দমা সম্বন্ধে সমস্ত পুরাতন রেকর্ডগুলি খুঁজিয়া বাহির করান। সে সকল রেকর্ডের কাপি আমি বেভারিজ সাহেবের নিকট দেখিয়াছি। হাইকোর্টের রেকর্ডেও দেখিয়াছি। কি করিয়া কি সুযোগে দেখিলাম, তাহা এখন বলিব। ক্ষুদ্রের কথা বলিয়া যে পাঠক শুনিবেন না—তাহা হইতেই পারে না।

মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে কিছু বেশী কথা জানিতে, কিশোরকাল হইতেই আমার মনে কেমন একটা আগ্রহ জন্মে। কেন তাহা বলিতেছি। আমি তখন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিব। কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের পাঠ্য। তাহাতে নন্দকুমার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ছিল। "জাল অপরাধে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়" ইহাই বাল্যকালে পড়িতাম। জাল অপরাধে ব্রাহ্মণের ফাঁসি ব্যাপারটা কি! কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় নন্দকুমারেরই রক্তসম্পর্কীয়। ইনি হেয়ার স্কুলের English Teacher ছিলেন। ভবিষ্যতে ঘটনাচক্র চালিত হইয়া, এই কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের ছাত্ররূপে হেয়ার স্কুলে তাঁহার কাছেই পড়ি। এই সময়ে ভূকৈলাস রাজবাটীতে "দেওয়ান নন্দকুমার" বলিয়া একজন দেওয়ান নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার পূর্ণ নাম নন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তখন খিদিরপুরে ভূকৈলাস রাজবাটীর পশ্চিমাংশে আমাদের বাটী ছিল। এই দেওয়ান নন্দকুমার, রাজবাটীতে যাইবার ও আসিবার সময় আমাদের বাটীতে একবার পদার্পণ করিতেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর। মুখখানি যেন যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ। পাকা আমের মত টুকটুকে রং। মাথায় টাক। আর সেই টাকের পাশে ছোট বাবরী। মাথায় সেকালের হাতেবাঁধা পাকড়ী। আর গায়ে পুরাকালের সেই ফিতাবাঁধা হাফ্ চাপকান। সে চেহারা দেখিলেই যেন ভক্তি ও ভয় যুগপৎ আসিয়া পড়িত। পিতৃদেব তাঁহাকে "খুড়া" বলিয়া ডাকিতেন। কাজেই আমি তাঁহার নাতি। তিনি আমাদের বহির্বাটীর একটী পুলের উপর বসিয়াই আমায় আদেশ করিতেন, "যা তামাক সেজে নিয়ে আয়।" আমিও আগ্রহের সহিত এই "জাল দেওয়ান নন্দকুমার"কে তামাক সাজিয়া আনিয়া যেন অতীত যুগের নবাবী আমলের দেওয়ান নন্দকুমারের খানসামাগিরি করিতেছি ভাবিয়া চরিতার্থ হইতাম!

ইহার দশ বৎসর পরে আমি সরকারী কর্ম্মে প্রবেশ করি। ভগবান টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে আমার অন্নজলের স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে আমি সামান্য বেতনে এই আপিসে কাজ করিতে প্রবিষ্ট হইলাম।

তখন আমার প্রাণে কোম্পানীর আমলের ইতিহাস আলোচনার একটা মহা উৎসাহ। কেন না, আমার প্রথম ঐতিহাসিক প্রবন্ধ "প্রাচীন কলিকাতা" ঠিক সেই সময়ে নব প্রকাশিত "নবজীবনে" ছাপা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের হাতের লেখা প্রশংসাসূচক চিঠি পাইয়াছি। তিনি প্রবন্ধের অপরাংশ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। "নবজীবনে"র কার্য্যাধ্যক্ষ স্বর্গীয় অঘোরনাথকুমারের সহিত

আলাপ হইয়াছে। অঘোরকুমার তখন "নববিভাকর সাধারণী" লইয়া ব্যস্ত। নবজীবনের ম্যানেজমেণ্টও তাঁহার হাতে। তাহার উপর আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের সার্টিফিকেট "বাঙ্গলার গুহ্য ইতিহাসে ঘুণ।" আর আমার পায় কে! আমি ছেলে ধরিতে কেউটে ধরিয়া বসিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র, তারাপ্রসাদ, হেমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, প্রভৃতি যে কাগজের Contributor, তাঁহাদের লেখার পাশে আমার লেখা যাইতেছে! এ অপেক্ষা ভাগ্য ও স্পর্দ্ধা কি হইতে পারে?

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের উৎসাহই আমার ভবিষ্যৎ ইতিহাস আলোচনার পথ প্রসারিত করিয়া দেয়। প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে তিনি আমাকে কখনও চোখে দেখেন নাই। ডাকে আমার লেখা পাইয়া, তাহা ছাপিবার উপযুক্ত ভাবিয়াছেন বলিয়া, হয়তঃ ছাপিয়াছেন। আর পরের অংশ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু পরের অংশ পাই কোথায়! আমি অতি পুরাতন কলিকাতা রিভিউ হইতে সংগ্রহ করিয়া "প্রাচীন কলিকাতা" দিয়াছিলাম। তাহার পরের অংশ না দিতে পারিলে বড়ই অপ্রতিভ হইতে হইবে—এই ভাবিয়া আমি পিতৃদেবের নিকট জলখাবারের যে টাকা পাইতাম, তাহা দিয়া ভূতপূর্ব্ব Metcalfe Hall এর Subscriber হইলাম। আর প্রতিদিন আপিসের টিফিনের সময়, রাণী-মুদীর গলির (British Indian Street) জমীদার সভার (British Indian Association) Hurrish Library অর্থাৎ সে কালের জমীদার সভার জীবনস্বরূপ হিন্দু-পেট্রিয়ট্ প্রবর্ত্তক প্রখ্যাতনামা হরিশ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ যে লাইব্রেরী আছে, তাহাতে পড়িতে যাইতাম।

কিন্তু সেখানে ত আমার মত লোকের পড়িবার বিশেষ কিছু নাই। কেবল Administration Report-এর কাঁড়ি। আর অন্যান্য বাজে বই। তবে পড়াটা তখন স্বভাবদোষে দাঁড়াইয়াছে। যে বই দেখি—পড়িয়া দেখি, পাতা উল্টাই, কিন্তু প্রাচীন কলিকাতার কিছুই পাই না। "নবজীবনে"র প্রবন্ধের জোগাড় হয় কি করিয়া?

তখন এই লাইব্রেরীর ও সভার কর্ম্মচারী ছিলেন বাবু শোভারাম পাল। ইনি এখনও বর্ত্তমান। পাঠক যেন মনে রাখেন, আমি আন্দাজ ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। তখন আমি সবে চাকরীতে প্রবেশ করি আর এখন আমার ৩১ বৎসর চাকরী হইয়া গিয়াছে, পেন্সনের সময় উপস্থিত। ইনি এখনও ঐ সভায় চাকুরী করিতেছেন। ইনি স্বর্গীয় মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের সম্পর্কীয় ব্যক্তি।

শোভারাম বাবু, আমার এইরূপ "বই-হাট্‌কানো" স্বভাবে কোন দিন বা ত্যক্ত হইতেন, কোন দিন বা কিছুই বলিতেন না। যাহা হউক বিনয়-নম্র ব্যবহারে আমি তাঁহাকে হাত করিয়া লইলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

মৃগয়া।*

প্রাচীনকালের শিক্ষা ও সমাজ লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু 'খেলা ধূলা'র কথা অল্পই চর্চ্চিত হয়। অনেকে 'বাজে কথা' বলিয়া উপেক্ষাও করেন। কিন্তু, যাহা স্মরণ করিলে প্রাচীন ইতিহাসের বহুকথা মনে পড়িয়া যায়, সেইরূপ রহস্যময় ক্রীড়ার আলোচনা নিরর্থক বলিয়া স্থির করা কি যুক্তিসঙ্গত?

এইরূপ ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট দুইটী ক্রীড়ার নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রথম—মৃগয়া, দ্বিতীয়—অক্ষক্রীড়া। এই দুইটী ক্রীড়াই ভারতীয় আদর্শ-চরিত্র মানবের জীবন-নাটকের অভাবনীয় দশা-পট পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আপনাদের অস্তিত্ব চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্রীড়ার সহিত ইতিহাসের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদি পাঠে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি, পরে যথাসম্ভব আলোচিত হইবে।

এই দুইটী ক্রীড়াই ক্ষত্রিয় বা তন্নিম্নজাতি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। ব্রাহ্মণকে এই সব রাজস ও তামস ব্যাপারে লিপ্ত হইতে কমই দেখা যাইত। (১)

এই দুইটীর মধ্যে প্রথমোল্লিখিত ক্রীড়া অর্থাৎ মৃগয়াই এই প্রবন্ধের বিষয়।

আমরা পিতামহীর মুখের গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, পুরাণে পর্য্যন্ত এই মৃগয়ার কথা ভূরি ভূরি শুনিতে পাই। শুধু নাটক, পুরাণ কেন? বেদের বহুস্থানেও মৃগয়ার উল্লেখ আছে।

---

* শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের সভাপতিত্বে "বারাণসী-শাখা সাহিত্য পরিষদে"র সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

(১) ব্রাহ্মণের মধ্যে অগস্ত্য ঋষি মৃগয়া করিতেন, ইহা মহাভারতে আছে। তিনি সেই সময়ে অরণ্যের সমস্ত মৃগ প্রোক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া, মৃগয়া-আহৃত মাংস প্রোক্ষণ করিতে হয় না।—মহাভারত। আদি। ১১৮ অঃ। ১৪ শ্লো।

মৃগয়া দেশভেদে জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর হইলেও ইহার উদ্দেশ্য সকলেরই প্রায় একরূপ। ইহার উদ্দেশ্য—

(ক) অতুল আনন্দ উপভোগ।

(খ) সৈন্যগণের শরীর ও অস্ত্রচালনায় উৎকর্ষলাভ।

(গ) হিংস্র প্রাণিগণের ভয় ও ক্রোধের অবস্থা লক্ষ্য করিতে করিতে যুদ্ধে ক্রমশঃ নির্ভীক হওয়া।

(আর একটী বিশেষ উদ্দেশ্য এ দেশে প্রচলিত ছিল—পূর্ব্বে দেব-সেবাদিতে মাংসের প্রয়োজন হইলে এই মৃগয়া দ্বারা তাহা সংগৃহীত হইত।—ভাগবত। ৪ স্কন্ধ। ১৬ অঃ। ৫।৬।৭ শ্লো)

কালিদাসও বলিয়াছেন —

"মেদশ্ছেদকৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহযোগ্যং বপুঃ
সত্ত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতিমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ স চ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যা হি ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কৃতঃ॥"

শকুন্তলা। ২ অঙ্ক।

"পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে ভয়রুষোশ্চ তদিঙ্গিত বোধনম্।
শ্রমজয়াৎ প্রগুণাঞ্চ করোত্যসৌতনুম্"..........॥

রঘুবংশ। ৯ম সর্গ।

যুদ্ধোপযোগী বহুগুণ থাকাতেই, কালিদাস—

"মিথ্যা হি ব্যসনং বদন্তি মৃগয়াম্" অর্থাৎ শাস্ত্রকারগণ মিথ্যাই মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন—

এবং নৈষধে শ্রীহর্ষ—

"মৃগয়াঘায় ন ভূভৃতাম্" মৃগয়া করিলে রাজগণের পাপ হয় না—

এই কথা বলিতে পারিয়াছেন, কিন্তু, মৃগয়া এত গুণের নিদান হইলেও বহুদর্শী শাস্ত্রকারগণ কামজব্যসন মধ্যে ইহার গণনা করিয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।

মনুসংহিতা।

মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা প্রভৃতি এই দশটী কামজ ব্যসন।

পূর্ব্বাপর ইতিহাস দেখিলেই বুঝা যায়—মৃগয়া ব্যসনান্তর্গত হইবারই উপযুক্ত। এত আকর্ষণী শক্তি, এত মাদকতা, এত চিত্তহারিতা যাহাতে দেখা যায়, যাহার আকর্ষণে নিজের অনুগামী পরিজন ভুলিয়া, নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া অন্যপথে মানব ধাবিত হয়, তাহা ব্যসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়াই ত' উচিত।

ব্যসন অনুষ্ঠান মনুষ্যমাত্রেরই অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাহাদের জীবনের উপর কোটি কোটি জীবের শান্তি নির্ভর করে, যাহাদের জন্য একটা রাজ্য পরিচালিত হয়, সেইরূপ মানবশ্রেষ্ঠ রাজগণের এইরূপ তীব্র আকর্ষক ব্যাপারে মত্ত হওয়া ত' উচিতই নহে। এইজন্যই মনু বলিয়াছেন—"ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ" কুফলপ্রদ ব্যসন প্রাণপণে বর্জ্জন করিবে! এবং

"কামজেষু প্রসক্তো হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ।
বিযুজ্যতেঽর্থধর্ম্মাভ্যাম্"............ ॥

কামজ ব্যসনে আসক্ত রাজগণ অর্থ ও ধর্ম্মহীন হয়। এইজন্যই, মৃগয়াবিরতি রাজগণের একটী গুণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। (১)

কেহ কেহ বলেন—ধর্ম্মশাস্ত্র মৃগয়াকে ব্যসন মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, কিন্তু নীতিশাস্ত্রমতে ইহা পাপের কারণ নহে। এই কারণেই কবি কালিদাস ও শ্রীহর্ষ সেই নীতিশাস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়া যুক্তি দেখাইয়া মৃগয়াকে ব্যসন বা দোষের বলেন নাই। এই কারণেই নীতিক্ষেত্রবিচারী রাজগণ ইহার অনুষ্ঠানে পাপভয়ে ভীত না হইয়া মৃগয়ামদে মত্ত হইতেন। এই কারণেই, "যেমন শত্রুবধে পাপ নাই তেমন মৃগহিংসায়ও পাপ নাই, ছলে বলে কৌশলে মৃগবধ করাই রাজধর্ম্ম" ইহাও পাণ্ডুরাজ বলিতে পারিয়াছিলেন। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১৮ অধ্যায়, ১২।১৩ শ্লোক)

যাহাই হউক, পূর্ব্বকালের রাজগণ, সুলিখিত কবিতার মত, সুগন্ধি পুষ্পমালার মত মৃগয়ার কথা কণ্ঠে কণ্ঠে রাখিতেন, মৃগয়া সেবার আনন্দে বিভোর থাকিতেন, তাই আমরা মৃগয়ার বিবরণ বহুস্থানে জানিতে পারি, জানিয়া স্বদেশী বিদেশী পাঁচজনকে জানাইতে পারি।

এক্ষণে দেখা যাউক, কিরূপ ভাবে মৃগয়া অনুষ্ঠিত হইত। বহু পুরাণে বহু ভাবে মৃগয়ার বিবরণ লিখিত আছে, তাহারই স্থূল মর্ম্ম এইরূপে দেওয়া গেল।

---

(১) ন মৃগয়াভিরতির্ন দুরোদরং......তমুদয়ায় যতমানমপাহরৎ ॥

রঘুবংশ। ৯ম সর্গ। ৭ শ্লোক।

মৃগয়া-যাত্রার পূর্ব্ব দিনেই রাজ-পরিজন সৈন্য প্রভৃতি সকলেই জানিল—কাল মৃগয়াযাত্রা হইবে। যাহারা মৃগয়া করিতে যাইবার রাজ-অনুমতি পাইল, তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। সমস্ত দিন ধরিয়া মৃগয়াযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। অগণিত হস্তী, অশ্ব, নানাচিত্রে চিত্রিত হইল। তরবারি, ধনুঃ নানাবিধ শর (ক্ষুরপ্র প্রভৃতি), গদা, মুসল, তোমর প্রভৃতি অস্ত্র সমূহ গৃহীত হইতে লাগিল। বাত্যাবিক্ষুব্ধ বারিধিবৎ সেইদিন রাজগৃহ অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়, মানবের আনন্দ কোলাহলে, সমবেত অশ্ব হস্তীর উচ্চনাদে আকুল হইয়া উঠিল। সে দিনের রজনীও যেন উৎসাহের মাদকতায় আর থাকিতে পারিল না, সেও নিজের তমোময় অঙ্গ প্রভাত-তপনের রক্তকিরণ-সজ্জায় সজ্জিত করিল। পরদিন যথাসময়ে, রাজার সহিত, সৈন্য, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সমস্তই একত্র সমবেত হইল। রথে আরোহণ করিয়া দৃঢ় লৌহবর্ম্মধারী, ধনুঃ ও বাণপূর্ণ তূণ স্কন্ধে লইয়া, উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে নরপতি মৃগয়ায় চলিলেন। রাজপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে মৃগয়ার উপযুক্ত বেশ (যোদ্ধৃবেশ) ধারণ করিয়া তিনি এক নূতন ভাবে শোভিত হইতে লাগিলেন। অশ্বখুরোত্থিত ধূলি সমূহে পথিপার্শ্বের গবাক্ষস্থিত রমণীগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি রুদ্ধ করিতে করিতে মৃগয়াযাত্রিগণ বনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। করিতুরঙ্গের পদধ্বনি, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও আনন্দ-কোলাহল একত্র মিলিয়া পথিপার্শ্বস্থ গ্রাম ও অরণ্য সমূহ কম্পিত করিতে লাগিল।

মৃগয়ার উদ্যোগ।

মৃগয়া-যাত্রা।

পূর্ব্ব হইতেই রাজ-নিদেশে কুক্কুরপালক নীচজাতীয় মানবগণ কুক্কুর লইয়া এবং বাগুরিকগণ (যাহারা ফাঁদ পাতে, ব্যাধ) অরণ্যে আসিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এদিকে সেই মৃগয়ার্থি জনশ্রেণী সহসা বন্যার ন্যায় সেই বিস্তৃত অরণ্য প্লাবিত করিয়া ফেলিল। অরণ্যবাসী জীবসমূহ প্রমাদ গণিল, তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বনের প্রান্তভাগ সমূহ কুক্কুর ও বাগুরা দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় সৈন্যশ্রেণীর তাড়না পাইয়া তাহারা তাহাদের পরিত্রাণের উপায় দেখিল না। পলায়নের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। রাজা ও সৈন্যগণের অব্যর্থ শরসন্ধানে বহু প্রাণী হত হইল। কতকগুলি খড়্গের প্রচণ্ড আঘাতে, কতকগুলি অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা নিহত হইতে লাগিল। কত হরিণ, কত ব্যাঘ্র, কত মহিষ এবং অন্যান্য কত পশু যে নিহত হইল, কে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে?

মৃগয়া বা পশুহত্যা।

কুক্কুরের ভীষণ দ্রংষ্ট্রাঘাতেও বহুপ্রাণী প্রাণত্যাগ করিল। আর কতকগুলি বা সুযোগ বুঝিয়া পলাইল। মদমত্ত কতিপয় হস্তী শস্ত্রক্ষত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতে লাগিল, তাহাদের পদপেষণে এবং ভয়ে ও পরিশ্রমে বহুপ্রাণী মরিল। জীবন্ত ভীত জন্তুদিগের গগনবিদারী চীৎকারে বনভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। এইরূপে একটী অরণ্য সংক্ষুব্ধ করিয়া রাজা অপর অরণ্যে মৃগয়ার্থ প্রবেশ করিলেন। পশুসমরোন্মত্ত সৈন্যগণ কেহ অগ্নিতে অর্দ্ধদগ্ধ, কেহ অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া বনভোজনের আনন্দ-উপভোগ করিতে করিতে রাজার অনুগামী হইল। সেই মৃগয়ামত্ত সৈন্যশ্রেণীকে দেখিলেই মৃগয়ার উন্মাদিকা শক্তির অসাধারণত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাইত। তাহাদের বীরনাদের সহিত, গমনে অহমিকতার সহিত, সেই যে একটা উন্মাদনা লক্ষিত হইতেছিল, সেই যে একটা কঠোরতা লক্ষিত হইতেছিল, তাহাতেই মৃগয়াশক্তির অসাধারণত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি হইত। স্থূলতঃ সেকালের মৃগয়া-ব্যাপার এইরূপ ভাবে নিষ্পন্ন হইত। (১) এইরূপে মৃগয়া দ্বারা রণচর্চ্চার অভাব পূর্ণ হইত। এইরূপে উৎসাহ, শক্তি, অধ্যবসায়, শ্রমসহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা অর্জ্জিত হইত। তীক্ষ্ণধার তরবারি যদি কর্ম্মবিহীন হইয়া ভূগর্ত্তে প্রোথিত থাকে, তাহা যেমন অচিরে কলঙ্কাবৃত হইয়া নষ্ট হয়, তেমনই এই সৈন্যকুল মনুষ্যযুদ্ধের অভাবে যদি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে অকর্ম্মণ্য হইবার সম্ভাবনা, এইজন্য মনুষ্যসংগ্রামের পরিবর্ত্তে পশুসংগ্রাম দ্বারা তাহাদের সেই উত্তেজকতা, সেই শক্তি, সেই অস্ত্রচালনা, সেই শ্রমসহিষ্ণুতা, সবই অর্জ্জিত হইত (২)। আজ কাল মৃগয়ার সেরূপ সুযোগ নাই বলিয়াই parade ও mock-fight প্রভৃতি যুদ্ধ-অভিনয়ের এত আধিক্য।

মহাকবি কালিদাস বিস্তৃতভাবেই মৃগয়া-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার ছায়ামাত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাজা দশরথ মন্ত্রীর উপর রাজ্যপরিচালনের ভার ন্যস্ত করিয়া মৃগয়ার উপযুক্ত বেশ পরিধান করিয়া বিপুল স্কন্ধে বৃহৎ ধনুঃ এবং পৃষ্ঠদেশে নানাবাণ পূর্ণ তূণ গ্রহণপূর্ব্বক পার্শ্বচরমাত্রসহায় হইয়া অশ্বারোহণে বন অভিমুখে চলিলেন। অরণ্য মধ্যে আসিয়া ধনুষ্টঙ্কার দ্বারা সিংহাদি হিংস্র প্রাণিগণকে

(১) মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।

(২) পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বিরচিত "অমরমঙ্গলম্" নাটকের ২য় অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

উত্তেজিত করিয়া ধনু'তে বাণ যোজনা করিলেন। পশুকুল চঞ্চল হইল। ভগ্নযুথ হরিণগণ তাহাদের নীল নয়নের চকিতচঞ্চল চাহনিতে যেন নীলপদ্ম ফুটাইয়া অরণ্যের ভীষণতা মধুরতায় পরিণত করিল। রাজা একটী হরিণের প্রতি বাণসন্ধান করিলেন, বাণ আকর্ণ আকৃষ্ট করিলেন, বুঝি ক্ষণের জন্য সেই হরিণের প্রাণবায়ু বাহির হইতে বাঁকী রহিল, এমনই সময়ে সেই মৃগ নিজ সহচরীর কোমল অঙ্গ স্পর্শে চমকিত হইল, দেখিল, সেই বজ্রতুল্য বাণের সম্মুখে সহচরী তাহাকে ব্যবধান করিয়া আছে। নিজের মৃত্যুর কথা বিস্মৃত হইল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজার মুখের দিকে কাতরভাবে চাহিয়া প্রাণের ব্যথা জানাইল। সেই সহৃদয় রাজা পশুপ্রজার প্রাণের কথা বুঝিলেন, অব্যর্থ বাণ সন্ধান প্রতিসংহার করিয়া দুর্ব্বলের প্রতি, শরণাপন্নের প্রতি,অস্ত্রত্যাগ না করিয়া নিজের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। এদিকে উগ্র বন্যবরাহসমূহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; রাজা দশরথ তাহাদের পশ্চাৎস্থিত বৃক্ষের সহিত তাহাদিগকে এমনভাবে বাণবিদ্ধ করিলেন যে, তাহারা ক্ষণকাল ইহা বুঝিতে পারিল না। বন্য মহিষশ্রেণী ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার প্রতি ধাবিত হইল, কিন্তু ক্ষিপ্রহস্ত নৃপতির তীক্ষ্ণশর অগ্রে মহিষকে ভূমিশায়ী করিয়া পরে নিজে দূরে পতিত হইল। তীক্ষ্ণধার ক্ষুরপ্রনামক বাণ বিশেষ দ্বারা গণ্ডারগণের নাসিকাস্থিত খড়্গ কাটিয়া দিলেন। মুখব্যাদান করিয়া গুহামধ্য হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ব্যাঘ্র-সমূহ সম্মুখীন হইবা মাত্র, রাজা দশরথ ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদের মুখমধ্যে এত বাণ বর্ষণ করিলেন যে, সেই বাণপূর্ণ ব্যাঘ্রের মুখ রাজপৃষ্ঠস্থিত তূণকেও যেন উপহাস করিয়াছিল। নরপতি এইরূপে ক্রমে পশুরাজ সিংহনিবহকে ধনুষ্টঙ্কারে অতিশয় উত্তেজিত করিয়া, অমিতবিক্রমে, অদ্ভুত কৌশলে বধ করিলেন। কত সুন্দর পক্ষী বনের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল, কত ময়ূরের কেকারবে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, কিন্তু, তাহাদিগের প্রতি রাজা বধ্যভাবে দৃক্‌পাতও করিলেন না, পক্ষি-হিংসা করিয়া আপনার সিংহশোণিতসিক্ত হস্ত কলঙ্কিত করিলেন না। এইরূপে মৃগয়ামত্ত হইয়া রাজা দশরথ বন হইতে বনান্তরে গমন করিলেন। (১)

এই চিত্র হইতে মৃগয়ায় যুদ্ধোপযোগিনী কত শিক্ষা পরিলক্ষিত হইল। ভীষণ শ্বাপদকুলের দ্রুত-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, কত ক্ষিপ্রকারিতা, কত সাবধানতা, কত সাহস অবলম্বন করিতে হয়, যাহা যুদ্ধের

(১) রঘুবংশ। ৯ম সর্গ।

সময়ে বিশেষ প্রয়োজনীয়, যাহা সৈন্যগণের একান্ত শিক্ষণীয়, তাহা এই চিত্রে বেশ বুঝা যায়।

মৃগয়া করিবার সময়ে অরণ্যের অবস্থা কিরূপ হইয়া উঠে - তাহাও একবার দেখা আবশ্যক। বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত বাণভট্টের কথায় বলি—যখন মৃগয়ার্থি-জনশ্রেণী অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল তখন তাহারা—"এষ রুধির পাটলঃ করি-মৌক্তিকদন্তুরো মৃগপতিমার্গঃ, পঙ্কচরস্য যূথপতের্মদজলমলিনা সঞ্চারবীথী, চমরীপঙ্‌ক্তিরিয়মনুগম্যতাম্, ত্বরিতমধ্যাস্যতামিয়ং বনস্থলী, তরুশিখরমারুহ্যতাম্, আলোক্যতাং দিগিয়ম্, আকর্ণ্যতাময়ং শব্দঃ, গৃহ্যতাং ধনুঃ, অবহিতৈঃ স্থীয়তাম্, বিমুচ্যন্তাং শ্বানঃ" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে মহোল্লাসে মৃগয়ায় মত্ত হইল। "সেই মৃগয়াশীল ব্যক্তিগণের শরতাড়িত সিংহের গর্জ্জনে, হস্তি-সমূহের ভীষণ নিনাদে, এণমৃগের করুণধ্বনিতে, মৃতপতি করিণীর চীৎকারে, বৃক্ষস্থিত পক্ষি-গণের কলরবে, পদদলিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মরশব্দে, শরবর্ষী ধনু'র টঙ্কার ও খড়্গ-পাতের উচ্চধ্বনিতে এবং কুক্কুরগণের শ্রবণভেদী চীৎকারে সেই অরণ্য যেন সজীব হইয়া উঠিল।"

আর একটী বিশেষত্ব, যাহা অন্য কোন মৃগয়াবিবরণে আমরা পাই নাই, তাহা যথার্থই উল্লেখযোগ্য। "কাদম্বরী"তে "চন্দ্রাপীড়ে"র মৃগয়াপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—"বনবরাহান্ কেশরিণঃ শরভাংশ্চমরাননেকবিধকুরঙ্গাংশ্চ সহস্রশো জঘান। অন্যাংশ্চ জীবত এব মহাপ্রাণতয়া স্ফুরতো জগ্রাহ।"

অর্থাৎ বন্যবরাহ, কেশরী ও শরভ চমরী প্রভৃতি বহুবিধ মৃগ সহস্র সহস্র বধ করিলেন। আর সেই মহাবল চন্দ্রাপীড় অন্য কতকগুলিকে জীবন্ত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিলেন।

যে জীবের গর্জ্জন শুনিলে মানবের হৃৎকম্প হয়, যে জীবের প্রতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ধাবমান হইলেও আক্রমণ ভয়ে মানবকে ভীত হইতে হয়, সেই সমস্ত ভীষণ শ্বাপদ বলের দ্বারা নিগৃহীত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন।

হায়! ভারতের এমনও একদিন ছিল—আর এখন?

মৃগয়া বলিতে শুধু পশুহত্যা নহে, পক্ষিশিকার, মৎস্যশিকার প্রভৃতিও মৃগয়ার অন্তর্গত, ইহা নৈষধে শ্রীহর্ষ ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন (১) সুতরাং পক্ষি-শিকার সম্বন্ধেও একটী চিত্র দেখান হইতেছে—

(১) অবলম্বকুলাশিনো ঝষান্ নিজনীড়দ্রুমপীড়িনঃ খগান্।
অনবদ্যতৃণার্দ্দিনো মৃগান্ মৃগয়াঘায় ন ভূভৃতাং ঘ্নতাম্॥ ২য় সর্গঃ।

"যথেষ্ট পশুমাংস আহরণ করিয়া শবরগণ (এক প্রকার নীচজাতীয় মানব) পশুহত্যা হইতে বিরত হইল। সে অরণ্যও কিছুক্ষণ পরে নিস্তব্ধ হইল। শবরগণ আনন্দের সহিত অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে একজন একবার উপরদিকে চাহিল, দেখিল—নীলগগনস্পর্শী শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর নিস্তব্ধ নীড়ে পক্ষিগণ বিশ্রাম করিতেছে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ সেই ঘনপত্রমধ্যবর্ত্তী নীড়নিচয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। বিহঙ্গকুল নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করিতেছে। এমন সময়ে সেই শবর অতি সন্তর্পণে বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। তাহার কার্য্যের ধীরতায়—নিপুণতায় বুঝি বনদেবতাও তাহার আগমন উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠিবামাত্র উড্ডয়নসমর্থ পক্ষিকুল উড়িয়া পলাইল। তখন সেই অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকদিগের এবং উড্ডয়নে অসমর্থ বৃদ্ধ পক্ষিদিগের অবস্থা যথার্থই শোকাবহ হইল। কত পক্ষিশাবক বৃক্ষতলে গতজীবন হইয়া পতিত হইল। কত ছিন্নপক্ষ বৃদ্ধ পক্ষীর করুণ চীৎকারে বনস্থলী কাঁদিয়া উঠিল। আর পলায়িত পক্ষিগণ শাবকদিগের বধ দেখিয়া করুণ কলরবে গগন কম্পিত করিল। অন্যান্য বৃক্ষ হইতেও বহু পক্ষী সেই কলরব মহান্ করিয়া তুলিল। এ সকলে সেই শবর কর্ণপাতও করিল না, ক্রমে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে আরোহণ করিয়া পক্ষিমাংস আহরণ করিল এবং বহু ডিম্ব নিজ বস্ত্র মধ্যে লইল।" (১) প্রাচীনকালের এইরূপ চিত্র এখনও বহু পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়।

তখনকার মৎস্যশিকারবিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এখন মৎস্যশিকার শুধু মৎস্যজীবীর নহে অনেক ভদ্রসন্তানেরও কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এত আসল বস্তু থাকিতে অঙ্কিত নকল চিত্রের প্রয়োজন কি?

অতি প্রাচীনকাল হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত মৃগয়ার প্রণালী সমভাবে ছিল বলিয়াই বোধ হয়। বহুগ্রন্থে মৃগয়া একইভাবে বর্ণিত হওয়ায় ঐরূপ অনুমান হয়।

তাহার পর, একবার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক; একবার মৃগয়ার সহিত ইতিহাসের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখা যাউক, দেখিয়া শাস্ত্রকারগণের বহুদর্শিতা অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া লই।

সকলেই জানেন, একদিন রাজা দুষ্মন্ত বিশেষ কোন কারণ না থাকিলেও

---

(১) কাদম্বরী।

ঋষিগণের তপঃপূত, বেদগান মুখরিত শান্ত এক তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। অলক্ষ্যে ঋষিকন্যাগণের আচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান এবং পরে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার ব্যবহার তত সাধুজনোচিত হয় নাই, ইহাও সকলে জানেন। এ সকলের ঠিক্ কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া তাঁহার মৃগয়া-ব্যসন অনুষ্ঠানকেই এ সকলের কারণরূপে নিরূপিত করিতে পারি।

আর একটা ঘটনা মনে পড়ে—যখন রাজা দশরথ "চতুরা কামিনীর মত মৃগয়া দ্বারা হৃত হইয়া" সঙ্গিহীন অবস্থায় নিবিড় বেতসকাননে আসিয়া উপস্থিত, মৃগয়ার মাদকতায় হস্তিভ্রমে এক ব্রাহ্মণ কুমারের উদ্দেশে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণ ব্রাহ্মণ কুমারের বক্ষে নহে, ইতিহাসের লৌহময় বক্ষে বজ্রের মত বিদ্ধ হইয়া চিরদিনের জন্য রাজা দশরথের অকীর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া গেল। তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ-কুমারের পিতার নয়নসলিল দ্বারা অভিশাপ প্রদান এবং সেই অভিশাপ ফলেই দশরথের পুত্র-শোকে অকালমৃত্যু। সুতরাং দশরথ ও দাশরথির জীবনের ইতিহাসের সহিত মৃগয়া পরম্পরায় জড়িত।

পাণ্ডুরাজের অকালমৃত্যুর কারণ—এই মৃগয়া। এই মৃগয়া হইতে রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া সাতদিনের মধ্যে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আরও বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনা এই মৃগয়া আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইহাতেই বুঝা যায়—ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ মৃগয়ার উপকারিতা থাকিলেও ইহাকে কেন ব্যসন মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। সংযমের অবতার, সাধুতার দৃষ্টান্তস্থল এই সব মহাত্মা রাজগণও যখন ইহার কুফলদায়ক আকর্ষণ হইতে রক্ষা পান নাই, তখন যে ইহা অকার্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

মৃগয়া ক্রীড়া মাত্র বটে, কিন্তু ইহা ইতিহাস-সেবকের তুচ্ছ তাচ্ছীল্যের বস্তু নহে, পরন্তু বিশেষভাবে আলোচ্য। অনেকে ইহা নিরর্থক বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু, ভারত-ইতিহাস তাহা পারিবে না। তাহার প্রতি অক্ষরে চিরদিন এই মৃগয়া ও অক্ষক্রীড়া, প্রাতঃস্মরণীয় রাজগণের চরিত্রের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বলিয়া অমর হইয়া থাকিবে, কেহ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

শ্রীশ্রীজীব কাব্যতীর্থ।

বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ

১২৮৪ সালে "বঙ্গদর্শন" যখন পুনর্জ্জীবিত হয়, তখন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পরবর্ত্তী অংশ ইহাতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমাপ্ত হইলে ঐ বৎসরেই 'রাজসিংহ' বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। চৈত্র সংখ্যায় রাজসিংহের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয় ও পর বৎসর ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্গদর্শনে আর উহার শেষ অংশ প্রকাশিত হয় নাই। ইহার কারণ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'সাধনা' পত্রিকায় "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গে" লিখিয়াছেন—

"রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, চন্দ্রশেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? বঙ্কিমবাবু তাঁহার কোন বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, এঁরা বলেন 'আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।"

পরে পুস্তকাকারে রাজসিংহ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজসিংহের সহিত চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত গ্রন্থের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বহু ঘটনা ও চরিত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত রাজসিংহে নূতন সংযোজিত হইয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা-সংশোধন বা পরিবর্ত্তনপ্রণালী বুঝিতে হইলে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অংশের সহিত মুদ্রিত গ্রন্থের তুলনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই তুলনায় দেখিব, বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন দ্বারা নিজ রচনাকে উৎকৃষ্টতর করিতেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে রাজা বিক্রমসিংহের পরিচয়-প্রসঙ্গে আছে "বিক্রমসিংহের আরও সবিশেষ পরিচয় পশ্চাৎ দিতে হইবে।" বঙ্গদর্শনে ছাপা হইয়াছিল "বিক্রমসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমরা বলিতে পারি। শ্রুত আছে যে তিনি স্নানাহার করিতেন, এবং রজনীযোগে নিদ্রা দিতেন, ইহার অধিক পরিচয় আমরা এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নহি।" এই রসিকতা-টুকু উঠাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভালই করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ উপদেশ "যেখানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বোধ হইবে…সে স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে" তাই অনুপযুক্তবোধে

পূর্ব্বোক্ত রসিকতা পরে বর্জ্জিত করিয়াছিলেন। মাণিকলালের পিসীর ননদের যায়ের এক খুল্লতাত পুত্রী ছিল।' এইটুকু লিখিয়া বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন "সম্বন্ধ বড় নিকট। সইয়ের বউয়ের বকুল ফুলের বোনপো বউয়ের বোনঝি জামাই প্রায়।". এ রসিকতাটুকুও বড়ই সাধারণ বলিয়া পরে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মার্জ্জিত রচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এত দৃষ্টি ছিল। তারপর অন্তঃপুর-বর্ণনা বঙ্গদর্শনে সংক্ষেপেই হইয়াছিল,—"শ্বেতপ্রস্তরের মেঝ্যা; শ্বেত-প্রস্তরের প্রাচীর, তাহাতে বহুবিধ লতাপাতা পশুপক্ষী ও মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত।" এই বর্ণনাটুকু গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—

"গালিচার অনুকরণে শ্বেতকৃষ্ণ প্রস্তররঞ্জিত হর্ম্ম্যতল শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত নানাবর্ণের রত্নরাজিতে রঞ্জিত কক্ষপ্রাচীর; তখন তাজমহল ও ময়ূরতক্তের অনুকরণই প্রসিদ্ধ. সেই অনুকরণে ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষী সকল অসম্ভব রকমে অসম্ভব লতার উপর বসিয়া অসম্ভব-জাতীয় ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া অসম্ভবজাতীয় ফলভোজন করিতেছে।"

এই বর্ণনাটুকু যোগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়কার শিল্পের বেশ একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মোগলের অনুকরণেই তখন গৃহাদি নির্ম্মাণ, শিল্পচাতুর্য্যও মোগলের অনুসরণ করিত। কাজেই উক্ত বর্ণনাটি ঐশ্বর্য্যশালী রাজার অন্তঃপুরের মোগলানুকরণে গঠিত একটি কক্ষের সুন্দর দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, অন্তঃপুরের রমণীদের রূপবর্ণনাটুকুও বঙ্গদর্শনে আদৌ ছিল না। "নানাবিধ রত্নের অলঙ্কারের বাহার। নানাবিধ উজ্জ্বল কোমলবর্ণের কমনীয় দেহরাজি; কেহ মল্লিকাবর্ণ, কেহ পদ্মরক্ত, কেহ চম্পকাঙ্গী, কেহ নবদূর্ব্বাদল-শ্যামা—খনিজ রত্নরাশিকে উপহাস করিতেছে।" এই রমণীগণ হাসিতেছে।

এইখানে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র একটি মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, সেটি পরে উঠাইয়া দিয়াছেন। বঙ্গদর্শনে আছে—

"কেহ ইহাতে এই অবলাগণকে দূষিও না—যতদিন হাসিবার বয়স আছে—ততদিন ইহারা হাসিয়া লইবে—হাসির অপেক্ষা আর সুখ কি? চিত্ত যদি নির্ম্মল হয়, আনন্দ যদি পাপশূন্য হয়, তবে এই যৌবনের আনন্দের চেয়ে, যৌবনের হাসির অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই। কাঁদিবার দিন সকলেরই আসিবে, শীঘ্রই আসিবে। যে যত পারে হাসুক, তোমার আমার চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য ও প্রথম পরিচ্ছেদের শেষের নিম্নলিখিত মন্তব্য গ্রন্থাকারে রাজসিংহ প্রকাশের সময় উঠাইয়া দিয়াছিলেন;—

"আমি জানি রূপের গৌরব ঘরে ঘরে আছে। ইহাও জানি অনেকে সেই রূপসীগণপদতলে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন। কিন্তু সে প্রণাম রূপের পায়ে নহে। সে প্রণাম সম্বন্ধের পায়ে। তুমি

আমার গৃহিণী, অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি, তোমার হাতে অন্নজল, অতএব তোমাকে প্রণাম করি, আমাকে একমুঠা খাইতে দিও, সে প্রণামের এই মন্ত্র। কিন্তু বুড়ীর প্রণাম সে দরের নহে। বুড়ী বুঝি অনন্ত সুন্দরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের ছায়া দেখিল। তিনিই রূপ, তিনিই গুণ। যেখানে সে অনন্তরূপের বা অনন্ত গুণের ছায়া দেখা যায়, সেইখানেই মনুষ্য-মস্তক আপনি প্রণত হয়। অতএব বুড়ী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।"

গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে উপাখ্যান-বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লেখক নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন। জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ এ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রথম এইরূপ মন্তব্য অধিক পরিমাণে প্রকাশ করিতেন। এমন কি "কৃষ্ণকান্তের উইলে" গোবিন্দলালের চরিত্র সমালোচনারও আভাষ দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত কৃষ্ণকান্তের উইল চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদের শেষে আছে—

"গোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্য, তাঁহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম্ম পরের সুখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলতাসাধনজন্য নহে। ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মের জন্য নহে, ইহা ভয়ানক ভ্রান্তি। যে পবিত্রতার জন্য পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য কোনও কারণে পবিত্র, সে বস্তুতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গোবিন্দলালের অধঃপতন হইল।"

এই সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র পরে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ গোবিন্দলালের চরিত্র-ব্যাখ্যা অনায়াসেই নিজেরা করিয়া লইবেন, এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশে বঙ্কিমচন্দ্র পরে বিরত হইয়াছিলেন। বোধ করি রাজসিংহে পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্যগুলিও তাই লুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। চঞ্চলকুমারী পদতলে ঔরঙ্গজীবের চিত্র-দলন করিলেন। তস্বীরওয়ালী চলিয়া গেল। এখন রাজসিংহে "চিত্রবিচারণ" নামক যে তৃতীয় পরিচ্ছেদটি আমরা দেখিতে পাই, তাহা আদ্যোপান্ত নূতন লিখিত। বঙ্গদর্শনে ইহার কিছুমাত্র প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমে তস্বীরওয়ালীর বাড়ী প্রথমে রাজপুতানার অন্তর্গত বুঁদি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। পরে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রবিক্রেত্রীকে আগ্রানিবাসিনী করিয়াছেন। বুড়ী ছবির কথা গোপন রাখিতে না পারিয়া পুত্রকে সব বলিয়া ফেলিল; এইটুকু বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিতরূপে অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

"তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বসিল। বুড়ী আর থাকিতে পারিল না।

শপথ ভঙ্গ করিয়া পুত্রের সাক্ষাতে সবিস্তারে চঞ্চলকুমারীর দুঃসাহসের কথা বিবৃত করিল। মনে করিল আপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? পুত্রকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল—আমার দিব্য এ কথা কাহারও কাছে বলিও না।

পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফিরিয়া গিয়াই আপনার উপপত্নীর কাছে গল্প করিল। বলিয়া দিল, জান্! কাহারও সাক্ষাতে বলিও না। জান্ তখনই আপনার প্রিয়সখীর কাছে গিয়া বলিল। তাহার প্রিয়সখী দুই চারিদিন বাদশাহের অন্তঃপুরে গিয়া বাঁদী-স্বরূপ নিযুক্ত হইল। সে অন্তঃপুরে পরিচারিকাগণের নিকট এই রহস্যের গল্প করিল। ক্রমে বাদশাহের বেগমেরা শুনিল। যোধপুরী বেগম বাদশাহের কাছে গল্প করিল।

ঔরঙ্গজেব সসাগরা ভারতের অধীশ্বর। ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজ এক চঞ্চলা বালিকার কথায় রাগ করিবেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্তু ক্রূরমনা ঔরঙ্গজেব সে প্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না। যে যত ক্ষুদ্র হউক, যে যেমন মহৎ হউক, কেহ তাঁহার প্রতিহিংসার অতীত নহে। অমনি স্থির করিলেন যে সেই অপরিপক্কবুদ্ধি বালিকাকে ইহার গুরুতর প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলিলেন "রূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীর রাজপুরে আসিয়া বাঁদীদিগের তামাকু সাজিবে।"

এই বিবরণের পরিবর্ত্তে প্রথম খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে মাতাপুত্রে উর্দ্দু ভাষায় কথোপকথন, নূতন একটি পঞ্চম পরিচ্ছেদ ও সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্কিমচন্দ্র পরে রচনা করিয়াছেন। বাদশাহের কাছে এ বৃত্তান্ত পরে যেরূপে পৌঁছিল তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই—তস্‌বীরওয়ালীর পুত্র খিজির দিল্লীতে গিয়া তাহার বিবি ফতেমাকে এই সংবাদ বেগম সাহেবাকে বেচিয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিতে পরামর্শ দিল। ফতেমা দরিয়া বিবিকে এই সংবাদ দিল। দরিয়া জেব্‌উন্নেসাকে এ সংবাদ দিয়া আসিল। জেব্‌উন্নিসার নিকট হইতে উদিপুরী শুনিল ও আওরঙ্গজেবকে জানাইয়া প্রার্থনা করিল "চঞ্চলকুমারী আসিয়া আমার তামাকু সাজিবে।" তখন বাদশাহ পরোয়ানা পাঠাইলেন।

প্রথমটা বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপে লিখিয়াছিলেন তাহাতে আওরঙ্গজেবের এই কথা বিশ্বাস করার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। সামান্য বাঁদীর মুখে জনরব বেগমের কাণে পৌঁছিলেও তাহাতেই এরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব। পরে তাই দরিয়া কর্ত্তৃক সংবাদবিক্রয় ব্যাপার রচিত হইয়াছিল। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য, এই সংবাদও সেইরূপ। তাই পূর্ব্বোক্ত বিবরণের পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভালই করিয়াছেন।

আরও একটি পরিবর্ত্তন সুন্দর হইয়াছে। প্রথমে যোধপুরী বেগম এই সংবাদ বলিয়া বাদশাহকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, এই কথা ছিল। যোধপুরী

প্রধানা মহিষী, রাজপুতরমণী। তিনি স্বজাতীয়া এক বালিকার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবেন সেটা তাঁহার পক্ষে বড়ই অশোভন দেখায়। তাই পরে যোধপুরীর চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া উদিপুরীর মুখে "চঞ্চলা আসিয়া তামাকু সাজিবে।" এই হীন বাণী প্রদত্ত হইয়াছে। আওরঙ্গজেবকেও অনেক কোমল করা হইয়াছে। তিনি নিজে যে বলেন নাই "চঞ্চল আসিয়া বাঁদীদের তামাকু সাজিবে" তজ্জন্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের এই পরিবর্ত্তনের প্রশংসা করি। 'বাঁদীদের তামাকু সাজিবে' ইহার পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত কোমল 'উদিপুরীর তামাকু সাজিবে' রচিত হইয়াছে।

আর সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডটি নূতন। দরিয়া, জেব্‌উন্নেসা, উদিপুরী, যোধপুরী প্রভৃতি চরিত্রগুলি নূতন সৃষ্টি। মোগল অন্তঃপুরের ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর ও পাপের এরূপ সুন্দর চিত্র, এই নন্দনে নরক-বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র পরে সংযোজিত করিয়াছিলেন। মবারক চরিত্র বঙ্গদর্শনে ছিল বটে, কিন্তু সেক্ষেত্রে সে সেনাপতি মাত্র। দরিয়ার সহিত তাহার বিবাহ, জেব্‌উন্নেসার সহিত তাহার প্রণয় প্রভৃতির কিছুমাত্র উল্লেখ পূর্ব্বে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পরে এক এক জোড়া বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। একথা তিনি রাজসিংহের উপসংহারে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। একদিকে আওরঙ্গজেব, অপরদিকে রাজসিংহ; একদিকে উদিপুরী, অপরদিকে চঞ্চলকুমারী; একদিকে জেব্‌উন্নিসা, অপরদিকে নির্ম্মলকুমারী; একদিকে মাণিকলাল, অপরদিকে মবারক। এই সকল বিপরীত চরিত্রে হিন্দুমুসলমানের বৈসাদৃশ্য দেখাইয়া রাজার মত প্রজা হয় ইহা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায়। তাই পূর্ব্বের ছোট রাজসিংহ নূতন নূতন চরিত্র ও ঘটনাসংযোগে সুবৃহৎ হইয়া পড়ে।

প্রথম যখন বঙ্কিমচন্দ্র চঞ্চলকুমারীর চরিত্র সৃষ্টি করেন তখন তাহাকে একটু প্রগল্‌ভা করিয়াছিলেন। পরে বেশ সুকৌশলে এই প্রগল্‌ভতার উপর লজ্জার আবরণ টানিয়া দিয়াছেন। নির্ম্মল যখন চঞ্চলকে জিজ্ঞাসা করিল "যে বীর তোমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?" বঙ্গদর্শনের চঞ্চল তখন স্থির, কাতর অথচ অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন "যে রাজপুত হইয়া আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে—সে রাজা হউক ভিক্ষুক হউক, সুরূপ হউক কুরূপ হউক, যুবক হউক বৃদ্ধ হউক, যেই হউক, সে যদি আমায় যথাশাস্ত্র গ্রহণ করে তবে আমি চিরকাল তাহার দাসী হইব।"

কিন্তু পরে বঙ্কিমচন্দ্র এ সকল কথা একেবারে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। নির্ম্মল পূর্ব্বপ্রশ্ন করিলে চঞ্চল "কাতর অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, কি দিব সখি? আমার কি আর দিবার আছে? আমি যে অবলা।" এই লজ্জানম্র উক্তিটুকু অতি সুন্দর। পূর্ব্বের বাক্যগুলির পরিবর্ত্তে এটুকু চঞ্চলের রমণীত্ব উজ্জ্বলতর-রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

এইরূপ রাজসিংহকে চঞ্চল যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার যে অংশে চঞ্চল রাজসিংহকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, সেটুকু বঙ্গদর্শনে প্রকাশের সময় চঞ্চল নিজেই লিখিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু পরে ইহা নিতান্ত নির্লজ্জের মত ব্যবহার হয় বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন—

"এই পর্য্যন্ত পত্রখানি রাজকন্যার হাতের লেখা, বাকি যেটুকু, সেটুকু তাঁহার হাতের নহে। নির্ম্মলকুমারী তাহা লিখিয়া দিয়াছিল। রাজকন্যা তাহা জানিতেন কি না আমরা বলিতে পারি না।"

পত্রমধ্যে পূর্ব্বে ছিল "আমি মুখরা, কতই বলিতেছি পাছে বাক্যে আপনাকে না বাঁধিতে পারি এজন্য গুরুদেবহস্তে রাখির বন্ধন পাঠাইলাম।" এই "বাক্যে আপনাকে না বাঁধিতে পারি" উক্তি অবিবাহিতা কুমারীর মুখে একজন পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া বড়ই বিসদৃশ ঠেকে। তাই পরে এ পংক্তিটুকু উঠাইয়া দেওয়া হয়।

রমণীর এই সলজ্জভাবটুকুই আমাদের চক্ষে ভাল লাগে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রথম পুরুষোচিত কাঠিন্যযুক্ত রমণীচরিত্র সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেবীচৌধুরাণীর প্রফুল্ল বাছা বাছা লাঠিয়ালের সহিত মল্লযুদ্ধ করিত! আনন্দমঠে শান্তি ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়। চঞ্চলকুমারীও প্রথমে একটু এই ধাঁজে চিত্রিত হইয়াছিলেন। পার্ব্বত্যপথে রাজসিংহের সহিত মোগল-সেনাপতির যুদ্ধ উপস্থিত তখন চঞ্চল রাজসিংহের তরবারি চাহিয়া লইলেন। তারপর বঙ্গদর্শনে ছিল—

"চঞ্চল অসি ঘুরাইয়া, মবারকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, তবে যুদ্ধ করুন। রাজপুতেরা যুদ্ধ করিতে জানে। আর রাজপুতানার স্ত্রীলোকেরাও যুদ্ধ করিতে জানে। খাঁ সাহেব! আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। স্ত্রীহত্যা হইলে আপনার বাদসাহের গৌরব বাড়িতে পারে।"

চঞ্চলের এই রণচণ্ডী মূর্ত্তি পরে বঙ্কিমচন্দ্র পরিবর্ত্তন করেন। সে পরে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজসিংহ ও মবারকের মধ্যবর্ত্তিনী হয় বটে, কিন্তু সে কমনীয়ভাবে। তেজের সহিত লজ্জার সেখানে অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখি, 'অসি ঘুরান' সেখানে

একেবারেই নাই। কাজেই এই সকল পরিবর্ত্তনে চঞ্চলকুমারীর চরিত্র যে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

এই সকল পরিবর্ত্তন নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যে কয়টি পরিবর্ত্তন তিনি করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিতে গ্রন্থের চরিত্র বা ঘটনা উৎকৃষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আর একটি উদাহরণ দিতেছি। রাজসিংহ যখন চঞ্চলকে উদ্ধার করিতে গিয়া বিপন্ন, যখন তাঁহার সসৈন্যে ধ্বংস আসন্ন, সেই সময় চঞ্চল বলিলেন "আমি দিল্লী যাইব। আমি এখন মোগলসম্রাটের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছি।" পাঠকের বুঝিতে বাকি থাকিবে না, যে রাজসিংহের প্রাণরক্ষার্থ চঞ্চল এরূপ বলিলেন। অভিপ্রায়, দিল্লীর পথে বিষ খাইবেন। রাজসিংহের তাহা তখনই বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনে ছিল "রাজসিংহ বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, তোমার দিল্লী যাইতে হয় যাও। আমার কোনও আপত্তি নাই। স্ত্রীলোক চিরকাল অস্থিরচিত্ত।" এই কথা কয়টি রাজসিংহের উপযুক্ত হয় নাই। রাজসিংহ একবারও যে ভাবিবেন যে চঞ্চল দিল্লীশ্বরের ঐশ্বর্য্য শুনিয়া লুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা একেবারে অসম্ভব। তাই রাজসিংহের চরিত্রোৎকর্ষ দেখাইতে, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা বুঝাইতে পরে বঙ্কিম লিখিলেন "রাজসিংহ বিস্মিত ও প্রীত হইলেন।" "স্ত্রীলোক চিরকাল অস্থিরচিত্ত" এ পংক্তি উঠাইয়া দিলেন। এই প্রীতির কারণ এই যে চঞ্চল রাজসিংহের রক্ষার্থ এই কথা বলিতেছেন তাহা রাজসিংহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাই তাঁহার মনে অভূতপূর্ব্ব প্রীতির উদয়। বঙ্কিম আরও এক পংক্তি যোগ করিয়া দিয়া ইহা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। রাজসিংহ বলিলেন "আর তোমার মনের কথা যে বুঝি নাই, তাহা মনে করিও না। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে দিল্লী যাইতে হইবে না।"

বর্ণনা অস্বাভাবিক না হয় সেজন্যও বঙ্কিমচন্দ্র দুই একটি পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথমে পুরোহিত "মিশ্রঠাকুর একাকী যাত্রা করিলেন।" ইহা লিখিত হয়। পরে সেই সময়কার ভ্রমণের অসুবিধা ও রাজপুরোহিতের একাকী ভ্রমণ করা নিতান্ত অস্বাভাবিক বুঝিয়া বঙ্কিম লিখিলেন "একমাত্র ভৃত্য সঙ্গে লইয়া" মিশ্রঠাকুর যাত্রা করিলেন। ডাকাতের আক্রমণের সময় "মিশ্রঠাকুরের ভৃত্যটি তৎক্ষণাৎ কোন্‌দিকে পলায়ন করিল, কেহ দেখিতে পাইল না।" চঞ্চল যখন দিল্লীযাত্রা করিল তখন তাহার পশ্চাতে অশ্বারূঢ় মাণিকলাল যে গীত গাহিতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র সেই

"শরম্ ভরম্‌সে পিয়ারী
সোমরত বংশীধারী
ঝুরত লোচনসে বারি।" ইত্যাদি

গীতটীর পরিবর্ত্তে প্রথমে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—

যাহা গায়িতেছিল, তাহার অনুবাদ যথা—
"যারে ভাবি দূরে সে যে সতত নিকটে।
প্রাণ গেলে তবু সে যে রাখিবে শকটে॥"

কিন্তু এই অনুবাদের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত গীতটি দেওয়াতে অনেক পরিমাণে স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নির্ম্মলকুমারীর সহিত মাণিকলালের কোর্টশিপ্ ও বিবাহের কথা বঙ্গদর্শনে ছিল না। পরে সংযোজিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র দুটি একটি শব্দ-পরিবর্ত্তনও করিতেন। "দুরারোহনীয় এবং দুরবরোহনীয়" স্থলে "দুরারোহ এবং দুরবরোহ," "আঁটু" স্থলে "হাঁটু," সৈন্যের উল্লাসধ্বনি "হর হর বম্ বম্" স্থলে "মাতাজীকি জয়" প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গদর্শনে দিল্লী যাত্রার উদ্যোগের সময় চঞ্চলকুমারী এক স্বপ্ন দর্শন করেন ইহা লিখিত হইয়াছিল। পরে ইহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হয়। সে স্বপ্নবৃত্তান্তটি এই—

"নিশীথকালে, নিদ্রার ঘোরে, চঞ্চলকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন, যে রজত গিরিসন্নিভ মহাকায়, বৃষভারূঢ়, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, জটাজুটসমন্বিত, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার সম্মুখে মূর্ত্তিমান্। তিনি আজ্ঞা করিতেছেন, তুমি কাল হইতে ভক্তিভাবে আমার পূজা করিবে। বৎসরকাল প্রত্যহ তুমি আমার পূজা করিবে। সেই বৎসর মধ্যে তোমার বিবাহ হইবে না। তাহার পর উপযুক্ত সময়ে তোমার বিবাহ হইবে। যদি একবৎসর ভক্তিভাবে পূজা কর, তবে অভীপ্সিত স্বামী পাইবে, ভক্তির ত্রুটি হইলে অনভিমত স্বামীর হস্তে পড়িবে।"

এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া স্নান করিয়া চঞ্চলকুমারী যত্নসঞ্চিত গঙ্গাজল লইয়া মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রণাম করতঃ ভক্তিভাবে দেবাদিদেবের পূজা করিলেন। স্বপ্নের কথা কাহাকেও বলিলেন না। যে তিনদিন রাজকুমারী রূপনগরে অবস্থিতি করিলেন, সে তিনদিন তিনি ঐরূপে শিবপূজা করিলেন। কিন্তু উদয়পুর হইতে কোনও সংবাদ আসিল না। মিশ্রঠাকুর ফিরিলেন না। তখন চঞ্চলকুমারী ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিল "হে অনাথনাথ দেবাদিদেব! অবলাকে কি প্রবঞ্চনা করিলে?"

বর্ত্তমান 'রাজসিংহ' আমরা যে আকারে দেখিতেছি, তাহার চতুর্থ খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদ প্রথম প্যারা পর্য্যন্ত বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার পর 'রাজসিংহ' বঙ্গদর্শনে আর প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু বঙ্গদর্শনে ইহার পর আরও কিয়দংশ ছিল। সে অংশটুকু নিতান্ত কম নহে। একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ ও একটি পরিচ্ছেদের অর্দ্ধাংশ। চঞ্চলকুমারীকে রাজসিংহ ছিনাইয়া লইয়া গেলে, মোগলসেনাপতি কি করিল তাহা লইয়াই একটি উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছিল। দীর্ঘ হইলেও আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"এদিকে মোগল সেনাপতি বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। রণে তিনি পরাজিত হইয়াছেন—বাদশাহের ভাবী মহিষী তাঁহার হস্ত হইতে রাজপুতে কাড়িয়া লইয়াছে! কি বলিয়া তিনি দিল্লীতে মুখ দেখাইবেন? বাদশাহকে কি উত্তর দিবেন? বাদশাহের নিকট লঘুদণ্ডের সম্ভাবনাই বা কি? সৈন্যের অধিকাংশই হত হইয়াছে, যাহা জীবিত আছে তাহারা কে কোথায় পলাইয়া গিয়াছে তাহার কোনও ঠিকানাই নাই! তিনি মবারককে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মবারকের পরামর্শে এক প্রান্তরমধ্যে নিশান পুতিয়া ভেরী বাজাইতে আজ্ঞা করিলেন। দুইজনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মোগল সেনাগণ এদিক ওদিক পলাইয়াছিল। যুদ্ধ ক্ষান্ত হইয়াছে বুঝিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে আসিয়া নিশানের কাছে জুটিল। তখন সেই ভগ্ন সেনা লইয়া সেই প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া হাসান আলি রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর একাকী তাম্বুমধ্যে বসিয়া হাসান আলি খাঁ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে বাদশাহের কাছে মান ও প্রাণ রক্ষা হইবে? শেষ তাহার উপায় স্থির করিয়া আপনার প্রিয়পাত্র হামীদ খাঁকে ডাকিয়া স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিলেন। হামীদ সেলাম করিয়া বিদায় হইল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন আবদুল হামীদও ভাবিতে জানে। তাহারও একটি ছোট তাম্বু ছিল—সেখানে সে আসিয়া কুরশীর উপর বসিয়া হুকায় অম্বুরী তামাকু চড়াইল। চারি পাঁচজন পারিষদ জুটিয়া গেল। সকলে মিলিয়া রাজপুতগণের ধূর্ত্ততা ও ভীরুতার বিশেষ নিন্দা, এবং আপনাদিগের অসাধারণ বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দাড়ি চুমরাইয়া ছেপ ফেলিতে ফেলিতে স্থির করিলেন যে, তাঁহারা একটা ভারি রণজয় করিয়াছেন, এবং রাজপুতেরা মূষিকতুল্য পলায়ন করিয়াছে—কোন ক্রমে রাজকুমারীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে মাত্র। বিশেষ শিবিরমধ্যে গোটাকত বড় বড় বকরি ও আরও বড় বড় চতুষ্পদ ও পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদের শুভাগমন হইয়াছে ও শুভ জবাইয়ের উদ্যোগ হইতেছে, ইতি সংবাদ আসিবার অদ্য রাত্রে সমাংস খিচুড়ী

ভোজনের বিশেষ প্রত্যাশা সকলেরই চিত্তমধ্যে উদিত হইল। সুতরাং তাঁহারা যে বিজয়ী বীরপুরুষ তদ্বিষয়ে আর কাহারও কোনও সন্দেহ রহিল না। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, পলাণ্ডু লশুন বিমিশ্র পক্ক মাংসের সুগন্ধে যাঁহার মনে বীররস উছলিয়া না উঠে তাঁহার দাড়ি গোঁপ বৃথায় ধারণ! সে গিয়া শ্মশ্রু গুম্ফ ও মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া আতপ তণ্ডুল ও মর্ত্তমান রম্ভার উপর ভরাভর করুন—তাঁহার আর কোন গতি দেখি না। তাঁহাদিগের দুঃখে আমি সর্ব্বদা কাতর।

এইরূপে আবদুল হামীদ এবং তস্য পারিষদেরা মাংসাহার ভরসায় উচ্ছ্বলিত বীররসে পরিপ্লুত হইয়া, শ্মশ্রুভার বহন সার্থক বিবেচনা করিলেন। আবদুল হামীদ তখন ছিলিমে একটু ফুৎকার দিয়া বলিলেন "ভাই সব! বীরপণা ত দেখাইয়াছ কিন্তু মেয়েটা যে রাজপুতেরা লইয়া গিয়াছে, সে কাজটা বড় ভাল হয় নাই। বাদশাহ সে কথা শুনিলে মনে করিবেন, যে তোমাদের রণজয় সব বৃথা গল্প! বিশ্বাস করিবেন না।" এই বলিয়া আবদুল হামীদ একটি ফারশী বয়েৎ আওড়াইলেন—আমরা শুনিয়াছি যে সে বয়েতের একটি শব্দও ফারশী নহে, তবে খাঁ সাহেবের রক্তবর্ণ চক্ষু, হাতনাড়ার জোর এবং গম্ভীর উচ্চারণের ঘটায় পারিষদেরা সকলেই মনে করিল যে, এ একটা ভারি বয়েৎ। তখন আবদুল হামীদ বিস্মিত শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে সেই অলৌকিক বয়েতের ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, যে ফলেই কার্য্যের পরিচয়। ফলটি না দেখিলে বাদশাহ রণজয়ের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? তাঁহাকে ফলটি দেখাইয়া দিতে হইবে। তবে আমাদের সেরপা মিলিবে।

মাজ্জুমহোসেন নামে একজন স্থূলবুদ্ধি পারিষদ বলিল, "সে ফলটি কি?"

আবদুল হামিদ বলিলেন, "বদ্‌বখৎ বুঝ্‌লে না? সে ফলটি রাজকুমারী।"

মাজ্জুম। রাজকুমারী আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

আবদুল হামীদ। কেন, রাজকুমারী কি কাহারও গায়ে লেখা থাকে? যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া দোলায় চড়াইয়া লইয়া গেলেই বাদশাহকে ভুলান যাইতে পারে।

শ্রোতৃগণ আবদুল হামীদের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইল। তাঁহারা বিস্তর সাধুবাদ করিলেন। কিন্তু বোকা মাজ্জুম সহজে বুঝে না। সে বলিল "হুঁ। যে সে মেয়ে লইয়া গিয়া দিলে কি বাদশাহ ঠকিবে? মুলুকের বাদশাহ—সে কি ছোটলোক বড়লোক চিনিতে পারে না?"

আবদুল। আমরা বড় ঘরের মেয়েই লইয়া যাইব।

মাজ্জুম। কোথায় পাইবে?

আব। যেখানে বড় বাড়ী দেখিব, সেইখানে তরবার হাতে প্রবেশ করিয়া, মেয়ে কাড়িয়া আনিয়া দোলায় বসাইব।

মাজ্জুম। দোলাই বা পাইবে কোথায়? তাও ত রাজপুত কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

আবদুল। তাহাও যেখানে দেখিব সেইখান হইতে কাড়িয়া আনিব।

মা। বস্ত্রালঙ্কার?

আ। তাও লুঠ করিয়া আনিব। হাতিয়ার থাকিলে অভাব কিসের? যার হাতিয়ার আছে, ছুনিয়া তার।

পারিষদগণ আবদুল হামীদের বিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু মূর্খ মাজ্‌ম তবু বুঝে না। তথাপি আপত্তি করিতে লাগিল। বলিল "তোমরা যেন রাজকন্যা সাজাইয়া বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলিলে এই রূপনগরের রাজকুমারী—কিন্তু কন্যা যদি বলে যে না—আমাকে মার কোল থেকে কাড়িয়া আনিয়া জাল রাজকুমারী সাজাইয়াছে।"

আবদুল বলিল,"উঃ! তা আর বলিতে হয় না। দিল্লীর বাদশাহের বেগম হতে কার অসাধ?"

মাজ্‌ম। হোক—না হয় সেই যেন লোভে পড়িয়া চুপ করিল—কিন্তু এই ছাউনিতে এত শিপাহী—ইহাদের কাহারও না কাহার দ্বারা এ জাল প্রকাশ পাইবে—তখন আমাদিগের প্রাণ কে রাখিবে?

আবদুল হতাশ হইয়া বলিল "আল্লা! এত বড় বেঅকুব বদহোস্ কমবখ্‌ৎ বেচারা আমি ত কখন দেখি নাই! এই ছাউনির মধ্যে আমার এ কারসাজি জানিবে কে? আমি কি একথা আর কাহাকে বলিব নাকি? কন্যা আনিয়া ছাউনিতে উপস্থিত করিয়া বলিব যে রাত্রে রাজপুতের ছাউনিতে পড়িয়া তাহাদের ফতে করিয়া রূপনগরের শাহজাদীকে কাড়িয়া আনিয়াছি। ভাবনা কি? সকলে সেরোপা পাইব।"

শুনিয়া পারিষদেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সুভান আল্লা। এত আকেল ও হোস্ ও ফেকের ও হিম্মৎ ও বঁওয়া মরদী ও এলেম পোষত পোষতান বুজুর্গ মধ্যে কেহ কখনও দেখে নাই। মাজ্জুমও পরাভূত হইয়া নীরব হইয়া রহিল।

তখন আবদুল হামীদ আপন পৌরুষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ বলিলেন, "হে ভাই সকল! কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আজ রাত্রেই এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এখানে কোথায় বড় লোকের বাড়ী আছে কেহ সন্ধান রাখ?"

তখন মেহের সেখ নামে একজন শিপাহী বলিল, "আমি একটি বড় মানুষের বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। যুদ্ধকালে বড় পরিশ্রম হওয়ায় আমি দণ্ডক্ষণ জন্য বিশ্রামলাভের অভিপ্রায়ে এক উদ্যানমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম (অস্যার্থঃ,—প্রাণ লইয়া পলাইয়া বনের ভিতর সারাদিন লুকাইয়াছিলেন) সেইখানে এক বড় ভারি বাড়ী দেখিয়াছি—বড় লোকের বাড়ী অনুমান হয়।"

আবদুল হামীদ খুসি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে বাড়ীতে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে কি না কোন সন্ধান রাখ?"

যে বাড়ীর কথা মেহের সেখ বলিতেছিল সে মোহনলাল শেঠিয়া নামে একজন অতি ধনাঢ্য বণিকের বাড়ী। তাহারই পার্শ্বস্থ জঙ্গলে মেহের লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতে যমুনা নামে একজন অর্দ্ধবয়সী পরিচারিকা ছিল। কৃষ্ণাঙ্গী, স্থূলোদরী, পঞ্চাশৎ বর্ষবয়স্কা। দৈবাৎ উপরের জানালা হইতে, বনমধ্যে লুকায়িত মেহেরের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মেহেরেরও সেই সময়ে যমুনার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এখন, এ পঞ্চাশৎ বৎসর মধ্যে কেহ কখন যমুনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহে নাই। যমুনা মনে করিল আজ সে সুখের দিন উপস্থিত হইয়াছে—যখন এ ব্যক্তি বনের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া আমার পানে চাহিতেছে

তখন নিশ্চিত এ আমার উপাসক ; ইহাকে মদনানলে পীড়িত করাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া যমুনা মেহেরের প্রতি চক্ষুঃকোঠর হইতে একটি বিলোল কটাক্ষ ঝাড়িয়া গৃহকর্ম্মে গেল। আবার একটু ঘুরিয়া আসিয়া আবার একটি ধারাল রকম নয়ন-বাণ হানিয়া ফেলিল। মেহেরও মর্ম্ম বুঝিয়া চরিতার্থ হইলেন। এই পঞ্চষষ্টি বৎসর বয়সে তাঁহার পাকা দাড়ি সার্থক বিবেচনা করিলেন—এবং বিমুগ্ধচিত্তে সন্ধ্যার পর সেই ত্রিতল গৃহমধ্যে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় গন্ধদ্রব্য ও পুষ্পমাল্য সহিত যমুনাসুন্দরীর বাহুলতায় কণ্ঠবেষ্টনের সুখকল্পনা করিতেছিলেন—ইত্যবসরে হাসান আলির ভেরী বাজিল। অগত্যা তাঁহাকে শিবিরে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু অদর্শনে কল্পনা দেবীর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ হয় অতএব মেহের ক্রমে ভাবিতে লাগিলেন যে সেই বাতায়নবিহারিণী মেহের প্রেমে অভিভূতার ন্যায় সুন্দরী আর ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহাতে মেহেরের অপরাধ নাই। কেন না, এই পঞ্চষষ্টিবৎসর পরিমিত জীবনমধ্যে তাহার অস্থিময় কৃষ্ণকান্তি কখনও স্ত্রীজাতির সরস কটাক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই। অতএব যখন আবদুল হামীদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে গৃহে যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী আছে কি না, তখন মেহের বেচারা এককালীন কল্পনা ও অলঙ্কারশাস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীদেবীর বশীভূত হইয়া বলিল যে, গোলাবের মত মোলায়েম, আফতাব ও সেতারের মত রোশনাই করনেওয়ালী দুই একজন ষোড়শী রমণী তিনি সেই গৃহে দেখিয়া আসিয়াছেন। আরও বলিলেন যে তাহারা (কল্পনায় বহুবচন) অত্যন্ত সুরসিকা—তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন এবং কেবল নিমকের অনুরোধেই তিনি সেই ত্রিতল গৃহস্থিত দুগ্ধফেণনিভ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কঠিন মাটিতে শয়ন করিতে আসিয়াছেন।

আবদুল হামীদ মেহেরের সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন কি না বলিতে পারি না—কিন্তু তিনি আহারান্তে সেই গৃহমধ্যে ইষ্টসাধনার্থ প্রবেশ করাই স্থির করিলেন এবং অনুচরবর্গকে বলিলেন যে, তোমরা ভাই বেরাদারি মধ্যে পঞ্চাশজন জোয়ান সংগ্রহ কর। ঠুসিয়া খিচুড়ী ভোজন করিয়া সকলে হাতিয়ার বন্ধ হইয়া এইখানে আসিও, মোল্লা মুফ্‌তির মাথায় বাজ পড়ুক—আমি কিছু উত্তম সরাব সংগ্রহ করিয়াছি—একত্রে পান করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে যাত্রা করিব।"

এইখানেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রাজসিংহের সমাপ্তি। এই উপাখ্যানটির শেষ কি হইবে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্ধারিত করিয়াছেন জানি না। * যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির (উপ) সংহার করিয়াছেন, তাঁহারা এটুকুর অবশিষ্ট অংশ লিখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এই উপাখ্যানটি পরে উঠাইয়া দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ভালই করিয়াছেন। মূল ঘটনার সহিত ইহার কোনও সংস্রব নাই। মূল উপন্যাসের কোনও চরিত্র ইহাতে ফুটে না। সুতরাং অবান্তর কথার

* বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পর 'রাজসিংহ' অতি ক্ষুদ্র কলেবরে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'শেষ নির্দ্ধারণ' ছিল। পরে উহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার লাভ করে—সম্পাদক।

অবতারণার ন্যায় ইহার অবতারণাও নিষ্ফল। 'রাজসিংহ' 'আলফ্ লয়লা' নহে যে গল্পের ভিতর গল্প থাকিলে শোভা বৃদ্ধি হইবে। যে সকল অবান্তর উপাখ্যান মূল আখ্যানের সৌন্দর্য্যবিকাশে কোনও সাহায্য করে না তাহা বর্জ্জনীয়। আমরা কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলিয়া ও ইহার বর্ত্তমানকালে প্রচার নাই বলিয়া এতখানি উদ্ধৃত করিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি উপদেশ দিয়াছিলেন, "কাব্য, নাটক, উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।" আমরা রাজসিংহের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অংশের সহিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রাজসিংহ তুলনা করিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র নিজ রচনা কিরূপ সাবধানে সংশোধন করিয়াছেন। যে যে চরিত্র বা যে যে ঘটনায় কিছুমাত্র দোষ ছিল তাহার পরিবর্ত্তনে বঙ্কিমচন্দ্র বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা দেখিলাম, কিরূপে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নির্ম্মমহৃদয়ে নিজ রচনা সংশোধন করিয়াছেন, দেখিলাম ক্ষুদ্র উপাখ্যান কিরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে বৃহৎ উপন্যাসে পরিণত করাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর এইরূপ ক্রমবিকাশ নিপুণভাবে আলোচ্য। অন্যান্য দেশের সাহিত্য-সমালোচনায় এই সকল পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে লক্ষিত হয়, কিন্তু যতদূর জানি আমাদের দেশে এ চেষ্টা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাই আজ বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ লইয়া এইরূপ ক্রমবিকাশের উদাহরণ দিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

বাস্তুভিটা।

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—বাঙ্গালা দেশে এ বাক্য বহুদিন হইতে প্রচলিত থাকিলেও, বাঙ্গালী জন্মভূমি মানে 'বাঙ্গালা দেশ' বা 'ভারতবর্ষ' বুঝিত না। এখন শিক্ষিত বাঙ্গালী বিলাতী রাজনীতি আলোচনা করে, কংগ্রেসের নেতাদিগের স্বদেশহিতকর ওজস্বী ভাষায় অনুপ্রাণিত হয়, কাজেই, তাহারা ভারতবর্ষকে 'জন্মভূমি' বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে। কিন্তু আপামর সাধারণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ের অন্তস্তলটুকু বেশ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে বুঝা

যায় যে, তাহারা বাস্তভিটাকেই জন্মভূমি বলিয়া বুঝে। বাঙ্গালী সহজে বাস্তভিটা ছাড়িতে চাহে না। ভিটা বিক্রয় করা বাঙ্গালীর পক্ষে অধঃপতনের চূড়ান্ত।

যুবক রমানাথ নৌকারোহণে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় হৃদয়ে বড় আনন্দ, বড় তৃপ্তি উপভোগ করিতেছিল। আবার কাল চাঁদ উঠিবার পূর্ব্বে সে তাহার পৈতৃক ভিটা উদ্ধার করিতে পারিবে—আজ পাঁচ বৎসর পরে সে তাহার মুমূর্ষু পিতার শেষ আদেশ পালন করিতে সক্ষম হইবে—এই প্রীতিকর চিন্তা যুবক রমানাথকে আত্মহারা করিতেছিল।

তাহার পিতা মামলা-মোকদ্দমা করিয়া একে একে পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্তই নষ্ট করিয়াছিলেন। শেষে চতুর্দ্দশ বিঘা বাগান ও পুষ্করিণী-সংযুক্ত ভদ্রাসন বন্ধক দিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তমর্ণের সহিত বন্দোবস্ত ছিল যে, দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে সে সম্পত্তি দায়মুক্ত করিতে না পারিলে তাহার পৈত্রিক বাস্ত উত্তমর্ণের অধিকারভুক্ত হইবে। তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি অনেক টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে ঋণের মাত্র পাঁচশত টাকা অবশিষ্ট ছিল। তখনও মিয়াদের পাঁচ বৎসর বাকি ছিল।

তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁহার একমাত্র পুত্র রমানাথকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা তোমার তো উনিশ বছর বয়স হ'ল, তুমি সবই বোঝ। আমার আর এ যাত্রা রক্ষা নাই।"

রমানাথ পিতার বাক্যে বালকের মত কাঁদিয়াছিল, আজ নৌকার উপর শুইয়া অলসভাবে চাঁদের দিকে চাহিতে চাহিতে যুবক সে কথা স্মরণ করিল। সে শৈশবেই মাতৃহীন হইয়াছিল।

তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাহার পিতা বলিয়াছিলেন—বাবা, কাঁদবার সময় নাই। তোমার মা আমায় ডাকছেন। তোমাকে পথে বসিয়ে যাচ্চি। আমার দুটা কথা—

তাহার পিতার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। রমানাথ পিতার মুখের নিকট কান লইয়া গিয়াছিল। পিতা ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন—"কখনও মোকদ্দমা ক'র না। আর যেমন ক'রে পার আজ হ'তে পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাস্তভিটা উদ্ধার ক'র। পাঁচ বৎসর পরে সুদে আসলে ঋণ হাজার টাকা—"

এই অবধি বলিয়া পিতা চক্ষু মুদিয়াছিলেন। রমানাথের চক্ষু আর্দ্র হইতেছিল। তাহার পর পিতার মুখ হইতে দুইটি মাত্র বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল—'হরি! হরি'! তাহার পর চিরদিনের জন্য সে মধুর বীণার স্বর বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু

পিতার শেষ আদেশ রমানাথ ভুলে নাই। শেষ কথা দুইটি সর্ব্বদা তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইত।

(২)

রমানাথ নৌকার উপর শুইয়া আবার হিসাব করিল। পাঁচ বৎসর শেষ হইতে আর পাঁচদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই পাঁচবৎসর প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অনশনে অর্দ্ধাশনে কায়িক ক্লেশে সে সহস্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছে। যখন ক্ষুধার জ্বালায় তাহার দেহ অবসন্ন হইত তখন আশার মধুর স্বর তাহাকে অনুপ্রাণিত করিত। পিতার শেষ কথা দুইটী কাণে বাজিত—'হরি! হরি'! হরিনাম বড়ই মধুর। কিন্তু রমানাথের নিকট হরিনামের এক নূতন রকম মাধুরী ছিল।

আজ রমানাথ সমরবিজয়ী বীর। আজ সে বড় সুখে চাঁদের গরিমা দেখিতেছিল। যুবক চাঁদের কোলে ছোট ছোট কাল মেঘের টুকরার চলাফেরা লক্ষ্য করিতেছিল আর ভাবিতেছিল—'মনুষ্য জীবনে আশা পূরণের মত সুখ আর কিছু নাই।' তাহার বাস্তুভিটার প্রত্যেক অংশটি তাহার নিকট এক অনির্ব্বচনীয় সুষমামণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই পুকুর, সেই জমি, সেই ফুলগাছ, সেই আমগাছ, সেই ছাদ, সেই দেওয়ালের বালিভাঙ্গা, সেই পেয়ারা বাগান, সেই ফাটা দরজা—বাস্তবিকই স্বর্গাদপি গরীয়সী।

ধীরে ধীরে রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল—কত দূর রে মাঝি?

মাঝি বলিল—আজ্ঞা, মহিষাদল তো তিন প্রহর বেলায় পার হ'য়েছি বাবু। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তেরপেখ্যে পৌছে যাব।

রমানাথের নৌকা খালের ভিতর দিয়া চলিতেছিল। ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থল গেঁয়োখালি হইতে এ খাল আরম্ভ। মহিষাদলের নিম্ন দিয়া খাল তেরপেখিয়া অবধি গিয়া হলদী নদীতে পড়িয়াছে। তেরপেখিয়ায় দুইটা 'লকগেট' আছে। হলদীর ওপারে ইটামগরায় আবার খাল আরম্ভ হইয়াছে। সেখানে দুইটা 'লকগেট' আছে। ইটামগরা হইতে ১৬ ক্রোশ যাইলে রমানাথের বাড়ী।

রমানাথ বলিল—জোয়ার হ'বে কখন রে?

মাঝি বলিল—আজ্ঞা রাত্রি একটায়।

রমানাথ বুঝিল যে, সে পরদিন দ্বিপ্রহরে বাটী পৌছিবে। তিনজনে নৌকার গুণ টানিতেছিল। রমানাথ তাহাদিগকে 'ফুর্ত্তি' করিতে বলিল। তাহারা একটু দ্রুত চলিতে লাগিল। রমানাথের চক্ষু মুদিয়া আসিল। কেবল তাহার কর্ণে

নাবিকদিগের গানের শব্দ মৃদু মন্দ জলের শব্দের সহিত মিশিতে মিশিতে প্রবেশ করিতেছিল।

(৩)

তেরপেখিয়ার খালের বাঁধের উপর হইতে ভাঁটার সময় হলদী নদীর দিকে চাহিলে হলদীর উপর কিছু শ্রদ্ধা হয় না। পাড় হইতে হলদী খুব গভীর হইলেও ভাঁটার সময় হলদীতে সামান্য জল থাকে। তেরপেখিয়ার পার হইতে ইটা-মগরার পার বহুদূর বলিয়া মনে হয়। ভাঁটার সময় সেই স্বল্পজলপূর্ণ হলদী নদীর ধারে কাদার উপর কাদাখোঁচা ও খঞ্জন নাচিয়া বেড়ায়, আর এক একটা সাদা বক দুর্গের সিপাহীর মত এখানে ওখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাহারা দেয়। খালের ফটকের উপর হইতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, খালের জলের 'থামাল' হলদীর জল হইতে প্রায় বিশ ফুট উঁচু। এই ভাঁটার সময় একবার খালের দরজা খুলিয়া দিলে সমস্ত খালের জল হলদীতে নিঃশেষ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

খাল ও নদীর সংযোগের মুখে দুইটা করিয়া ফটক থাকে। প্রথম ফটকটা খুলিয়া তাহার ভিতর নৌকা প্রবেশ করাইয়া সে ফটক বন্ধ করা হয়। পরে নদীতে জোয়ার আসিলে খাল ও নদীর জলের 'থামাল' যখন সমান হয় তখন দ্বিতীয় ফটক খুলিয়া খালের নৌকা বাহির করিয়া দেওয়া হয় আর বাহিরের নৌকা খালের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লওয়া হয়। সে সময় নাবিকদিগের হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি গলাবাজিতে সে স্থলটি বেশ সরগরম হইয়া উঠে।

প্রায় মধ্য রাত্রে রমানাথের নৌকা তেরপেখিয়ায় আসিয়া পঁহুছিল। তাহার অল্পক্ষণ পরেই তাহার নৌকা প্রথম ফটকের মধ্যে ঢুকিল। রাখী পূর্ণিমার চন্দ্র হলদীর আবিল জলরাশিকেও লাবণ্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল। রমানাথ নৌকা ছাড়িয়া পাড়ের উপর উঠিল। হলদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া সে হলদীতে জোয়ার দেখিতেছিল।

হলদী নদীর এ অংশটি সাগরের সন্নিকটে। বেগে জোয়ার আসিতেছিল। জলের কি ভীষণ রোল। সে প্রবল জোয়ারের মুখে মত্ত ঐরাবত পড়িলেও তৃণের মত ভাসিয়া যাইতে পারে। ক্ষণে ক্ষণে জলের মাত্রা বাড়িতেছিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে প্রায় কুড়ি ফুট জল বাড়িল। খালের ফটকের ভিতর ও বাহিরে জলের মাত্রা সমান হইল।

রমানাথ নৌকায় গিয়া বসিল। মাঝিরা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল। হলদী পার হইবার সময় কোন আরোহী নৌকার ঘরের ভিতর বসিতে পায় না।

রমানাথ বাটীর যত নিকটে আসিতেছিল তাহার আনন্দ তত বাড়িতেছিল। সে প্রফুল্লচিত্তে নৌকার উপর বসিয়াছিল। নৌকা খালের বাহির হইয়াই জোয়ারের টানে তীর বেগে ছুটিতে লাগিল। নাবিকেরা 'হরি! হরি!' বলিতে লাগিল। রমানাথের বড় আনন্দ হইল। তাহার ধমনীর ভিতর শোণিত রাশি 'হরি হরি' বলিয়া তাহার প্রতি লোমকূপে আনন্দের লহর ছুটাইল। সেই স্ফীত নদীস্রোতের সহিত অমল শুভ্র জ্যোৎস্না মিশিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছিল। সেই বেগবতী তরণীতে বসিয়া ভীত নাবিকদিগের হরিধ্বনি শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ রমানাথ বক্ষের নিকট হইতে একটি ক্ষুদ্র থলি বাহির করিল। তাহার ভিতর তাহার পিতৃ-আজ্ঞা পালনের সামগ্রী ছিল,তাহাতে তাহার পাঁচ বৎসরের উদ্যম উৎসাহ পরিশ্রমের ফল আবদ্ধ ছিল। সেই বেগবতী তরণীতে বসিয়া আনন্দিতমনে রমানাথ চাঁদের আলোতে একবার থলিটি তুলিয়া ধরিল। তাহার ভিতর কি প্রবল মোহিনী শক্তি আবদ্ধ ছিল! সে নৌকায় বসিয়া পূর্ব্বে অনেকবার সেই থলিটি দেখিয়াছিল। খরস্রোতা হলদীর উপর সে আবার সেই টাকার তোড়াটি দেখিল। তাহার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির স্মৃতিতে তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইল। হঠাৎ নৌকা একটু টলিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! টাকার তোড়া যুবকের হস্তচ্যুত হইয়া হলদীর জলে পড়িল। যুবকের হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হইল। সে আত্মহারা হইয়া জলে লাফাইয়া পড়িল।

'বাবু! বাবু! কি কর!' ভীত নাবিকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্ষিপ্ত রমানাথ টাকার তোড়াটাকে ধরিবার জন্য ডুবিল, উঠিল, আবার ডুবিল, আবার উঠিল; বাতুলের মত বারিবেগের সহিত যুঝিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে মত্ত স্রোতে রমানাথ তৃণের মত ভাসিয়া গেল! তাহার সংজ্ঞা লোপের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাহার কর্ণে আর্ত্ত নাবিকদিগের চীৎকার পঁহুছিল—'হরি বোল'! 'হরি বোল'! 'হরি! হরি'!

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

পাপক্ষয়।

জ্যোতির্ম্ময়ী একমুখ হাসি লইয়া, সোণার অঙ্গে একরাশি গহনা পরিয়া উৎকৃষ্ট রকমের প্রসাধন সমাপন করিয়া স্বামীর সহিত মোটরে উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী এত এসেন্স মাখিয়াছিল যে যখন ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে তাহার স্বামী-পরিচালিত মোটর গাড়ী ভীমবেগে ছুটিতেছিল, তখন পথ সুগন্ধে আমোদিত হইতেছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীর স্বামী তাহাকে খুব আদর করিত, ভালবাসিত, নিত্যই তাহাকে নূতন নূতন উপহার আনিয়া দিত, কিন্তু গুরুজনের ভয়ে, পাড়া-প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজনের সমালোচনার জ্বালায় আপনার অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রীটিকে মোটর গাড়ী করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতে পারিত না। আজ বহুদিন পরে তাহার ভাগ্যে এ সুখ ঘটিয়াছিল বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয় এত প্রফুল্ল হইয়াছিল।

গড়ের মাঠে সুন্দরী নানা দৃশ্য দেখিল। কত সাহেব মেম বাঙ্গালী মাড়োয়ারী ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। কলিকাতার মত সহরের রাজপথে দেখিবার ও শিখিবার অনেক পদার্থ আছে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিতেছিল সব, কিন্তু শিখিতেছিল অল্প। কারণ তাহার স্বামী সম্মুখে বসিয়া সারথির কার্য্য করিতেছিল। সে গাড়ীর ভিতর একেলা বসিয়াছিল।

বহুবাজারের মোড়ে আসিয়া গাড়ী হঠাৎ থামিল। একটা কাতর আর্ত্তনাদে যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তাহার স্বামী সৌরেন্দ্র তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। গাড়ীর গবাক্ষ দিয়া মুখ বাড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিল রক্তাক্তদেহে একটী আট দশ বৎসরের বালক যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। বেদনায় পথের পাথরের উপর গড়াইতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর চক্ষে জল আসিল। সে রকম মুখের কাতরতা সে অদ্যাপি দেখে নাই। যখন দুই তিনজনে মিলিয়া বালককে তুলিল তখন দেখা গেল যে তাহার বামপদের হাঁটুটি একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

(২)

জ্যোতির্ম্ময়ী ভাবিতেছিল—"পাপতো কখনও করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে আমার এমন শাস্তি হইতেছে কেন"? সেত কখন কাহারও অনিষ্ট

করে নাই, তবে কেন তাহার পুত্রের এমন কঠিন পীড়া হইল? সেকথা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার স্বামী সৌরেন্দ্রমোহন যখন ক্রোধের বশে চাকরদিগকে ভৎর্সনা করিত, তখন পাছে তাহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বামীকে অভিসম্পাত করে সেই ভয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাদিগকে নিভৃতে ডাকিয়া কিছু কিছু অর্থ দিত আর দুঃখিত হইতে নিষেধ করিত। কত দরিদ্র প্রতিবেশিনী তাহার নিকট হইতে সাহায্য পাইত। তবু কেন তাহার পুত্রটি এমন পীড়িত হইল, সে তাহার কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহার ঘরের বিলাস-সজ্জা যেন তাহাকে ধিক্কার দিতেছিল। তাহার মনে মনে সন্দেহ হইতেছিল তবে কি এসব সুচারু শিল্প-দ্রব্যের সহিত সুখ বাস করে না। সুখ কি কেবল পর্ণকুটীরে থাকে?

চিন্তিতা জ্যোতির্ম্ময়ীকে সৌরেন্দ্র বলিল—তুমি কেন মিছে ভাব্‌ছ জ্যোতি? ডাক্তার সাহেব বল্‌লেন যত্ন করলেই খোকা সারবে।

জ্যোতির্ম্ময়ী ডাক্তার সাহেবের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা না দেখাইয়া বলিল—আমি বড় পাপী। তা না হ'লে—

সৌরেন্দ্র হাসিল। সে তাহাকে বুঝাইল যে তাহার অনুতাপের কোনও কারণ নাই। তাহার মত রমণী-রত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না।

জ্যোতির্ম্ময়ী সে কথাটা মোটেই বিশ্বাস করিল না। সে বলিল—না একটা কি অপরাধ হ'য়েছে। আমার মন বল্‌ছে কি একটা পাপ হ'য়েছে। পাপটুকু ক্ষয় না হ'লে খোকা সার্‌বে না।

কি করিলে তাহার সে কল্পিত পাপটুকু ক্ষয় হইতে পারে যুবক সৌরেন্দ্র তাহা জানিতে চেষ্টা করিল। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, পরদিন তাহারা কালীঘাটে গিয়া মাতৃদর্শন করিয়া আসিবে আর প্রত্যেক কাঙ্গালীকে জ্যোতির্ম্ময়ী স্বহস্তে একটি করিয়া সিকি বিতরণ করিবে।

(৩)

মৌচাকে খোঁচা দিলে যেমন মোমাছির দংশন-জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, তীর্থস্থানের ভিখারীদিগের প্রতি একটু দয়া দেখাইলে তেমনি বিপদে পড়িতে হয়। আদি গঙ্গায় স্নান করিয়া গরদের সাড়ী পরিয়া পিঠে কুঞ্চিত কেশদাম ঝুলাইয়া কালীঘাটের কাঙ্গালীদিগকে সিকি বিতরণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী প্রথমটা আনন্দ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে যখন তাহারা 'মা তোমার জয় হোক' 'রাণী মা সুখে থাক' প্রভৃতি চীৎকারে তাহাকে ঘেরিয়া ধরিল তখন তাহার জয় বা সুখ পাইবার সম্ভাবনা মোটেই রহিল না। এক একজন ভিখারী

ঘুরিয়া ফিরিয়া তিন চারি বার করিয়া তাহার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিল। যাহারা কানাখোঁড়া তাহারা মোটেই সে ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার নিকট আসিতে পারিল না। সুতরাং যে যত বলবান সে তত অধিক লাভ করিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রবলের জয়।

শেষে যখন বহুকষ্টে জ্যোতির্ম্ময়ী ঘর্ম্মাক্তকলেবরে আলুলায়িতকেশে বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তখন তাহার স্বামী হাসিয়া বলিল—কি হ'ল, সাধ মিট্‌ল?

যুবতী একটু হাসিল। সৌরেন্দ্রের চক্ষে সে শতগুণ সুন্দরী বলিয়া প্রতিভাত হইল। সে তাড়াতাড়ি পুত্রকে বুকে তুলিয়া চুম্বন করিয়া বলিল—এবার মণি সেরে যাবে। কি বল?

শিশু একটু হাসিল। বাহির হইতে দ্বিগুণ বেগে—'জয় হোক' 'জয় হোক' শব্দ আসিতে লাগিল। সৌরেন্দ্রমোহন স্ত্রীকে দরজা খুলিতে দিল না।

তাহাদের বাটী যাইবার সময় হইয়াছিল। তখন আর ভিখারীর দল তাহাদিগের অনুসরণ করে নাই, তাহারা গাড়িতে উঠিয়া বসিল। জ্যোতির্ম্ময়ী কালীমাতার মন্দিরের চূড়ার দিকে চাহিয়া ভক্তিভরে শিবানীকে প্রণাম করিল। হঠাৎ যেন একটা পরিচিত স্বরে কে বলিল—'জয় হোক মা।' মন্ত্রমুগ্ধের মত জ্যোতির্ম্ময়ী সেইদিকে চাহিল। একটা দশবারো বৎসরের খোঁড়া বালক লাঠি ধরিয়া কাতরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আবার বলিল--'জয় হ'ক।'

জ্যোতির্ম্ময়ী যেন সে স্বর পূর্ব্বে শুনিয়াছে, সে কাতর মুখ পূর্ব্বে দেখিয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য সে স্থির হইয়া ভাবিল। তাহার স্মরণ হইল,—এখন সে বুঝিল কি পাপের জন্য সে কষ্ট পাইতেছিল। সে ক্ষিপ্তের মত গাড়ী হইতে নামিয়া গিয়া বালককে ধরিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার পা ভাঙ্গিল কেমন ক'রে?

বালক বলিল—মা, মোটর গাড়িতে।

যুবতী বলিল—কতদিন পূর্ব্বে?

"দু' বছর আগে মা। বৌবাজারের মোড়ে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আর্দ্রকণ্ঠে বলিল—তুমি ভিক্ষা কর কেন?

বালক বলিল,—"কি করব মা? হাঁসপাতাল থেকে বেরোবার পর আমার মা মারা গেল। আমার আর দুনিয়ায় কেউ নেই। খোঁড়া মানুষ, কাজ করতে কি পারি মা?"

জ্যোতির্ম্ময়ী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—না।

সে বালকের হাত ধরিয়া গাড়ীর নিকট গিয়া বলিল—'যা খুঁজছিলাম পেয়েছি, পাপ বুঝেছি। আমাদের মোটর গাড়ীতে খোঁড়া হ'য়ে এ ছেলেটি ভিক্ষে করে!'

সৌরেন্দ্র শিহরিয়া উঠিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী একটু আব্দারের স্বরে বলিল—'এ আজ থেকে আমাদের বাড়ি থাক্‌বে, কেমন?'

তাহারা দুইজনে দুইহাত ধরিয়া খঞ্জ বালককে গাড়ীতে তুলিয়া লইল।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

পুস্তক-সমালোচনা।

নানান-নিধি।—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত। এ গ্রন্থে ত্রিশটি সন্দর্ভ আছে। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত গোস্বামী-রচিত বাঙ্গালা সন্দর্ভমালার নাম শুনিলে ভীতির উদ্রেক হয়। কিন্তু পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের নানান-নিধিতে সার্দ্ধ তিন পংক্তি বিস্তৃত সমাসান্ত পদ নাই বা আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে নানা মুনির নানা মতের কোটেসন নাই। সরল মধুর ভাষায় গোস্বামী মহাশয় তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রথম সন্দর্ভ 'নূতন বৎসর'। তিনি আমাদের বলিয়াছেন—"ভাই রে, আজ তোমরা নূতন খাতার উৎসবে খুবই মাতিয়া গিয়াছ দেখিতেছি, কিন্তু আপন পরমায়ুর জমা খরচের হিসাব নিকাশটাও একবার দেখিলে ভাল হইত না কি?" 'দশহরা' প্রবন্ধে তিনি দশবিধ পাপের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মপথ দেখাইয়াছেন। 'শ্রীশ্রীহিন্দোল-লীলা'র ভাষা বড় মনোরম। আমরা সে কালের মানুষ নহি তবুও 'সেকালের নন্দোৎসব' প্রবন্ধে আমাদের শৈশবের অনেক মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কলিকাতায় এখন আর নন্দোৎসবের আমোদ নাই। কিন্তু বাল্যে আমাদের ঘরে ঘরে বৈষ্ণবের দল নাচিয়া গাহিত—

"ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ॥"

তাহারা 'হাতে নড়ি, কাঁদে ভার' লইয়া নাচিত, আমাদেরও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। সে কথা স্মরণ করিলে এখনও আমাদের হৃদয়ে সেই নাচের নিক্কণ শুনিতে পাই। গোস্বামী মহাশয় বড় প্রাণস্পর্শী ভাষায় সে স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। শাক্ত বৈষ্ণবের গণ্ডগোল দলাদলি কেবল মূর্খের সমাজে বিদ্যমান। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নেতা গোস্বামীর লেখনীতে 'মায়ের আবাহন' ও 'মা

এলো' প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া কোন ভক্ত অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবে না। এই আশ্বিনের মহাপূজার পূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠক কি অপার আনন্দে পড়িবে—"বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে তোমরাও বল আর আমিও বলি—ঐ আমাদের মা এলো গো মা এলো। তোমাদের মা, আমাদের মা,—জগতের মা উমা এলো।" ভক্ত লেখক আমাদিগকে মা-বশ করিবার একটি মন্ত্র শিখাইয়াছেন। সে মা-বশ করিবার মন্ত্রটি পড়িলে 'মা শুড়শুড় ক'রে' বশীভূত হয়ে পড়্‌বেন। "মা-বশ করার মন্ত্রও হইতেছে সেই—মা, মা, মা।" কি মধুর কবিতা! কি সরল শিক্ষা!

গৌর-পুর্ণিমার জয়, দোল-লীলা প্রভৃতি বৈষ্ণব সন্দর্ভ অতি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রভু নিত্যানন্দবংশ প্রদীপ অতুলচন্দ্রের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। গল্পের ছলে তিনি কতকগুলি নীতিকথা শিক্ষা দিয়াছেন। 'বায়স্ কোপ', 'এলারম-শিগনাল' 'ফুটবল' প্রভৃতি কতকগুলি রহস্যমূলক প্রবন্ধে তিনি সরল ভাষায় গভীর নীতিশিক্ষার অবতারণা করিয়াছেন। শেষ প্রবন্ধ 'মাতৃ-দর্শন' সাধারণ পাঠকের নিকট একটু কঠিন বোধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে যে দর্শনের মত প্রকটিত হইয়াছে প্রত্যেক হিন্দু সন্তান তাহা অবগত। সুতরাং একটু মনোযোগ দিয়া পড়িলে তাহা মোটেই দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হইবে না।

'নানান-নিধি'র অমৃতভাণ্ড নামকরণ করিলে নামে বিষয় সূচিত হইত। এ পুস্তক বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক ইঁহা আমাদের আন্তরিক বাসনা।

আকিঞ্চন।—কবিতা-পুস্তক। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত। আর্ট পেপারে মুদ্রিত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই। মূল্য এক টাকা।

আমরা 'আকিঞ্চন' পড়িয়া বড় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার অধিকাংশ কবিতাই শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ লইয়া রচিত। বঙ্কিমবাবুর কবিতার ভাষা মনোরম, চিত্রের বর্ণ বিন্যাসে প্রকৃত শিল্পকরের তুলিকার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ছন্দে নবীন কবির উল্লম্ফন নাই, তাঁহার কবিতাগুলি সরল, সরস অথচ একটু গম্ভীর।

আকিঞ্চন পড়িয়া প্রথমেই মনে হয় যে লেখক অতীতকালকে সুবর্ণরাগরঞ্জিত করিয়াছেন। তিনি অতীতের শাস্ত্রীয় গল্প লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন বলিয়া এ কথা বলিতেছি না। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই তিনি অতীতের স্মৃতিতে মুগ্ধ হইয়াছেন, অতীতের জন্য তিনি একটু বিলাপ করিয়াছেন। এক এক স্থলে তাঁহার এই বিলাপধ্বনি এত করুণ ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছে যে, সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে পাঠক অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব কবিবর দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের প্রতিকৃতি তলে বসিয়া তিনি একবারও ভাবেন নাই যে নীলদর্পণ-প্রণেতা দীনবন্ধুবাবু বঙ্গসাহিত্যে অক্ষুণ্ণ যশ রাখিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ে মৌরসী পাট্টা পাইয়াছেন, আপনার ওজস্বিনী ভাষার বলে তিনি দেশে একটা যুগান্তর ঘটাইয়াছেন, হাস্যরসের প্রবাহে এখনও তিনি নিরানন্দময় বাঙ্গালীর ঘর সজীব করিয়া রাখেন। তাঁহার কবি-সন্তানের প্রাণে সে কথা জাগে না। তিনি পিতৃদেবের স্মৃতিতে কেবল দেখিয়াছেন—

"আজি সে চন্দ্রিকা নাই, যূথিকা-সৌরভ (ও) নাই
সে চারু গৌরব ভরে বৃথা সে পূরবে চাই

শুকায়েছে সে শ্যামতা, কঠিন সে কোমলতা,
শুকায়েছে তরুসনে পল্লবিনী সেই লতা।"

'শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় ধামে গমন' নামক কাব্যটি বর্ণনা-গৌরবে অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কথোপকথনে বাসুদেবের ব্রজলীলা বড় মধুর চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে কবি এত সংক্ষেপে এত বড় কর্ম্মবীর শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন সে কবি হিন্দুসমাজে বরেণ্য। তাঁহার ভক্তিপ্রাণতা প্রতি ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। কিন্তু এ কাব্যে কবি-প্রাণের সেই অতীত পূজার বলবতী বাসনা বেশ প্রবলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নরদেহ ধারণ করিয়া যে লীলা করিয়া গিয়াছেন সে বর্ণনায় কবি আমাদের হৃদয়কে পুলকিত করিয়াছেন, প্রাণমন ভিজাইয়াছেন, চোখে জল আনিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের শান্তিময় বাণীতে একবার বলিতে চেষ্টা করেন নাই যে আমাদের আরাধ্য পূতিগন্ধময় পৃথিবী ছাড়িয়া স্বীয় ধামে পলাইয়াছেন বটে কিন্তু তিনি আমাদের জন্য তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসার গীতারত্ন রাখিয়া গিয়াছেন—আমাদের অভয়দান করিয়া গিয়াছেন যে সংসারে গৃহীর মত কাজ করিয়াও তাঁহার ভক্তগণ অন্তিমে মোক্ষ পাইবে। তিনি ক্ষীরসরনবনী-চোরা ব্রজদুলালকে ফুটাইয়াছেন, তিনি একবারও সেই অনাদি অনন্ত সারথিকে দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই, তাঁহার মুখে তাঁহার দেহ ধারণের উদ্দেশ্যটা বুঝাইতে প্রয়াস করেন নাই। তাহা হইলে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র সম্পূর্ণ হইত সে কথা বলা বাহুল্য। প্রত্যেক কবিতা আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। কিন্তু প্রত্যেক কবিতাতেই অতীত কীর্ত্তি বিবৃতির চেষ্টা আছে। প্রত্যেক কবিতাতেই অতীতের স্মৃতি কবিকে মাতাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃশ্য-বর্ণনায় নবীন কবির ফটো-চিত্রের শিল্প প্রকটিত নাই—ইহাতে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয়। 'নারদের ব্রহ্মদর্শন' কবিতায় তিনি 'মহা ঘোরা অমানিশি'তে এমন ভীম বিভীষিকাময় ভীম যবনিকা দেখিয়াছেন যে তাহা 'শত সূর্য্য চন্দ্র বুঝি পারে না করিতে ক্ষয়।' তাহার করাল বেষ্টনে শবপ্রায়া অবনীর 'বক্ষে স্পন্দমাত্র নাই রুদ্ধকণ্ঠে নাহি রব।" তাঁহার বদরিকাশ্রমের বর্ণনা বড় চিত্তাকর্ষক। এ চিত্র আনন্দের। কিন্তু ইহাতেও 'ছ্যাবলামি' নাই—বেশ গম্ভীর মন্ত্রে তিনি স্বভাবের এক গম্ভীর অথচ উল্লাসকর চিত্র আঁকিয়াছেন। এখানে অনন্ত তারকাকুল আনন্দের প্রতিবিম্ব, হেথায় উদার গগন প্রায়, কাননও উদার। কিন্তু তাহা আনন্দময়ের রূপ। হেথায় 'হিমকণা-প্রবাহিনী ক্ষীর গঙ্গা প্রবাহিত' হেথায় শিখরকুল তরল তরঙ্গভঙ্গে মুখর। পুণ্য বদরিকা ধামে—

'অনিল খেলিত সুখে হিমানীর কণা ল'য়ে,
বিলায় বিটপীকুলে, সৌরভের বিনিময়ে;
জ্যোতির্ম্ময় মহোৎসবে মত্ত যেন প্রতি রেণু,
প্রতিরন্ধ্রে জয়ধ্বনি করে যেন বিশ্ব-বেণু।"

যে সকল 'উড্ডীয়মান' কবির ধারণা যে কুলু কুলু, ঝুর ঝুর, রুণু রুণু, ঝুমু ঝুমু না লিখিলে কবিতা সুমিষ্ট হয় না তাঁহাদের আমরা এ বর্ণনা পাঠ করিতে বলি। ইহাতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের অন্তর্দৃষ্টি ও গাম্ভীর্য্য আছে, অথচ বাঙ্গালী কবিতার মিষ্টতা আছে। কবি তাঁহার মাতৃভাষার

আধুনিক কবিতা (?) রাশির আবিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন নাই। তিনি মৌলিকতা দেখাইয়াছেন এবং আপনার বিশেষত্ব রাখিয়াছেন। অনুকরণশীল বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটা মস্ত প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

আমরা এ স্থলে আকিঞ্চনের দুই একটা দিক মাত্র দেখাইলাম। বঙ্কিমবাবুর প্রত্যেক কবিতাটিতে উচ্চভাবের শিক্ষা প্রকটিত, প্রত্যেক রচনাটি ভক্তিরসে সিঞ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রকথায় গদ্গদচিত্ত হইতে লজ্জা বোধ করেন নাই, গোকুল, বৃন্দাবন মহুমন ঝোলায় ঘুরিতে পুলক অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের স্মৃতিতে তিনি নিজে কাঁদেন, পাঠককে কাঁদাইতে পারেন—এ কথা তাঁহার বিশেষ গৌরব, সৎসাহস ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক ইহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের অন্তর্নিহিত নব উন্মেষণোন্মুখ প্রাণের লক্ষণ। বঙ্কিমবাবুর মত কবি শিক্ষিত সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিবে। বাঙ্গালী মাত্রের নিকট তাঁহার 'আকিঞ্চন' প্রিয় হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বরণডালা।—কলিকাতার বিখ্যাত পারফিউমার্ শ্রীযুক্ত এইচ্ বসু প্রকাশিত, ১৩২০ সনের কুন্তলীন উপহার। তিনি দশটী গল্পে এই বরণডালাখানি সাজাইয়াছেন, বলা বাহুল্য, যাঁহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন তাঁহারা এই ডালায় বৃত হইয়া ধন্য হইবেন।

লেখক 'চারু বন্দ্যো' আমাদের পরিচিত। তিনি 'শ্রী'মান্ সংসর্গে পড়িয়া "শ্রী"যুক্ত হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। আমরা 'শ্রী'র অনুরাগী,—'শ্রী' হীনের নহে।

এই আলোচ্য পুস্তকে "কী", "মতো" প্রভৃতি অপূর্ব্ব প্রয়োগ,—"ছুরীর নখ" এইরূপ উৎকট উপমা—"বাদশার বুকে কষাইয়া দিল এক লাথি" এইরূপ কবিতাময়ী ভাষা যেমন লেখকের অন্যান্য রচনাতেও পাই, ইহাতেও সেইরূপ দেখিলাম। আমাদের মনে হয়, এইগুলি যদি বর্জ্জিত হইত, তাহা হইলে মুদ্রণাদির সৌন্দর্য্যের মত গল্পগুলিরও সৌন্দর্য্য বাড়িত!

প্রথম গল্পটীতে মৌলিকতার অভাব! জানি না সুক্ষণে কি কুক্ষণে বঙ্কিমবাবুর নায়িকা বন্দীকে কারারক্ষকের হস্ত হইতে কন্দী করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। এখন সেই ব্যাধি সংক্রামক হইয়া সমস্ত লেখককে স্পর্শ করিয়াছে। এখন ঐতিহাসিক বা কল্পিত ঐতিহাসিক নায়িকা মাত্রেই কারারক্ষককে প্রেমে বশীভূত করে ও সরাপ পানে তাহাকে অচেতন করাইয়া স্বকার্য্য সাধন করে। বন্দীকে উদ্ধার করিতে হইলে বঙ্কিমবাবু-প্রদর্শিত পন্থা ব্যতীত অন্য কোনও পন্থা কাহাকেও অবলম্বন করিতে দেখি না—ইহা লেখকদের কল্পনা-শক্তির অভাব সূচনা করে মাত্র!

যাহা হউক 'বরণডালা'র কতকগুলি গল্প চলনসই হইয়াছে। নীর ত্যাগে ক্ষীর গ্রহণের ন্যায় পাঠক সেগুলির রসাস্বাদন করিতে পারিবে এরূপ আশা ও ভরসা আমাদের আছে।

পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, আবরণ প্রভৃতি সমস্ত মনোরম—কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হইলে যেমন হওয়া উচিত, সৌখীন দ্রব্যের ব্যবসায়ী সৌখীন শ্রীযুক্ত এইচ বসুর পছন্দে কভার কাগজ প্রভৃতি যেমন হওয়া উচিত তাহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। বলা বাহুল্য 'কুন্তলীন উপহার' শিরোদেশে লিখিত না থাকিলে গ্রন্থখানি ১৲ টাকা মূল্যে বাজারে বিকাইত। পাঠকগণ ইহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন   পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী   পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বিদ্যারত্ন

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী

মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন

কাশীনরেশ-সভাপণ্ডিত
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ তত্ত্বরত্ন

পুরাতন প্রসঙ্গ।

(খিদিরপুর ও আলিপুর)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ভবিতব্যের কথাই বলি। ভবিতব্য নয় ত কি? একদিন শোভারাম বাবু উপরে কোন কাজের জন্য গিয়াছেন। সেদিন মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভাগৃহে কি একটা মিটিং হইবে। শোভারাম বাবু সেই মিটিংএর বন্দোবস্তের জন্য বড়ই ব্যস্ত। আমি তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ পাইলাম। মনের সাধে বই ঘাঁটিতে লাগিলাম। সেই ঘরে আলমারির উপরের স্তর হইতে বই পাড়িবার জন্য, একখানি ক্ষুদ্র কাঠের মই ছিল। সেখানি সংগ্রহ করিলাম, মই বাহিয়া উপরে উঠিলাম।

দেখিলাম, আলমারির সর্ব্বোচ্চস্তরে ধূলি-ধূসরিত—চল্লিশ ভলম বই—"Holwell's State Trials" রহিয়াছে। একটা ঔৎসুক্য জন্মিল। এটা ভগবৎ-প্রেরণা। এ Holwell নবাবী আমলের হলওয়েল নহেন। ভগবান একটী ভলমের দিকে আমার হস্তকে যেন সজোরে প্রসারিত করিয়া দিলেন। সেটী Vol. XX. বা কুড়ি সংখ্যক ভলম। সহসা সেই ধূলি-ধূসরিত, বৃহৎ ভলমটী টানিয়া বাহির করিলাম। সেই ধূলায় আমার জামাটী নষ্ট হইল। আমি সেই ভলমটী খুলিবামাত্রই একস্থানে দেখিলাম, তাহার মধ্য ভাগে—"Trial of Maharaja Nundcomer" শীর্ষক একটী বিষয় রহিয়াছে। ইংলণ্ডে যত বড় বড় State Trial হইয়াছিল, ইহা তাহারই ইতিহাস। হাতে যেন স্বর্গ পাইলাম। বইখানি লইয়া নামিয়া আসিলাম। আনন্দ আর ধরে না—যেন বহুমূল্য গুপ্ত ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি।

কোঁচার কাপড়ে ধূলা ঝাড়িয়া, সেই অংশটুকু তাড়াতাড়ি দেখিয়া লইলাম। ভয়—শোভারামবাবু আসিলেই হয়ত বকিবেন। প্রথমেই "Deposition of Raja Naba Kissen" পাতাটী চোখে পড়িল। দেখিলাম, তাহাতে অনেক মজার কথা আছে। এদিকে অফিসের টিফিনের সময় উত্তীর্ণ। কাজেই বইখানি আলমারির এক আয়ত্তাধীন স্থানে রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।

তৎপরে আফিসের ছুটী হইলে আবার লাইব্রেরীতে আসিলাম। সেই বই-খানি বাহির করিয়া, শোভারামবাবুর সম্মুখে ধরিয়া, অতি কাতরভাবে বলিলাম, "আপনি যদি এক রাত্রের জন্য বহিখানি ছাড়িয়া দেন—তাহা হইলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হই।" তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"এই বই লইয়া তোমার কি হইবে?" আমি, পুস্তকের যে অংশে নন্দকুমারের বিচারের ইতিহাস ছিল, সেই টুকু তাঁহাকে দেখাইয়া, অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া পুস্তকখানি এক রাত্রের জন্য পাইলাম।

তখন আমার উৎসাহ দেখে কে? খিদিরপুরের বাজার হইতে তিন দিস্তা শ্রীরামপুরের কাগজ কিনিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বারিষ্টারের ব্রিফের (Brief) আকারে তাহা ভাঁজ করিলাম। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, নন্দকুমারের বিচার অংশটুকু অবিকল কপি করিয়া লইলাম। সে এক বিরাট কাণ্ড! রাত্রি যখন তিনটা, তখন আমি বড়ই ক্লান্ত। হাত আর চলে না। তার পর দিন আপিস কামাই করিয়া, কাজ শেষ করিয়া—ঠিক বেলা দুইটার সময় শোভারাম বাবুকে প্রতিশ্রুতিমত সেই বইখানি ফিরাইয়া দিলাম।

নন্দকুমারের জাল মোকদ্দামার সমস্ত ছাপা কাগজপত্র তখন আমার হাতে। কিন্তু তাহাতে স্তর ইলাইজা সম্বন্ধে অনেক Reference ছিল। আমি দেখিলাম, ফুটনোটে অনেক স্থলে লেখা আছে—Vide—"Parliamentary History of England" এখন এ বই পাই কোথায়? কখনও ইহার নাম শুনি নাই। State Trial বহিখানি লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ছাপা। পার্লামেণ্টারি ইতিহাস—হয় ত ইহার পূর্ব্বে ছাপা হইতে পারে।

তখন মেটকাফ্ হলের প্রধান লাইব্রেরীয়ান ছিলেন—গ্রেগরি সাহেব। গ্রেগরি সাদা সাহেব নয়—মিশ্ কালো। মেট্‌কাফ্ হলের অনেক সবস্ক্রাইবার নিয়মিত ভাবে চাঁদা দিতেন না। তখন মাসে মাসে বিল পাঠাইয়া, পুস্তক-গ্রাহকদের কাছে চাঁদা আদায় করা হইত। গ্রেগরি সাহেবের চাঁদার বিল আসিলেই—আমি আমার "জলখাবারের টাকা দুইটী" চাঁদা-স্বরূপ দিতাম। এজন্য সাহেব আমায় একটু নেক নজরে দেখিতেন। হয়ত ভাবিতেন, ছোকরা বড় regular.

আমি মাসিক দুই টাকার চাঁদাদাতা ছিলাম। তখন সবে মাসকাবার হইয়াছে। সাহেবকে বলিলাম—"এ মাস হইতে আমি ফার্ষ্ট সেকেণ্ড সবস্ক্রাইবার হইব, অর্থাৎ ৪৲ টাকা চাঁদা দিব।" আমি তাঁহাকে প্রকাশ্যে মিষ্টার গ্রেগরি ও

মনে মনে মিঃ গড়গড়ি বলিতাম। ৪৲ টাকা চাঁদাওয়ালারদের দলে উঠায়, তাঁহার কাছে আমার যেন একটু "প্রেষ্টিজ" বাড়িল। সন্ধানে জানিলাম—Parliamentary History ঐ মেট্‌কাফ্ হলেই আছে—আর তাহা কুড়ি ভলমের কম নয়। গ্রেগরি সাহেবকে, প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি প্রয়োজনীয় ভলম্‌টী অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়া, আমায় ব্যবহার করিতে দিলেন। তখন লাইব্রেরীর বই বাড়ীতে আনিবার নিয়ম ছিল। বই আনিয়া কিয়ৎকাল পাঠান্তে অমূল্য জিনিষ পাইলাম। সেরিফ্ ম্যাক্রেবী সাহেব—নন্দকুমারের জাল-অপরাধে আটক হওয়ার পর হইতে, তাঁহার ফাঁসীর দিন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনার এক ধারাবাহিক শোচনীয় বিবরণ লিখিয়া গিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের মহাবিচারের বা Impeachmentএর সময়, এই ম্যাক্রেবী সাহেব পার্লামেণ্টে এই ব্যাপারের সম্বন্ধে সাক্ষী দেন। ম্যাক্রেবী কলিকাতার তদানীন্তন Gaol Keeper বা জেল-দারোগা। এ জেলখানা লাল-বাজারে ছিল। ম্যাক্রেবীর লিখিত সমসাময়িক ঘটনার—ইতিহাসে, যাহা কখনও বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয় নাই, তাহা পড়িলাম। মহারাজ নন্দকুমার জেলের মধ্যে আবদ্ধ হইবার পর জাতি যাইবার ভয়ে অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন। জেলে নানা জাতির লোক বাস করিতেছে। ফিরিঙ্গি, খ্রীষ্টান, মুসলমানী, আরমানী সবই আছে। সে জেলের মধ্যে হিন্দু মহারাজা অন্নগ্রহণ করিবেন কিরূপে? কাজেই তিনি বলেন—"এখানে আমি আহারাদি করিতে পারি না।"

হেষ্টিংস যখন শুনিলেন, যে মহারাজ জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই—এইরূপে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়াছে—তখন তাঁহার বড় ভয় হইল। তিনি ইলাইজা ইম্পির পরামর্শমতে—কলিকাতায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ব্যবস্থা আনাইলেন। পণ্ডিতদের সেই "ভাস" নন্দকুমারের নিকট প্রেরিত হয়। যে কয়জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে তত্ত্বনিধি, সার্ব্বভৌম গোছের বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন। এই ব্যবস্থাপত্রখানির সন্ধানও তখন কেহ জানে না। কাজেই এই ব্যবস্থাপত্র, নন্দকুমারের ফাঁসির ঘটনা—প্রকাশ করিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইল।

কিন্তু আমার বড় দুর্ভাগ্য—যে তখন আমার বড় সাধের "নবজীবন" লোপ পাইয়াছে। নবজীবন কেন লোপ হইল, তাহা আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বলিতে পারেন। এই "নবজীবনে" এ দীনের, কাশিমবাজার রাজবংশ, জগৎশেঠ ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। নন্দকুমারও যাহাতে "নবজীবনে" প্রকাশিত হয়, আমার

বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে 'নবজীবন' 'বঙ্গদর্শনে'র ন্যায় কালসমুদ্রে বিলীন হইল। 'প্রচার' ইহার আগেই লোপ পাইয়াছিল।

তখন ভরসা কেবলমাত্র "ভারতী"। ভারতী তখন—পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্ত হইতে, পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর হস্তে আসিয়াছে। প্রবন্ধটী 'ভারতী'তে পাঠাইলাম। তিনটী সংখ্যায়, নন্দকুমারের ফাঁসীর ব্যাপার প্রকাশিত হইল। ভারতী-সম্পাদিকা, পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার অনুগ্রহে উৎসাহে—এক বৎসর ধরিয়া ভারতীতে "নন্দকুমার ও সুপ্রীমকোর্ট" প্রকাশিত হইল। এজন্য আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের ন্যায়—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকটও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

'ভারতী'র যে তিন সংখ্যায় বাঙ্গালায়-লেখা নন্দকুমার প্রকাশিত হয়—তাহা আমি মহাত্মা বেভারিজের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। সেই সঙ্গে তাঁহাকে একখানি পত্রও লিখিলাম। বেভারিজ সাহেব সেকালের হেলিবরি সিবিলিয়ান। তিনি খুব ভাল বাঙ্গালা জানিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি আলিপুরের সেসন-জজ্ ছিলেন—শেষে মুরশীদাবাদে বদলী হন। অনেক সময়ে, তিনি সাক্ষী-দের বাঙ্গালা জবানবন্দী শুনিতেন এবং তাহাদের বাঙ্গালায় প্রশ্ন করিতেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" সবে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি তাঁহাকে একখানি "আনন্দমঠ" পড়িতে দিই। পাঠান্তে তিনি একদিন মন্তব্য প্রকাশ করেন—"I think Bunkim Chunder has too much overpainted *Shanti*. Shanti is not an ideal Bengali lady."

যাক্ এ সব কথা। বেভারিজ সাহেব আমার পত্র পাইয়াই—আমাকে একদিন দেখা করিতে অনুমতি দিলেন। আমি একজন সামান্য লোক। তিনি একটা জেলার সিভিলিয়ান-জজ। যে ব্যাপার লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, তাহাও বড় জটিল। কিন্তু আমি তাঁহার সহায়তা চাই। ভগবানকে ডাকিয়া, ভরসায় বুক বাঁধিয়া, সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম।

এমন সহৃদয় সিবিলিয়ান খুব কম দেখিয়াছি। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি সরলান্তঃকরণ। সাহেব, প্রথমতঃ আমায় আমল দিতে চাহিলেন না। আমি তাঁহাকে আমার সেই বালীর কাগজের "ব্রিফ্" দেখাইলাম। তখন তিনি ভারী সন্তুষ্ট। সমস্ত ঘটনা যে কাকতালীয়বৎ ঘটিতেছে, তাহাও তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি নন্দকুমারের ব্যাপার সম্বন্ধে আমায় অনেক জেরা করিলেন। তৎপরে অভয় দিয়া বলিলেন—"আমি হাইকোর্ট হইতে যে সমস্ত

কাগজপত্র পাইয়াছি—তাহা তুমি তোমার প্রয়োজনমত দেখিয়া লইতে পার।" আমি বলিলাম—"বোলাকী-দাসের যে খতের জন্য নন্দকুমারের এত বিপদ, তাহা আমি দেখিয়াছি। Indictmentএর কাগজখানার বাহ্যিক দীর্ঘাকারটাও দেখিয়া লইয়াছি।"

একদিন এই বেভারিজ সাহেবের সহিত "Kidderpore House"টী দেখিতে যাই। এই বাড়ীটি আজও বর্ত্তমান। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পৃষ্ঠপোষক কৌন্সিলের মেম্বর বারওয়েল সাহেব, এই বাটীতে বাস করিতেন। পরবর্ত্তী আমলে এই বাটীর প্রশস্ত হল্-কামরায় "বল নাচ" হইত। এখনও এ হলটী বর্ত্তমান। সেকালের বড় বড় ইংরাজদের এক একটী বাগানবাটী ছিল। ক্লাইভ দমদমাতে বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুপ্রীমকোর্টের জজ স্যর রবার্ট চেম্বার্সএর বাগানবাড়ী কাশীপুরে ছিল। ভবানীপুরে স্যর রবার্ট আর একখানি বাড়ী করিয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, আলিপুরে থাকিতেন। আজও "হেষ্টিংস-হাউস" অতীতের স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে। লর্ড কর্জ্জন এই বাগানবাড়ীর অধিকৃত স্থানেই, রাজ অতিথিদের "আশ্রয় ভবন" করিয়া দিয়াছেন। স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসেরও বাগানবাড়ী আলিপুরে। আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টার সাহেবেরা, যে বাড়ীতে আগে বাস করিতেন—অনেকে অনুমান করেন, তাহাই ফ্রান্সিসের বাগানবাটীর স্থান অধিকার করিয়া নির্ম্মিত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে আলিপুর-পল্লীটা খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। আজকাল যেস্থান অধিকার করিয়া "এগ্রিহার্টিকল্চরাল সোসাইটী"র বাগান—জনপ্রবাদ, এই স্থানে—নবাব মীরজাফরের আবাসবাটী ছিল। জিরাট নামক স্থানে—মণি-বেগমের জন্য একটী মহল নির্ম্মিত হয়। এই জিরাট বস্তী, এখন "জু-গার্ডেনে" পরিণত হইয়াছে। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের কাগজপত্র হইতে জানা যায়—যে হেষ্টিংস সাহেব, কালীঘাটের নিকট গঙ্গার উপর একটী পুল প্রস্তুতের জন্য বিলাত হইতে অনুমতি পান। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে কর্ণেল হেনরি ওয়াটসন, খিদিরপুরে জাহাজ নির্ম্মাণের এক "ডক" স্থাপনা করেন। এই ওয়াটসন্ হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে—ফ্রান্সিসের সহকারী বা Secondএর কাজ করিয়াছিলেন। এখনও খিদিরপুরের মধ্যবর্ত্তী "ওয়াটগঞ্জ" তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে।

পাঠক! পুরাতন ইতিহাসের কথা বলিতে গিয়া—মধ্যে একটু নিজের জীবনের অতীত কথা বলিয়াছি। এজন্য আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া, আমি একাগ্রচিত্তে সাহিত্য-সাধনা করিতেছি। এজন্য

আমাকে অনেক সহিতে হইয়াছে।* এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর সরকারের চাকরী করিয়াও, আজও আমি সাহিত্যালোচনা ছাড়ি নাই। আর বলিবার অবসর পাইব কি না—তাহা জানি না, কারণ জীবনের দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে। আমার সাহিত্য-সাধনার কষ্ট, আমার কনিষ্ঠ সহোদরতুল্য সাহিত্য-সম্পাদক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি অনেক জানেন। আর জানিতেন—আমার সোদরতুল্য অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, ভূতপূর্ব্ব 'কল্পনা'র সম্পাদক, স্বর্গগত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধরিতে গেলে—বেভারিজের নন্দকুমারের পর হইতেই—মুর্শিদাবাদ ইতিহাসের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বেভারিজের Old places of Murshidabad ইতিহাসের হিসাবে বড়ই বহুমূল্য। তাঁহার Trial of Maharaja Nandkumar নন্দকুমারের বিচার-ব্যাপারের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস।

মুরশীদাবাদ ও বাঙ্গালার নবাবী আমলের ইতিহাস আলোচনায় যাঁহারা যশস্বী—তাঁহাদের সকলেই ঈশ্বরেচ্ছায় সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ই সাহিত্য-সংসারে সর্ব্বজন পরিচিত। আর রামপ্রাণবাবুও "রিয়াজে"র অনুবাদ করিয়া সাধারণে বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

---

* একবার একখানি অতি পুরানো Central India Gazetteer বাহির করিতে গিয়া আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম। বিধাতা কৃপাপরবশে রক্ষা করিয়াছিলেন তাই, নচেৎ বোধ হয়, মাথায় আঘাত লাগিয়া জন্মের মত অকর্ম্মণ্য হইতাম। ইহার কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি জব্বলপুরে যাই। নর্ম্মদাতীরে গৌরীশঙ্কর মহাদেবের মন্দিরের নিকট যে "চৌষট্টিযোগিনী"র মন্দির, ভগ্নস্তূপের মত পড়িয়া আছে, তাহার কোন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। স্থানীয় জনপ্রবাদ, আলমগীর বাদসা ঐ মন্দির চূর্ণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গেজেটিয়ার খানিতে যদি কিছু পাওয়া যায় ভাবিয়া, আমি মেট্‌কাফ হলের চাকাওয়ালা কাঠের সিঁড়ির উপর উঠিয়া সেই বই পাড়িতে যাই। কিন্তু পদস্খলন হওয়ায় ১৫ ফুট উচ্চ স্থান হইতে ভূপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হই। পূর্ব্বোক্ত গ্রেগরি সাহেব আমার প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষাদি করায়, চেতনা সঞ্চার হয়। তিনি আমায় একখানি গাড়ি করিয়া মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়া দেন। কালেজ হইতে Dressing করিয়া বাড়ী যাই ও দুই মাসকাল শয্যাগ্রস্ত থাকি।

বিধবা।

---

(১)

সেদিন প্রভাতে বামুনপাড়া গ্রামখানা যেরূপ বিরাট উৎসাহ ও তুমুল কোলাহল সহকারে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবে সে আর কখনও জাগে নাই। গ্রামের ত্রিলোচন বিদ্যানিধি মহাশয়ের টোলেও সেদিন অদৃষ্টপূর্ব্ব লোক সমারোহ হইয়াছিল। সেই সমুৎসুক জনমণ্ডলীর সমক্ষে বিদ্যানিধি মহাশয় সেদিন যেরূপ প্রবল উৎসাহ সহকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেরূপ পাণ্ডিত্য তিনি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহার অপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে জনমণ্ডলী বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল; টোলের ছাত্রবৃন্দ এই অগাধ পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকারে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিল।

গ্রামখানির এরূপ বিরাট জাগরণের, বিদ্যানিধি মহাশয়ের এরূপ অপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যার অবশ্যই একটী কারণ ছিল। কারণটাও বড় গুরুতর। ৺রাম-গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র বংশধর শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, সম্প্রতি একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালবিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া চট্টোপাধ্যায়-কুলে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা এবং নব্যসমাজের সমক্ষে আপনার সৎসাহসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারই বিরুদ্ধে এই বিরাট্ আন্দোলন, এবং বিদ্যানিধি মহাশয়ের বিশাল শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন দ্বারা সদ্যবস্থারূপ অমৃত আহরণ।

কিন্তু গ্রামের সকলেই যে এই দেবদুর্লভ অমৃতের প্রসাদার্থী ছিল তাহা নহে। আর তাহা হইলে আন্দোলনও এত প্রবলভাব ধারণ করিতে পারিত না। ইহার মধ্যে দুইটা দল ছিল; এক দলে কয়েকজন নব্যশিক্ষিত যুবক—তাঁহারা বিধবাবিবাহের পৃষ্ঠপোষক; অপর পক্ষে প্রাচীনের দল; তাঁহারা এই বেদবিধিবিগর্হিত আচরণের উপর খড়্গহস্ত।

তাঁহাদের মতামতে কি আসে যায়? বিদ্যানিধি মহাশয়ই গ্রামের মাথা, সমাজের নেতা, ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাদাতা। বিদ্যানিধি মহাশয়ও ইহারও যথোচিত ব্যবস্থা দিলেন। তিনি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া প্রমাণিত করিলেন যে, বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়; কেবল অশাস্ত্রীয় নহে, সমাজের অনিষ্টকর; ইহা দ্বারা

হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা বিনষ্ট হইবে, সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিবে, সমাজ যাইবে, গার্হস্থ্য সুখশান্তি তিরোহিত হইবে, সংসার রসাতলে যাইবে। বিধবা হিন্দুসমাজে মূর্ত্তিমতী দেবী; বিবাহ দিয়া তাহার দেবীত্ব নষ্ট না করিয়া তাহার চরিত্রকে আরও উন্নত করিতে চেষ্টা কর: তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দাও, সংযম শিখাইয়া তাহার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের উপায় বিধান কর; তাহাকে সম্মান দেখাইয়া, তাহার আদর্শে আপনাদিগকে গঠিত করিয়া হিন্দুসমাজকে পবিত্র কর, ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত কর। বিদ্যাসাগর নিতান্ত অর্ব্বাচীন, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, অদূরদর্শী, তাই এমন একটা অকাণ্ডের সূচনা করিয়া হিন্দু-সমাজকে রসাতলে দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন···ইত্যাদি।

ধন্য ধন্য রবে বিদ্যানিধি মহাশয়ের শ্রুতিযুগল রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। এদিকে সূর্য্যদেব মধ্যগগনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, বক্তার ও শ্রোতৃ-বর্গের জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সুতরাং সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় স্নানার্থ গমন করিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলীও সন্ধ্যাসমাগমে নীড়াভিমুখী বিহঙ্গমকুলের ন্যায় ব্যক্তাব্যক্ত বিবিধ স্বরে গ্রাম্যপথ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। গমনকালে তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত আর নাই; তাঁহার উক্তিগুলি 'ষষ্ঠবেদ' নামে অভিহিত হইতে পারে। কেবল ছিদ্রান্বেষী কয়েকজন যুবক বলিলেন যে, ইহা প্রমথকুমার শর্ম্মার বিধবা-বিবাহ প্রতিবাদের পুনরুক্তি মাত্র।

(২)

"গৌরি!"

স্নানান্তে পূজার ঘরে ঢুকিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় উগ্রস্বরে ডাকিলেন, "গৌরি!"

রন্ধনশালা হইতে গৌরী উত্তর করিল, "কেন দাদা?"

"বলি এসব হয়েছে কি?"

ভয়চকিত স্বরে গৌরী বলিল, "কেন, কি হয়েছে?"

সপ্তমে সুর চড়াইয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "হয়েছে আমার মাথা মুণ্ড, আর তোমার শ্রাদ্ধ।"

গৌরী তখন ডাউল সাঁতলাইবার জন্য হাঁড়িতে তেল দিয়াছিল; ব্যস্তভাবে তাহাতে ডাউল ঢালিয়া দিল। খানিকটা গরম ডাউল তাহার হাতে লাগিল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া গৌরী হাত ধুইয়া তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে গেল।

বিদ্যানিধি মহাশয় রক্তনেত্রে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এমনি ক'রে বুঝি পূজার যো' কর্‌তে হয় ?"

গৌরী দেখিল, দাদার ক্রোধ অকারণ নহে। কোশায় জল নাই, পুষ্পপাত্রে চন্দন নাই, শিবপূজার মৃত্তিকা শুষ্ক, বসিবার আসন এককোণে জড় করা। বিদ্যানিধি বলিলেন, "এ কি হয়েছে ?"

গৌরী নিম্নস্বরে বলিল, "আজ বৌ ঠাকুরঘরে এসেছিল।"

গৌরী তাড়াতাড়ি চন্দন ঘষিতে বসিল। বিদ্যানিধি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "কেন, তুমি কোন্ যমালয়ে গিয়েছিলে ?"

গৌরী। ঘরের পাট সার্‌তে বেলা হয়ে গেল, তাই বৌকে ব'লে তাড়াতাড়ি রাঁধতে—

দন্তভঙ্গী করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন, "তাই তাড়াতাড়ি আমার পিণ্ডদানের যোগাড়ে গিয়েছিলে! একজনের ত সকাল সকাল পিণ্ড দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ, আবার আমারও সকাল সকাল পিণ্ড দেবার ইচ্ছা আছে না কি ?"

গৌরী একবার কাতর দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া নতমুখে চন্দন ঘষিতে লাগিল। চোখ দুইটা তখন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, গৌরী বহুকষ্টে তাহা রোধ করিল। কিন্তু পুষ্পপাত্রে চন্দন দিবার সময় এক ফোঁটা চোখের জল কোন বাধা না মানিয়া একটী রক্তকরবী ফুলের উপর পড়িল। লাল ফুলের উপর স্ফটিকস্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু ঢল ঢল করিতে লাগিল। গৌরী তাড়াতাড়ি ফুলটা তুলিয়া ফেলিয়া দিল।

এমন সময় রন্ধনশালা হইতে একটা বিকট দুর্গন্ধ বাহির হইল। বিদ্যানিধি-গৃহিণী বরদাসুন্দরী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সব গেল যে! বলি হচ্চে কি ? পোড়া নাকও কি নাই ?"

গৌরী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ছুটিয়া আসিল; দেখিল, ডাউল হাঁড়িতে ধরিয়া পুড়িতেছে; বরদাসুন্দরী শয়নগৃহের দাবায় বসিয়া খোকাকে স্তনপান করাইতেছেন, আর গৌরী যে ইদানীং নিতান্ত স্বার্থপরায়ণা এবং অলসস্বভাবা হইয়া পড়িয়াছে, তাহার যে আর কাহাকেও সুখে স্বচ্ছন্দে খাইতে দিবার আদৌ ইচ্ছা নাই, মুখে ইহাই প্রকাশ করিতেছেন।

সে সকল কথায় গৌরী কাণ দিল না। সে নীরবে আপনার কাজ করিতে লাগিল। তাহাকে উত্তরদানে বিরত দেখিয়া বরদাসুন্দরী অগত্যা নিরস্ত

হইলেন। এত শীঘ্র নিরস্ত হইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এক পক্ষ নীরবে থাকিলে অপর পক্ষ কতক্ষণ বাক্‌চাতুরী প্রকাশ করিতে পারে? সুতরাং এক্ষেত্রে গৌরীরই জয় হইল।

তারপর আহারের সময় গৌরীকে আবার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার নিকট যথাশাস্ত্র তিরস্কার বাণী শুনিতে হইল। ডাউলের অভাবে বরদাসুন্দরীর ত সেদিন খাওয়াই হইল না।

সকলের আহারাদি শেষ হইলে গৌরী আহ্নিক সারিয়া আপনার হবিষ্যান্ন চড়াইল। তখন প্রাঙ্গণস্থ নারিকেল গাছের ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। গৌরী আহারে বসিয়া সবে মাত্র এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়াছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, গৃহিণী বিদ্যানিধিকে উপলক্ষ্য করিয়া গৌরীকে শুনাইয়া বলিতেছে, "একটা সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এবার আমার সংসার জ্বালাতে এসেছে। আমাদের খেতে দেখ্‌লে হিংসেয় জ্বলে মরে, তাই ইচ্ছে ক'রে ভাত তরকারি পুড়িয়ে দেয়। কিন্তু নিজের পিণ্ডীর রাশিটা একবার দেখ না গিয়ে।"

বিদ্যানিধি সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, "হুঁ।"

গৌরীর আর খাওয়া হইল না। তাহার রুদ্ধ শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল, মুখের ভাত বাহির হইয়া আসিতে লাগিল; চোখের জলে পাতের ভাত ভিজিয়া গেল। গৌরী ভাতগুলি তুলিয়া লইয়া পুকুরের জলে ঢালিয়া দিয়া আসিল। পরদিন যে একাদশী, তাহা তাহার মনেই রহিল না।

বিদ্যানিধি মহাশয় তখন গৃহিণীর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া হিন্দুর সংসারে দেবীরূপিণী বিধবার অসীম মাহাত্ম্য দর্শন করিতে করিতে নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।

(৩)

রাত্রিতে সকলে যখন নিদ্রাগত, গৌরী তখন আপনার বিছানায় পড়িয়া আছে। ঘুমায় নাই, জাগিয়া আছে—কাঁদিতেছে। আজিকার ঘটনায় যে সে কাঁদিতেছে তাহা নহে, এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে, এমন তিরস্কার, এমন অনাহার তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু একটা কথা, বিদ্যানিধি মহাশয়ের একটা মর্ম্মভেদী বাক্য গৌরীর বুকে আজ বড় বাজিয়াছে। "এক জনের ত সকাল সকাল পিণ্ড দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ, আবার আমারও সকাল সকাল পিণ্ড দেবার ইচ্ছা আছে না কি?" গৌরী সকাল সকাল একজনের পিণ্ড দিয়াছে? গৌরী ভাবিতেছে, "সে কে? সে দেখিতে কেমন?" গৌরী

আপনার সমস্ত হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, সেখানে কাহাকেও পাইল না। মানসনেত্র উন্মীলন করিয়া সংসারময় চাহিয়া দেখিল, কেহই তাহার আকুল দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। গৌরী তখন মনে মনে ডাকিল, "কে তুমি দেবতা, তোমাকে যে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না! কবে তুমি এ হৃদয়াসনে আসিয়া বসিয়াছিলে? আবার কবেই বা সে আসন শূন্য করিয়া চলিয়া গেলে? গেলে ত একটুও পদাঙ্ক রাখিয়া গেলে না কেন? আমি যে তোমার সেই পদচিহ্নটুকু বুকে ধরিয়া সংসারের সকল দুঃখ—সকল যন্ত্রণা বুক পাতিয়া লইতে পারিতাম। হায় প্রভু! আমার যে কিছুই নাই, কেহই নাই, যাহার চরণে আমি আমার চোখের জল ঢালিব? কে আসিয়া আমার চোখের জল মুছাইবে?"

গৌরী পড়িয়া পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

সাত বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়া গৌরী আট বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিল। বিবাহের সময় সে তিনদিন মাত্র শ্বশুরালয়ে ছিল। কিন্তু সে সেই বিবাহের কথা, সেই তিন দিনের পরিচিত শ্বশুরালয়ের কথা কিছুতেই মনে আনিতে পারে নাই। স্বামী কেমন, তাহাকে সে কখন দেখিয়াছিল কি না, তাহা গৌরী কিছুই জানে না।

বিধবা হইয়া অবধি গৌরী পিত্রালয়েই রহিল। তখন মাতাপিতা উভয়েই জীবিত। তারপর তাঁহারা একে একে সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। গৌরী বড় কাঁদিল, কিন্তু ভ্রাতার মুখ চাহিয়া আবার শান্ত হইল। তারপর ভ্রাতৃজায়া আসিল। গৌরী নিজে গৃহিণী হইয়া ভ্রাতৃজায়াকে গৃহিণীপণা শিখাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দিন শিক্ষকের পদে থাকিতে হইল না, অচিরাৎ একটী পুত্র প্রসব করিয়াই বরদাসুন্দরী স্বয়ং শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন, ননদ আবার শিষ্যের স্থান অধিকার করিল। তখন গৌরীর বড় একটা গোলমাল হইয়া গেল। বড় সাধ করিয়া ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্র লইয়া যে সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল, তথা হইতে বিতাড়িত হইল। তবে ইহাতেও গৌরী বড় বেশী ক্ষতি বোধ করিল না; ভাবিল, হউক না কেন, সংসার বজায় থাকিলেই হইল; আমার সংসার ত বটে।

কিন্তু আর কিছুদিন পরেই গৌরী দেখিল, এখানে তাহার আমার বলিবার কিছুই নাই, সে এ সংসারের কেহই নহে। সংসারে একটা দাসীর যতটুকু অধিকার থাকে, তাহার ততটুকু অধিকারও নাই। দাসী প্রভাত হইতে

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া উপযুক্ত বেতন পায়, কিন্তু গৌরী পায় কেবল ভ্রাতৃজায়ার তীব্র তিরস্কার, আর ভ্রাতার কটূক্তি। দাসী ইচ্ছা করিলে অন্যত্র যাইতে পারে, কিন্তু গৌরীর আর কোথাও যাইবার স্থান নাই। দাসী পাঁচটা কথা সহ্য করিয়া একটা কথাও শুনাইয়া দেয়, কিন্তু গৌরীর একটা কথা বলিবারও অধিকার নাই, তাহাকে নীরবে সমস্ত বাক্যবাণ সহ্য করিতে হয়। নিতান্ত অসহ্য হইলে গৌরী কাঁদিত; প্রকাশ্যে নয়—নির্জ্জনে কাঁদিত। কিন্তু অনাথা বিধবার সে চোখের জল কে দেখিবে? কে তাহা মুছাইয়া দিবে?

আজিও গৌরী নির্জ্জনে কাঁদিতেছিল; কেবল দুইটী উজ্জ্বল তারকা দূর নীলাম্বরে বসিয়া গবাক্ষপথে তাহার চোখের জল দেখিতেছিল; কেবল ধীর নৈশ বায়ু তাহার তপ্ত ললাটে হাত বুলাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল।

(৪)

"ওঠ না পিসি মা, বেলা হয়েছে যে!"

দুই দিনের উপবাসে অবসন্ন হইয়া গৌরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাই দ্বাদশীর প্রভাতে ভ্রাতুষ্পুত্র দুলাল তাহার ঘরের দরজা ঠেলিয়া ডাকিতেছিল, "ওঠ না পিসি মা, বেলা হয়েছে যে!"

গৌরী চক্ষু মেলিয়া চাহিল; দেখিল, প্রভাত-সূর্য্যকিরণ তাহার শয্যা স্পর্শ করিতেছে। গৌরী ব্যস্তসমস্ত হইয়া যেমন শয্যা হইতে নামিতে যাইবে, অমনি তাহার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। গৌরী বুক ধরিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

দুলাল ডাকিল, "পিসি মা, পিসি মা!"

গৌরীর উত্তর দিবার শক্তি নাই; তাহার শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। দুলাল আবার ডাকিল, "পিসি মা!"

বরদাসুন্দরী তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "কেন ডাকাডাকি করছিস্? সারা রাত জেগেছে, সকালে একটু ঘুমাক।"

গৌরীর বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল। সে নিশ্বাসের সঙ্গে তাহার বুকের হাড়গুলা যেন মড় মড় করিয়া উঠিল। গৌরী ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বার খুলিল, কিন্তু দ্বারের বাহিরে আসিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িল।

দুলাল বলিল, "ওকি পিসি মা, অমন ক'রে ব'সে পড়লে কেন? কি হয়েছে পিসি মা?"

রুদ্ধশ্বাসে বহুকষ্টে গৌরী ডাকিল, "দুলাল !"

দুলাল পিসিমার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "কেন পিসি মা ?"

দুলালের হাতখানি লইয়া গৌরী আপনার বুকের উপর রাখিল।

বরদাসুন্দরী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দুলাল, তোর কি এখনও পাঠশালে যাবার বেলা হয় নি ?"

দুলাল একবার পিসিমার যন্ত্রণা কাতর মুখের দিকে, একবার মাতার তীব্র কটাক্ষের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ পরে বুকের ব্যথাটা একটু কমিয়া আসিলে গৌরী উঠিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইল।

(৫)

বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাড়ীর অনতিদূরে মল্লিকদের পুকুর। পুকুরের জল বেশ পরিষ্কার, কাকচক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; দুই দিকে দুইটা ঘাট বাঁধান, পাড়ের উপর কয়েকটা অশ্বত্থ, বট ও তালগাছ। জল ভাল বলিয়া গ্রামের অধিকাংশ লোকই পানের জন্য এই জল ব্যবহার করিত। প্রত্যহ অপরাহ্নে বামাকুলের কলঝঙ্কারে ঘাট দুইটী মুখরিত হইত, অনেক সুন্দরীর মুখপদ্ম স্বচ্ছ কৃষ্ণসলিলে ভাসমান হইয়া পুষ্করিণীর পদ্মের অভাব পূর্ণ করিয়া দিত।

ঘরের কাজ শেষ করিতে বিলম্ব হওয়ায় সেদিন গৌরী যখন ঘাটে আসিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, জলার্থিনী কামিনীরা জল লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের পরিত্যাগে ব্যথিত সরোবর অভিমানে কৃষ্ণসলিলের উপর অন্ধকারের আবরণ টানিয়া দিতেছে।

গৌরী তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া কলসীতে জল ভরিয়া ঘাটের উপরে উঠিল। সহসা পাশের বটগাছের আড়াল হইতে কে যেন শীষ দিল। গৌরী সেদিকে না চাহিয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতগমনে পাড় হইতে নামিল। আবার শীষের শব্দ; কিন্তু শব্দ এবার পশ্চাতে নহে সম্মুখে। গৌরী থমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সম্মুখে শিমুলগাছের পাশ হইতে একটা লোক বাহির হইতেছে। গৌরী ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। ক্ষণপরেই লোকটা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। গৌরী দেখিল, সে মল্লিকদের সুরেন।

সুরেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে গৌরীর মুখের দিকে চাহিল। গৌরী ভীত হইয়া বলিল, "পথ ছেড়ে দাও।"

সুরেন বলিল, "ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। আমি

কেবল তোমাকে একবার দেখ্‌তে এসেছি। আমাদের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গৌরী !”

গৌরী দৃঢ়স্বরে বলিল, “পথ ছাড় ; মনে রেখো, আমি বিধবা রমণী।”

সুরেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “তুমি বিধবা বলিয়াই ত আমার দুঃখ। গৌরী, তুমি কি সুখে থাকৃতে চাও না ?”

গৌরী আবার বজ্রকণ্ঠে বলিল, “এখনও বলছি, পথ ছেড়ে দাও।”

সুরেন বলিল, “পথ ছাড়িতেছি ; কিন্তু তুমি কতদিন আর—”

সহসা দূরে দীর্ঘাকার মনুষ্যাবয়ব দৃষ্টি করিয়া সুরেন ছুটিয়া পলাইল ; গৌরী কম্পিতচরণে গৃহে ফিরিল।

* * * *

সন্ধ্যার পর বিদ্যানিধি ডাকিলেন, “গৌরি !”

সে স্বরে চমকিত হইয়া গৌরী ভ্রাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যানিধি বলিলেন, “আজ জল আন্‌বার সময় কা’র সঙ্গে কথা হচ্ছিল ?”

গৌরীর বুক কাঁপিয়া উঠিল ; সে নতবদনে নিরুত্তর রহিল।

বিদ্যা। কে সে হতভাগা ? পথে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কি কথা ?

গৌরী নিরুত্তর।

বিদ্যা। সব বুঝেছি ; এখন তুমি দূর হও, তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ-দর্শনেও পাপ আছে।

কম্পিতকণ্ঠে গৌরী বলিল, “আমার কোন দোষ নাই।”

রাগে চক্ষু কপালে তুলিয়া বিদ্যানিধি বলিলেন, “তোর দোষ নয়তো কি আমার দোষ ? হতভাগী, আমাকে আবার দোষ গুণ বুঝাইতে আসিয়াছ ? আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি, এখন এ বাড়ী হ’তে দূর হও।”

ক্রন্দনবিজড়িতস্বরে গৌরী বলিল, “কোথায় যাব ?”

বিদ্যা। চুলোয়, যমালয়ে, যে পুকুর হ’তে জল আন্‌ছিলে, সেই পুকুরে—

গৌরী আপনার ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, “কে কোথায় আছ দেবতা, আমায় রক্ষা কর, আত্মহত্যার পাপ হ’তে আমায় বাঁচাও।”

(৬)

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরাতীত। বিদ্যানিধি মহাশয় গৃহিণীর সহিত সুখশয্যায় শয়ন করিয়া তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতেছেন। জগৎ সুষুপ্ত। কেবল গৌরী

একা ছাদের উপর জাগিয়া বসিয়া আছে। আকাশে চাঁদ নাই, নক্ষত্র নাই, নিদাঘের নিবিড় নীরদমালায় আকাশ সমাচ্ছন্ন, গ্রাম, নগর, বৃক্ষলতা গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। গৌরী সেই প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন দিগন্তের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, এই ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় তাহারও বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ গাঢ় তিমিরে আবৃত; এই অন্ধকারময়ী ধরণীর ন্যায় তাহার হৃদয়ও দুর্ভেদ্য আঁধারে ঢাকা। সেখানে একটুও আলো নাই, একটুও আশা নাই, একবিন্দু সান্ত্বনা নাই! সে সংসারের পরিত্যক্তা অনাথা বিধবা—বিধাতার অভিশাপগ্রস্তা চিরদুঃখিনী কন্যা! কিন্তু কেন—কি দোষে তাহার এত কষ্ট, এই ভীষণ শাস্তি; বাল্য, কিশোর, যৌবন,—কোন কালেই তো সে কোন পাপ করে নাই, তবে কোন্ মহা অপরাধে এই ভীম দণ্ড তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইতেছে? কোন্ পাপে এত বড় সংসারে আজি তাহার জন্য এতটুকু স্থান নাই, এতটুকু মমতা নাই, এতটুকু সান্ত্বনা নাই? বলিয়া দাও ভগবান! সে কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? প্রভাতে গৃহ বহিষ্কৃত হইয়া সে কোথায় দাঁড়াইবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তাহার রূপ আছে, বয়স আছে; সংসারের চারিদিকে শত প্রলোভন শত শত বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। কে তাহাদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে? আত্মহত্যা—আত্মহত্যা মহাপাপ। সে মহাভারতে শুনিয়াছে আত্মঘাতী ব্যক্তি কুম্ভীপাক নামক ভীষণ নরকে কোটিকল্পকাল দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করে। তবে সে কোথায় যাইবে? কে কোথায় আছ বলিয়া দাও, অভাগিনী অনাথা বিধবা কোথায় যাইবে?

কড় কড় শব্দে আকাশ গর্জ্জিয়া উঠিল; প্রবল বৃষ্টিধারা মাথায় লইয়া বায়ু উদ্দামবেগে ছুটিল, বিদ্যুতের তীব্রবিকাশে চক্ষু ঝলসিয়া গেল। গৌরী দুই হাতে বুক চাপিয়া ছাদের উপর বসিয়া রহিল, তাহার মাথার উপর দিয়া প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা চলিতে লাগিল।

(৭)

প্রভাতে উঠিয়া বিদ্যানিধি দেখিলেন, গৌরী একা ছাদের উপর অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তাহার পরিধেয় বস্ত্র আর্দ্র, চক্ষুর্দ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ, গাত্র হইতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় উত্তাপ বাহির হইতেছে। ধরাধরি করিয়া তাহাকে নীচে নামান হইল। বরদাসুন্দরী বলিলেন, "মুখে আগুন, আবার

ঢং ক'রে ছাদে পড়ে বৃষ্টিতে ভেজা হয়েছে। নষ্টের চরিত বুঝা ভার! এখন আবার ডাক্তারের জন্যে টাকা বের কর।"

বরদাসুন্দরীর আশঙ্কা ফলবতী হইল না, গৌরীর জন্য ডাক্তার আসিল না। হিন্দুর ঘরের বিধবাকে ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট অপবিত্র জল খাওয়াইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে? একে প্রবল জ্বর, তাহার উপর বুকের বেদনা; গৌরী একা শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিত। প্রায় সর্ব্বক্ষণই অচেতন অবস্থায় থাকিত; যখন চৈতন্য হইত, তখন করুণস্বরে চীৎকার করিয়া বলিত, "পথ ছেড়ে দাও, এখনো বল্‌ছি, পথ ছেড়ে দাও।" কখন বা বলিত, "দাদা, আমায় মেরো না, আমার কোন দোষ নাই, আমাকে তাড়িয়ে দিও না।" কখন বা তৃষ্ণার যন্ত্রণায় জল জল বলিয়া চীৎকার করিত। দুলাল মাঝে মাঝে গিয়া পিসিমার কাছে বসিত, জল দিত, কিন্তু মাতার ভয়ে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিত না। আর বিদ্যানিধি মহাশয় বিধবাবিবাহকারী সুবোধচন্দ্রকে সমাজচ্যুত করিতে ব্যস্ত, তাঁহার রোগীকে দেখিবার সময় কোথায়?

তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার পর গৌরী ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "দুলাল, বাপ!"

"কেন পিসি মা!"

"আমি যাই বাবা।"

"তুমি কোথায় যাবে পিসি মা, আমি তোমাকে যেতে দেব না।"

গৌরীর আর বেশী কথা কহিবার শক্তি ছিল না, ক্রমেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল; মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া তাহাকে টানিয়া ফেলিতেছিল।

দুলালের কথায় গৌরীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; সে বহুকষ্টে আপনার হাতখানি দুলালের মাথায় রাখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর স্বরে বলিল, "বাবা আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।"

দুলাল কাতরস্বরে বলিল, "তুমি অমন করছ কেন পিসি মা!"

বাহির হইতে বরদাসুন্দরী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দুলাল, রাত জেগে জেগে তুই কি একটা কাণ্ড না করে ছাড়বি না?"

গৌরীর কোটরগত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া তাহার শুষ্ক গণ্ডে পতিত হইল। দুলাল মাতার শাসনে ধীরে ধীরে আসিয়া শয্যা গ্রহণ করিল।

ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া বিদ্যানিধির পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন।"

আগন্তুক সেই সুরেন। বিদ্যানিধি মহাশয় বিস্মিত হইয়া ব্যাপার কি

জানিতে চাহিলেন। তখন সুরেন যাহা বলিল, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ,—বিদ্যানিধি মহাশয় সুবোধচন্দ্রকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করায় বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী কয়েকজন যুবক বিদ্যানিধির উপর খড়্গহস্ত হন এবং মিথ্যা অপরাধে তাঁহাকে কলঙ্কিত করিবার জন্য সেই দলের অন্যতম নেতা সুরেন সেদিন সন্ধ্যাকালে গৌরীর পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। ঘটনাক্রমে বিদ্যানিধি মহাশয়ও সেই সময়ে সেই পথে উপস্থিত হওয়ায় তাহার অভীষ্ট সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহার পর যখন সে শুনিল যে, গৌরী তাহার চক্রান্তের ফলে রোগশয্যায় পড়িয়া কেবল "পথ ছাড়, পথ ছাড়" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন তাহার মনে অনুতাপাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, এবং তজ্জন্য সে বিদ্যানিধির নিকট ও গৌরীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছে।

বিদ্যানিধি মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন, এবং ধীরে ধীরে গৌরীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৌরীর যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান হইয়াছে, মৃত্যু আসিয়া অনাথা বিধবার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে!

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মহাকবি কালিদাসের নৈতিক চরিত্র।

একজন মনীষী বলিয়াছেন,—কবিকে চিনিবার ও জানিবার একমাত্র উপায় তাঁহার কাব্য-সমালোচনা। কাব্যের প্রতি ছন্দেঃ, প্রতি শ্লোকে কবির স্বীয় ব্যক্তিত্বটুকু পরিস্ফুট হয়। কবি ঋষি, কবি মুনি, কবি অনন্ত কালের সাক্ষী। কবি জগৎ-গুরু, জগতের শিক্ষক ও আদর্শ। অধ্যাপক ডাউডেন বলেন,—Every poet is a teacher and he who draws most largely from life and nature is the greatest of such teachers অর্থাৎ প্রত্যেক কবিই শিক্ষক। তন্মধ্যে যিনি মানবের-জীবন ও প্রকৃতি হইতে উপাদান সংগ্রহ করেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। ডাউডেনের উল্লিখিত মহাবাক্যগুলি মহাকবি কালিদাসের প্রতিই কেবল প্রযুজ্য হইতে পারে।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত-সম্বন্ধে Mons. H. Fouche বলেন,—There is nothing so perfect in the eligiac literature of Europe as the Meghduta of Kalidasa.

Coleridge রঘুবংশ-সম্বন্ধে বলেন,—It is a splendid monument of his genius and has been distinguished for the beauty of its similies and the power of imagination displayed by the Indian Shakespeare—Kalidasa অর্থাৎ রঘুবংশ, ভারতীয় সেক্ষপীয়র কালিদাসের প্রতিভার গৌরব-স্তম্ভ। উপমা ও কল্পনাশক্তি-বিকাশের জন্য এই কাব্যখানি বিখ্যাত হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাস কি ভাবে আপন কাব্যের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বটুকু কতটুকু ফুটাইয়াছেন, জগতের শিক্ষকতা-কার্য্যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং তাঁহার নৈতিক চরিত্র-বল কতটুকু সেই পরিচয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হইল।

বিনয়।

মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ। বিনয়ী লোক জগতের অলঙ্কার, জাতির গৌরব, দেশের সুসন্তান। কালিদাস, মানব-জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক রঘুবংশের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই। কবি আপনাকে খর্ব্বকায় বলিয়া বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ-জন-সুলভ ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে নিজের অক্ষমতা জানাইয়াছেন। যথা,—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।

(রঘু ১ম—৩)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবির কাব্যের প্রতি অক্ষরে—প্রতি শ্লোকে নানাভাবে তাঁহার অন্তর্নিহিত চরিত্রের বা ভাবের বিকাশ হয়। দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে বিতাড়িত করায় মহর্ষি মারীচ যখন রাজা দুষ্মন্তকে—

তব ভবতু বিড়ৌজাঃ প্রাজ্যবৃষ্টিঃ প্রজাসু
ত্বমপি বিতত যজ্ঞো বজ্রিণং প্রীণয়ালম্
যুগশত পরিবৃত্তেরেবম মন্যোন্য কৃত্যৈ-
র্নয়তুমুভয় লোকানুগ্রহ শ্লাঘনীয়ৈঃ।

(শকুন্তলা ৭ম—২০১)

বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, রাজা তখন যথোচিত বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগবন্! যথাশক্তি শ্রেয়সে যতিষ্যে।"

রাজা অতিথির বিনয়-সম্বন্ধে কালিদাস লিখিয়াছেন,—

বয়োরূপ বিভূতিনাম্ একৈকং মদকারণম্
তানি তস্মিন্ সমস্তানি ন তস্যোৎসিসিচে মনঃ॥
(রঘু ১৭শ—৪৩)

অর্থাৎ ধন যৌবন ও সৌন্দর্য্য থাকা সত্ত্বেও রাজা অতিথি অতি বিনয়ী শাসক ছিলেন।

সূর্য্যবংশীয় রাজন্যবৃন্দের বিনয়-সম্বন্ধে কালিদাস লিখিয়াছেন,—

স্বাভাবিকং বিনীতত্বং তেষাং বিনয়কর্ম্মণা
মুমূর্চ্ছ সহজং তেজো হবিষেব হবির্ভুজাম্
(রঘু ১০ম—৭৯)

অর্থাৎ সূর্য্যবংশীয় রাজগণের স্বাভাবিক বিনয় শিক্ষা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

মহাকবি কিরূপ বিনয়ী ছিলেন, উল্লিখিত কয়েকটি উদাহরণই তাহার সম্যক পরিচয়। বস্তুতঃ তাঁহার কাব্যে যেমন বিনয়ের প্রকাশ দেখিতে পাই, ভবভূতির কাব্যে তাহার বিন্দুমাত্র দেখি না।

আভিজাত্য।

কালিদাস আভিজাত্যের আদৌ উপাসক ছিলেন না। তবে তিনি ধনোপার্জ্জনের একান্ত বিরোধী ছিলেন, এ কথায় সত্যের অপলাপ করা হয়। তিনি অন্যায়ভাবে বা অসদুপায়ে ধনোপার্জ্জনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। যে ধন পরোপকারার্থ ব্যয়িত হয় সেই ধনকেই তিনি প্রকৃত ধন মনে করিতেন। যে সংযতভাবে ধনের ব্যবহার করে এবং সন্তুষ্টচিত্তে ধন দিয়া যাচকের প্রার্থনা করে, তাঁহার মতে সেই-ই প্রকৃত ধনবান্।

মহামতি বেকন বলেন,—"Of great riches there is no real use, except it be in distribution * * *. Seek not proud riches, but such as thou mayest get justly, use soberly, distribute cheerfully and leave contentedly.

ইহার ভাবার্থ এই যে, বিতরণ ব্যতীত ধনের সদ্ব্যবহার হয় না। গর্ব্বোদ্দীপক ধনের অন্বেষণ করিও না। যাহা ন্যায়ভাবে উপার্জ্জন করিতে পারিবে, কেবল

তাহাই উপার্জ্জন করিবে। সংযতভাবে ধনের সদ্ব্যবহার ও আনন্দিতচিত্তে ধন বিতরণ করিবে।

বেকনের এই উক্তির সহিত কালিদাসের ঐকমত্য দেখিতে পাই। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দেখিতে পাই তিনি লিখিতেছেন,—

স বিশ্বজিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্ব্বস্বদক্ষিণম্
আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব।
(রঘু ৪র্থ—৮৬)

সংসার-ধর্ম্ম।

কালিদাস সংসার-ত্যাগই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করেন। ঐহিক কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকারের সামাজিক ও ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানের পোষকতা করিতেন। যে সমস্ত দার্শনিক বলেন যে, শরীর বিশুষ্ক করিয়া, কঠোর তাপস-ব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবদারাধনা করিতে হয়, কালিদাস সেই শ্রেণীর দার্শনিক-গণের মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিলেন। তাঁহার মতে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্"। তাই তিনি তদীয় 'কুমার সম্ভবে'র পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, মহাদেব একজন অবিবাহিত পুরুষের বেশে কঠোরতপা পার্ব্বতীর সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

বিধি প্রযুক্তাং পরিগৃহ্য সৎক্রিয়াং
পরিশ্রমং নাম বিনীয় চক্ষণম্
উমাং স পশ্যন্ ঋজুনৈব চক্ষুসা
প্রচক্রমে বক্তুমনুজ্ঝিতক্রমঃ॥
(কুমার ৫ম—৩৩)

অর্থাৎ তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী কুশকাষ্ঠ এই স্থানে পাওয়া যায় ত? এই স্থানের জলে তোমার স্নানাদি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় ত? কেমন, ক্ষমতার অতিরিক্ত তপস্যা করিয়া শরীরকে ক্লেশ দাও না ত? যেহেতু শরীরই ধর্ম্মানুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান উপায়।

স্বাস্থ্য।

কালিদাসের মতে প্রাতরুত্থান স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম উপায়। তিনি আপনার এই মতটী সূর্য্যবংশীয় রাজন্যবর্গের প্রাতরুত্থানের বর্ণনায় প্রকাশ করিয়াছেন।

যথাবিধি হুতাগ্নীনাং যথাকামার্চ্চিতার্থিনাম্
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাম্॥
(রঘু ১ম—৬)

শারীরিক পরিশ্রমের জন্য রাজন্যবর্গের মৃগয়া করা কর্ত্তব্য ইহাই কালিদাসের অভিমত। এইজন্য তিনি লিখিয়াছেন,—

পরিচয়ং চললক্ষ্যনিপাতনে
ভয়রুষোশ্চ তদিঙ্গিতবোধনম্
শ্রমজয়াৎ প্রগুণাঞ্চ করোত্যসৌ
তনুমতোঽনুমতঃ সচিবৈর্যযৌ ॥

(রঘু ৯ম—৪৯)

আত্মসংযম।

আত্মসংযম, কালিদাসের নিকট মনুষ্যত্ব-লাভের একমাত্র সোপান। তাঁহার মতে আত্মসংযমী পুরুষ দেবতুল্য, অজেয়। আত্মসংযমী পুরুষ দৃঢ়চিত্ত। সংসারের কোনরূপ পাপ প্রলোভন, কোন মোহিনীমূর্ত্তি তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নিত্য বুদ্ধ, মুক্ত, সন্ন্যাসী, যোগী।

মহাদেব পার্ব্বতীর শুশ্রূষা দানে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নাই। কারণ তাঁহার মত জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ চিত্তচাঞ্চল্যের অশেষ হেতু মধ্যবর্ত্তী হইয়াও সুস্থির থাকিতে পারেন।

অবচিত বলি পুষ্পা বেদি সম্মার্গ দক্ষা
নিয়ম বিধি জলানাং বর্হির্ষাঞ্চোপনেত্রী
গিরীশমপুচচার প্রত্যহং মা সুকেশী
নিয়মিত পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্র পাদৈঃ।

(কুমার ১ম—৫৯)

শুধু ইহাই নহে। সংযমী মহাদেব অপ্সরাগণের সঙ্গীতেও ধ্যানচ্যুত হন নাই। কারণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের মনের একাগ্রতা কোনরূপ বিঘ্নদ্বারা নষ্ট হইবার নহে।

শ্রুতাপ্স রোগীতিরপি ক্ষণেস্মিন্
হরঃ প্রসখ্যান পরো বভুব
আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ
সমাধি ভেদ প্রভবো ভবন্তি।

(কুমার ৩য়—৪০)

পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা কালিদাস মহা অন্যায় কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার হৃদয়-নিহিত এই পবিত্র ভাবটী শকুন্তলায় বর্ণিত দুষ্যন্ত-চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। অসামান্যা রূপবতী শকুন্তলা যখন রাজা দুষ্যন্তের নিকট

উপস্থিত হন, তখন রাজা তাঁহার রূপ-বর্ণনা করিতে যাইয়াও "ভবত্বনির্ব্বণ্যায় খলু পর কলত্রং" বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

বিবাহের তাৎপর্য্য।

ভগবান বলিয়াছেন, "একোঽহং বহুস্যাম প্রজায়েয়" অর্থাৎ আমি এক, কিন্তু প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব। কালিদাস ঠিক্ ভগবানের বাণীর সার্থকতা ও সত্যতা-রক্ষণের জন্য বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। বিবাহ না করিলে "সংসার" এ কথাটির মাহাত্ম্য থাকিল কোথায়? ইন্দ্রিয়বৃত্তি-পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ কালিদাসের জ্ঞানের অতীত, কল্পনা-সীমার বহুদূরে অবস্থিত। তাই তিনি লিখিয়াছেন যে,

ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্
(রঘু :ম—৭)

ব্যসন।

মানুষ একবার বাহ্য আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলে সে কখনও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, কালিদাস তাহা তদীয় রঘুবংশে অগ্নিবর্ম্মার চরিত্র-বর্ণন-প্রসঙ্গে বেশ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

দুষ্ট দোষমপি তন্ন সোঽত্যজৎ
সঙ্গ বস্তু ভিষজামনাশ্রবঃ
স্বাদুভিস্তু বিষয়ৈর্হৃত স্ততো
দুঃখমিন্দ্রিয়গণো নিবার্য্যতে॥
(রঘু ১৯শ—৪৯)

অর্থাৎ অগ্নিবর্ম্মা অবশেষে মদ্যপান ও কুসংসর্গের ফলে ক্ষয়কাসে যৌবনাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কোন মতেই তিনি ইন্দ্রিয়সেবা হইতে বিরত হইতে পারিতেছিলেন না।

পবিত্র প্রণয়।

পবিত্র ভালবাসা কালিদাসের নিকট স্বর্গীয় বস্তু। তাঁহার মতে লোকে রূপ-মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া একে অন্যের প্রতি যে আসক্ত হয়, সে আসক্তির পরিণাম অতি ভীষণ ও তাহার স্থায়িত্ব অতি অল্প। তাঁহার এই মতটী তিনি শারঙ্গরবের উক্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজা দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলাকে চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন শারঙ্গরব বলিলেন,—

অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ
অজ্ঞাত হৃদয়েষ্বেবং বৈরী ভবতি সৌহৃদং

অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের মন জানে না, এইরূপ দুইজনের বন্ধুত্ব প্রায়ই বিস্মৃতিতে পরিণত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাকবি 'ভালবাসা'কে 'স্বর্গ' অপেক্ষাও আরও কিছু শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। দেবাদিদেব মহাদেব যখন কঠোরতপা পার্ব্বতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি পার্ব্বতীর ক্রীতদাস, তাঁহার তপস্যায় তিনি ক্রীত হইয়াছেন: পার্ব্বতী তখন বিনয়-নম্র-বদনে বলিলেন, দেব! আমার পিতা আপনার সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধে যাহা হয় স্থির করিবেন। আমি পিতার আদেশানুযায়িনী হইতে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃসখীম্
দাতা মে ভূভৃথাং নাথঃ প্রমাণী ক্রিয়তামিতি।

(কুমার ৬—১)

অর্থাৎ পার্ব্বতী বিশ্বস্ত সখীর দ্বারা শিবকে বলিয়া পাঠাইলেন, পর্ব্বতরাজ আমাকে সম্প্রদান করিবার অধিকারী, অতএব আপনি তাঁহার মত গ্রহণ করুন।

কি অপূর্ব্ব উদাহরণ! পার্ব্বতী যাঁহার জন্য পার্থিব যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোরতপা হইয়াছেন, সেই ভূতনাথ শিবকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়াও তাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের উদয় হইল না। তিনি পিত্রানুমোদিত বিবাহ-বন্ধনের দ্বারা শিবের সহিত পবিত্র ভালবাসা-সূত্রে গ্রথিত হইতে ইচ্ছুক। পবিত্র ভালবাসার ইহা অপেক্ষা আর কি উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে জানি না।

অধুনা কতকগুলি নারীজাতির উন্নতিকামী বলেন, 'যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে, রমন্তে তত্র দেবতা"। কালিদাস, এই সমস্ত "উদার বিশ্বপ্রেমিকগণের" বহু পূর্ব্বে জানিতেন, নারী দেবী, নারী শক্তি, নারী মহাশক্তি। তাই তাঁহার কাব্যের অধিকাংশ স্থলে নারীজাতির প্রতি সম্মানের উদাহরণ দেখিতে পাই। রাজা রঘু রথ হইতে প্রথম অবতরণ করিয়া পাছে পড়িয়া যান এবং পাছে স্ত্রী জাতির প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শিত হয়, তজ্জন্য হস্তে ধরিয়া তাঁহার মহিষীকে অবতরণ করাইতেছেন।

অথ যন্তারমাদিশ্য ধুর্য্যান্ বিশ্রাময়েতি।
তামবারোহয়ৎ পত্নীং রথাদবততার চ ॥

(রঘু ১ম—৫৪)

কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা যখন মধুমক্ষিকার অত্যাচারে উৎপীড়িতা হইয়া চীৎকার করিতেছিলেন, রাজা দুষ্যন্ত তখন তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন,—

কঃ পৌরবে বসুমতীং শাসতি শাসিতরি দুর্ব্বিনীতানাং
অয়মাচরত্যা বিনয়ং মুগ্ধাসু তপস্বি কন্যাসু ॥

(শকু ১ম—১৩৯)

অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্ত থাকিতে কে তোমায় যাতনা দিতে সাহস করিবে ?

উর্ব্বসীকে দানবগণ লইয়া গেলে তাহার সহচরীগণ যখন সাহায্যার্থ চীৎকার করিতেছিলেন, তখন পুরুরবা বিশেষ দক্ষতা সহকারে দানবদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া উর্ব্বসীর উদ্ধারসাধন করেন।

সপ্ত ঋষিগণ হিমালয়ের নিকট পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের পরিণয় প্রস্তাব করিলে, হিমালয় বলেন, এ বিবাহে আমার আপত্তি নাই বটে, কিন্তু তথাপি আমার স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণাবশ্যক ; যেহেতু পিতার ন্যায় মাতাও কন্যার মঙ্গল-কামিনী।

প্রায়েন গৃহিণী-নেত্রাঃ কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ
মেনে মেনাপি তৎসর্ব্বং প্রত্যুং কার্য্যমতীপ্সিতম্

(কুমার ৬—৮৫)

কালিদাস গৃহিণীকে মন্ত্রী, সঙ্গী, ছাত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ।

(রঘু ৮ম—৬৭)

আদর্শ গৃহিণী।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে কালিদাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা আজিও বেদ-বাক্যের মত অনেকের গৃহে প্রতিপালিত হইতেছে। শকুন্তলা যখন ভর্ত্তৃ-গৃহে গমনোদ্যোগিনী হন, কশ্যপ তখন তাঁহাকে বলেন,—

শুশ্রূষা স্ব গুরূন্ কুরুপ্রিয় সখী বৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্ব্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্মপ্রতীপং গমঃ
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেম্বনুৎসেকিনী
যাণ্ডেবং গৃহিণী পদং যুবতয়োঃ বামা কুলস্যাধয়ঃ ॥

(শকু ৪র্থ—১৫৮)

অর্থাৎ তুমি তোমার বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান করিবে, ও তাঁহাদের সেবা করিবে। তোমার সপত্নীদিগের সহিত সৌখ্য করিবে, কখনও তোমার স্বামীর ইচ্ছার বিরোধিনী হইও না ; তাহাতে যদি তিনি তোমাকে ভৎ'সনা করেন সেও ভাল।

সাধ্বী স্ত্রী।

সতী স্ত্রী কখনও স্বামীর ইচ্ছার প্রতিকূলচারিণী হয় না, কালিদাসের হৃদয়ে এই ভাবটী বদ্ধমূল ছিল। মেনকা-চরিত্রে তিনি তাঁহার এই ভাবটী বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন। হিমালয় যখন শিবের সহিত পার্ব্বতীর বিবাহে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন, মেনকা তখন স্বামীর মনোগত ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বিবাহে সম্মতি জানাইলেন। কারণ পতিব্রতা নারী কখনও স্বামীর ইচ্ছা-বিরোধিনী হয় না।

মেনে মেনাপি তৎসর্ব্বং প্রত্যু কার্য্যমভীপ্সিতম্
ভবন্ত্য ব্যাভিচারিণ্যঃ ভর্ত্তুরিষ্ট পতিব্রতাঃ।
(কুমার ৬ষ্ঠ—৮৬)

আদর্শ স্বামী।

কেবল স্ত্রীই স্বামীর অনুবর্ত্তন করিবে এবং স্বামী যদৃচ্ছা করিবেন, কালিদাস এ কথা কখনও বলেন নাই। তিনি বলেন, স্ত্রী যেমন স্বামীর শোকে শোকান্বিতা এবং স্বামীর সুখে সুখী, স্বামীকেও তদ্রূপ স্ত্রীর দুঃখে দুঃখী ও স্ত্রীর সুখে সুখী হইতে হইবে। তাঁহার এই ভাবটী তিনি রাজা রঘু-চরিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। রাজা রঘু স্ত্রীর মৃত্যুর পর আট বৎসর কাল পত্নীশোকে অতিকষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। একদিন তিনি পত্নীর জন্য দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "আমার সমস্ত ভালবাসার সমাপ্তি হইয়াছে। আমার জীবনে আর আমোদ-প্রমোদাভিলাষ নাই। সঙ্গীত এখন বন্ধ হইয়াছে, ঋতু এখন আনন্দশূন্য। অলঙ্কারে আমার প্রয়োজন নাই, আজ আমার শয্যাশূন্য।"

(রঘু ৮ম—৯১-৯৫)

সীতাকে বনবাসে দিয়া শ্রীরামচন্দ্র অতি কষ্টে নিরন্তর সীতা-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া কালযাপন করিয়াছিলেন।

বৃত্তান্তেন শ্রবণ বিষয় পাপিনা তেন ভর্ত্তুঃ
সা দুর্ব্বারং কথমপি পরিত্যাগ দুঃখং।
(রঘু ১৪শ—৮৭)

কালিদাস বলেন, স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করুন বা নাই করুন, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর গৃহে অতি হীনজনোচিত কার্য্য করিয়াও অবস্থান শ্রেয়ঃ। স্বামীগৃহ ত্যাগ

করিলেও প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীর পক্ষে পিতৃগৃহে অধিক দিন বাস করা নিন্দাজনক। রাজা দুষ্যন্তের নিকট শকুন্তলাকে রাখিবার জন্য কণ্বপের শিষ্য শারঙ্গরব গিয়াছিলেন; তিনি দুষ্যন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজবৈনাং গৃহাণ বা
উপযুক্তর্হিদারেষু প্রভূতা বিশ্বতোমুখী।
(শকু ৫ম—১৪৬)

অর্থাৎ এই আপনার স্ত্রী। ইঁহাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান আপনার ইচ্ছাধীন; যেহেতু স্ত্রীর উপর স্বামীর যদৃচ্ছা ক্ষমতা আছে।

শকুন্তলা স্বামী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিলে শারঙ্গরব বলিলেন,—শকুন্তলে! শৃণোতু ভবতী

"যদি যথা বদতিক্ষিতিপস্তথাত্বমসি কিং পুনরুৎকুলয়া ত্বয়া
অথতুবেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিগৃহে তব দাস্যমপিক্ষমং।
(শকু ৫ম—১৫৪)

অর্থাৎ স্বামি-গৃহে শকুন্তলার অতি হীন কার্য্য করিয়া অবস্থান করাও কর্ত্তব্য।

কালিদাস বলেন, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য কেবল স্বামীর প্রীত্যর্থে; সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃক্‌পাত করা স্ত্রীলোকের উচিত নহে। তাই তিনি দেখাইয়াছেন যে, অনিন্দ্যসুন্দরী রতি দেবী মন্মথের মৃত্যুর পর তাঁহার সৌন্দর্য্যকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

কালিদাস স্ত্রীলোককে উপস্থিত বুদ্ধিমতী বলিয়া মনে করেন। রাজা দুষ্যন্ত, শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে গৌতমী নানাপ্রকারে তাঁহার চিত্তে শকুন্তলা-স্মৃতি জাগাইবার চেষ্টা করেন। রাজা দুষ্যন্ত তখন বলিলেন "উপস্থিত বুদ্ধি স্ত্রীজাতির বিশেষত্ব"।

জনৈক মনীষী বলিয়াছেন,—The greatest men see the wide vision of life and as they gaze upon that vision, it causes them and satisfies them and they care not to boast or preach but only to say what they have seen.

মহাপুরুষের এই মহাবাণী কেবল কালিদাসের প্রতি প্রযুজ্য হইতে পারে। কালিদাস আপনার চতুর্দ্দিকস্থ দৃষ্ট পদার্থপুঞ্জের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন এবং তন্মধ্যে নিজের জীবনের শিক্ষা নির্ণয় করিয়াছিলেন। *

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

* Calcutta Review পত্রে প্রকাশিত 'The Morality of Kalidasa' নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত—লেখক।

বঙ্গদেশের শিল্প।

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান। ১৯১২ খৃঃ ইহার অনুমান লোকসংখ্যা ৪ কোটী ৬৬ লক্ষ এবং ইহাদের শতকরা ৭৫ জন লোকে কৃষিকার্য্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কেবলমাত্র শতকরা ৮ জন লোক শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত আছে। বঙ্গদেশের শিল্পের কতদূর যে অবনতি হইয়াছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় দুঃখানলে জ্বলিতে থাকে। এদেশের অধিকাংশ শিল্পই বিদেশীয় বণিক-দিগের হস্তে ন্যস্ত, তাহারাই শিল্পের উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট ফল ভোগ করিয়া থাকেন, আর এদেশবাসীদিগের ভাগ্যে কেবল তিক্ত, কটু, কদাচিৎ বা অম্লমধুর ফললাভ হইয়া থাকে। এদেশীয় শিল্পীরা অতিকষ্টে দিনপাত করিয়া থাকেন—প্রধানতঃ কলের হস্তনির্ম্মিত শিল্পবস্তু, যন্ত্রনির্ম্মিত (Power Machinery) শিল্পবস্তুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না বলিয়াই দেশীয় শিল্পের দিন দিন অবনতি হইতেছে।

বঙ্গদেশের শিল্পাগারগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—প্রথম—বৃহদাকার শিল্পাগার যেখানে কলে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে; দ্বিতীয়—যে সকল শিল্পাগারের প্রস্তুত দ্রব্যাদি কলের সাহায্য ব্যতীত কেবল হস্ত-পরিচালিত যন্ত্রাদিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পর পৃষ্ঠায় একটি তালিকা * প্রদত্ত হইল, ইহাতে বৃহদায়তন ও কলে পরিচালিত শিল্পাগারের সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইল। এগুলিতে দৈনিক ৫০ জন লোকের অধিক কার্য্য করিয়া থাকে। যেগুলিতে ৫০ জনের ন্যূন সংখ্যা কার্য্য করে সেগুলির উল্লেখ করা হইল না।

এতদ্ভিন্ন গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব নানা প্রকারের ২৫টী শিল্পাগার আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ইছাপুর, কাশিপুর, দমদমা প্রভৃতি স্থানে বারুদ ও বন্দুকের কারখানা; কাঁচড়াপাড়া, বেলেঘাটা, শেয়ালদহ এবং চিৎপুর প্রভৃতি স্থানে রেল সমূহে ব্যবহারের জন্য কলকবজা (Railway Plant) প্রস্তুতের কারখানা; আলিপুরে সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য জামা প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা।

* Vide 'Statistics of British India', Part I—Industrial, 1st and 6th Issue.

শিল্পের নাম	খৃঃ ১৯০৫	খৃঃ* ১৯০৭	খৃঃ* ১৯০৮	খৃঃ ১৯০৯*	খৃঃ ১৯১০*	খৃঃ ১৯১১	খৃঃ ১৯১২
চটের কল	৪৩	৪৮	৫৩	৫৬	৫৬	৫৭	৬০
কাপড়ের কল	১২	১৪	১৩	১২	১৩	১৪	১৫
লোহার কারখানা	২৩	৩০	৩২	৩৫	৩৬	৩২	৩৪
তুলা ঝাড়াই ও গাঁইট বাঁধাই, ও পাটের গাঁইট বাঁধাইয়ের কল	৮৬	৩০	৩১	৩৬	৪২	১২৮	১২২
রেলের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা	৯	১৬	১৪	১৩	১৭	১৪	১৪
ময়দার কল	৩	৬	৫	৬	৬	৮	৭
বরফ ও সোডা লেমনেড প্রস্তুত করিবার কল	৩	৩	৪	৪	৩	৩	৩
কাগজের কল	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
ছাপাখানা	৩	১৫	২৭	১২	১০	৫	৪
চিনির কারখানা	৪	১২	১১	৯	৭	১	১
তৈলের কল	১	১২	৮	১০	১৫	১০	৫
রসায়ন ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানা	১	২	২	২	২	২	২
উপরোক্ত কারখানা ব্যতীত নানা প্রকার কারখানা	৪৪	৩৬৪	২৭৭	৩৪৭	৩১৮	১৬২	১৫৮
মোট	২৩৫	৫৫৫	৪৮০	৫৪৫	৫২৮	৪৩৯	৪২৮

* বিহার ও উড়িষ্যার শিল্প এই তালিকাভুক্ত, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

চটের কল ঃ—পাট বঙ্গদেশের* একচেটিয়া কৃষিজাত দ্রব্য। অন্য কোন দেশে পাট উৎপন্ন হয় না। নানাদেশে পাট বা তৎপরিবর্ত্তে লম্বা আঁইস বিশিষ্ট গুল্ম উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে সকল চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বঙ্গদেশে কত জমিতে পাট আবাদ হয় এবং তাহাতে কি পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়, নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রদত্ত হইল।

খৃঃ	কত একার (১) জমি আবাদ হইয়াছিল	কত গাঁইট (২) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল	প্রতি গাঁইটের মূল্য কত উত্তম	মধ্যম শ্রেণী
১৮৯৫	২২,৪২,৭০০	৬৪,২১,৬০০	৩৩৶০	...
১৯০০	২০,৯৩,৪০০	৬০,০০,০০০	৩৭৲	৩৪৷৴০
১৯০৫	৩১,২৮,৩০০	৮১,৪০,৯০০	৪৭৶০	৪৪৴০
১৯০৭	৩৯,৭৪,৩০০	৯৮,১৭,৮০০	৭৯৵০	৪৯৸৴০
১৯১০	২৯,৩৭,৮০০	৭৯,৩২,০০০	৪৩৸৴০	৩৬৸০
১৯১১	৩১,০৬,৪০০	৮২,৩৪,৭০০	৬১৸৴০	৫১৷৶০
১৯১২	৩৩,৫৩,৮০০	৯৫,২১,৮০০	৬৫৷৵০	৫৪৸০

পাট কিরূপে জন্মে বা তাহা হইতে কিরূপে থলে বা চট প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবলমাত্র মাদ্রাজে ২টী পাটের কল আছে এবং বাকীগুলি সমস্তই বঙ্গদেশে। চটের কলে অধুনা ৪০ হইতে ৪৫ লক্ষ গাঁইট অর্থাৎ দুই কোটি বার লক্ষ মণ পাট ব্যবহার হইয়া থাকে, এবং এদেশে ৫০ লক্ষ মণ অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চটের কল সমূহ গঙ্গার কূলে অবস্থিত বলিয়া উৎপন্ন স্থান হইতে পাটের কলে আমদানি করিবার—এবং প্রস্তুত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিবার সুবিধা হয়। হস্ত দ্বারা পরিচালিত তাঁতে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে থলিয়া এবং চট প্রস্তুত হইত; কলের তাঁতের প্রবর্ত্তন হওয়াতে এই সকল তাঁতের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে এবং শীঘ্রই এই শিল্পীদের বিলোপ সাধন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ১৮৫৫ খৃঃ অক্‌লেণ্ড নামক একজন ইংরাজ কলিকাতার নিকট সর্ব্বপ্রথমে একটী চটের কল স্থাপন করেন। প্রথম কিছুদিন এই কল চালাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়, পরে এই কলে অত্যধিক লাভ হওয়াতে নানা কোম্পানী গঠিত হইতে লাগিল এবং কলের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে

---

* বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশের উৎপন্ন পাট এই তালিকা ভুক্ত। Vide 'Area and yield of certain Principal Crops in India, 15th Issue, 1912-13'.

(১) এক একার—তিন বিঘা জমির সহিত সমান।

(২) এক গাঁইট পাটের ওজন ৫ মণ।

লাগিল। নিম্নে একটি তালিকা দিয়া ভারতের চটের কলের সংখ্যা, মূলধন এবং টাকুর সংখ্যা প্রদর্শিত হইল :—

খৃঃ	চটের কলের সংখ্যা	কত টাকা মূলধন	মজুরের সংখ্যা	তাঁতের সংখ্যা	টাকুর সংখ্যা
১৮৭৯-৮০	২২	৩,৩৭,০০,০০০	২৭,৫০০	৪,৯৪৬	৭০,৮৪০
১৮৮৯-৯০	২৬	৩,৯০,০০,০০০	৫৯,৫৪১	৭,৭০৪	১,৫৬,৮৬৬
১৮৯৪-৯৫	২৮	৪,২৭,০০,০০০	৭৪,৩৫৭	৯,৬৩৮	১,৯৯,৭৫৭
১৮৯৯-১৯০০	৩৪	৫,৯৭,০০,০০০	১০২,৪৪৯	১৪,১১৯	২,৯৫,৩০২
১৯০৪-০৫	৩৮	৮,০৯,০০,০০০	১৩৩,১৬২	১৯,৯৯১	৪,০৯,১৭০
১৯০৬-০৭	৪৪	৯,৫০,০০,০০০	১৬৬,৮৯৫	২৫,২৮৪	৫,২০,৫০৪
১৯০৯-১০	৬০	১১,৫১,০০,০০০	২০৪,৩৯০	৩১,৪১৮	৬,৪৫,৮৬২
১৯১০-১১	৫৮	১১,৫০,০০,০০০	২১৬,৩৯০	৩৩,১৬৯	৬,৮২,৫২৭
১৯১১-১২	৫৯	১১,৯৫,০০,০০০	২০১,৩২৪	৩২,৯২৭	৬,৭৭,৫১৯
১৯১২-১৩	৫৯	১৫,০০,০০,০০০	২০৪,০৯২	৩৩,৯৭৫	৭,০৬,৩৮০

তিনটী ভিন্ন এই সমস্ত কল যৌথ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত। প্রায় ১৫ কোটী টাকা এই সকল চটের কলে নিয়োজিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১০ কোটী টাকা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত। এই সমস্ত কলে বাৎসরিক প্রায় ১৷৹ কোটী টাকা লাভ হয়। দুই লক্ষের উপর লোক এ সকল কলে কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং ৪৷৹ ক্রোর টাকা প্রতি বৎসর মজুরী পাইয়া থাকে। বঙ্গদেশের চটের কল সমূহ সমস্তই ইংরাজ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। কত পাট এবং চট ও থলে বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে নিম্নের তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইল :—

খৃঃ		থলের সংখ্যা লক্ষ	কত গজ চট লক্ষ	থলে এবং চটের মোট মূল্য লক্ষ টাকা	কত পাট রপ্তানি হইয়াছিল লক্ষ হন্দর
১৮৭৯-৮০ হইতে ১৮৮৩-৮৪	৫ বৎসরের গড়	৫,৪৯	৪৪	১,২৫	৭৫
১৮৮৪-৮৫ হইতে ১৮৮৮-৮৯	ঐ	৭,৭০	১,৫৪	১,৬৩	৮৯
১৮৮৯-৯০ হইতে ১৮৯৩-৯৪	ঐ	১১,১৫	৪,১০	২,৮৯	১,০০
১৮৯৪-৯৫ হইতে ১৮৯৮-৯৯	ঐ	১৭,১২	১৮,২০	৫,১৮	১,২৩
১৮৯৯-১৯০০ হইতে ১৯০৩-০৪	ঐ	২০,৬৫	৪২,৭২	৮,২৬	১,২৭
১৯০৪-১৯০৫ হইতে ১৯০৮-০৯	ঐ	২৫,৭৮	৬৯,৮০	১৪,৪৩	১,৫১
১৯০৯-১০		৩৬,৪৪	৯৪,০১	১৭,১০	১,৪৬
১৯১০-১১		৩৬,০৯	৯৫,৫৩	১৬,৯৯	১,২৭
১৯১১-১২		২৮,৯৮	৮৭,১৫	১৬.০১	১,৬২
১৯১২-১৩		৩১,:৭	১,০২,১৮	২২,৮৭	১,৭৫

পাটের চাষে অনেক কৃষিজীবী লোকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় পাটের চাষ বৃদ্ধিতে অনেক ধান্য-ক্ষেত্র পাট-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, ধান্য ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ইহার অন্যতম কারণ। দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশে অনেক চটের কল রহিয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে এ দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত একটিও নাই। কলিকাতার হাটখোলার মহাজনেরা অনেকেই পাটের ব্যবসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমবেত হইয়া একটি যৌথ কোম্পানী গঠিত করিয়া একজন সুদক্ষ অধ্যক্ষ (Mill Manager) নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইলে, একটি পাটের কল উত্তমরূপ চলিতে পারে। তাহারা অগ্রণী হইয়া এইরূপ কল স্থাপন করিয়া লাভবান হইলে, বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলের ন্যায়, এ দেশীয় ধনী লোকদিগের চটের কল খুলিবার বিশেষ আগ্রহ জন্মিবে বলিয়া মনে হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীঃ—

পাগলিনী।

(১)

জলন্ধরের সন্নিকটস্থ পৌড়িয়া গ্রামের শঙ্কর সিংহের সহিত সুন্দরী মূর্ত্তির উদ্বাহ বন্ধনে পাশ্চাত্য বিবাহের পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলেও ভারতবর্ষের সাধারণ বিবাহ অপেক্ষা তাহাতে অনেকটা স্বাধীনতা ছিল। যুবক শঙ্কর সিংহের কোনও অভিভাবক ছিল না। সে শৈশবে মূর্ত্তির সহিত খেলিয়াছে, সময়ে সময়ে তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিয়াছে, বাল্যেও তাহার সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিয়াছে, শতদ্রুর জলে সাঁতার কাটিয়াছে; তরুণ বয়সে তাহাকে মাথায় করিয়া নদী হইতে জল তুলিয়া আনিতে দেখিয়াছে, মাঝে মাঝে নিরালায় তাহার জন্য জল বহিয়া আনিয়া গৃহের কাছে তাহার হস্তে কলসী দিয়া তাহার আকর্ণ-বিস্ফারিত নয়নে কৃতজ্ঞতার জ্যোতিঃ দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। যৌবনে অপরের সম্মুখে মূর্ত্তি তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে সঙ্কুচিত হইত। কিন্তু পথে মাঠে শতদ্রুর তীরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই শিখ ললনার

অনিন্দ্য-সুন্দর মুখে বৈশাখী চপলার মত হাসিরেখা যুবকের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহার সেই বলিষ্ঠ দেহ পুলকিত করিত। এ ক্ষেত্রে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক শঙ্কর সিংহ পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী মূর্ত্তিকে বিবাহ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ কি? লজ্জার মাথা খাইয়া সে স্বয়ং মূর্ত্তির পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, তাহাদের বিবাহে এ দেশের সাধারণ বিবাহের মত নিরস প্রাণহীনতা ছিল না, তাহাতে একটু পাশ্চাত্যের 'রোমান্স' ছিল, খৃষ্টীয় জগতের স্বাধীনতা ছিল।

বিবাহের এক বৎসর পরে শিখ পল্টনে নাম লিখাইয়া যখন শঙ্কর সিংহ গৃহে যুবতী স্ত্রীকে রাখিয়া বক্সা দুয়ারে যাত্রা করিল তখন পৌড়িয়ার ক্ষুদ্র কুটীর-কক্ষে কি প্রাণস্পর্শী অভিনয় হইল তাহা অনুমান করা দুরূহ নহে। স্বামীর বিশাল বক্ষে মুখ লুকাইয়া, দুই হস্তে স্বামীর কমনীয় কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মূর্ত্তি অনেক কাঁদিল। বলবান শঙ্করেরও চক্ষু হইতে অশ্রুকণা পড়িয়া তাহার নব বিকসিত শ্মশ্রুরাজি সিক্ত করিল। তাহার উষ্ণীষবিহীন শিরে সুদীর্ঘ কেশরাশি সিংহের কেশরের মত প্রতিভাত হইতেছিল। তাহার সেই সুগঠিত মাংসপেশীগুলিতে যে এত কোমলতা থাকিতে পারে, অন্য সময় তাহাকে দেখিলে সে কথা আদৌ বিশ্বাস হয় না। মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে রোদন-কাতর চক্ষে ভৎর্সনা ভরিয়া স্বামীর দিকে চাহিতেছিল। সে এক মারাত্মক বাণ। শঙ্কর ওষ্ঠরূপ ঢালে সে বাণের ভীষণতা হ্রাস করিয়া আনিতেছিল। মূর্ত্তি বক্ষ হইতে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিবামাত্র সে তাহার বক্ষে চুম্বন করিতেছিল। অমনি অভিমানিনী মুখ লুকাইয়া স্বামীর বিরাট বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল।

(২)

পল্টনে ভর্ত্তি হইয়া শঙ্কর কুচকাওয়াজ শিখিত, বন্দুক অভ্যাস করিত, পল্টনের অন্যান্য যুবক সেনানীর সহিত রহস্যালাপ করিত কিন্তু সর্ব্বদা তাহার মনটি সেই শতদ্রুতীরস্থ পৌড়িয়া গ্রামের ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে দৌড়িয়া আসিত। মূর্ত্তি তাহার কথা ভাবিতেছে, তাহার উপর অভিমান করিয়া সুন্দরী প্রসাধন করিতেছে না, ময়লা জীর্ণ পাজামার ভিতর, মলিন পিরাণের মধ্যে আপনার সোণার অঙ্গ লুকাইয়া রাখিয়া সে মনে মনে স্বামীকে তিরস্কার করিতেছে, গ্রামের সখীদিগের নিকট স্বামীর নিষ্ঠুরতার গল্প বলিয়া কাঁদিতেছে, সিপাহী শঙ্কর সিং প্রথম প্রথম বক্সা দুয়ারের পাহাড়ের দিকে চাহিয়া কেবল তাহাই ভাবিত। শুধু তাহাই নহে জলন্ধর জেলা যে ভারতের শীর্ষস্থান, পৌড়িয়া

গ্রামের সেই শুষ্ক পথঘাটগুলা যে বিধাতার লীলাভূমি, শতদ্রুর খরস্রোত যে জাহ্নবী-যমুনা অপেক্ষা অনেক পবিত্র সে ধারণাটাও সৈনিক শঙ্কর সিংহ ধীরে ধীরে বেশ উপলব্ধি করিতেছিল। প্রবাসে চাকুরী না করিলে তাহার জীবন-যাত্রা হইবে না। তাই অগত্যা তাহাকে বাপ-পিতামহের ব্যবসা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে সে স্ত্রীকে সঙ্গে রাখিতে অনুমতি পাইবে। তখন তাহার জীবন মধুময় হইবে। সে সেই আশায় বাঁচিয়াছিল।

(৩)

তিন সপ্তাহ হইল শঙ্করের পল্টন প্রয়াগে আসিয়াছিল। আজ বিজয়া দশমী—এলাহাবাদের চৌকে দশেরার মেলা। সাদা পাজামা, সাদা পিরহান, মস্ত বড় একটা শুভ্র উষ্ণীষ পরিধান করিয়া পল্টনের কতকগুলি যুবক সিপাহীর সহিত শঙ্কর বাজারে রামলীলা দেখিতে আসিল। চৌকে বিষম জনতা। যে পথ দিয়া শোভাযাত্রা যাইবে সে পথের প্রত্যেক গৃহের ছাদে, অলিন্দে প্রস্তরায় সর্ব্বত্র রাশি রাশি নরনারী। পথের দুই দিকে তো লোকের সংখ্যা করা যায় না। সকলেই সাধ্যানুসারে সুসজ্জিত, সকলেরই মুখে আনন্দের রেখা। এই আনন্দের মাঝে পড়িয়া বিরহ কাতর শঙ্করও মনে বেশ প্রফুল্লতা অনুভব করিতেছিল।

দূরে বাজনার শব্দ শুনা গেল। সকলে সেই দিকে চাহিল। অশ্বারোহী পুলিস ছুটিয়া মিছিলের জন্য পথের মধ্যের রাস্তা সাফ করিতে আসিল। মিছিল সোজা আসিয়া কোতয়ালীর পাশ দিয়া চলিয়া যাইবে। শঙ্কর সিংহের সিপাহীর দল কোতয়ালীর নিকট সারি দিয়া দাঁড়াইল। যাহারা দূরে মিছিল দেখিতে পাইল না, তাহারা সিপাহীর সারি দেখিল। তাহাও দৃষ্টি-সুখকর।

সাহেবেরা বলে, ভারতবর্ষের সকল অনুষ্ঠানেই সুব্যবস্থার অভাব। কথাটায় অনেকটা সত্য আছে। এই রামলীলা ব্যাপারে প্রতি বৎসর প্রয়াগে যে অর্থ ব্যয় হয়, যতটা শক্তির অপচয় ঘটে, ঠিক সেই পরিমাণে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় না। অতটা বিশৃঙ্খল না হইলে এই রামলীলার মিছিল প্রকৃত দৃষ্টি-সুখকর হইত। কিন্তু সুব্যবস্থার অভাবে রামলীলার সময় কেবল নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, হনুমান, জাম্বুবান, মর্কটের দন্ত-বিকাশের আধিক্য।

প্রথমে হাতীর দল আসিল। প্রথম হাতীর উপর হইতে কাড়া-নাকড়া-দামামা দুন্দুভির ভীষণ রোল সমুত্থিত। তাহার পশ্চাতের হস্তি-পৃষ্ঠে মুখে খড়ি মাখিয়া, কাপড়ের রঙ্গীন পাখা বিস্তার করিয়া একদল পরী। পরীর

সাজেই একটা ছোকরা স্বদেশী বিড়ি টানিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। ধূমপানরত পরী দেখিয়া সিপাহীর দল হাসিয়া উঠিল। তাহার পশ্চাতের হস্তিপৃষ্ঠে মুখোস-পরা পাঁচটা বানর নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিতেছে। এইরূপে হাতীর সারি এক এক করিয়া চলিয়া গেল। প্রত্যেক করীর পৃষ্ঠে বিচিত্র সাজে সজ্জিত লোক। শঙ্কর এক এক করিয়া গণিল পঁয়তাল্লিশটি হস্তী হেলিয়া দুলিয়া শুঁড় নাড়িয়া তাহার সম্মুখ দিয়া কোতয়ালীর পার্শের গলিতে প্রবেশ করিল।

তাহার পর ঋষিবেশধারী অভিনেতার দল। প্রায় ত্রিশ জন লোক গাত্রে ভস্ম মাখিয়া,মাথায় জটাজুট ধারণ করিয়া, গৈরিকবাসে দেহ আবৃত করিয়া সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। উহাদের মধ্যে অনেকেই কুস্তির পালোয়ান। এক এক লোটা সিদ্ধি পান করিয়া, গঞ্জিকায় দম দিয়া ঢুলু ঢুলু নেত্রে বশিষ্ট বিশ্বামিত্র দুর্ব্বাসার দল 'রামচন্দ্রজী কি জয়' 'লছমনজী কি জয়' বলিতে বলিতে সদর্পে চলিয়া গেল। কেহ বা চলিতে চলিতে 'জয় সীতামায়ী কি জয়' বলিয়া হাতের ত্রিশূল ঘুরাইয়া একটু তাণ্ডব নৃত্য করিয়া গেল। দুই একজন পার্শ্বের পানের দোকান হইতে পান তুলিয়া লইয়া উদরস্থ করিল। জটাজুটধারী ত্রিশূলপাণি না হইলে লোকে ইহাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের কিষ্কিন্ধ্যাবাসী অনুচর বলিয়া সহজেই ভ্রম করিতে পারিত।

তাহার পর 'কুব্জপৃষ্ঠ মুক্ত দেহ' উষ্ট্রের সারি। সম্মুখের উঠের লেজের সহিত পশ্চাতের উঠের মুখ বাঁধা। প্রত্যেক উষ্ট্রের উপর দুই একজন করিয়া অভিনেতা। কেহ রাজপুত্র সাজিয়াছে; কেহ হনুমান সাজিয়াছে; কেহ বীর যোদ্ধার বেশে সজ্জিত হইয়াছে। পাঞ্জাবী সিপাহীদলের উট দেখিয়া একটু আনন্দ হইল। তাহাদের দেশে এ জন্তুর বাহুল্য। শঙ্কর সিংহের সঙ্গী গণিল,—উনপঞ্চাশটি উষ্ট্র।

উষ্ট্র সারির পশ্চাতে আসাসোটা বল্লম ঢাল তরবারী লইয়া একদল পদাতিক সৈন্য। পরিধানে বড় বড় চাপকান কিন্তু কোনও চাপকানটি কাহারও অঙ্গে ঠিক হয় নাই। পদাতিকদিগের পশ্চাতে একটা চতুর্দ্দোলায় ভারত-মাতা। একটি সামিয়ানার ভিতর ভারতবর্ষের মানচিত্র। মানচিত্রের গাত্রে একজন ভারতমাতা সাজিয়া বাম হস্ত প্রসার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পদার্থটা কি সে সম্বন্ধে অজ্ঞ দর্শকদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ চলিল। কেহ বলিল রমণীটি সূর্পনখা, কেহ বলিল রাণী দুর্গাবতী; যাহারা এলফ্রেড্ পার্কে

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছিল তাহারা বলিল চতুর্দ্দোলায় বিলাতের মহারাণী যাইতেছেন।

এইরূপে একে একে অনেক চতুর্দ্দোলা গেল। তাহাদের উপর নানা প্রকার মূর্ত্তি। একটিতে কালীমূর্ত্তি। কালীর হস্তে ছিন্নমুণ্ড, দক্ষিণ হস্তে কালী অসি ঘুরাইতেছেন। কোন কোন অভিনেতা গরমে কাঠের মুখোস সহ্য করিতে না পারিয়া মুখোস খুলিয়া মাথার উপর রাখিয়া রহস্যবোধে নিজে হাসিতেছে, লোক হাসাইতেছে।

তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠে ঝান্সীর রাণী আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে প্রায় শতেক অশ্বারোহী। এ দৃশ্যে দর্শকদের হৃদয় নাচিয়া উঠিল—বিশেষ শিখ্ সিপাহীদের। জনতার মধ্যে সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—'জয় রাণী দুর্গাবতী'। দুইটা ঘোড়া ক্ষেপিয়া চৌকের পাশের রাস্তা দিয়া সহরের নির্জ্জন স্থলে চলিয়া গেল। হীনবল হইয়াও রাণীজি মিছিলের সহিত কোতয়ালীর পাশের গলিতে প্রবেশ করিলেন।

আরও দুই চারিখানা চতুর্দ্দোলা গেল। একটা চতুর্দ্দোলায় পিতলের গাছের ডালে ডালে কপিকুল শায়িত, আর সমস্ত গাছটা ঘুরিতেছে। ঐরূপ ঘূর্ণায়মান অপর বৃক্ষে কতকগুলা পরী মূর্ত্তি। এ কৌতুকপ্রদ শিল্পে দর্শকবৃন্দ বড় আনন্দ লাভ করিল।

শেষে হস্তি-পৃষ্ঠে শ্রীরাম লক্ষ্মণ আসিলেন। দুইটা লোক ছোট ছোট ফুলের ছড়ি বিক্রয় করিতে করিতে করিবরের পাশে পাশে ছুটিতেছিল। লোকে সেই ফুলছড়ি কিনিয়া সেগুলি শ্রীরামচন্দ্রের উপর ছুঁড়িতেছিল। একটি লোক হাওদার পশ্চাতে বসিয়া সেই ফুলশর হইতে যথাসাধ্য রঘুকুলচূড়ামণিকে বাঁচাইতেছিল।

মিছিল চৌকের পথ ছাড়িয়া গলিতে প্রবেশ করিল। একটা ভীষণ জনতা আসিয়া সিপাহীর দলকে ধাক্কা দিল। একটা হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি হইতে লাগিল। যাহারা দুর্ব্বল তাহারা স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া শঙ্করসিংহ উপরদিকে চাহিয়া চমকিত হইল। একটা বারান্দায় কতকগুলা স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া—মূর্ত্তি। সে একবার, দুইবার, বহুবার দেখিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, সে প্রত্যেকবার দেখিল সেই রমণী শ্রেণীর মধ্যে তাহার স্ত্রী মূর্ত্তি। পিছন হইতে ধাক্কা আসিল। তাহাকে অগ্রসর হইতে হইল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ভিড় ঠেলিয়া সেই স্থলে আবার ফিরিয়া শঙ্কর

কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহার প্রয়াগে বদলীর কথা মূর্ত্তি জানিত না। শঙ্কর হাসিল। ভাবিল, সে খেয়াল দেখিয়াছে।

(৪)

আবার কঠোর কর্ত্তব্য। বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পরদিন প্রাতে শঙ্কর ছোট লাট সাহেবের ফটকে পাহারা দিতেছিল। পূর্ব্ব রাত্রিতে মিছিলের পর চৌকের রাস্তা নানারূপ আলোকমালায় বিভূষিত করা হইয়াছিল। সে বহুবার সে পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকল রমণীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে। যাহাকে সে মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল, সে রমণীকে সেখানে দেখিতে পায় নাই।

সে ফটকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বন্দুক স্কন্ধে ঘুরিতেছিল। মনে মনে কত চিত্র আঁকিতেছিল. অতীত জীবনের কত চিত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে উৎফুল্ল করিতেছিল। এতদিন চাকুরি করিয়া সে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল। ছয়মাস পরে ছুটি পাইয়া সে যখন গৃহে ফিরিবে, তখন মূর্ত্তির জন্য কি উপহার লইয়া যাইবে, যুবক তাহাই ভাবিতেছিল। মূর্ত্তির সেই অভিমানস্ফীত মুখখানি তাহার সেই নবনীত কোমল দেহ—

অকস্মাৎ আবার সেই বিভীষিকা! লাউথার রোডের উপর দিয়া বিকট শব্দ করিতে করিতে একখানা এক্কা ছুটিতেছিল। সিপাহী চাহিয়া দেখিল—এক্কায় মূর্ত্তি বসিয়া—না না মূর্ত্তি না, মূর্ত্তির মত চেহারা—সাটিনের পায়জামা—লাল ওড়না—রাত্রির রমণী—না মূর্ত্তি—উঁহু। কিন্তু ঠিক মূর্ত্তির মত দেখিতে। শঙ্কর বন্দুক ফেলিয়া এক্কার পিছনে ছুটিতে চাহিল। আবার সৈনিক জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ফটক ছাড়িয়া এক পা চলিলে ভীষণ বিপদ। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত বেগবান্ এক্কার দিকে চাহিয়া রহিল। কি রহস্য!

(৫)

আজ হইতে সাতদিন শঙ্করের কেল্লার যমুনায় ফটকে পাহারা। সে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া যেখানে পায়চারি করিতেছিল সে স্থল হইতে যমুনা দেখা যায়। পার্শ্বে একটা প্রাচীর আছে বলিয়া গঙ্গা দেখা যায় না। তাহার ফটক হইতে একটা গড়ানে পাকা রাস্তা একেবারে যমুনায় গিয়া শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বে সেইখানে গঙ্গাযমুনা মিলিত হইত। বর্ষার সময় এখনও উহা সঙ্গমস্থল। কিন্তু আশ্বিন মাসে গঙ্গা সরিয়া গিয়াছিল। প্রয়াগদুর্গ হইতে যমুনার তীরে গঙ্গার চড়ের উপর দিয়া প্রায় একপো রাস্তা চলিলে তবে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল।

শঙ্কর পাহারা দিতেছিল। তাহার সম্মুখে কালিন্দীর কাল জলরাশি মৃদুমন্দ গতিতে গঙ্গার দিকে চলিতেছিল। উষালোকে যমুনার জল ঝক্ ঝক করিতেছিল। দূর হইতে তীর্থযাত্রীদের কণ্ঠস্বর আসিয়া যুবক সৈনিকের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছিল। সে বিচার করিতেছিল, বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে একটা স্ত্রীলোকের মত কোমল প্রাণ লুকাইয়া রাখা ঠিক শিখধর্ম্ম কি না। মনকে দৃঢ় করিবার জন্য সে পদবিক্ষেপ দৃঢ় করিতেছিল। কিন্তু হাঃ অদৃষ্ট! আবার সেই বিভীষিকা।

পাকা রাস্তার উপর দিয়া সাটিনের পায়জামা পরিয়া, অঙ্গে লাল রেশমী ওড়না উড়াইয়া পায়ে জরির জুতা তাহার উপর রূপার পাঁয়জর পরিয়া সেই রমণী মূর্ত্তি একটি শিখ যুবকের বাহুতে ভর দিয়া কেল্লা দেখিবার জন্য উঠিয়া আসিতেছিল। শঙ্কর একদৃষ্টিতে সেই দম্পতির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হইবার উপক্রম হইল। তাহার দেহ টলিতেছিল। যুবক যুবতী আপনার মনে গল্প করিতে করিতে আসিতেছিল। শঙ্কর স্পষ্ট চিনিল—মূর্ত্তি। তাহার জীবনের সকল আশার কেন্দ্রস্থল, তাহার ভবিষ্যৎ সুখসৌধের ভিত্তি, তাহার পরিণীতা স্ত্রী, বিরহিণী মূর্ত্তি যুবক টিকমচাঁদের বারবিলাসিনীর মত তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য তাহারই দিকে আসিতেছে। টিকমচাঁদ কলিকাতায় মোটর-চালকের কার্য্য করিত। টিকম তাহার প্রতিবেশী। শঙ্করের অনুপস্থিতিতে গ্রামে ফিরিয়া সে সরলা মূর্ত্তিকে ভুলাইয়াছে। আকবর সাহ নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রয়াগদুর্গ টলিতে লাগিল। যমুনার জলরাশি তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল। আপনার দেহ স্থির রাখিবার জন্য সৈনিক স্কন্ধ হইতে বন্দুক নামাইয়া বন্দুকের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। টিকম ও মূর্ত্তি তাহার দশ হস্তের মধ্যে আসিল।

এবার শঙ্করের স্পন্দন বন্ধ হইল। কার্য্যের সময় আসিল। তাহার হৃদয়ের পাশববৃত্তি নাচিয়া উঠিল। সে বন্দুক তুলিল। হঠাৎ আগন্তুকদ্বয় তাহার দিকে চাহিল। তাহারা এতক্ষণ তাহার প্রতি লক্ষ্য করে নাই। সে যে এলাহাবাদে থাকিতে পারে, এ সন্দেহ তাহাদের মনে একবারও উপস্থিত হয় নাই। তাহার ও মূর্ত্তির চক্ষু মিলিত হইল। একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্ত্তি দুর্গ-প্রাচীরের উপর পড়িল। টিকমচাঁদ কাপুরুষের মত প্রাণভয়ে ছুটিল।

শঙ্কর তাহাকে গুলি করিল না। নিজ হস্তে তাহাকে টিপিয়া মারিবে বলিয়া শার্দ্দূল-বিক্রমে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। পাকা রাস্তা ছাড়িয়া

গঙ্গার চড়ের উপর টিকম ছুটিতে লাগিল। একজন প্রাণভয়ে ছুটিতেছে, একজন প্রতিহিংসার জন্য ছুটিতেছে। প্রতিহিংসার জয় হইল। যমুনার তীরে শঙ্কর টিকমের গলা টিপিয়া ধরিল। টিকম এক হস্তে তাহার কেশ ধারণ করিল অপর হস্তে তাহার পোষাকের পেটি ধরিল।

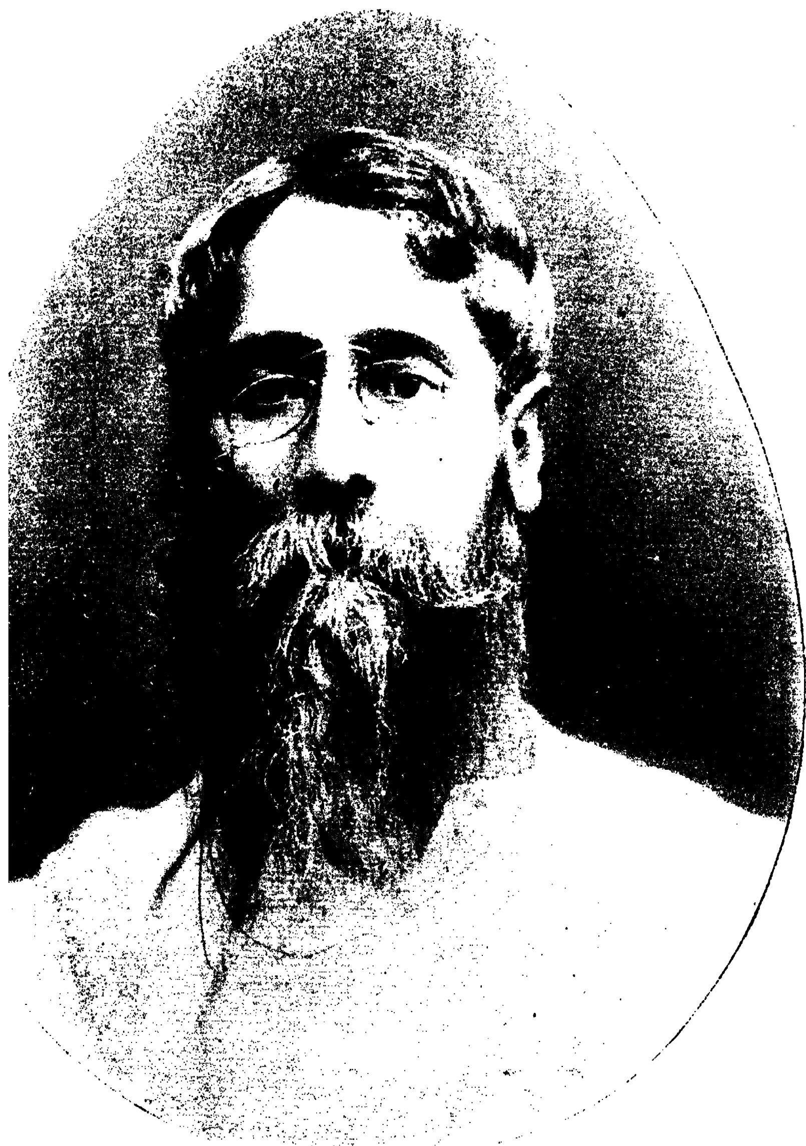
দুইজনে মহা মল্লযুদ্ধ হইল। শেষে পা পিছলাইয়া টিকম জলে পড়িল। শঙ্কর তাহার গলা টিপিয়া রহিল। তাহার মুখ জলের উপর ছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট সে টিকমকে জলের ভিতর বজ্রমুষ্টিতে টিপিয়া রহিল। ঠিক তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি কাঁদিতেছিল। দূর হইতে দুই একটা লোক তাহাদিগকে দেখিতেছিল। কিন্তু তখন যমুনার জলে কি ভীষণ ব্যাপার অভিনীত হইতেছিল তাহা কেহ বুঝিল না।

যখন শঙ্কর বুঝিল কার্য্য শেষ হইয়াছে তখন সে মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া এক বিকট হাস্য করিল। যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তাহার ক্ষিপ্ত স্বামীর চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। সে ঝলসিত হইবার ভয়ে কোমল করে মুখ ঢাকিল।

শঙ্কর স্থির করিল এইবার মূর্ত্তির পালা। কর্ত্তব্য সাধন করিবার জন্য সে উঠিতে গেল। কিন্তু সর্ব্বনাশ মৃত্যু যন্ত্রণায় টিকমের হস্ত বজ্রমুষ্টিতে তাহার কেশ ও পেটি চাপিয়া ধরিয়াছে। সে শবদেহ হইতে আপনার দেহ ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। উভয়ে সরিয়া অধিক জলে পড়িল। ক্রমশঃ শবে ও জীবে সংগ্রাম ভীষণ হইয়া উঠিল। সে যত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল শবদেহ তাহাকে ততই অধিক জলে লইয়া গেল। তীরে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—সে কাঁদিল শবের জন্য এবং জীবের জন্য। একজন সন্ন্যাসী ছোট নৌকায় জগন্নাথের মূর্ত্তি বসাইয়া জলে ঘুরিয়া যাত্রীদিগের নিকট কিছু উপার্জ্জন করিতেছিল। শঙ্করকে বাঁচাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া সেস্থলে আসিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় শব ও জীব ডুবিল। কালিন্দীর শেষ জলে দুইটি নরদেহ লুক্কায়িত হইল। পাঁচ হাত অগ্রসর হইয়া যমুনা ও ভাগীরথীর শুভ্র বারিরাশির মধ্যে লুকাইয়া পড়িল।

(৬)

মূর্ত্তি কাঁদিল। তাহার চতুর্দ্দিকে লোক আসিয়া জমিল। মূর্ত্তি স্থির হইল। সকলের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্ট অদ্ভুত। সে দৃষ্টি প্রাণহীন। তাহার পর সে যমুনার দিকে চাহিল। যেখানে তাহারা দুইজনে ডুবিয়াছিল সেই স্থলে



রবীন্দ্রনাথ

চাহিয়া রহিল। বোধ হয় মনে মনে ভাবিল কাহার ওষ্ঠে অধিক মধু ছিল। সে দুইজনকে প্রাণ দিয়াছিল, হিন্দুললনা কুলে কালি দিয়া পলাইয়াছিল—হাঃ হাঃ হাঃ। মূর্ত্তি হাসিল। খুব হাসিল। তাহার পর নাচিল। তাহাকে লোকে ঘিরিল। সে পাঞ্জাবী গান গাহিল। নাচিল, কাঁদিল, হাসিল।

উন্মাদিনী আজীবন সেই নদীসৈকতে কল্পবাস করিল। তীরে বাঁধের উপর একটা দেবমন্দিরে শুইত। যাত্রীরা যাহা দিত, তাহা খাইত। দিনের বেলায় রৌদ্রে সেইখানে, ঠিক সেইখানে গিয়া বসিত। রাত্রে যখন গঙ্গা যমুনার সম্মিলন স্থলে চাঁদের আলো পড়িত, তখন ধীরে ধীরে সেই স্থলে—ঠিক সেই স্থলে চাহিয়া পাগলিনী প্রথমে খুব কাঁদিত। তাহার পর হাসিত। তাহার পর নাচিত। আবার হাসিত। শেষে কাঁদিত—মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল শুনিয়া নির্জ্জন নদীসৈকতে ভয়ে শিবার দল ডাকিয়া উঠিত।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

নিভৃতে।

(বড়াল-কবির "নিশীথে" কবিতার অনুকরণে।)

রমণীরে,
কি কাব্য লিখিছ তুমি প্রেমের অক্ষরে,
হৃদয়ের 'পরে!
আজীবন চেয়ে থাকি ওই মুখ পানে,
অবাক নয়ানে।
যেই সেবা, যেই ভক্তি
যেই দয়া, অনুরক্তি
বুঝিতেছি মর্ম্মে মর্ম্মে হাসিতে ইঙ্গিতে—
কত কি বলিতে চাই!
কিছু না ভাবিয়া পাই,
মুগ্ধ সুরভিতে!

সে বিরহ, সেই ব্যথা
মিলনে সে অধীরতা,
সে মুকুর, সেই মুখ, সেই ভিজে চুল,
অতসীর দুল—
সেই তুলসীর তল
সেই দীপ জ্বল জ্বল,
সেই ফুল, সেই পূজা—সজল নয়ন,
সেই মেঘ, সেই অশ্রু, সোহাগে মরণ
সেই গলে ফুলডোর,
মুখে হাসি, চোখে ঘোর,
অক্ষরে অক্ষরে তোর কেমনে উথলে
এ হৃদয় তলে!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

কমলিনী।—এই উপন্যাসখানি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার এম্‌-এ, বি-এল প্রণীত। লেখকের এই প্রথম উদ্যম। ইহার ভাষা পড়িলে মনে হয় যোগেন্দ্রবাবু বহুদিন ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতেছেন। বেশ সরল ভাষায় লেখক একটি সুন্দর গল্পের অবতারণা করিয়া শেষ অবধি পাঠকের চিত্তবিনোদ করিয়াছেন। গল্পের নায়ক-নায়িকার চরিত্র একেবারেই অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই। নবকুমার আদর্শ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। আমরা আশা করি, ডেপুটি হাকিমদিগের মধ্যে যাঁহাদের শরীরে একটু তমোভাবের আধিক্য তাঁহারা এই গ্রন্থ হইতে সুশিক্ষা লাভ করিবেন।

কমলিনী উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস হইয়াছে। লেখকের উপর বাঙ্গালা সাহিত্যের দাবী রহিল; তিনি এ কথা স্মরণ রাখিয়া যেন লেখনী বন্ধ না রাখেন।

মূর্চ্ছনা।—(গীতিকাব্য) শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক-প্রণীত। এখানি কবিতার বহি। ইহাতে পঞ্চাশটির অধিক কবিতা এবং নয় খানি চিত্র আছে। সচিত্র কবিতার পুস্তক এ দেশে কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র অতি বিরল। পুস্তকখানির বাঁধা অতি মনোরম।

মূর্চ্ছনা বোধ হয়, লেখকের প্রথম রচনা। তাঁহার কবিতাগুলি হেঁয়ালী-বর্জ্জিত। কালে তিনি সুকবি হইবেন আমাদের একপ আশা আছে।

গিরিশচন্দ্র।—নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত ও ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। সুন্দর কাগজে ছাপা, অসংখ্য চিত্র-সম্বলিত। এই গ্রন্থখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত। সম্পাদকের পূর্ব্বপ্রকাশিত "গিরিশ-গীতাবলী"তে গিরিশচন্দ্রের যে আধুনিক নাটকাবলীর গীতগুলি সন্নিবেশিত হয় নাই সেইগুলি এবং কতকগুলি অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য গীত প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ২য় খণ্ডে গিরিশচন্দ্রের জীবনের শেষাংশ, ৩য় খণ্ডে 'গিরিশ-প্রসঙ্গ'—ইহাতে গিরিশচন্দ্রের জীবনের কতকগুলি প্রসঙ্গ ও ৪র্থ খণ্ডে তাঁহার রচনাবলীর কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গিরিশচন্দ্রের বিবিধ ভাব রস-ব্যঞ্জক দ্বাবিংশখানি চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহার প্রত্যেকটী শিখিবার, বুঝিবার ও উপভোগ করিবার। বাঙ্গালা দেশে অন্য কোনও অভিনেতা ইতিপূর্ব্বে এত প্রকার মুখের ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমাদের মতে যাঁহারা থিয়েটার বা যাত্রায় অভিনয় করেন তাঁহারা এই চিত্রগুলি সম্মুখে রাখিয়া ভূমিকার মহলা দেওয়া অভ্যাস করিলে সুন্দর ভাব-প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হইবেন। গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের সংস্রবে ছিলেন—এই হিসাবে যেমন অসংখ্য নটনটীর চিত্র ইহাতে স্থান পাইয়াছে, আমাদের মতে যে সমস্ত মহাত্মা তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-জীবনের অনুসঙ্গী ছিলেন বা সংস্রবে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও কতকগুলি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করিলে সুপ্রযুক্ত হইত। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'গিরিশ-প্রসঙ্গ' পাঠ করিলে গিরিশচন্দ্রকে কতকটা বুঝা যায়। প্রসঙ্গগুলি শিক্ষাপ্রদ ও পাঠেচ্ছাবর্দ্ধক। এই গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি। আমরা আশা করি গ্রন্থখানির বহুল প্রচার হইবে এবং সম্পাদকের অজস্র অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

বঙ্গভাষার গৌরব।

"ফুটিছে হিমাদ্রি-শৃঙ্গে হিরণ্য-কুসুম!
মেখলায় উঠে স্তোত্র উদাত্ত গম্ভীর!
তীরে তীরে জাহ্নবীর পল্লব-কুটীর—
অঙ্গনে দোহন-গন্ধ, চূড়ে যজ্ঞ-ধূম!
অর্দ্ধ-নিদ্রা-জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি!—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে' রবি—কবি!"

—অক্ষয়কুমার।

কবির কবি-বন্দনা আজি সার্থক হইল। বিশ্বের সাহিত্যাকাশে বঙ্গের রবি কবি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। আজি সত্য সত্যই যেন 'জীবনে স্বপন-ভ্রম' হইতেছে। বাঙ্গালার কোকিল বিলাতে গিয়া যে গান গাহিয়া আসিবে, এবং সেই গানের সুরে সেখানকার শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করিয়া যশের মালা গলায় ধারণ করিবে, এ ঘটনা বাঙ্গালী-জীবনে স্বপন নহে ত কি?

প্রায় বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন, বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা করিতে করিতে আশার কুহকে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন,—"দিব্য চক্ষে দেখিতেছি বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতি শুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি শত শত ভাবী লেখক ও ভাবী প্রতিভাশালী লোক উদয় হইতেছেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, শত শত কাব্য বঙ্গবাসীকে আনন্দে ভরাইয়া ভাষান্তরিত হইয়া দেশ দেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন করিতেছে। আমার কর্ণে কত ভবিষ্যৎ বাণীর ও বীণার প্রতিঘাত লাগিতেছে তাহা বলিতে পারি না।" এই বত্রিশ বৎসর পরে ঐ 'ভবিষ্যৎ বাণী'র কিয়দংশও যে আজি সফল হইবে, ভবিষ্যতের খানিকটা জমি বর্ত্তমান যে আজি দখল করিয়া বসিবে, একথা সে সময়কার দিনে স্বপ্নেও কেহ মনে করে নাই। সে সময়ে দেশের সকলেই উপরি-উদ্ধৃত উক্তিকে আনন্দের অত্যুক্তি ও উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি মনে করিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছিল। এ উপেক্ষার হাসি তখনকার দিনে যে অস্বাভাবিক হইয়াছিল, তাহা নহে। সে কালের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ আচরণ বাঙ্গালী-প্রকৃতির পক্ষে তখন খুব স্বাভাবিকই হইয়াছিল। সেকালের শিক্ষিত বাঙ্গালী যে শুধু মাতৃভাষার সেবা করিত না, তাহা নহে। এমন কি, তাহাদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে ইহাও বলিতে হইয়াছে যে, "আজিও নাকি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজ-নবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়।"

কিন্তু সেই একদিন গিয়াছে, আর আজি এই একদিন! যে শিক্ষিত সম্প্রদায় একদিন বঙ্গভাষা জানে না বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছে, মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিয়া বাহাদুরী লইয়াছে, সেই ইংরেজনবীশের দলই আজি মাতৃভাষার কবির সম্বর্দ্ধনার জন্য দিবা-দ্বিপ্রহরে অনাহারে দিগ্বিদিক শূন্য হইয়া বোলপুরে ছুটিয়া গিয়াছে। সুশিক্ষিতের হস্তে মাতৃভাষার লাঞ্ছনা দেখিয়া একদিন, যে কবিকে বলিতে শুনিয়াছিলাম,—"হে সুশিক্ষিত, হে আর্য্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্য্যাদা জান! ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার গভীর মর্ম্ম কি কখনো বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, আমি যখন মিল, স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাশ করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিত মাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃত কৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরাজি পড়িয়া বাঙ্গালা লিখি ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালার সৌভাগ্য কি হইতে পারে! আমি যখন ইংরাজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড় বড় ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জ্জন দিতেছি, তখন, জীর্ণবস্ত্র দীন পান্থগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়, তেমনি আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধা বিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখ আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি, আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে

আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্য্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য্য করিতেছে তৎ সম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি, তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুট নোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতী সাহিত্যের কোন্ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্ সমালোচক কি কথা বলেন তাহাও বাঙ্গালীর অগোচর থাকিবে না। কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণ চীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশ মাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাঙ্গালায় লিখিব না, আমি ওকালতী করিব, ডেপুটি হইব, ইংরাজী খবরের কাগজে লীডার লিখিব, তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।"—আজি সেই কবির—সেই রবীন্দ্রনাথের পূজার জন্য উকীল, ব্যারিষ্টার, ডেপুটী ও প্রফেসর প্রভৃতি দেশীয় সুশিক্ষিতগণ ছুটাছুটি করিতেছেন, উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। এ ঘটনা বাঙ্গালী-জীবনে 'স্বপন' নহে ত কি?

এতদিন যাহা স্বপ্ন ছিল, আজি তাহা সত্যে পরিণত হইল। 'বঙ্গীয় কোন কাব্য যে ভাষান্তরিত হইয়া দেশ দেশান্তরস্থ পণ্ডিতবৃন্দকে আনন্দে মগ্ন' করিতে পারে, এ কথা ইতিপূর্ব্বে আমাদের নিকট 'আকাশ-কুসুম' বলিয়াই বোধ হইত। রবীন্দ্রনাথ আজিকে সেই 'আকাশ-কুসুম'কে প্রত্যক্ষীভূত করিলেন। পরপদদলিত পরাধীন জাতির ভাষাকে আজি তিনি বিশ্ববাসীর চক্ষের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেইজন্যই দেশবাসীর আজি এত আনন্দ—এত উল্লাস! সার্থক আজি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা! ধন্য তাঁহার জীবন!

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বঙ্গে দ্বিতীয় সাহিত্য-সেবী নাই, যিনি বঙ্গ সাহিত্যকে এতদূর পর্য্যন্ত প্রচার করিতে পারেন বা পারিতেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের নিজের দ্বারাও এ কার্য্য অসাধ্য ও অসম্ভব হইয়া উঠিত, যদি তিনি আর্থিক অবস্থায় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস হইতেন। বিধাতা বঙ্গ সাহিত্যকে বিদেশীর চক্ষে বিখ্যাত করিবার জন্যই যেন প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পৌত্রকে এতটা শক্তি, এত প্রতিভা প্রদান করিয়াছিলেন। নহিলে, দশখানা 'গীতাঞ্জলি' লিখিলেও রবীন্দ্রনাথকে কেহ গ্রাহ্য করিত না। 'গীতাঞ্জলি' রবীন্দ্র-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দানও নহে,—'নৈবেদ্য' কাব্যের কতকটা চর্ব্বিত চর্ব্বণ! আর রামপ্রসাদ বা চণ্ডীদাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, যাঁহারা বায়রণ ও শেলীতে মসগুল্ হইয়া আছেন, তাঁহাদের নিকট অবশ্য উপনিষদের দুই চারিটী বুকনি-বসানো এই কবিতা-

পুস্তক অতি উপাদেয় ও অসামান্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের সৃষ্টি রসে মজিয়া আছেন, তাঁহাদের নিকট 'গীতাঞ্জলি' অকিঞ্চিৎকর—নিতান্ত সামান্য সামগ্রী মাত্র। 'গীতাঞ্জলি' এপারের কিছু ভাব লইয়া ও পারে কিছু প্রচার করিতে পারিয়াছে বলিয়াই ইহার প্রতি যা একটু আমাদের সহানুভূতি; নহিলে সাহিত্য হিসাবে বা আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের হিসাবে আমাদের দেশে এ গ্রন্থের মূল্য যৎসামান্য মাত্র।

বঙ্গভাষাকে ইংরেজ-নবীশদের অবজ্ঞার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের দেশে যে কয়জন মহাত্মা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজনের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথম,—বঙ্কিমচন্দ্র। দ্বিতীয়,—আশুতোষ। আর তৃতীয়,—রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম "আপন প্রবল-প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যের স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।" তাঁহার সুতীব্র কশাঘাতে এবং আন্তরিকতাপূর্ণ সদুপদেশে অনেক ইংরেজী-নবীশেরই নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। অনেককেই তিনি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষা কাজের ভাষা না হইতে পারে, কিন্তু ভাবের ভাষা বটে! ইহা দ্বারা পেট ভরিতে না পারে, কিন্তু যখন মানসিক ক্ষুধার তাড়নায় আহার খুঁজিতে হইবে, তখন এই ভাবের ভাষার শরণাপন্ন ব্যতীত গত্যন্তর নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহে ও শাসনে অনেক শিক্ষিত লোকেই বাঙ্গালা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমের প্রতিভা পাঠক ও লেখক সৃষ্টি করিল বটে; কিন্তু তবুও বিস্তর বাকী পড়িয়া রহিল। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সখের হিসাবে লিখিতে ও পড়িতে লাগিলেন। সে সেবার মধ্যে ভক্তি বা প্রীতির লক্ষণ বা আকর্ষণ বিশেষ কিছু দেখা গেল না। বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত বাঙ্গালা বহির কোনও সম্পর্কই ছিল না। ছেলেদের হাতে বাঙ্গালা বহি দেখিলে অভিভাবকের দল আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন।

আশুতোষ দেখিলেন যে, 'মাতৃসম মাতৃভাষা' কথাটা পোড়া বাঙ্গালী বুঝে না। এ জাতিকে বঙ্গভাষা পড়াইতে হইলে উপদেশে হইবে না, মিষ্ট কথায় চলিবে না। কাণ ধরিয়া পড়াইতে পারিলে তবেই পড়িবে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারই চেষ্টায়, তাঁহারই উদ্যমে বঙ্গভাষা আজি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-লাভের অধিকার পাইয়াছে। যে কার্য্য করিতে

বঙ্কিম, আনন্দমোহন ও গুরুদাসের চেষ্টা একদিন বিফল হইয়াছিল, সেই কার্য্য-সাধনে পুরুষসিংহ আশুতোষের চেষ্টা আজি সফল হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও আমাদের তৃপ্তি হইল না। যে কাজে ইংরাজের 'বাহবা' নাই, সে কাজটাকে বড় বলিয়া, কর্ত্তব্য বলিয়া, বাঙ্গালী-স্বভাব কিছুতেই মানিতে চাহে না। কিন্তু আজি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালীর সে মোহ ঘুচিয়া গিয়াছে। মাতৃভাষার সেবা যে সম্মানের কার্য্য, ইহা এক্ষণে বুঝিতে শিখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালী বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভাবরাজ্য জগন্নাথদেবের সার্ব্বজাতিক ভূমি। এখানে জাতিভেদ নাই। এখানে একদিক্, আর একদিকের সহিত নিঃসঙ্কোচে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। ভাবের এই নূতন রপ্তানি দেখিয়া এখন কেবল আশা হইতেছে যে, বঙ্গের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিও এবারে ভাষান্তরিত হইয়া দেশ-বিদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতে পারিবে। মনে হইতেছে যে, বিদেশীয়গণ বঙ্গীয় কাব্য-সুধার রস আস্বাদন করিবার জন্য এবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইবে। বঙ্গভাষাকে তাহারা যতটা দীন-হীনা মনে করিত, বঙ্গভাষা যে ততটা দীনহীনা নহে, এবারে তাহা বুঝিতে পারিবে। তাই মনে হয়, শুভক্ষণে রবীন্দ্রনাথ বিলাত-যাত্রা করিয়াছিলেন। শুভক্ষণে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছিল।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

শান্তি।

(১)

এ রকম "দেশভ্রমণে" আমরা ছুটি পাইলেই বাহির হইতাম। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির গণ্ডীর বাহির হইলেই আমরা 'দেশভ্রমণে' বাহির হইয়াছি ভাবিতাম।

সেদিন কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। গ্রামটা কলিকাতার খুব সন্নিকটে। নাম করিব না, তাহা হইলে সকলে চিনিয়া ফেলিবে। পথে কোকিল পাপিয়া প্রভৃতি কোনও নামজাদা পাখী না ডাকিলেও বিহঙ্গম-কাকলীতে গ্রাম্য পথটি মুখরিত ছিল। পথের ধারের নালা হইতে বরষার জল তখনও নিঃশেষ হয়

নাই। ছোট ছোট বেলে মাছের ঝাঁক নালায় সাঁতার কাটিতেছিল। দুই একটা সফরীও আস্ফালন করিতেছিল। সূর্য্যদেব চেষ্টা করিয়াও গাছের ভিতর দিয়া আসিয়া আমাদিগকে তাঁতাইতে পারেন নাই।

সেই নির্জ্জন পথ দিয়া প্রায় দেড় ক্রোশ চলিবার পর অমূল্যচরণের বাসনা হইল যে, পার্শ্বের পুকুরের বাঁধা ঘাটে একটু বসিয়া বিশ্রাম করিবেন। সুরেশ-চন্দ্রও সেরূপ কার্য্যে উৎসাহ দেখাইলেন। অগত্যা তাহাদিগকে অলস প্রভৃতি বিশেষণ-মণ্ডিত করিয়া আমাকে তাহাদের সহিত অপরিচিত ব্যক্তির উদ্যানে অনধিকার প্রবেশ করিতে হইল। মনে মনে বড় সুখী হইলাম, যেহেতু চরণ-যুগল আর অধিক দূর যাইতে মোটেই সম্মত হইতেছিল না।

পুকুরে বেশ সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া ছিল। আমরা ভাবিলাম সেগুলা ফুল্লারবিন্দ। পরে শুনিয়াছিলাম সেগুলা শালুক ফুল। কিন্তু অমন নির্জ্জন সরোবরের সোপানে যে ওরূপ কৃষ্ণবপু ভীমদর্শন লোক থাকিতে পারে সে কথা. দেশী বিদেশী কোন কাব্যে পড়ি নাই। আমাদিগকে দেখিয়া যোড় হাত করিয়া হাসিতে হাসিতে লোকটা আমাদের দিকে অগ্রসর হইল।

অমূল্য বলিল,—এই যে! ভাল ত!

বুঝিলাম অমূল্যচরণ লোকটাকে 'খাদ্য' ভাবিয়াছে। 'খাদ্য' কথাটা পরিভাষা। আমাদের মধ্যে ইহার অর্থ পরিহাস করিবার লোক।

অমূল্যের সৌজন্যে লোকটা গলিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে ঘাটের রক পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিল। আমরা বসিলাম।

লোকটা বলিল—আজ ঠিক এক বৎসর। ঠিক গেল বছর এমন দিনে—

অমূল্য বলিল—না, এক বছর তিন দিন না?

"আজ্ঞে না। ঠিক এক বছর। আমি দিন গণি। এক দুই ক'রে গণি। আজ ঠিক ৩৬৫ দিনের দিন।"

জানিতাম জ্বরবিকারে লোকে দিন গণনা করিয়া থাকে। কিন্তু খুব কঠিন জ্বরবিকারও মাত্র একচল্লিশ দিন স্থায়ী। লোকটা কেন এমন দিন গণিতেছে তাহা ঠিক করিয়া বুঝিবার জন্য বলিলাম—আহা আপনি আর দিন—

"ঠিক বলেছেন। এই মোটা দেহ দেখ্‌ছেন, এর ভিতর কি ব্যাপারটা হ'চ্চে বুঝ্‌ছেন? ধু ধু জ্বল্‌ছে! ধু ধু জ্বল্‌ছে—দিন. রাত, সকাল, সন্ধ্যা সর্ব্বদা জ্বল্‌ছে।"

আমাদের 'ক্ষুধার' নিবৃত্তি হইতেছিল। লোকটার যেন প্রতি লোমকূপের ভিতর দিয়া একটা অব্যক্ত বেদনা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সুরেশ চুপি চুপি বলিল,—'কাজ নেই ভাই চল।'

কিন্তু আমাদিগকে 'কমলি' ছাড়িল না। জোর করিয়া সে শুনাইল। ভক্তে অত মনোযোগ দিয়া ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনে না।

(ক)

সবই তো জানেন। ফের শুনুন। প্রথম প্রথম ভাবিতাম, আমার এমন দুষ্‌মন চেহারা তাই স্ত্রী কাছে আসিতে চাহে না। যখন সে কাছে আসিতে শিখিল তখন মনে হইল এ দেবী। আহা! কি স্নেহ, কি মিষ্ট কথা, কি বীণার স্বর। এই কালো মুস্কো স্বামীকে ষোল বছরের মেয়ে রাত্রিতে বাতাস করিত—মুকুল বাতাস করিত। ভাণ করিয়া মিথ্যা চোখ বুজিয়া দেখিয়াছি—বাতাস করিত। বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ক্লালীর মত ঘাম মুছাইয়া দিত। বাপের পয়সা ছিল—যাত্রা করিতাম, থিয়েটার করিতাম, 'জনা'য় গঙ্গারক্ষকের ভূমিকা অভিনয় করিয়া নিজেকে একজন খুব প্রতিভাশালী অভিনেতা ভাবিতাম—তবু স্ত্রী একদিনও ঘৃণা করা দূরে থাক, বিরক্তির ভাব দেখায় নাই।

হঠাৎ একদিন যেন চোখের সামনের একখানা যবনিকা সরিয়া গেল। সে মহা কু-দিন। তারিখ স্মরণ আছে—২৭এ আষাঢ়। মুষলধারে জল পড়িতেছিল। ভাবিলাম অসময়ে বাড়ি গিয়া মুকুলকে বিস্মিত করিব। আমার স্ত্রীর নাম মুকুল।

বিস্মিত হইলাম আমি। হরি! হরি! জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম আমার শয্যার উপর নন্দলাল বসিয়া হাসিতেছে। তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুকুলও হাসিতেছে—প্রেমের হাসি, আবেগের হাসি। নির্জ্জন গৃহ। নন্দলাল আমার চেয়ে তিন চারি বছরের ছোট—অনূঢ়—পাশ করা, সুপুরুষ। মুকুল যুবতী, সুন্দরী, রসিকা। আর আমি তার স্বামী—মূর্খ—কদাকার চেহারা, যাত্রা করি। মুকুল বহি পড়ে। আমি পড়ি না। সে আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যত্ন করে। কেন? কিছু গোপন করিবার জন্য। আমার চোখে একটা আবরণ দিবার জন্য। দুই আর দুই যোগ করিলে সমষ্টি কত হয় একথা বলা যেমন সহজ, মুকুলের চরিত্রটা আমি তত সহজে বুঝিয়া ফেলিলাম। আপনারা বলুন দেখি—তখন যে রাগে কাঁপিয়াছিলাম সে কি বৃথা কারণে। মাতালের মত টলিতে টলিতে বাটীর বাহির হইলাম। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে এই

ঘাটে আসিয়া বসিলাম। ঝড় উঠিল—বাহিরে নয়, ভিতরে। নন্দলাল অনাথ, আমার মৃতা পিসির ছেলে। সে আমাদের বাটীতে থাকিত। শেষে সিদ্ধান্ত করিলাম সন্দেহটা মিথ্যা। কিন্তু মনের কুমতি বলিল—নাহে ভবানী কাজটা ভাল হ'ল না। একটু লক্ষ্য রেখ।

লক্ষ্য রাখিলাম। চোরের পিছনে যেমন গোয়েন্দা ঘুরিয়া বেড়ায় তেমনি লক্ষ্য রাখিলাম। মুকুল নন্দলালকে খুব যত্ন করিত। নিজে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইত, তাহার পুস্তকগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। আমার সম্মুখেও কিন্তু তাহারা ঐ রকম ব্যবহার করিত। যদি মুকুলের কাছে নন্দলালের সুখ্যাতি করিতাম তাহা হইলে সে বড় আনন্দ পাইত। আমার কিন্তু হৃদয়ে শেল বিঁধিত। অথচ মনের মধ্যে একটা স্বর তোষামোদ করিয়া বলিত, মুকুল তোমাকে ভালবাসে। তোমার ছোট ভাই বলিয়া সে নন্দলালকে স্নেহ করে। তাহারা নির্দোষ।

আপনারা হাসিতেছেন। ভাবিতেছেন বেটা পাগল—নারকী—নরাধম। আপনাদের নীতিজ্ঞান আছে শিহরিয়া উঠিতেছেন—স্ত্রীকে সন্দেহ, ভ্রাতাকে অবিশ্বাস—রমণীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব! হায়! হায়! আপনারা যদি পৃথিবীকে আর একটু বিশেষরূপে জানিতেন, যদি জানিতেন ভদ্রলোকের পরিচ্ছদ পরিয়া, বাহিরে বিদ্যার তক্‌মা ঝুলাইয়া আপনাদিগকে ভদ্রলোক, বিদ্বান্ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচয় দিয়া কত লোক মনে মনে আমার মত নরক পুষিয়া রাখে, মুখে মধুর হাসি হাসিয়া প্রাণের অগ্নিশিখার লক্ লকে জিহ্বাকে ঢাকিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে আপনারা আমাকে ঘৃণা করিতেন না। এটা একটা রোগ, উনপঞ্চাশ বাইরের এটা বাই, কিন্তু মোটেই ভাবিবেন না যে, এ রোগ জগতে বিরল। বরং আমাদের মত মূর্খের মধ্যে অল্প। আপনাদের মত উদারনীতি সম্পন্ন কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে অধিক।

যাহাই বলুন, রক্তমাংসের শরীর লইয়া আমি কিন্তু হিংসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম না। মনে শান্তি পাইবার জন্য বাহিরে বাহিরে ঘুরিতাম। একটু বিলম্বে গৃহে আসিতাম। কিন্তু যত রাত্রিতেই কেন আসি না, দেখিতাম মুকুল জাগিয়া বসিয়া আছে। বসিয়া নভেল পড়িত। সম্মুখে আমার আহার্য্য থাকিত। একদিন তাহাকে বলিলাম—এত রাত্রি অবধি জেগে থাক কেন?

সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—ব'সে ব'সে পড়ি।

"তা হ'লে আমার অপেক্ষায় না। আমাকে খাওয়াবার জন্য না?"

খুব লজ্জা পাইলে যুবতী স্ত্রীলোক যেমন সঙ্কুচিত হইয়া এক রকম হাসে, মুকুল তেমনি করিয়া হাসিল। আমার কিন্তু তাহার ভাবটা প্রকৃত বলিয়া বোধ হইল না। সে জানাইতে চাহিতেছিল যেন সে আমারই জন্য রাত জাগিয়া বসিয়া থাকে অথচ আমাকে তাহা জানাইতে চাহে না। যদি কথাটা সত্য বুঝিতাম তো তখনই তাহার পদচুম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, কিন্তু তাহার ভণ্ডামিতে জ্বলিয়া উঠিলাম। হৃদয়ের সুপ্ত শয়তান মাথা তুলিয়া ভ্রূকুটি করিল। শয়তানের বিদ্রূপে বড় কষ্ট হইল। তাহাকে বলিলাম—একেলা থাক?

স্ত্রী বলিল—তুমি একটু সকাল সকাল এলেই আর একেলা থাকিতে—

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—কেন, নন্দলাল?

একথা বলিবার সময় আমার কণ্ঠস্বর কিরূপ হইয়াছিল জানি না। মুকুল বিস্মিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে আমার হাত ধরিয়া বলিল—তোমার কি অসুখ ক'রেছে?

আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। ভাবিলাম,—রমণী তুমি সর্ব্বনেশে জীব। তাহাকে প্রকাশ্যে বলিলাম—সিদ্ধি খেয়েছি, কিছু খাব না।

(খ)

দিন দিন কেন—ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মিনিটে মিনিটে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কি ভীষণ যাতনা ভোগ করিয়াছি, মনের মধ্যে কি তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়াছে, কুমতি ও সুমতিতে কিরূপ দ্বন্দ্ব হইয়াছে, প্রতিহিংসা বৃত্তি ও ধর্ম্মজ্ঞানে কি ভীষণ কলহ হইয়াছে, সে কথা আপনাদের বলিতে চাহি না। আপনাদের বিলাতী নাটকে 'ওথেলো' নাকি তাহার স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া টিপিয়া মারিয়াছিল; প্রতি মুহূর্ত্তে সেই চিন্তা আমার হৃদয়ে বলবতী হইত। বহু যত্নে আত্মসংযম করিয়া তবে সেরূপ ভীষণ কার্য্য হইতে আপনাকে বিরত করিয়াছিলাম। লেখাপড়া শিখিয়া পাশ করিয়া পিতৃমাতৃহীন নন্দলাল বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া সকলে তাহাকে আদর যত্ন করিত। আমি কিন্তু তাহাকে দেখিলে শেলবিদ্ধ হইতাম, জ্বলিয়া উঠিতাম, প্রাণের ভিতর সহস্র বৃশ্চিক দংশনের যাতনাভোগ করিতাম।

কোজাগর লক্ষ্মীপূজার আর দুই দিন আছে। আমাদের বাড়ীতে খুব সমারোহে লক্ষ্মীপূজা হইত। প্রাতঃস্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া পিঠের কাপড়ের উপর মুক্তকেশদাম ঝুলাইয়া সমস্ত দিন বড় উল্লাসে বড় উৎসাহে মুকুল পূজার আয়োজন করিতেছিল। দিনের বেলায় আমি গৃহে শুইয়াছিলাম।

নন্দলাল কলিকাতায় গিয়াছিল। ভাবিতেছিলাম মুকুল তাহার সৌন্দর্য্যটা বৃথা নষ্ট করিতেছে। নন্দলাল নাই দেখিবে কে, মজিবে কে? বাস্তবিক সে রকম পোষাকে মুকুলকে বড় সুন্দরী বলিয়া মনে হইতেছিল। ভাবিলাম তাহার অন্তরটা যদি অত সুন্দর হইত।

বৈকালে একটু ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমাকে মুকুল দেখে নাই। বারান্দায় কি একটা শব্দ হইল। জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিলাম মুকুল নন্দলালের জামা ধরিয়া টানিতেছে। সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাইতেছে। মুকুলের মুখে এক অব্যক্ত মিশ্র ভাব—অভিমানের মাত্রা অধিক। অন্ধকারে নন্দলালের মুখ দেখিতে পাইলাম না।

আমি কাঁপিতেছিলাম। জানালার গরাদে ধরিয়াও আপনাকে স্থির রাখিতে পারি নাই। মনে মনে সেই ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যেও একটু সামান্য আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। আনন্দ হইতেছিল—নন্দলালের প্রত্যাখ্যানে। নারকী পিশাচিনী নিজের স্বামীর স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা ভুলিয়া অপরের পিছনে ছুটিয়া বেশ উপযুক্ত উপহার পাইতেছিল। উঃ কি নির্লজ্জা! রমণী হইয়া কিরূপে সে উপযাচক হইয়া অপরের প্রেমভিক্ষা করিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাহুতে 'ওথেলো'র শক্তি চাহিলাম। ভগবানের উপর বিশ্বাস ছিল না। শয়তানকে ডাকিয়া বলিলাম—বল দাও প্রভু।

এ আবার কি? নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞ নন্দলাল হাসিয়া ভূমিতে কি একটা ফেলিল—পত্র—হাঃ হাঃ হাঃ! তাহাদের পাপের সাক্ষ্য। বড় দামী দলিল। পাপিষ্ঠা আর অস্বীকার করিতে পারিবে না। জগৎকে দেখাইব আমার পিতৃ অন্নে প্রতিপালিত আমাদের করুণা-বর্দ্ধিত অকৃতজ্ঞ বিদ্যাভিমানী নন্দলাল কিরূপ পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

হাসিমুখে মুকুল ঘরে ঢুকিল। আমি ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িলাম। বজ্রমুষ্টিতে তাহার মুক্ত কেশরাশি ধরিয়া বলিলাম—পিশাচিনী পাপিষ্ঠা—এবার!

কাতরদৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিল। আমার চক্ষের অগ্নি সহ্য করিতে না পারিয়া সে নিচের দিকে চাহিল। আমার পায়ের উপর তাহার অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

আমি বলিলাম—মুকুল! এ কাজ ছাপা থাকে না—

মুকুল বলিল—কি কাজ?

আর বলিতে প্রবৃত্তি হইল না। বলিলাম—কি কাজ? ব্যভিচার-পত্র-বিনিময়! পাপীয়সি টের পাইনি? নন্দলালের সঙ্গে—

তাহাকে পদাঘাত করিলাম। এই পায়ে—ঠিক্ তাহার বক্ষে। মুকুল শব্দ করিল না। আমি তাহার চুল ছাড়িয়া দিলাম। মুকুল মাটীতে পড়িল।

তাড়াতাড়ি তাহার বক্ষের কাপড়ের ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া লইলাম। সে স্থলে সে সংসর্গে থাকিতে ঘৃণা বোধ হইতেছিল। ছুটিয়া চিঠিখানা পড়িবার জন্ম বাহিরের ঘরে গেলাম। চিঠি পড়িয়া বক্রী কার্য্য সমাধা করিবার বাসনা ছিল।

চিঠি পড়িলাম। সর্ব্বনাশ! মাথা ঘুরিতে লাগিল। প্রকৃতিস্থ হইতে পাঁচ মিনিট সময় লাগিল। ছুটিলাম, উপরে যেখানে মুকুল ছিল।

ঘরে মুকুলকে পাইলাম না। এধার ওধার ছুটিলাম, বাক্সের উপর একখানা চিঠি ছিল। ছুটিলাম—গঙ্গার দিকে ছুটিলাম। এই রাস্তা সমান গঙ্গার ধারে গিয়াছে। সমান ছুটিলাম। প্রায় গঙ্গার ধারে গিয়া সম্মুখে মুকুলকে দেখিতে পাইলাম। আমি যখন ঘাটে পৌঁছিলাম তখন মুকুল গঙ্গার গর্ভে। আমি জলে পড়িলাম। কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না।

আজ ঠিক ৩৬৫ দিন।—দাঁড়ান—

(২)

ভবানী বাটীর মধ্যে ছুটিল। আমরা তিন জনে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। সুরেশ বলিল—ভাই পালাও। এ বেটা পাগ্‌লা।

আমরা তাহাতে সম্মত হইলাম না। তখনই ভবানী ফিরিয়া আসিল। সে আমার হস্তে একখানা চিঠি দিয়া পড়িতে বলিল। আমি পড়িলাম।

কলিকাতা

২৭শে আশ্বিন।

মুকুল

আমাদের পরীক্ষা আস্‌ছে ব'লে তোর কাছে যেতে পারিনি। শীঘ্র যাব। নন্দলালের কাছে তোর খবর পাই। তোদের বাড়ী নাকি লক্ষ্মীপূজায় খুব ধুমধাম হ'বে?

নন্দলাল ব'লে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া যে মাতৃস্বরূপিনী তোকে দেখে সে তা বুঝেছে। বাস্তবিকই সে তোকে খুব ভালবাসে, ভক্তি করে। সে আমার বন্ধু, তার মা বাপ নাই—তা'কে খুব যত্ন করিস।

ভবানী বাবু কেমন আছেন? এবার যেখানে তাঁদের যাত্রা হ'বে, নিশ্চয় যাব। আশীর্ব্বাদ জানিস। মার চিঠি পেয়েছি।

আঃ দাদা।

ভবানী বলিল—এই চিঠি পেয়েছিলাম। নন্দলাল বোধ হয় এর মর্ম্ম জানিত তাই চিঠিখানা দিতে লজ্জাবোধ করিতেছিল। এই চিঠি না পড়িয়া—

সেই ভীমদেহ কাঁপিতে লাগিল। সেই বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল—কাঁদিতে কাঁদিতে ভবানী বলিল—ভুল—ভুল—সব ভুল—

সুরেশের চক্ষু আর্দ্র হইল। অমূল্যচরণ খুব চালাক। লোকের সহিত ব্যঙ্গ করিতে খুব পটু; 'খাদ্য' ধরিতে বড় উৎসুক। বুঝিলাম এবার সে ঠকিয়াছে।

ভবানী একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কাপড়ের ভিতর হইতে একখানা ছবির ফ্রেম বাহির করিল। পরে জানিয়াছিলাম ফ্রেমটা গিনি সোনার। সে বলিল—দেখুন।

ভাবিলাম বুঝি মুকুলের ফটোচিত্র। তাড়াতাড়ি ফ্রেমটা হাতে করিয়া দেখিলাম তাহা নহে। সেখানা মুকুলের শেষ পত্র। পড়িলাম—

"স্বামী—দেবতা—প্রিয়তম্, কি পাপে এ কলঙ্ক দিলে জানি না। যাহার উপর সন্দেহ করিয়াছ সে কেমন করিয়া চরণ সেবা করিবে? তুমি তো আশ্রয় দিলে না। মা গঙ্গা দিবেন।

সেবিকা মুকুল"

আবার ভবানী কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল—এই দেখুন জলের দাগ। মুকুল কেঁদেছিল, চিঠিতে চোখের জল পড়েছিল।

অমূল্য বলিল—নন্দলাল?

ভবানী বলিল—তাহার কাছে সব বলেছিলাম। সে শুনলে! তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। সে বল্‌লে—দাদা আমরা লক্ষ্মীছাড়া হ'লেম। তার পর দুই ভাই গলা জড়াজড়ি করে খুব কাঁদিলাম। উঃ! কি ভীষণ শাস্তি!

* * * * *

পথে অমূল্য বলিল—বাবা! আর যা'র তা'র সঙ্গে লাগা হ'বে না। হাসতে গিয়ে কেঁদে ফিরলুম।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বঙ্গদেশের শিল্প।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সূতা ও কাপড়ের কল।—ভারতবর্ষে উপস্থিত ২৫৭টী কাপড়ের ও সূতার কল আছে, তন্মধ্যে ১৫টী বঙ্গদেশে অবস্থিত। ইহার মধ্যে ৬টীতে কেবলমাত্র সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ৯টীতে সূতা ও কাপড় উভয়ই উৎপন্ন হয়। বঙ্গদেশে কি পরিমাণ সূতা ও কাপড় প্রস্তুত হয়, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল—

খৃঃ	সূতার ওজন পাউণ্ড *	কাপড়ের ওজন পাউণ্ড *
১৯০৪-০৫	৩,৮৩,৪৭,৫৭৭	৭,২০,২২৪
১৯০৫-০৬	৫,১২,৭৬,৮৩৯	৬,৫৭,২৭৫
১৯০৬-০৭	৪,৬৫,৬৬,৭০২	১৩,১৬,২৪৯
১৯০৭-০৮	৪,১৮,১৭,৮৩১	১৯,৩৪,০৭৩
১৯০৮-০৯	৩,৯১,৪৬,৭২৩	২৮,৬১,২৭৩
১৯০৯-১০	৩,৪৪,১৯,৩৯২	২৮,৭৬,৬০১
১৯১০-১১	৩,৮২,৭৮,৮২৮	২৮,০৪,৩১৩
১৯১১-১২	৩,২৬,২৫,৪৯৭	২৬,৫৬,১৫৫
১৯১২-১৩	৩,৭৩,৫৫,১১৩	৪০,০৮,২৬৬
		বা ২,০৯,৮০,২৮৫ গজ

ভারতবর্ষে উৎপন্ন সূতার শতকরা ৫·৫ ভাগ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের সূতার কলের মধ্যে কেবলমাত্র দুইটীতে ৪০ নং পর্য্যন্ত সূতা প্রস্তুত হয়, অন্যগুলিতে ২৫ নম্বরের বেশী হয় না। এ দেশের কল সমূহে প্রায় ১॥০ কোটী টাকা মূলধন প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে বঙ্গদেশে কাপড় বয়নের তাঁত অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০৫ খৃঃ ২১৮ খানি তাঁত ছিল, এবং ১৯১২ খৃঃ ১৯০০ খানি হইয়াছে। বঙ্গদেশে ৫টী কল স্থাপিত হইয়াছে, যথা—শ্রীরামপুরে 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'কল্যাণজী', কলিকাতায় 'গণেশ মিল' এবং 'শ্রীনাথ মিল' এবং কুসটিয়ায় 'মোহিনী মিল'। এই ৫টী কল দেশীয় লোকের মূলধনে ও যত্নে স্থাপিত এবং তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত—এই গুলিতে বেশ ভাল ধুতি,

---

* এক পাউণ্ড প্রায় ॥০ সের।

সাটী ও ছিট প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল মালের বাজারে বেশ সুখ্যাতি আছে। বঙ্গলক্ষী মিল ১৯০৬ খৃঃ স্থাপিত হয় এবং উপস্থিত তাহাতে ৩৭১ খানি তাঁতে এবং ১৬,৪১৫টী টাকুতে কার্য্য হইতেছে। ইহার মূল ধন ১৮ লক্ষ টাকা এবং গড়ে ৮৬০ জন লোক দৈনিক ইহাতে মজুরী করিয়া থাকে। এই কলটি বঙ্গদেশের গৌরব বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বাগবাজারে 'শ্রীনাথ মিলে' নানাপ্রকার সুন্দর জামার ছিট প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কলে প্রস্তুত ছিট কোন অংশে বিলাতী অপেক্ষা হীন নহে। কুসটিয়ার 'মোহিনী মিল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইহাতে ৭৮ খানি তাঁত আছে, এবং এই কলেও উত্তম ছিট প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশে কাপড়ের কলের উপযুক্ত মজুরের বড়ই অভাব—যতদিন না কার্য্যদক্ষ মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ততদিন কলের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইবে না। ১৯১২-১৩ খৃঃ প্রায় ৫৩ কোটী টাকার কাপড় প্রভৃতি বিদেশ হইতে ভারতে আমদানি হইয়াছিল, তন্মধ্যে বঙ্গদেশ ২৭ কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্রাদি লইয়াছিল। বঙ্গদেশে যে তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় না, এজন্য আমেরিকা ও মিশর দেশ হইতে ভাল তুলা আমদানি করিতে হয়। হস্তের দ্বারা পরিচালিত তাঁতে অনেক বস্ত্র ও চাদর প্রস্তুত হইয়া থাকে—এই বস্ত্র সমূহ "দেশী" নামে অভিহিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিদেশী। কারণ তাহাতে ব্যবহৃত সূতা অধিকাংশই বিলাত হইতে আমদানি।

অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কাপড় বুনিতে পারা যায় এরূপ ঠকঠকি (Fly Shuttle) তাঁত, এ দেশীয় লোক—তাঁতি, জোলা, প্রভৃতিদিগের মধ্যে প্রচলন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশে শ্রীরামপুরে একটি বয়ন বিদ্যালয় (Weaving School) স্থাপিত হইয়াছে। কলের তাঁতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারায় এ দেশীয় তাঁতিদিগের দিন দিন অবনতি হইতেছে, এবং যতদিন না এইরূপ Fly Shuttle তাঁতে তাহারা ভালরূপ কার্য্য করিতে পারে ততদিন তাহাদের আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রেসিডেন্সি, বর্দ্ধমান ও ঢাকা বিভাগে বিলাতী কাপড়ের প্রতিযোগিতায়, তাঁতের কাপড়ের বিশেষ অবনতি হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের পর সে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। হুগলী জেলায়—আরামবাগ, হরিপাল ও কৈকালা, ফরেশডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, নদিয়া জেলার অন্তর্গত কুসটিয়া, মহেশপুর, শিকারপুর এবং শান্তিপুরে; বর্দ্ধমান জেলায়—কাল্না, মন্তেশ্বর

প্রভৃতি স্থানে; মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালে এবং পাবনা জেলায় তাঁতের কাপড় বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকার ঢাকাই কাপড়ের, শান্তিপুরের জরিপাড় কাপড়ের, এবং ফরেশডাঙ্গার কাঁচি ধুতির বিশেষ সুনাম আছে, এবং অনেক উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। হাবড়ার হাট দেশী কাপড় ক্রয় বিক্রয়ের প্রধান স্থান—প্রতি মঙ্গলবারে এই হাট বসিয়া থাকে। বঙ্গদেশের হস্তদ্বারা পরিচালিত তাঁত সমূহের দুই প্রকারে উন্নতি সাধন হইতে পারে—প্রথম:—সর্ব্বত্র সরল অথচ স্বল্প মূল্যের ঠক্‌ঠকি (Fly Shuttle) তাঁতের প্রবর্ত্তন; ২য়—কোন ধনবান লোক নিজ ব্যয়ে, অথবা যৌথ কোম্পানীর দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া, বৃহদায়তন কারখানা স্থাপন পূর্ব্বক মাহিনা হিসাবে লোক (তাঁতি, জোলা প্রভৃতি) নিযুক্ত করিয়া, অথবা প্রত্যেক জোড়া ফুরান হিসাবে দিয়া, কাপড়, জামার ছিট, প্রভৃতি বয়ন করাইয়া বড় বড় নগরে চালান দিতে পারিলে দেশীয় শিল্পের বিলোপসাধন হয় না এবং ধনীও বিশেষ রূপে লাভবান হন। মাদ্রাজ প্রদেশে এরূপ কারখানা স্থাপনপূর্ব্বক অনেকে লাভবান হইয়াছেন।

রেশমের কারখানা।—বঙ্গদেশ রেশমের কাপড়ের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে রেশমের কাপড় আমদানি হইলেও এই শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। মালদহ, ঘাটাল, কক্সবাজার, মুরশিদাবাদ, রাজসাহী, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে গুটি হইতে রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিকাংশ কারখানা Bengal Silk Co. Ltd., Berhampore Silk Concern, Faridpur Silk Concern এবং Louis Payen and Co. দ্বারা অধিকৃত। মুরশিদাবাদ, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর, বীরসিংপুর, রাজসাহী, মালদহ এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাধাকান্তপুরে উত্তম গরদ ও তসরের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। বহুকাল হইতে হুগলী আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বালী—দেওয়ানগঞ্জের গরদের ওড়না ও পাগড়ি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রয় হইয়া থাকে। পূজা, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে সূত্র বস্ত্রাপেক্ষা পট্টবস্ত্র পবিত্র বলিয়া স্বদেশজাত তসর ও গরদের এখনও বেশ আদর আছে। যে সকল লোক এই কাপড় বয়ন করে, তাহাদের অবস্থা মন্দ নহে। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিতে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (১ম) Monograph on the Silk Fabrics of Bengal by N. G. Mookerjee M.A, M.R.A.C, 1903; (২য়) Report of a Committee

appointed to enquire into the conditions of the Silk Industry in Bengal 1906; (৩য়) Review of the Industrial Position and Prospects in Bengal by J. G. Cumming, B.A.I.C.S. 1908.

কাচের কারখানা।—বঙ্গদেশে কাচ প্রস্তুত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৮৯০ খৃঃ টিটাগড়ে Pioneer Glass Manufacturing Co. নামক একটি কাচ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। এই কারখানায় দৈনিক দশ হাজার পর্য্যন্ত নানা প্রকারের শিশি বোতল প্রস্তুত হইত। ১৮৯৯ খৃঃ ইহা বন্ধ হইয়া যায়। সোদপুরে ১৮৯৮ খৃঃ Bengal (formerly Indian) Glass Co. নামক আর একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহারা সোডা জলের বোতল তৈয়ার করিত; কিন্তু ১৯০২ খৃঃ এই কারখানাটীও বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্গদেশে কাচ প্রস্তুত করিবার মাল মশলা যথেষ্ট থাকা সত্বেও কাচের কল স্থায়ী হইতেছে না, তাহার কারণ (১) শিক্ষিত কারিকরের অভাব; (২) গ্রীষ্মকালে দারুণ গ্রীষ্মে অগ্নিতাপে হাপরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া নলে ফুঁ দিয়া শিশি প্রস্তুত করা দারুণ কষ্টকর। অধুনা Owen's Bottle-blowing Machineএর দ্বারা ফুঁ দেওয়া কার্য্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। যদি ইংলণ্ড, বেল্‌জিয়ম, জার্ম্মানী বা অষ্ট্রিয়া হইতে কাচের দ্রব্য প্রস্তুত করিবার বিশেষজ্ঞ আনয়ন করা যায় এবং তাঁহাদের শিক্ষাধীন থাকিয়া Technical বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রবৃন্দ অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং যদি গভর্ণমেণ্ট এই দেশজাত শিশি বোতল প্রভৃতি হাঁসপাতাল ও ঔষধালয় সমূহে ব্যবহার করিতে উৎসাহ প্রদান করেন তাহা হইলে বঙ্গে কাচের কল স্থায়ী হইবে। ১৯১১-১২ খৃঃ বঙ্গদেশে ৫০ লক্ষ, এবং ১৯১২-১৩ খৃঃ ৫৮ লক্ষ টাকার কাচ ও কাচনির্ম্মিত দ্রব্যাদি আমদানি হইয়াছিল, তন্মধ্যে চুড়ি ১৬, লক্ষ ও ১৩ লক্ষ টাকার। কেবলমাত্র কাচের চুড়ি তৈয়ারী করিতে পারিলেও দেশের মহদুপকার সাধন করা হয়।

রসায়ন ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানা।—উপস্থিত বঙ্গদেশে ৩টী উল্লেখযোগ্য কারখানা আছে। D. Waldie কোং কোন্নগরে একটি কারখানা আছে—ইহাতে নানাপ্রকার দ্রাবক (Acid) ও অন্যান্য ঔষধ এবং সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। Bengal Chemical and Pharmaceutical Worksএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ইহা অধুনা বঙ্গদেশের

গৌরবজনক। কলেজের প্রসিদ্ধ রসায়নবিৎ পণ্ডিত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে এই কারখানাটি স্থাপন করেন, এবং তাঁহারই যত্নে এই কারখানা এতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে ৩।৪ জন লোকের মূলধনে ইহা স্থাপিত হয়। প্রায় ১২ বৎসর হইল ইহা একটি যৌথ কারবারে পরিণত হইয়াছে, এবং কলিকাতার অনেক রসায়নবিৎ পণ্ডিত এবং ডাক্তার ইহার অংশীদার। এই কারখানায় নানাপ্রকার ঔষধ, দ্রাবক (Acid) এবং বহুপ্রকার ডাক্তারী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং অধুনা নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্যও প্রস্তুত হইতেছে। ভেষজ দ্রব্যের জন্য ভারত চির প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর এদেশের বহু গুল্মলতা প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি ও তাহা হইতে ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া পুনর্ব্বার এদেশে প্রেরিত হইতেছে। এই কোম্পানী দেশীয় গাছ গাছড়া—যথা নিম, কালমেঘ, বাসক, কুর্চ্চি, পেঁপে, গোক্ষুর প্রভৃতি—হইতে নানাপ্রকার তরল সার প্রস্তুত করিয়া দেশের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছেন। আর একটি কারখানাকে আমরা উল্লেখযোগ্য মনে করি—কলিকাতাস্থিত Indian Pharmaceutical Works; ইঁহারাও দেশীয় গুল্ম লতাদি হইতে নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। সুদক্ষ এবং ভৈষজ্য শাস্ত্র নিপুণ শিক্ষিত বঙ্গবাসীর পক্ষে এইরূপ কারখানা স্থাপন করিয়া উন্নতি লাভ অতি সহজেই হইতে পারে।

সাবানের কারখানা।—অধুনা এদেশে সাবানের কারখানা স্থাপনের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। মিরাটের North West Soap Co. কলিকাতার সন্নিকট গারডেন্‌রিচে একটি সাবানের কারখানা খুলিয়াছেন। বঙ্গদেশে এদেশীয় লোকের মূলধনে স্থাপিত ও পরিচালিত কয়েকটী কারখানাও আছে, তন্মধ্যে কলিকাতার অন্তর্গত মেছুয়াবাজারস্থিত বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী, গোয়াবাগানস্থিত ওরিয়েণ্টাল (Oriental) সোপ, এবং আপার সারকুলার রোডস্থিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের ন্যাসনেল সোপ ও ঢাকার বুল্‌বুল সোপ ফ্যাক্টরীগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কারখানায় নানাপ্রকার সুগন্ধ সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এবং গ্লিসিরিণ এণ্ড সন্সের ট্রান্সপেরেণ্ট (Transparent) গ্লিসিরিন সোপ, রূপে এবং গুণে বিলাতী অপেক্ষা কোন অংশে অপকৃষ্ট নহে। বস্ত্র পরিষ্কার করিবার সাবান এদেশে কতক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে তন্মধ্যে বাগমারীর

সাবান প্রসিদ্ধ। বস্ত্র পরিষ্কার করিবার সাবানের জন্য বৃহদায়তন কারখানা স্থাপন করিলে বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা।

কাগজের কল।—হস্তনির্ম্মিত কাগজের দিন দিন অবনতি হইতেছে এবং প্রায় ধ্বংসের সম্মুখে উপস্থিত। হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাদ, গোঁসাই মালপাড়া, নেয়ালা, বালীদেওয়ানগঞ্জ স্থানে "কাগজী" নামধেয় কতকগুলি মুসলমান দ্বারা এই দেশী কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাবড়া জেলার সেইনান নামক স্থানে, মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জঙ্গিপুর নামক মহকুমার শ্রীকৃষ্ণপুর ও শ্রীরামপুর নামক স্থানেও হস্তনির্ম্মিত কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলিকাতা মহানগরীতে হিসাবের খাতা প্রস্তুত করিবার জন্য কতকগুলি লোক এই কাগজ সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে হস্তনির্ম্মিত "তুলট" কাগজে পুঁথি লেখা হইত এবং তাহা বহুদিন স্থায়ী হইত। বঙ্গদেশে টিটাগড়, কাঁকনাড়া এবং রাণীগঞ্জ নামক স্থানে তিনটি কাগজের কল আছে। ইংরাজ সদাগর মেসার্স এফ্, ডব্লিউ হিলজার্স ও মেসার্স বামার লরি এণ্ড কোং দ্বারা এই সমস্ত কলগুলি পরিচালিত। এই তিনটি কলে সাদা, বাদামী প্রভৃতি নানাপ্রকার রঙ্গিন, কাটরিস্ ও Blotting কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের কাগজ সাধারণতঃ ছিন্ন বসন, সাবুই ঘাস, খড়, পাট, পুরাতন থলে এবং পুরাতন কাগজ প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাবুই ঘাস প্রধানতঃ সাহেবগঞ্জ এবং রাজমহল প্রভৃতি মহকুমা হইতে আমদানি হইয়া থাকে এবং গড়ে ১॥০ হিঃ মণ বিক্রীত হইয়া থাকে। ১৯১১ খৃঃ ৬৫,৫৫,১৭০ টাকার কাগজ বঙ্গের কলসমূহে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল কলে প্রস্তুত অনেক কাগজ গভর্ণমেণ্টও লইয়া থাকেন।

লোহার কারখানা।—১৯১২ খৃঃ বঙ্গদেশে ৩৪টী লোহার কারখানা ছিল। তন্মধ্যে Bengal Iron and Steel Co., Vulcan Iron Works এবং বরন কোং Howrah Iron Works বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার মার্টিন কোং প্রথমোক্তটীর Managing Agents, ইহাদিগের পরিচালনে কোং সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে—ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য কোং দ্বারা পরিচালনে এই লৌহের কারখানায় কোন উন্নতি হয় নাই বা লভ্যাংশ দিতে পারে নাই। ইহাদিগের কারখানা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বরাকরে স্থাপিত। ১৯১২ খৃঃ ৯,৮৮২ টন অপরিষ্কৃত খনিজ লৌহ (Iron ore) উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং ৫৮,৮৮৬ টন Pig Iron নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থলে আর একটি লৌহের

কারখানার নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ। ইহার নাম টাটার আয়রণ্ এণ্ড ষ্টীল্ কোং লিমিটেড (Tata's Iron and Steel Co. Ltd.) ইহা বি, এন্ রেলওয়ের ষ্টেশন কালীমাটী হইতে এক ক্রোশ অন্তরে সাকচী নামক স্থানে স্থাপিত।* মিঃ জে, এন্, টাটার যত্নে এবং অর্থে সর্ব্বপ্রথমে ইহা স্থাপিত হয়; উপস্থিত ইহা একটি যৌথ কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে, এবং বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর এবং কাপড়ের কলওয়ালা টাটা এণ্ড সন্স ইহার পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন। এরূপ বৃহদায়তন লৌহের কারখানা এশিয়া মহাদেশে আর নাই। এই কারখানার মূলধন ২ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা—ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ উৎকৃষ্ট লৌহ এবং ইসপাত অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানকার লৌহ ও ইস্পাত বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে এবং আশা করা যায় যে বিদেশী লৌহের আমদানি অচিরাৎ কমিয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট এই কোম্পানীর নিকট হইতে বহুল পরিমাণে রেল প্রভৃতি খরিদ করিবার জন্য চুক্তি করিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ এই কারখানায় ৪,৭১,২৩২ টন অপরিষ্কৃত খনিজ লৌহ (Iron ore) এবং ৮৬,৮২২ টন অবিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড (Pig Iron) প্রস্তুত হইয়াছিল। Bengal Iron and Steel Co. এবং Tata's Iron and Steel Coতে যে লৌহপিণ্ড (Pig Iron) প্রস্তুত হইতেছে তাহা হইতে ইস্পাত তৈয়ারী হয় বলিয়া, এদেশে ছুরি, কাঁচি প্রভৃতির জন্য উহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বঙ্গদেশে যে সকল লৌহের বৃহদাকার কারখানা আছে, তাহা প্রায় ইংরাজদিগের দ্বারা পরিচালিত। এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা আছে, যাহা এদেশীয়দিগের যত্নে ও অর্থে পরিচালিত। মাণিকতলার সিকদার কোং, শ্যামবাজারের আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সালিকা ও বৈঁটরার ঢালাই করিবার কল উল্লেখযোগ্য। ইহাতে চিনে লোহার (Cast Iron) রেলিং, থাম, গেট, রেল, ওয়াটার পাইপ, আখমাড়া কল, পাটের গাঁটকসা কল তৈয়ার হয় এবং অন্যান্য কলের কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাও ঢালাই হয়। বৈঁটরার রাজারাম ও অক্ষয়কুমার সরকার ঢালাই কারখানা করিয়া বিদেশ হইতে বাটখারা আমদানি রহিত করিয়াছে। ছোট ছোট কারখানায় এদেশীয় লোকের দ্বারা লৌহ ও ইসপাত হইতে ছুরি, কাঁচি, কড়াই, Steel Trunk,

* ইহার চিত্রাদিসহ বিশদ বিবরণ গত ৬ই অক্টোবরের 'হিন্দু-পেট্রিয়টে' প্রকাশিত হইয়াছে।

লৌহের আলমারি, বন্দুক, কাটারী, কোদাল, তালা ও চাবি, জাঁতি প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানের উপকণ্ঠে কাঞ্চননগরে বিলাতির সমকক্ষ ছুরি কাঁচি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি কারখানা আছে; প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী এই বিষয়ের অগ্রণী। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর হইতে ৩০ মাইল দূরে সানপুরেও উত্তম ছুরি ও কাঁচি নির্ম্মিত হইয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন বীরভূম, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, খুলনা এবং নদীয়া জেলা প্রভৃতিতেও উত্তম ছুরি কাঁচি প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুরসিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরে এবং খুলনার অন্তর্গত সাতখিরা মহকুমায় উত্তম জাঁতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পিতল এবং কাঁসার বাসন প্রভৃতি প্রস্তুতের ছোট ছোট কারখানা।—শ্রীযুক্ত টি, এন্. মুখার্জ্জী এই শিল্প সম্বন্ধে ইংরাজীতে Monograph on the Brass and Copper Manufactures of Bengal, 1894 লিখিয়াছেন, ইহাতে অনেক তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই শিল্পের দিন দিন উন্নতি হইতেছে এবং একটি শিল্পী মাসিক ১৫৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মজুরী পাইয়া থাকে। কলিকাতায়—কাঁসারিপাড়া, চিৎপুর ও ভবানীপুর; বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত—বনপাস, কামারপাড়া, ডাঁইহাট, মেঁটরী, পূর্ব্বস্থলী, জাবুই; বাঁকুড়া জেলায়—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, পাত্রসাই; হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁসবেঁরে, খামারপাড়া; মেদিনীপুর জেলায়—চন্দ্রকোণা, খাবার, ঘাটাল, রামজীবনপুর; মৈমনসিং জেলার অন্তর্গত কাগমারি; নদীয়া জেলায় রাণাঘাট ও শান্তিপুর এবং মুরসিদাবাদে খাগড়া এবং জঙ্গিপুর প্রভৃতি বহু স্থানে উত্তম কাঁসার ও পিতলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। খাবার নামক স্থানের প্রস্তুত থালা, ঘাটালের গাড়ু ও খাগড়ার পানের ডিবা এবং গেলাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ কার্য্যই হস্তের দ্বারা হইয়া থাকে তবে ঢালাই, পেটাই প্রভৃতি কার্য্য কলের সাহায্যে হইলে এই শিল্পের সমধিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং দ্রব্যাদির মূল্যও অনেক কম হইতে পারে। খাবার, ঘাটাল, ডাঁইহাট, খাগড়া প্রভৃতি স্থানে কলের সাহায্যে কার্য্য বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

দীপশলাকা বা দেশালায়ের কল।—পূর্ব্বে এদেশে পেঁকাটীর (পাটের শুষ্ক গাছ) মুখে গন্ধক লাগাইয়া, চকমকির (ইস্পাত এবং পাথর) সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন করিয়া, শোলা ধরাইয়া, সেই গন্ধকযুক্ত পেঁকাটী অগ্নি-

সংযুক্ত শোলায় প্রজ্বলিত করিত—ইহাতে ব্যয় খুব অল্প হইত; কিন্তু নরওয়ে, সুইডেন ও জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে অল্প আয়াসে প্রজ্বলিত দেশালাই আমদানি হওয়াতে ক্রমে ক্রমে এদেশের দেশালাই প্রস্তুত করিবার পুরাতন রীতি একবারে লোপ পাইয়াছে ১৯১১-১২ খৃঃ ২৬ লক্ষ টাকার এবং ১৯১২-১৩ খৃঃ প্রায় ২৯ লক্ষ টাকার দেশালাই বঙ্গদেশে আমদানি হইয়াছিল। দেশালায়ের বাক্স ও কাটীর উপযুক্ত হালকা কাষ্ঠ বঙ্গদেশে পাওয়া সুকঠিন তজ্জন্য দেশালায়ের কলে লাভ হইতেছে না এবং কলগুলিও ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

শালকিয়ার দেশালায়ের কল উঠিয়া যাইবার সম্ভবতঃ এই একটি কারণ। ১৯০৭ খৃঃ জানুয়ারি মাসে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ এবং শৈলেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়দিগের অর্থে "বন্দে মাতরং" নামক দেশালাইয়ের কল কলিকাতার সন্নিকটে টালিগঞ্জে স্থাপিত হইয়াছিল। এই কারখানায় প্রস্তুত কাটী বেশ পরিষ্কার হয় নাই। কাটীর উপযুক্ত হাল্‌কা কাষ্ঠের অভাবই ইহার কারণ। বাঁকিপুরের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক এই কলের ডুবাইবার কল (dipping Machine) প্রস্তুত করিয়াছেন। Oriental Match Manufacturing নামধেয় একটি যৌথ কোং কলিকাতার সন্নিকট কোন্নগরে একটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। রায় সাহেব উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল ১৯০৬ খৃঃ কলিকাতার Industrial Conference "দেশালাই প্রস্তুত করিবার উপযোগী ভারতীয় কাষ্ঠ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় 'Industrial India" Vol III. 1906 April যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে ভারতে দেশালাই প্রস্তুত সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

চামড়ার কারখানা।—অনেক টাকার কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ হইতে ১৯০৮-১৯০৯ খৃঃ ৬ কোটী ৮১ লক্ষ টাকার ১৯১০-১১ খৃঃ ৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকার, ১৯১১-১২ খৃঃ ৭ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার এবং ১৯১২-১৩ খৃঃ ৮ কোটী ৩০ লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানি হইয়াছিল। চামড়ার পরিবর্ত্তে পাটকরা চামড়া এবং জুতা প্রভৃতি বহু পরিমাণ আমদানী হইয়া থাকে। যাহাতে বঙ্গদেশে চামড়া পরিষ্কার এবং পাট করা হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এবং এই চেষ্টা ফলবতী হইলে দেশের অনেক টাকা এই দেশে থাকিয়া যাইবে। কানপুর ও আগ্রার Shoe and Boot Factory এই বিষয়ের পথ প্রদর্শক। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার

জন্য Mr. E. R. Watson. M. A. F. C. S., কে নিযুক্ত করেন। তিনি তাহার অনুসন্ধানের ফল দুইখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১)

কলিকাতার সন্নিকট টেংরায়, খিদিরপুরে এবং বেলেঘাটায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয়ের National Tannery Factory আছে এবং নদীয়া জেলার অন্তর্গত মহেশগঞ্জ নামক স্থানে একটি চামড়ার কারখানা আছে কাশিমবাজারের মহারাজা বহরমপুরে একটি ট্যানারি স্থাপন করিতেছেন। মাদ্রাজে যে চামড়া পরিষ্কার করিবার গভর্ণমেণ্টের একটী কারখানা আছে, তাহা হইতে এই শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ হইতে পারে।

এরূপ প্রবন্ধের সবিস্তার আলোচনা 'অর্চ্চনায়' স্থানাভাব অতএব বঙ্গদেশ জাত উপরি উল্লিখিত ভিন্ন অন্যান্য শিল্পের নাম উল্লেখ মাত্র করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল—পোড়া মাটির প্রস্তুত নল (Pipe) প্রভৃতি, মাদুর প্রস্তুত, কালী প্রস্তুত, বোতাম ও পেনসিল প্রস্তুত, গিল্টির কার্য্য নৌকা প্রস্তুত, বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত, ফিতা প্রস্তুত, গালা, হস্তিদন্তের কারুকার্য্য ঢাকার শাঁকা, বিড়ি এবং সিগারেট ফ্যাক্টারী প্রভৃতি।

কাজের লোক ও বিশেষজ্ঞ (expert) ব্যতীত কোন শিল্পের উন্নতি হয় না। সুদক্ষ অধ্যক্ষের অভাবে বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত বড় বড় যৌথ শিল্পাগার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষার অভাবে যৌথ শিল্পাগার উঠিয়া যাওয়াতে লোকে বিশ্বাস করিয়া ঘরের টাকা বাহির করিতে ইচ্ছা করেন না।

কোন শিল্পাগারের অধ্যক্ষ হইতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির আবশ্যক। বিশেষরূপ অভিজ্ঞ না হইলে পাটের কল, লৌহের কারখানা ইত্যাদির অধ্যক্ষ হওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে সুদক্ষ ম্যানেজার (Manager) আনাইয়া তাঁহার নিকট শিক্ষানবীশ হওয়া কর্ত্তব্য। নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা করিবার জন্য Association for the advancement of Scientific and Industrial Education in India এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এদেশীয় শিক্ষিত ও মেধাবী ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিয়া ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপান প্রভৃতি দেশে পাঠাইতেছেন। এই সকল ছাত্র সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত হইয়া আসিলে এদেশের শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

শ্রী—

---

(১) Enquiry as to the possibility or Desirability of Improving the Cure of Hides and skins exported from Bengal; (২) Enquiry as to the Desirability of Developing the Tanning Industry in the Province of Bengal, and to the Possibility of Government assisting in the Development by means of Education or Instruction.

বংশ।

(আদর্শ আধ্যাত্মিক কবিতা)

দীর্ঘ তনু, শীর্ণ সরু, কি লম্বা মহান্।
　　গগন ভেদিয়া উঠে যাও!
পাপে জীর্ণ হোক দীর্ণ এ অখিল ধরা—
　　অনন্তের পথে শুধু চাও।
ধরণীর কোন ধারে নাহি দৃষ্টি তব
　　উ'ন্নয়ান ঊর্দ্ধে নিরন্তর,
কি যেন হারায়ে গেছে জন্মিবার আগে—
　　তাই তব ব্যাকুল অন্তর!
অনন্ত কালের কথা—মৎস্য রূপে যবে
　　ফিরে ধাতা মহাপারাবারে,
করুণায় সেই দিন ছিপ্ রূপে তুমি
　　স্নেহভরে তুলেছিলে তারে!
তা'র পর কূর্ম্মরূপ—বরাহ যখন—
　　লগুড়ের দেখালে প্রভাব;
বামন রূপেতে তোমা' সূক্ষ্ম করে লয়ে
　　ঘুচাইল যষ্টীর অভাব।
তুমি কি হে বাঁশ শুধু—বাঁশি হয়ে পরে
　　গোকুলের গোপিনী ভুলা'লে,
সুমধুর কত সুরে লহরে লহরে
　　যমুনায় উজান বহালে!
সেই তুমি! নগ্ন তব শ্যামল শরীর—
　　তরুবর! হে বংশ সুন্দর!

এ ঘোর কলিতে এক তোমারাই শুধু
　　দুর্ব্বাসার আছ বংশধর!
দুর্ব্বাসার ভীম ক্রোধে কাঁপিত যেমন
　　অতীতের দেবতা-মণ্ডলী,
প্রহরীর করে তোমা' দণ্ডরূপে হেরে
　　আছি সবে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি!
অটুট রেখেছ পিতৃ-পুরুষ গৌরব
　　হে তাপস শাঁসশূন্য বাঁশ!
দ্বাপরে রাখাল যথা—কলিতে পুলিশ
　　করেছে তোমারে সর্ব্বগ্রাস।
তুমি কি গো আজিকার! যুগ যুগান্তের—
　　মূক সেথা 'গবেষক'-ভাষা;
তাই রোষে কহে তব জন্ম তৃণ হ'তে
　　অভিব্যক্ত-বাদী যত চাষা!
আরে মূঢ়! আরে চাষা! এও কি সম্ভবে!
　　তৃণ হ'তে বংশের বিকাশ!
খর্জ্জুর কি মর্ম্ম দুখে সাধনার বলে
　　তালরূপে হয়েছে প্রকাশ!
তৃণ হয়ে জন্ম যায়—তৃণ চিরদিন!
　　বাঁশ হ'তে কোথা অধিকার!
কঞ্চী হেন চিরকাল কঞ্চী হয়ে রয়—
　　এই মত লীলা বিধাতার!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

পতঙ্গ।*

হা অদৃষ্ট! গৃহে মুমূর্ষু পত্নী, তবু বড় বাবু ছুটি দিবেন না! সকলে বলিল, নূতন ছোট সাহেবের নিকট আবেদন করিলে সিদ্ধকাম হইব, কাজেই রবিবার প্রাতে চৌরঙ্গিতে সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইলাম। নূতন সাহেব ভারি ভদ্রলোক—নিজের বসিবার ঘরে আমায় একখানি চেয়ার দিলেন এবং সযত্নে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবু তোমার কি করিতে পারি?" আমি তাঁহাকে আগমনের উদ্দেশ্যটা বুঝাইয়া বলিলাম। সাহেব প্রথমে একটু গম্ভীর হইলেন, তাহার পর বলিলেন—"ছুটি, নিশ্চয় পাইবে। যতদিন ইচ্ছা, স্ত্রীকে মধুপুরে রাখিতে পার। আর যদি কিছু অর্থের আবশ্যক হয় আমাকে বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিও না, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব।" কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরিয়া গেল, বলিলাম—"সাহেব আপনার দয়া অসীম।" সাহেব বলিলেন—'না বাবু দয়া নহে, কর্ত্তব্য—আমার টেবিলের উপর সুবর্ণ পিঞ্জরে কি রহিয়াছে দেখিতেছ?'

আমি বিস্ময়ে দেখিলাম একটী সুচারু সুবর্ণ পিঞ্জরে একটী মৃত পতঙ্গ—আকৃতি, অনেকটা প্রজাপতির মত, দেওয়ালী পোকার সহিত এগুলিকে আলোকের নিকট দেখা যায়। সাহেব বলিলেন "বাবু তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে আত্মা জীবদেহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্ব-রূপ প্রকাশ করে। আমি একথা বিশ্বাস করি। এ পতঙ্গটীকে কেন এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছি জান? আমার বিশ্বাস আমি একদিন যে আত্মাকে একটী মনুষ্যদেহে পাইয়া পূজা করিয়াছি সেই পবিত্র আত্মাটী এক সময়ে এই পতঙ্গদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই এই পতঙ্গের মৃতদেহ আমার জীবনের সাথী। আমি যখন মরিব আমার দেহের সহিত এই পতঙ্গ দেহটীরও কবর হইবে।"

আমি বিস্ময়ে সাহেবের মুখের দিকে চাহিলাম। এক অব্যক্ত বেদনার স্মৃতিতে তাঁহার চক্ষু দুইটী নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। সাহেব বলিলেন—"বাবু শুনুন, আপনাকে আমার জীবনের একটা ক্ষুদ্র কাহিনী বলি। আপনি কি সত্বর যাইতে চাহেন?"

* Strand Magazineএ প্রকাশিত "Moth" নামক গল্প অবলম্বনে। ইহা সত্যঘটনা মূলক।

আমি বলিলাম—না সাহেব।

সাহেব বলিতে লাগিলেন—"আজ আপনি যেরূপ মুমূর্ষু পত্নীর শুশ্রূষার জন্য ছুটী চাহিতেছেন, একদিন আমিও আপনার মত ব্যাকুল অন্তরে আমার পত্নীর শুশ্রূষার জন্য অবসর চাহিয়াছিলাম। সে স্ত্রী দেবী ছিল। আমার পিতৃবিয়োগের পর নিঃসম্বলে ইংলণ্ড ছাড়িয়া কানাডা উপনিবেশে প্রস্থান করিয়াছিলাম। বাল্যাবধি আমার কলকব্জা কার্য্যে একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। কানাডায় গিয়া ইঞ্জিন-চালকের কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করি। যখন কার্য্য শিখিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হই তখন জেনীর সহিত আমার পরিচয় হয়। তাহার সরলতা, তাহার অনুপম রূপরাশি, তাহার মিষ্ট কথায় আমি মুগ্ধ হইলাম,—অথচ বুঝিলাম সেরূপ রমণী-রত্নকে ইঞ্জিন-চালকের পত্নী করিয়া কুটিরে রাখা ঘোর স্বার্থপরতা। একদিন জেনীকে বলিলাম,—'জেনী আজ হইতে আমাদের পরস্পরের সখ্য স্থগিত হইল।' জেনী তাহার নীল চক্ষে অতি কাতরভাবে আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম—'জেনী, তোমার রূপ-রাশি প্রাসাদের উপযুক্ত, সামান্য ইঞ্জিন-চালকের কুটীরের নহে। জেনী বলিল —"সুখ প্রাসাদেও থাকে না কুটীরেও থাকে না, সুখ থাকে মনে।" আমি আগ্রহে তাহার সেই কোমল বাহু চাপিয়া ধরিয়া—নতজানু হইয়া বলিলাম,— 'জেনী, প্রিয়তমে, তুমি আমাকে লইয়া কুটীরে সুখী হইতে পার?'

অতি মৃদুস্বরে আমার প্রণয়িনী বলিল—"অবশ্য পারি"।

(২)

"বাবু, সেই স্ত্রী মুমূর্ষু অবস্থায় আমার সামান্য গৃহে পড়িয়াছিল। আমি তখন প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিন-চালক। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সমস্ত রাত্রি তাহার শুশ্রূষা করিতাম। তবু পত্নী দিন দিন যেন কবরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তিন দিন তিন রাত্রি ঘুমাই নাই। চতুর্থ রাত্রে, ক্যানেডার 'এক্সপ্রেস্' লইয়া আমাকে সমস্ত রাত্রি ছুটিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ছুটি চাহিলাম,—তাঁহারা আমার দুঃখে 'বাচনিক' সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন মাত্র, কিন্তু অবসর দিলেন না। যখন জেনী সেই রক্তহীন কৃশ অধরে হাসিয়া বলিল—"প্রিয়তম যাও 'কর্ত্তব্য' করগে, আমার মন তোমার নিকট পড়িয়া থাকিবে।" তখন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মাতালের মত ইঞ্জিনে আসিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, প্লাটফর্ম্মে খুব সমারোহ। আমাদিগের উর্দ্ধতম কর্ম্মচারিবৃন্দ নিজেরা প্লাটফর্ম্মে ছুটাছুটি করি-তেছেন। একজন বড় সাহেব স্বয়ং আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"বিল্

খুব সাবধানে ট্রেণ চালাইবে, এ গাড়ীতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের দুই তিন জন সভ্য আছেন এবং একজন লর্ড আছেন। ও কি! ওরূপ করিতেছ কেন? তুমি কি পীড়িত?"

ক্লান্তিতে আমার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল। উত্তেজনায় মানসিক স্থিরতা নষ্ট হইতেছিল। আমি সাহেবকে আমার দুঃখের কাহিনী বলিলাম এবং তাঁহার নিকট ছুটি চাহিলাম। নিজের মেতের কুকুরকে যেরূপ আদর করিয়া সান্ত্বনা দেয় সেইরূপ স্তোকবাক্যে সাহেব আমাকে ভুলাইয়া বলিলেন—"তোমার মত ড্রাইভার এ লাইনে নাই। তুমি ভিন্ন আজিকার এই 'এক্সপ্রেশ' কাহাকেও দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের কোম্পানীর গৌরবের ভার আজ তোমার হস্তে ন্যস্ত।

কি করিব? আবার উত্তেজনা আসিল। আমাদের ইঞ্জিনও আমাদের নিকট একটা স্নেহের পদার্থ—ভাবিলাম জেনীর চিন্তা এই ইঞ্জিনকে আদর যত্ন করিয়া ভুলিব। একজনের স্নেহ ভুলিতে গেলে অপরকে স্নেহ করিতে হয়। যথাসাধ্য ইঞ্জিনের কলকব্জার উপর আয়ত্ব করিয়া ছুটিতে লাগিলাম। 'এক্সপ্রেশ' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ভীমবেগে অসুর-বিক্রমে চলিল। আমরা সম্মুখের গন্তব্য পথ কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। কয়দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর আজ চতুর্দ্দিক ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেরূপ কুয়াসা আপনারা ভারতবর্ষে কোথাও দেখিতে পান না। হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিতেছিল! দেহের ভিতরের সমস্ত কলকব্জা, যন্ত্রগুলা অবশ হইয়া পড়িতেছিল। ইঞ্জিনের কলের উপর আয়ত্ত করিব কেমন করিয়া? আমার সহিত আমার সহকারী জ্যাক ছিল, তাহাকে বলিলাম—"জ্যাক, আজ একটা বিপদ ঘটিবে। এই কুয়াসা-পরিবৃত মাঠের মধ্যে সিগনালের আলো দেখিবার কোনও উপায় নাই। তুমি খুব লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে দেখ। আমিও এক পার্শ্বে দেখি। আমার হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে।"

জ্যাক আমার অবস্থা জানিত। সে নিঃশব্দে একটা বোতল বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। বিকারের তৃষাতুর রোগীর মত আমি একেবারে অনেকটা ব্রাণ্ডী পান করিয়া ফেলিলাম। জ্যাক বলিল—"না হয় তুমি বিশ্রাম কর, আমি ইঞ্জিন চালাই।" আমি তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না।

ইঞ্জিনের আলোকে জ্যাক বাম দিকে, আমি দক্ষিণ দিকে দেখিতেছিলাম—হঠাৎ আমি বিস্মিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সম্মুখে কুয়াসা-

ভ্যন্তর হইতে এক বৃহদাকার রমণীর ছায়ামূর্ত্তি বাহু প্রসারণ করিতেছে, তুলিতেছে, নামাইতেছে—আবার স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিতেছে। পূর্ব্বে ক্যানেডার রেলপথে আকস্মিক বিপদ সম্ভাবনা থাকিলে যে কোন রমণী এইরূপ নিশানা-প্রদর্শন করিয়া গাড়ী থামাইতে পারিত। জ্যাক নিজকার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই আমি ভার্গ করিয়া চোখ মুছিলাম এবং গোঁয়াইতে লাগিলাম।

অস্থিরচিত্তে আমি পুনরায় ইঞ্জিন চালাইলাম—জ্যাক আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তখন আমরা স্নো-হিলের সঙ্কীর্ণ পথে পর্ব্বতের উপর অধিরোহণ করিয়াছিলাম। ঐ স্থান হইতে নামিবার পথ খুব ঢালু ও সঙ্কীর্ণ এবং নিম্নদেশে রেলওয়ে লাইন বক্র হইয়া গিয়া সুদীর্ঘ 'ক্লেভবর ব্রীজে'র উপর দিয়া পরপারে গিয়াছে।

আমি অস্থিরচিত্তে জ্যাককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিছু দেখিতেছ? এইবার একবার উঠ!"

সে উত্তর করিল—"কই কিছু দেখি নাই।"

আমরা পাহাড় হইতে নামিয়া মাত্র দুই মাইল গিয়াছি, আবার দেখিলাম কুয়াসা মধ্য হইতে সেই বিরাট রমণীর ছায়ামূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। বাহু উত্তোলন করিল, নামাইল,—আবার উর্দ্ধে, আমার নিম্নে!

জ্যাক তখন নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার রক্তিম বর্ণ তাহার বদনমণ্ডলে প্রতিভাত। আমি তাহাকে বলিলাম—"দোহাই জ্যাক, দেখ—সম্মুখে কি!" সে ত্রস্তে পার্শ্বে মুখ বাড়াইয়া দেখিল ও বলিল—"কই কিছু না—বেশ পরিষ্কার!"

"কিছু না! কুয়াসার মধ্যে এক রমণীর ছায়ামূর্ত্তি গাড়ী থামাইবার ইঙ্গিত করিতেছে! আমি দুইবার দেখিয়াছি!"

সে বলিল—"কিছু না—ভ্রম! চিন্তায়, অনিদ্রায়, অবিশ্রামে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত! তুমি গৃহিণীর চিন্তায় মগ্ন! এক পেগ্' টানিয়া বিশ্রাম কর, আমি খানিকক্ষণ চালাই!"

"তা নয় জ্যাক! আমি ভাল ক'রে দেখেছি এ জেনীরই ছায়ামূর্ত্তি! আমি আসবার পর তার মৃত্যু হয়েছে—" আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম—হাঁফাইতে লাগিলাম। গম্ভীর ভাবে জ্যাক আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিল—

"ওটা চিন্তাগ্রস্ত বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা-প্রসূত!" এইরূপে পর্ব্বতোপরে

অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময় পুনরায় সেই মূর্ত্তি, সেই ভাব। তাহার নিশানা উপেক্ষা করার জন্ত এরার যেন তাহার মুখে ক্রোধের চিহ্ন প্রকট। আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, সজোরে ব্রেক (Brake) করিলাম!

জ্যাক বিরক্ত হইয়া বলিল—"বিল, তুমি কি পাগল হ'লে ?"

"না জ্যাক, তা নয়, আবার সেই মূর্ত্তি আমাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করছে। নিশ্চয় ইহার ভিতর কোনও নিগূঢ় অর্থ আছে!"

জ্যাকের বদনমণ্ডলে যেন একটা চিন্তার ভাব দেখিলাম! সে ব্রেক হইতে আমার হাত ঠেলিয়া দিয়া বলিল—"দোহাই থামাইও না। গাড়ীতে ইন্সপেক্টর আছেন। তিনি এসেই বল্‌বেন তুমি মাতাল হয়েছ। ঐ দেখ তাহার আলো দেখা দিয়েছে—তিনি ফুটবোর্ডে পা দিয়েছেন। চালাও, তা না হলে তোমার কর্ম্মচ্যুতি সম্ভব।"

আমি খুব সন্তর্পণে, খুব ধীরে গাড়ী ছাড়িতে ছাড়িতে চীৎকার করিয়া বলিলাম—"দেখ, শীঘ্র দেখ জ্যাক! আমাদিগকে পুনরায় সাবধান করিতেছে—ঐ দেখ সম্মুখে!"

জ্যাক আমার চিন্তার কারণ কিছু বুঝিল—তখন ফ্রেভবয় উপত্যকায় আসিয়াছি। তাহার পর দুইবার বক্রভাবে গিয়া পুলে উঠিতে হইবে। আমি গাড়ী থামাইলাম। জ্যাক ঘড়ী দেখিয়া বলিল—"বিল, গাড়ী ছাড়—আমাদের ৪ মিনিট বিলম্ব হইয়াছে! না হয় দাও এইবার আমি একবার চালাই, বিল।"

আমার বোধ হইল জ্যাক আমার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া ভীত হইয়াছিল। আমি জীবন্মৃত হইয়াছিলাম। "জেনী, জেনী—জেনীর মৃত্যু—" গাড়ীর চাকাগুলি এই গীত যেন একযোগে সমস্বরে গাহিতেছিল! অন্যমনস্ক ভাবে আমি আবার গাড়ী ছাড়িলাম।

জ্যাক বলিল—"আজ একটা খুব বন্যা হইবে। রাশীকৃত বরফ গ'লে নদীতে মিশ্‌ছে। সকলে বলে পুলটা ভাল তৈরী হয় নাই। বন্যার ধাক্কা সামলাইবার মত মজবুত নহে! বিস্কে সাগরের মত নদী তরঙ্গায়িত।"

গাড়ী তখন ঘণ্টায় ৪০ মাইল হিসাবে ছুটিতেছিল! আর একটা বক্র পথ অতিক্রম করিলেই আমরা পুলের উপরে উঠি।

"জ্যাক"—এই বলিয়া আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সম্মুখে আবার সেই মূর্ত্তি—আবার তাহার সেই বাহু উর্দ্ধে, নিম্নে—ব্যস্তভাবে গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিতেছে! "এই ধারে এস—ঐ দেখ!"

"তাইত বিল! ব্যাপার কি! এ কি!"

আমি কিন্তু এইবার গাড়ী থামাইলাম। ব্রেক্ কষিলাম। ষ্টীম্ ছাড়িলাম! দুইবার বাঁশীর রব করিয়া ব্রেক্সম্যানকে ব্রেক কষিতে ইঙ্গিত করিলাম। গাড়ী পুল হইতে দুই শত হাত অন্তরে থামিল।

"বিল, এটা কি? এটা ত মনুষ্য-মূর্ত্তি নহে অথচ আমাদিগকে গাড়ী থামা-ইতে ইঙ্গিত করিতেছে! ব্যাপারটা কি?"

ক্রুদ্ধ আরোহিগণ আমাদিগের দিকে আসিতে লাগিল। আমরা কি উত্তর দিব! সন্তোষজনক উত্তর দিবার ত কিছুই ছিল না!

(৩)

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আরক্তিম মুখে ইন্সপেক্টর আসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"ব্যাপার কি বিল্! তুমি আরও ২।১ বার গাড়ী প্রায় থামিয়েছিলে! ইঞ্জিনের কিছু খারাপ হয়েছে?"

"কি হয়েছে বল"—জলদ গম্ভীরস্বরে ইন্সপেক্টর পুনরায় প্রশ্ন করিল।

"ইঞ্জিনের কোনও দোষ হয় নি—কে আমাদের গাড়ী থামাতে নিশানা দিয়াছে।"

তিনি আমাকে মাতাল মনে করিবেন এই ভয়ে তাঁহার নিকট সত্য গোপন করিলাম।

ইন্সপেক্টর আমার দিকে আরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল—"নিশানা দেখিয়ে গাড়ী থামিয়েছে! অসম্ভব, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনও লোকের বসতি নেই! তুমি কি পাগল হয়েছ?"

জ্যাক বলিল—"আমিও দেখেছি মশাই!"

"লাইনের ধারে কেহ নাই—এ কার্য্য করিবার কোনও কারণও দেখ্ছি না। ছিঃ ছিঃ—এরই মধ্যে দশ মিনিট বিলম্ব হয়েছে—গাড়ীতে এত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক রয়েছেন—আমি এ বিষয়ে রিপোর্ট করব—এখনই গাড়ী চালাও।" এই বলিয়া ইন্সপেক্টর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

আসল কথা বলিলে চাকুরী যাইবে এই ভয়ে সব গোপন করিলাম এবং প্রকাশ্যে বলিলাম—"ব্যাপারটা ভাল করে না দেখে আর ইঞ্জিন চালাব না।"

আমার কথা শুনিয়া ইন্সপেক্টর পার্শ্বের একজন আরোহীকে সম্বোধন করিয়া

বলিল—"আমার মনে হচ্ছে মুমূর্ষু স্ত্রীর চিন্তায় লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। জ্যাক তুমি গাড়ী চালাও।"

জ্যাক কোনও উত্তর করিল না, গাড়ীও চালাইল না।

হুকুম অমান্য করায় অপমানিত ইন্সপেক্টর গর্জ্জন করিতে করিতে বলিল—

"এখানে আবার কোথায় কে আছে? এ একটা মস্ত বাঁদরামি—চল একটু অনুসন্ধান করে দেখি!"—

কুয়াসাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছিল। ২।১০ মাইলের মধ্যে লোকের কোনও বসবাস নাই। মনোমধ্যে সেই ছায়ামূর্ত্তির নিশানা উদিত হওয়ায় আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম—"কে এমন সময় আমাদিগকে থামাইতে আসিবে?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমরা যতই নদীতীরে আসিতে লাগিলাম—নদীর ভীষণ গর্জ্জন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

আমরা আলো লইয়া লাইনের এদিক, ওদিক ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করিয়া একটা তাম্রবর্ণ আলোক-ছটায় আমরা নদীর তরঙ্গায়িত কাল জল এবং ব্রীজের রেলিংগুলি দেখিতে পাইলাম।

আমি কর্ম্মচ্যুত হইব, স্ত্রেনীর কত না কষ্ট হইবে, এইরূপ নানা চিন্তা আমাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল! "কি দেখিতেছ, এইবার তোমরা উভয়ে কোনও সহজ কাজ গ্রহণ কর। তোমরা স্বপ্ন দেখ ছিলে।" বিদ্রূপের সহিত এই কথা বলিয়া ইন্সপেক্টর পুলের উপর পা বাড়াইল। তরঙ্গের আঘাতে তখন তাহার পদস্থিত কাষ্ঠখণ্ড সজোরে দুলিতেছিল। নিজেকে সামলাইবার জন্য ইন্সপেক্টর এরূপ সজোরে আমার স্কন্ধদেশ ধরিয়াছিল যে কয়দিন পর্য্যন্ত সেস্থানে তাহার অঙ্গুলির চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

"বিল, দেখ দেখ কি সর্ব্বনাশ" এই বলিয়া ইন্সপেক্টর চীৎকার করিয়া উঠিল। আমরা আকাশ হইতে বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মিতে সাশ্চর্য্যে দেখিলাম—পুলটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং কতক অংশ নদীর জলে ভাসিতেছে!

"ঈশ্বর বাঁচাইয়াছেন, পুলটী ভাঙ্গিয়াছে—একেবারে নদীর গর্ভে পড়িয়াছে!" এই বলিয়া ইন্সপেক্টর হাঁফাইতে লাগিল। আমরা তিনজনে তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভীষণ নদীর দিকে দেখিতে লাগিলাম—পশ্চাতে আরোহীবৃন্দ চীৎকার করিতে লাগিল, আমরা কোনও উত্তর দিলাম না।

ভীষণ তরঙ্গের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ইন্সপেক্টর বলিলেন—"আপনাদিগকে কে নিশানা দেখাইয়াছিল?—ইঁদুরের মত কলে আবদ্ধ হয়ে এতক্ষণ ত আমরা নদীগর্ভে কবরে অবস্থান কর্‌তুম্! কে নিশানা দেখালে, কে বাঁচালে?"

আমরা তিনজনে ফিরিলাম। লাইনের ধারে ধারে, গাড়ীর তলায় তলায় ইন্সপেক্টর অনুসন্ধান করিতে লাগিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল সে ভবয় ব্রিজ একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ইঞ্জিন-চালকের জন্য আজ আমরা প্রাণ পাইলাম - নইলে এতক্ষণ পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কবলে পড়িতাম কি ভীষণ!"

কতকগুলি সন্ত্রান্ত আরোহি এই কথা শুনিয়া আমার নিকট ছুটিয়া আসিল, আমার করমর্দ্দন করিল এবং আমাকে কিছু পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিল! আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—আমি ত তাহাদিগকে রক্ষা করি নাই—আমি ত ট্রেণ থামাই নাই!

আরোহীরা আসিয়া ইন্সপেক্টরের কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিল। সকলে বলিল—"আবার অন্বেষণ কর—লোকটা বোধ হয় গাড়ীতে কাটা পড়েছে।"

ইন্সপেক্টর আমাদিগকে গাড়ী ফিরাইতে হুকুম দিলেন—আমি জ্যাককে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে একাজ করেছিল?"

আমার চক্ষু নিদ্রাজড়িত ছিল। পুনরায় চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলাম—যদি সেই রক্ষাকর্ত্রীর মূর্ত্তি পুনরায় দেখিতে পাই। হঠাৎ ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারিলাম!

গাড়ীর বৃহদাকার আলোক-আধারের মধ্যে একটা পতঙ্গ ছিল। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল এবং তাহার ডানা দু'টা প্রক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছিল! আলোক-সাহায্যে এই পতঙ্গটার ছায়া বিরাটাকারে রমণী-মূর্ত্তির অনুরূপ হইয়া দূরবর্ত্তী কুয়াসার মধ্যে প্রকট হইতেছিল। এই পতঙ্গটার বাহু দুটাই উত্তোলিত ও নিক্ষিপ্ত হইয়া গাড়ী থামাইবার ইসারা করিয়াছিল! ব্যাপারটা জলজল হইয়া গেল!

কি জানি কেন কাহারও নিকট এ বিষয় আমি গল্প করিলাম না, সযত্নে পতঙ্গটী বাহির করিয়া লইলাম এবং যথা সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম! দেখিলাম আমার জেনি নাই—শান্তিতে নিদ্রামগ্না! অধর দুইটী পূর্ব্বের মত স্মিত, মৃত্যু-যন্ত্রণার বেদনাব্যঞ্জক নহে!

আমি সেই অবধি পরিব্রাজক হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে [illegible] কি রহিয়াছে এইবার [illegible] আমার [illegible] পতঙ্গটাও আমার সাথী হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

বিবাহের সম্বন্ধ।

[illegible] একরাতে ঘোর রাত্রি হ'লে ভোর
[illegible] কঠোর—
[illegible]
[illegible]
[illegible] ঘুরি'
[illegible] খুঁজি'
[illegible] সত্য [illegible]
[illegible] পণি'
বঁধুর পিছিল পথে নাহি কভু থামি
[illegible] একবার উঠি আর নামি।
হেনকালে দক্ষিণের বাতায়ন দিয়া
[illegible] পরে পড়িল খসিয়া
[illegible] এক উড়ি' মোর পাশে।
[illegible] বাতাসে
[illegible] সব দূরে
[illegible] কোথা উড়ে।
[illegible] কারে সাহানা রাগিণী
নয়নে [illegible] জাগি' বাসরী যামিনী
[illegible] আলোময়ী। [illegible]
[illegible] হরষে;
[illegible]
[illegible] ঝঙ্কারে;
[illegible]
[illegible]
[illegible]
হাসিয়া [illegible] বরে শতধারে।

তার পর ধীরে ধীরে সন্নত নয়নে
কে আসে ও আলিপনাভরা সে প্রাঙ্গণে?
পরবিণী [illegible] লাবণ্যলতিকা
[illegible] হস্তে লয়ে কুসুম মালিকা;
পায়ে [illegible] রুণু রুণু মঞ্জীর-শিঞ্জনে
[illegible] বক্ষ-তন্ত্রী সঞ্জীবনে
[illegible], দুল্য অলকে অলকে,
কুঙ্কুমের [illegible] লেখে চন্দন তিলকে
অশোক [illegible] পুষ্প ফুটাইয়া পায়
কে রমণী [illegible] দীপ সম চায়?

তা'র প[illegible] শুভদৃষ্টি—প্রাণ বিনিময়!
সাত পা[illegible]—[illegible] পাকে জড়িত হৃদয়
তা'র প[illegible] সে পরশ মনোরসায়ন
নয়নে কৌমুদী সম সে যে সম্মোহন
রোমাঞ্চে কদম্ব যষ্টি প্রস্ফুট কোরক
পুলকেতে কণ্টকিত সকল অঙ্গক;
দুরু দুরু হিয়া বাজে মধুর পেলব
আবেগে [illegible] আসে নয়ন পল্লব।

* * * *

কিন্তু এ কি! কোথা গেল পরীক্ষার পাঠ?
[illegible] সে গেল [illegible] হাট।
[illegible] আঁখি;
[illegible] বাকী?
[illegible] এ কি [illegible]
ছাড়িয়া [illegible] কি [illegible]!

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রাণের বিকাশ।

পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদীদিগের মতে একই আদি প্রাণী হইতে ক্রমশঃ প্রাণী-জগত সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, তিনটি নিয়মে এ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সন্তান পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক সন্তান কিন্তু পিতার সমস্ত গুণ পায় না। প্রত্যেকেই একটু বিভিন্ন হইতে স্বতঃ প্রবৃত্ত। তৃতীয়তঃ, বাহ্যজগতের প্রভাব। এই শেষোক্ত কারণের জন্য জীবের একটা স্বাভাবিক নির্ব্বাচনের শক্তি আছে। সেই শক্তির দ্বারা প্রাণী-জগতে এত প্রকারের বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। *

আমরা দেখিয়াছি যে জীব ও উদ্ভিদ জগতের একই নিয়ম। যেমন বিবর্ত্তনের দ্বারা ইতর শ্রেণীর জীব হইতে মানবের মত পূর্ণাবয়ব জীবের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তেমনি নিম্নশ্রেণীর সবল দেহ বিশিষ্ট উদ্ভিদ হইতে আম, কাঁটাল প্রভৃতি বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে নিম্নশ্রেণীর জীবে ও উদ্ভিদে আকার প্রকারের বিশেষ পার্থক্য নাই। এমন কি অনেক স্থলে একটা সাবয়ব প্রাণী (organism) জীব কি উদ্ভিদ সে কথা নিশ্চয়রূপে বলা কঠিন। প্রাণী-জগতে জীব ও উদ্ভিদ কিয়দ্দূর একত্র যাত্রা করিয়াছিল। তাহার পর কতকগুলি শ্রেণীতে বৃক্ষত্বের বিকাশ হইল, কতক গুলিতে জীবের লক্ষণ দেখা দিল। †

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে এক শ্রেণীর আদি প্রাণী হইতে জীব ও উদ্ভিদ উভয় জাতির উন্মেষণ হইয়াছে। সেই প্রথম প্রাণী—জীব ও উদ্ভিদের আদি পুরুষ—জীব জাতীয় কি উদ্ভিদ জাতীয় ছিল সে বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ খুব গবেষণা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের প্রথম পূর্ব্ব পুরুষ বৃক্ষ জাতীয় ছিলেন, কেহ কেহ বলেন তিনি জীব জাতীয় ছিলেন। আমরা এ প্রবন্ধে পণ্ডিতদিগের সেই কূটতর্কের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

বিলাতী জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, যে আমাদের পৃথিবীটা পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর গরম ছিল। তখন ইহাতে মাটি জন্মে নাই। ক্রমশঃ ইহার উপরটা

---

* অর্চ্চনা বৈশাখ ১৩২০ ও আষাঢ় ১৩২০।

† অর্চ্চনা ভাদ্র ১৩২০।

একটু শীতল হইয়া ইহার উপর একটা 'সর' পড়িয়া গেল। কিন্তু পৃথিবীর জঠর মধ্যে সেই তেজোময় ও উষ্ণ পদার্থ গুলা রহিয়া গেল। ক্রমশঃ যখন পৃথিবীর উপরটা বেশ শীতল হইতে লাগিল কতকটা বাষ্পও বিগলিত হইয়া জলের স্বষ্টি করিল। সেই জল পৃথিবীর শীতল দেহে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অন্তরের অগ্নি ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া পদার্থ গুলা জমিতে লাগিল। পৃথিবীর উপরের আবরণের উপর টান পড়িতে লাগিল। কতক অংশ বসিয়া গেল, কতক অংশ উঁচু হইয়া রহিল। পৃথিবীর উপরের আবরণ বসিয়া যাওয়ায় যে সকল বৃহৎ গর্ত্তের স্বষ্টি হইল—জলরাশি সেই সকল গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই সকল গর্ত্ত গুলাই অধুনা প্রশান্ত মহাসাগর, আট-লান্টিক মহাসাগর প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। আর পৃথিবীর যে সকল অংশ একটু মাথা তুলিয়া রহিল সে গুলা হিমালয়, আলপ্‌স্ প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর কতক অংশ জলে ডুবিল না। সেই গুলা এখন মহাদেশ।

যখন পৃথিবী আগুনের তাল মাত্র ছিল তখন এ স্থলে প্রাণের আবির্ভাব অসম্ভব। তাহার পর ক্রমশঃ যখন পৃথিবী শীতল হইল, ইহার উপর 'সর' পড়িল, জলের স্বষ্টি হইল, নিশ্চয় সেই সময়ই প্রথম প্রাণীর স্বষ্টি হইল। ঠিক পৃথিবীর অভিব্যক্তির কোন্ অবস্থায় প্রথম তাহার উপর প্রাণের স্বষ্টি হইল বা সে দিনটা আজ হইতে ঠিক কত কোটী বৎসর পূর্ব্বে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে না।

প্রথম প্রাণের আবির্ভাব পৃথিবীর কোন্ অংশে হইল তাহা লইয়া অবশ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে মসীযুদ্ধ হইয়াছে। ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ বাফোঁ (Buffon) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উত্তর মেরুতে (North Pole) প্রথম প্রাণের স্বষ্টি হয়। কমতে ডি সাপোরটা (Comte de Saporta) তাঁহার মতের পোষকতা করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, উত্তর মেরুতেই প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছিল। আজকাল উত্তর মেরু বরফে আবৃত, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীতল। সুতরাং পৃথিবী যখন শীতল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, যখন দক্ষিণ য়ুরোপ বা আফ্রিকা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল তখন উত্তর মেরু আধুনিক আরেবিয়া, আফ্রিকার মত গরম ছিল। তাহার দক্ষিণে আর জীবের বাস করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এরূপ যুক্তি ভিন্ন কতক চাক্ষুস প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। উত্তর মেরুর বরফের মধ্যে যে সকল লতাগুল্ম বা জীবের কঙ্কাল

পাওয়া গিয়াছে সে সকল জীব ও উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশেই জন্মিতে পারে। এইরূপ নানাপ্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া, অশেষ প্রকার আলোচনা দ্বারা তাঁহারা সপ্রমাণ করিলেন যে, উত্তর মেরুতেই আদি প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল।

অনেকে বলিতে পারেন যে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর জল হাওয়া প্রায় একই রকমের। উত্তর মেরুও যেমন শীতল দক্ষিণ মেরুও তেমনি শীতল। তবে দক্ষিণ মেরুই বা কেন আদি জীবের লীলাভূমি বলিয়া ঘোষিত হইবে না? ইহারও বিরুদ্ধে তর্ক আছে। যত জমি পৃথিবীর উত্তর দিকেই আবির্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীর গর্ত্ত গুলা দক্ষিণ দিকেই বেশী। মোট কথা পৃথিবীর "ঢাল" দক্ষিণ দিকে। যত জলের স্রোত সেই দিকে ছুটিয়াছে। এরূপ দক্ষিণ মেরুতে জীব জন্মিতে পারে না। যদি জন্মিয়া থাকে তো তাহাদের পক্ষে উজান বহিয়া মহাদেশ গুলা অধিকার করা অসম্ভব। সুতরাং দক্ষিণ মেরুর আদি প্রাণীর জন্মভূমি হইবার দাবী পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আদি প্রাণী তো উত্তর মেরুতে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু তিনি স্থলচর না জলচর ছিলেন সে বিষয় একটা মীমাংসার আবশ্যক হইল। জীব বা উদ্ভিদ উভয় জাতীয় সাবয়ব প্রাণীর পক্ষেই জল এবং উষ্ণতার আবশ্যক। তাহা না হইলে তাহারা বাঁচিতে পারে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে প্রথমে যে জাতীয় প্রাণীর সৃষ্টি হইল সে জাতীয় প্রাণী জলচর। ইহা হইতে অনেকে বলিল যে হিন্দুদিগের শাস্ত্র নির্ভুল। জগতের প্রথম অবতার মৎস্য। অবশ্য তাহার পর যে জীবের অভিব্যক্তি হইল তাহা কখনও জলে কখনও স্থলে বিরাজ করিতে পারিত। তাই হিন্দুদিগের মতে দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্ম। তাহার পর বরাহ। বরাহের পর নৃসিংহ। পশুর মত মুখ, পশুর মত বল, কিন্তু কতকটা মানবের মত চালচলন। শেষে ক্ষুদ্র বিকৃত দেহ মানবের অভিব্যক্তি। আর্য্য ঋষিগণ বামন অবতারের উল্লেখ করিয়া সে শ্রেণীর মানবের পরিচয় দিয়াছেন।

পৃথিবীর আবরণ কিয়দ্ পরিমাণে শীতল হইল। পৃথিবী ভূভাগ ও বারিধি মালায় বিভক্ত হইল। উত্তর মেরুতে প্রাণধারণের উপযুক্ত শৈত্য উপলব্ধি হইল। প্রাণহীন বাষ্প ও গ্যাস হইতে প্রাণহীন জল স্থল হইল, প্রাণহীন প্রস্তর জন্মিল, প্রাণহীন বায়ুও সৃষ্ট হইল। এতদূর অবধি ব্যাপারটা পণ্ডিতমণ্ডলী বেশ বুঝিলেন। কিন্তু সেই প্রাণহীন গ্যাসগুলা মিশিয়া কিরূপ প্রাণের সৃষ্টি করিল তাহা তাঁহারা ভাবিয়া পাইলেন না।

এই বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যার 'অর্চ্চনা'য় জীবের স্বতঃ-উৎপত্তি নামক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া অনেক আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে স্বতঃ উৎপত্তি অসম্ভব, "জীব হইতে জীবের উদ্ভব। অপ্রাণী হইতে প্রাণী সৃষ্ট হয় না।" এই সিদ্ধান্তটা পণ্ডিত-দিগকে ভ্রূকুটি করিতে লাগিল। তাঁহারা এক ভীষণ বিভীষিকা দেখিলেন। অথচ এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত আবশ্যক।

এ বিষয়ে তাঁহারা যদি হিন্দু শাস্ত্রের দ্বারে উপনীত হইতেন তাহা হইলে একটা সন্তোষজনক উত্তর পাইতেন। তাঁহারা বুঝিতেন আত্মা অবিনশ্বর, আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজিত। কোথাও আত্মার চারিদিকে মায়ার আবরণটা খুব ঘন কোথাও কম। যাহা প্রাণহীন বলিয়া ভ্রম হয় তাহারও ভিতর একটা প্রাণ আছে। প্রাণহীন হইতে প্রাণের অভিব্যক্তিতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কারণ প্রাণহীন পদার্থই নাই। মণিমালার সূত্রের মত পরম প্রাণ পরমাত্মা সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

কিন্তু এই পণ্ডিতগণ ঈশ্বর মানেন না। সমস্ত বিষয়ে প্রমাণ চাই। তাঁহারা প্রমাণ করিলেন কিরূপে অপ্রাণী হইতে প্রাণের উদ্ভব হইল। তাঁহারা মনে মনে বুঝিলেন এবং জগতকে বুঝাইলেন যে তাঁহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর অভ্রান্ত যুক্তির দ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তির ভিতরও যে সংস্কার আছে, অন্ধ বিশ্বাস আছে, অলঙ্ঘনীয় বাধা আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিলেন না। তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন তাহার প্রত্যেক হেতুর প্রমাণ আছে। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঠিক অভ্রান্ত নহে। জীব ও উদ্ভিদের দেহের অভিব্যক্তির প্রমাণ দিয়া তাঁহারা বলিতে চাহেন যে তাঁহারা ;জীব ও উদ্ভিদের প্রাণের অভিব্যক্তির প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। তাহা হইতেই সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি বুঝিতে পারা যাইবে।

চেতন ও অচেতন পদার্থের দেহের গঠন সম্বন্ধে একটা খুব সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্র বলে, দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেলে পঞ্চভূতে দেহ বিলীন হইয়া যায়। পাশ্চাত্য গবেষণার ফলে পঞ্চভূতের ঠিক স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে কতকগুলি 'এলিমেণ্টে' বা উপকরণের সংযোগ দ্বারা সমগ্র প্রত্যক্ষ জগত সৃষ্ট হইয়াছে। সেই উপকরণের সংমিশ্রণে জীব ও উদ্ভিদের দেহও নির্ম্মিত। কেবল বিভিন্ন পদার্থে সেই সকল উপকরণের ভাগের পার্থক্য আছে এবং তাহাদের সংখ্যারও বিভিন্নতা আছে। কোন পদার্থ

পাঁচটা উপাদানে গঠিত, কোন পদার্থ দুইটা উপকরণে গঠিত। জলের মধ্যে সেইরূপ দুইটা উপকরণ আছে—জলজান বা হাইড্রজেন ও অম্লজান বা অক্সিজেন। এই জলজান ও অম্লজান লক্ষ লক্ষ পদার্থে আছে। কিন্তু সে সকল পদার্থ অপর উপকরণের সহিত মিশিয়া আছে এবং বিভিন্ন মাত্রায় বর্ত্তমান আছে। ঠিক দুই ভাগ জলজান ও একভাগ অম্লজান মিশিলে তবে জলের সৃষ্টি হয়।

আবার অনেক স্থলে দেখা যায় যে একই উপকরণ একটু ঘন হইলে এক প্রকার পদার্থ সৃষ্টি করে অপর অবস্থায় অন্য রকমের পদার্থ সৃজন করে। অঙ্গারজান (Carbon) বলিয়া একপ্রকার উপকরণ আছে। এই অঙ্গারজান পৃথিবীতে তিন রকম আকার ধারণ করিয়াছে। যেখানে অঙ্গারজানের দানায় দানায় খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছে সেখানে এই অঙ্গারজানের নাম হীরক, যেখানে দানাগুলা খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে নাই, সেখানে ইহার নাম গ্রাফাইট। আমাদের লিখিবার পেনসিলের সিস্ গুলা গ্রাফাইটের, সীসার নহে। আর যেখানে কার্ব্বনের দানাগুলা খুব গাঢ় ভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে নাই সে স্থলে এই কার্ব্বন পাথুরে কয়লার আকার ধারণ করিয়াছে। এই একই পদার্থ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ঠিক কিরূপ অবস্থায় একই পদার্থ কিরূপ আকার ধারণ করে বা কোন্ পদার্থের সহিত মিলিত হয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে রাসায়ন শাস্ত্র নির্ণয় করিতে পারে নাই।

অম্লজান, জলজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারজান প্রভৃতি কতকগুলা উপকরণ পৃথিবীর মধ্যে খুব অধিক মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা চেতনের দেহ ও অচেতন উভয়বিধ পদার্থের মধ্যেই খুব বেশী রকম বিরাজিত। এ সকল উপকরণের মধ্যে অঙ্গারজান বড় মিশুক। অঙ্গারজান যত রকমে যত বেশী উপকরণের সহিত মিশিতে পারে এমন কোনও পদার্থ পারে না। জীব ও উদ্ভিদের দেহে এ পদার্থ পাওয়া যায়।

জীব ও উদ্ভিদ জগত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও আদি সৃষ্টির protoplasm। জীবের দেহও এই protoplasm বা শুক্রকীট হইতে জন্মে এবং বৃক্ষের দেহও protoplasm হইতে জন্মিয়া থাকে। এই শুক্রকীটের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীব বা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ অবয়বের সমস্ত উপকরণ বিদ্যমান। এই শুক্রকীট ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া সম্পূর্ণ জীবে পরিণত হয়।

এই প্রটোপ্লাজমকে ব্যবচ্ছেদ করিলে বুঝা যায় যে, অঙ্গারজানের সহিত

অম্লজান প্রভৃতি কতকগুলা পদার্থ মিশিয়া প্রটোপ্লাজমের সৃষ্টি হয়। এই প্রটোপ্লাজমের চতুর্দ্দিকে একটা আবরণ থাকে। তাহাকে cell (সেল) বলে। জীবদেহে তথা উদ্ভিদদেহে cellএর কেবল বৃদ্ধি হইতেছে, একটি হইতে অপর cell নির্ম্মিত হইতেছে। সমস্ত দেহটা কেবল এই cellএর সমষ্টি। সেল হইতে সেলের সৃষ্ট হইতেছে, নূতন সেল বাড়িলে পুরাতন সেল ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এ প্রণালী জীবে ও উদ্ভিদে সমান।

বলা বাহুল্য, আদি প্রাণী খুব সরল দেহ বিশিষ্ট ছিল। তাহাতে protoplasm ছিল, cell ছিল। এই protoplasm ও অপ্রাণী পদার্থকে ক্লোরাফিলের সাহায্যে নিজের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া তবে পুষ্ট হইতেছে বাড়িতেছে। কিন্তু প্রটোপ্লাজমও কার্ব্বন, অম্লজান প্রভৃতির সমষ্টি ভিন্ন কিছু নহে। তবে অম্লজান প্রভৃতি ঠিক কিরূপে মিশ্রিত হইয়া প্রটোপ্লাজম সৃষ্টি করে তাহা বিজ্ঞানের অতীত। এই সকল পদার্থ লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলী বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু প্রটোপ্লাজম নির্ম্মাণে সফলকাম হয়েন নাই।

পৃথিবীর অতি শৈশবাবস্থায় কিরূপে ঐ কয়টা পদার্থ মিশিয়া আদিজীবের প্রটোপ্লাজম সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার পর প্রটোপ্লাজম হইতে প্রটোপ্লাজম সৃষ্ট হইয়া বিচিত্র জীবে ও উদ্ভিদে—কোটী কোটী বিভিন্ন শ্রেণীতে জগতকে সুশোভিত করিয়াছে। কিন্তু সেই আদি—প্রটোপ্লাজম কিরূপে সৃষ্ট হইল, সে কথা কেহ বলিতে পারে না বা ঠিক সেই রকম করিয়া কেহ অম্লজান অঙ্গারজান প্রভৃতির মিলন ঘটাইতে পারে না।

এবার পণ্ডিতমণ্ডলী চাক্ষুস প্রমাণ ছাড়িয়া আনুমাণিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভগবানের অস্তিত্ব মানিতে গেলে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া যাঁহারা জগদীশ্বরে বিশ্বাস করিতে নাসিকা কুঞ্চন করেন তাঁহারা জড় হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অনুমান করিতে লাগিলেন। যদি আমরা সংস্কার দোষে দোষী তাহা হইলে জড়বাদীরাও সে দোষ মুক্ত হন নাই।

পাশ্চাত্য রাসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে অনেক সময় কতকগুলা উপকরণের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালাইয়া দিলে তাহারা মিশ্রিত হয়। কেবল বৈদ্যুতিক প্রবাহের সান্নিধ্য ব্যতীত কোন প্রকারে কতকগুলা পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং পৃথিবীর শৈশবে যখন বারিধি রাশির সৃষ্টি হইতেছিল, পৃথিবীর বাষ্পগুলা শীতল হইতেছিল, পৃথিবীর উপর আবরণ সৃষ্টি হইতে-

ছিল, সেই আবরণের কতক অংশ বসিয়া গিয়া মহাসাগরের বিকাশ হইতেছিল, তখন পৃথিবীতে ঝড় হইত, বজ্র হানিত, তুমুল কাণ্ড ঘটিত। সে রকম ঝড়, সে রকম দামিনীর আস্ফালন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। সেই দামিনী প্রবাহে প্রাণহীন, আত্মাহীন অম্লজান, অঙ্গারজান প্রভৃতি মিশিয়া গিয়া প্রটো-প্লাজম সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই প্রটোপ্লাজম বিকসিত হইয়া প্রাণী জগতের সৃষ্টি করিল। কিন্তু অঙ্গারজান প্রভৃতি মিশিয়া যে পাহাড় পর্ব্বত মৃত্তিকা প্রভৃতি সৃষ্টি করিল তাহারা প্রটোপ্লাজমের ভাগে মিশিল না বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রাণের বিকাশ হইল না। ভাগ্যগুণে প্রাণহীন দামিনীর ভীষণ হাস্যে, প্রাণহীন অম্লজান, প্রাণহীন অঙ্গারজান প্রভৃতি মিশিয়া প্রটোপ্লাজমের সৃষ্টি করিয়া ফেলিল, অজ্ঞান জড়ে জ্ঞানবান নরের আদিপুরুষের প্রাণ সঞ্চার করিল।

উদ্ভিদ ও জীব একত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং অকস্মাৎ যে প্রাণ সৃষ্ট হইল তাহা ইঁহাদের মতে প্রথমে উদ্ভিদ আশ্রয় করিল, না প্রথমে জীবদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সে কথা আমরা বারান্তরে বলিব।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ।—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত। মূল্য ।• আট আনা। এ গ্রন্থে 'ভূমিকা' আছে। 'ভূমিকা'র স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিয়াছেন,—"পাঠক, যদি অনায়াসে স্বামীজির মহান্ জীবন ও উপদেশের কথঞ্চিৎ পরিচয় চাও, তবে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন কর—ইহাতে তাঁহার পূর্ণাবয়ব না হউক, নিখুঁত চিত্র পাইবে।" কিন্তু গ্রন্থ পড়িয়া দেখিলে ভূমিকাকারের এ উক্তি অত্যুক্তির সমীপবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। যে কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী সাধকশ্রেষ্ঠ জনসেবায় চিরজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, যে পুরুষসিংহ পৌরুষ ও চরিত্র-বলের উন্নত ও উজ্জ্বল আদর্শে দেশবাসীর হৃদয় উন্নত ও কর্ত্তব্যপথে প্রণোদিত করিয়া গিয়াছেন, যে স্বতঃসিদ্ধ লোক-গুরু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় অজ্ঞান জনসাধারণের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন; সেই মহাপুরুষের মহান্ জীবনের 'নিখুঁত চিত্র' প্রতিফলিত হওয়াত দূরের কথা, সামান্য অংশও ইহাতে অঙ্কিত হয় নাই। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে স্বামীজির 'মহান্ উপদেশের কথঞ্চিৎ পরিচয়' আছে বটে। কিন্তু "ভারতে বিবেকানন্দ" নামক গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ পুস্তক কিছু-না, নিতান্ত চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বলিয়াই বোধ হইবে। বিবেকানন্দের জীবন—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, এই তিনের

সামঞ্জস্য বিধানের জীবন। সেই জীবন-চিত্র বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইলে, যে চিন্তাশীলতা ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রয়োজন, তাহার নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থের কুত্রাপি নাই। লেখক শুধু স্বামীজির গোটাকত মতামত উদ্ধৃত করিয়া মাঝে মাঝে বাহবা বসাইয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা বিবেকানন্দের প্রতি লেখকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু স্বামীজির চরিত্র-চিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। যাহা হউক, তবু আমরা এরূপ গ্রন্থের পক্ষপাতী। কারণ, বিবেকানন্দের ভাব-সম্পদ যত প্রকারে যত অধিক প্রচারিত হয়, দেশের পক্ষে এক্ষণে ততই মঙ্গল।

সাহিত্য-সমাচার।

সাধক —"নদীয়া সাহিত্য সম্মিলনী" হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্র। "শিশু সাধকের শুভ অন্নপ্রাশন" নামক প্রবন্ধ হইতে বুঝিলাম সাধক ছয় মাসের শিশু। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই সাধক বকেয়া পড়িয়া আশ্বিন ও কার্ত্তিকের যুগ্ম সংখ্যা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত। পাছে এই শুকদেব শিশুর জীবন চরিতটা স্মর স্মর করিয়া বিস্মৃতির গর্ভে প্রবেশ লাভ করে তজ্জন্য ইহার জীবন-চরিত অন্ততঃ চারিজন কৃতবিদ্য লেখক লিখিয়া ফেলিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয় এরূপ আশা করিয়াছেন যে সৎপথে চলিলে এই শিশুর দ্বারা পল্লীগ্রামের "স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া আসিবে, পল্লী বাসযোগ্য হইবে, ম্যালেরিয়া পলাইয়া যাইবে, প্রকৃত লোকশিক্ষা আবার প্রচলিত হইবে এবং সাহিত্যও শতভাগে বিকশিত হইবে।" বলিহারী আশা! কিন্তু সাধক অন্নপ্রাশনের ভাত খাইয়াই যেরূপ কুখাদ্য ভোজন করিয়াছে তাহাতে আমাদের ভয় হয় যে অচিরেই বাছার 'ইন্‌ফ্যাণ্টাইল লিভারে' প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়া হইবে। অপর একজন লেখক আশা করিয়াছেন যে সাধক "অতীত কালিমা নাশি", প্রীতির রেখা ফুটারে দিক সে "নবতর ভাবে"। এই শিশুর অতীতে কি কালিমা ছিল জানি না। 'দেবগ্রাম' প্রবন্ধে লেখক দেবগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন এবং তথাকার বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের নাম বেশ মোটা টাইপে তালিকাবদ্ধ করিয়াছেন। বুঝিলাম ইনি সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং একটি "কৃতবিদ্য" ও "উল্লেখযোগ্য" লোক, কারণ ইঁহার নামও বেশ মোটা অক্ষরে সেই তালিকা-ভুক্ত। তবে ইনি বড় বিনয়ী বলিয়া নিজের নাম সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন। 'তোমার আসন' এক অপূর্ব্ব কবিতা। কোনও লাইন ১৮ পদী কেহ ২২ কেহ ২৪ পদী। সাড়ে চারি পৃষ্ঠায় "শ্রীঃ—" মহাশয় ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইয়া ফেলিয়াছেন। নদীয়াবাসীরা বুঝিলেই ভাল। "নবদ্বীপের পুরাতন কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক 'নিতম্বিনী রাজ্যের একান্ত বশংবদ প্রজার ন্যায়" কিরূপে বৃন্দাবনে ঘুরিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা আছে। অলমতি বিস্তরেণ। আমরা নূতন মাসিক পত্রের পক্ষপাতী। কিন্তু নূতন মাসিক পত্রের পরিচালকবৃন্দের একটা দায়িত্ব আছে একথা তাঁহারা বিস্মৃত হইলে বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়।

আদি প্রাণ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদদিগের মতে কিরূপে জড় জগত হইতে উদ্ভিদ ও জীব জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা সে তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছি। জড়ে প্রাণ নাই অথচ জড় হইতে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছে এ কথাটা তাঁহাদের নিকট বড়ই প্রহেলিকাময় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ভারত-সমর-প্রাঙ্গণে মহারথী পার্থ যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জগদীশ্বরের সে বিশ্বরূপ দেখিতে পাইলেন না। স্থাবরে যে আত্মা থাকিতে পারে, প্রাণ যে জড়ের ভিতর দিয়া পশু পক্ষীতে আশ্রয় গ্রহণ করে, শেষে মনুষ্য-প্রাণরূপে বিকশিত হয় সে ধারণা হিন্দুশাস্ত্রের। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ ধারণা সত্যমূলক বলিয়া বিবেচনা করে না। নির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে—

স্থাবরাস্ত্রিংশল্লক্ষশ্চ জলজো নবলক্ষক:
কৃমিজা দশলক্ষশ্চ রুদ্রলক্ষশ্চ পক্ষিণঃ
পশবো বিংশলক্ষশ্চ চতুর্লক্ষশ্চ মানবাঃ
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।

অর্থাৎ ত্রিংশতি লক্ষ স্থাবর, নয় লক্ষ জলজ, দশ লক্ষ কৃমিজ, একাদশ লক্ষ পক্ষি, বিংশতি লক্ষ পশু, চতুর্লক্ষ মানব দেহে ভ্রমণ করিয়া তবে আত্মা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়।

অবশ্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদের সহিত হিন্দু শাস্ত্রের অভিব্যক্তিবাদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সে কথার আলোচনা পরে করিব। জড়ের ভিতর আত্মা আছে কি না, জড় পিণ্ডের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রতি অণুর মধ্যে প্রাণ আছে কি না সে সকল কূটতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়ের ও সাবয়ব প্রাণীর (জীব ও উদ্ভিদের) গণ্ডী স্থির করিয়া লইয়াছে। ভগবান 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান' বলিয়া প্রত্যেক অণু পরমাণুতে প্রাণ আছে—প্রত্যক্ষবাদীরা তাহা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা কতকগুলি প্রত্যক্ষ লক্ষণের উপর প্রাণী ও জড়ের পার্থক্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মতে জড়ের পাঁচটি লক্ষণ। প্রথমতঃ সরল উপাদানে জড় জগত গঠিত।

জড় জগতের কতকগুলি পদার্থ, উপকরণ (element) মাত্র। স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু, অম্লজান প্রভৃতির বস্তু উপকরণ মাত্র। ইহারা কতকগুলি উপ-করণের মিশ্রণে গঠিত নহে। জল দুইটি মাত্র উপকরণের সংযোগের ফল। দ্বিতীয়তঃ, জড় পদার্থের দেহের অবয়ব নাই। এক টুকরা পাথর ভাঙ্গিয়া চারি টুকরা করিলে পাষাণখণ্ড অঙ্গহীন হয় না। তৃতীয়তঃ, জড় পদার্থের আকৃতির কোনও স্থিরতা নাই। কোনও কোনও জড় পদার্থ দানা (crystal) বাঁধে। তাহা হইলেও তাহাদের দেহ সরল রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। চতুর্থতঃ, কোন জড় পদার্থ স্বতঃ বর্দ্ধনশীল নহে। কোন কোন পদার্থের দানা বাড়ে কিন্তু তাহা বাহিরের পদার্থের সংযোগের দ্বারা (accretion), পাহাড় বাড়ে মেদিনীর আভ্যন্তরীন উষ্ণতার জন্য। এবং পঞ্চমতঃ জড় পদার্থের জন্ম মৃত্যু নাই, শৈশব, যৌবন, জরা, বার্দ্ধক্য নাই। বাহ্য বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতে জড় পদার্থের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে বটে কিন্তু সে পরিবর্ত্তনে জীব বা উদ্ভিদের পরিবর্ত্তনের রহস্য নাই। রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা দুইটি উপকরণের মিশ্রণে তৃতীয় জড় পদার্থের জন্ম হইতে পারে কিন্তু সে জন্মে জীব ও উদ্ভিদের জন্ম-রহস্য নাই।

প্রাণী-জগত—জীব ও উদ্ভিদে বিভক্ত। প্রাণী জগত প্রথমতঃ অঙ্গারজান, জলজান, অম্লজান, যবক্ষারজান প্রভৃতি কতকগুলি উপকরণে গঠিত। প্রাণী দেহের রাসায়নিক গঠন বড় জটিল। তাহাদের শরীরে জলের মাত্রা খুব অধিক। প্রাণীর দেহ অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী এবং তাহা ধ্বংসশীল। প্রাণীদেহ আপনা আপনি ধ্বংস হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জীব ও উদ্ভিদের শরীর মাত্রেই প্রটোপ্লাজম বা প্রাণ-বীজ বর্ত্তমান থাকে। সাধারণতঃ এই প্রাণ-বীজ বর্দ্ধিত হইয়া শরীরকে সাবয়ব করে। দেহের প্রত্যেক অংশের দ্বারা দেহধারণোপযোগী এক এক প্রকারের কার্য্য সাধিত হয়। উচ্চ শ্রেণীর জীব চক্ষের দ্বারা দেখিতে পায়, কর্ণের দ্বারা শুনিতে পায়, রসনায় স্বাদ গ্রহণ করে, নাসিকায় আঘ্রাণ করে ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে। ইহা ব্যতীত শিরা, উপশিরা, প্লীহা, যকৃৎ, স্নায়ু, কোষ প্রভৃতি বিভিন্ন অবয়বে নির্দ্ধারিত বিভিন্ন কর্ত্তব্য নিহিত আছে। যে সকল জীবাণু একটি মাত্র প্রাণ বীজ দ্বারা গঠিত, যাহাদের কেবল অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিতে হয় তাহাদের মধ্যে এত রকমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না থাকিলেও তাহাদের কোন কোন শ্রেণীর পায়ের মত অবয়ব বিদ্যমান থাকে। শুধু তাহা নহে, ইহাদেরও প্রাণ বীজ একটি কোষের (cell) মধ্যে আবদ্ধ থাকে। সেই কোষের মধ্যে সংকোচক বস্তি (Contractile vesicle) থাকে, নিউক্লিয়স নামক পদার্থ

থাকে এবং যেমন ক্ষুদ্র জীবাণু তেমনি তাহার দেহে ততোধিক ক্ষুদ্র উদ্ভিদাণু উদরস্থ করিবারও স্থান থাকে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই জীবাণুকে (protozoa) দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার শরীরের রহস্য দেখিয়া বিধাতার সৃষ্টি মাধুর্য্যে চমৎকৃত হইতে হয়। তৃতীয়তঃ জীব ও উদ্ভিদেরই প্রকৃতপক্ষে বাড়িবার ক্ষমতা আছে। ইহারা আপনাদের দেহের মধ্যে বাহ্যবস্তু গ্রহণ করে, ইহাদের শরীরের ভিতর অদ্ভুত কারখানা আছে দেহের এই কারখানায় ইহারা বাহ্য বস্তুকে, যে উপাদানে দেহ নির্ম্মিত সেই পদার্থে পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এই কার্য্যকে ভোজন ও পরিপাক কার্য্য বলা হইয়া থাকে। আহার্য্য পরিপক্ক হইলে তখন প্রাণীর দেহ বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে ভিতর হইতে বাড়িবার ক্ষমতা, সামান্য সরিষার মত বীজ হইতে সুমহান্ বট বৃক্ষের মত প্রাণীতে বিকসিত হইবার সাধ্য জড়ের নাই। চতুর্থতঃ প্রাণীদেহ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একটি কোষ (cell) হইতে অপর কোষের সৃষ্টি হইতেছে, দেহের বৃদ্ধি হইতেছে হ্রাস হইতেছে। শেষে জীবনীশক্তি শুদ্ধ হইয়া, জীব ও উদ্ভিদের দেহ ধ্বংস হইয়া আপনাপন উপাদানে মিলিত হইয়া যাইতেছে। জন্ম ও মৃত্যু, শৈশব, তারুণ্য, বার্দ্ধক্য এবং সময়ে সময়ে পীড়া শরীরের ধর্ম্ম। এক প্রাণ হইতে অপর প্রাণের সৃষ্টি, একটি জীব বা উদ্ভিদের শরীর হইতে ঠিক নিজের আকৃতির অনুরূপ জীবের নির্গমন প্রাণী-জগতের এক বিষম রহস্য। বৃহৎ চ্যুত পাদপের সামান্য বীজটির ভিতর ভবিষ্যত রসালবৃক্ষের সকল শক্তি লুকায়িত আছে, সুবিধামত স্থলে প্রোথিত করিলে সেই সামান্য 'আমের আঁটি' হইতে সুমহান মহীরুহের সৃষ্টি হইতে পারে। এরূপ রহস্য জড় জগতে নাই। ধবলশির গিরিরাজের বিশাল দেহের মধ্যে এমন কোনও পদার্থ নাই যাহা স্থানান্তরিত করিলে দ্বিতীয় হিমালয়ের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু সুবিধাজনক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িলে কুম্ভীরের ক্ষুদ্র অণ্ড ফুটিয়া কৃতান্ত দূত হিংস্রক কুম্ভীরের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। সন্তানোৎপাদিকা শক্তি কেবল জীব-জগতেই নিবদ্ধ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা সর্ব্বভূতে আত্মার অস্তিত্ব না মানিলেও, প্রত্যেক পদার্থের অণু পরমাণুতে মণিমালায় সূত্রের মত পরমাত্মার অস্তিত্ব না দেখিলেও স্বীকার করেন যে প্রথম প্রাণ বা আদি প্রাণী জড় হইতে জন্মিয়াছিল। সে কথা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহাদের মতে জীব ও উদ্ভিদে কি পার্থক্য তাহাও আমরা বলিয়াছি *।

* অর্চনা, ভাদ্র ১৩২০।

এ প্রবন্ধে জড়ের সহিত জীব ও উদ্ভিদের কি পার্থক্য তাহা বর্ণনা করিলাম। সুতরাং কিরূপ জড় পদার্থ হইতে কি সৃষ্টি হইল তাহা বোধ হয় পাঠকের বোধগম্য হইবে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে সেই পঞ্চ লক্ষণযুক্ত প্রথম সৃষ্ট প্রাণী উদ্ভিদ না জীব। অর্থাৎ প্রাণের বিকাশ প্রথমে উদ্ভিদে হইয়াছিল না জীবে হইয়াছিল।

জীবাণুকে ইংরাজিতে প্রটোজোয়া বলে এবং উদ্ভিদাণুকে প্রটোফাইট (Protophyte) বলে। প্রটোজোয়া ও প্রটোফাইট উভয়কেই অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে হয়। আদি প্রাণী প্রটোজোয়া না প্রটোফাইট সে বিষয় লইয়াও বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিষম বাদানুবাদ চলিয়াছে। যেখানে শক্তি সেইখানেই যুদ্ধ। ইঁহারা প্রত্যেকে অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত, ইঁহাদের বিচারশক্তি অত্যধিক প্রবল। সুতরাং বিজ্ঞান-জগতেও একজন অপরকে বলে, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'।

'জীব ও উদ্ভিদ' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, জীব জড় পদার্থ পরিপাক করিয়া আপনার শরীর পুষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদ তাহা পারে। উদ্ভিদের শরীরের মধ্যে ক্লোরোফিল (chlorophyll) নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। শিকড়ের সাহায্যে উদ্ভিদ ভূমি হইতে নিজ শরীরে জল টানিতে পারে এবং পত্রের ভিতর দিয়া নিজদেহে বায়ু প্রবিষ্ট করিতে পারে। বায়ুতে দ্যম্লঙ্গার বিদ্যমান। ক্লোরোফিলে সূর্য্যালোক পড়িলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। দ্যম্লঙ্গার ও অম্লজান ও অঙ্গারে বিশ্লিষ্ট হয়। জলের অম্লজান উদ্ভিদদেহে প্রবিষ্ট দ্যম্লঙ্গারচ্যুত অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া যায়। তাহাতে হাইড্রোকার্ব্বন বা উদঙ্গারের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ এই উদঙ্গার নিজদেহ মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখে। উদঙ্গারের দ্বারা দেহের প্রাণকোষের পুষ্টি হয়। উদ্ভিদ উদঙ্গার নির্ম্মাণ করিতে পারে, জীবদেহ সে কার্য্য সাধিতে অপারক। তাই জীবকে উদ্ভিদ খাইতে হয় বা উদ্ভিদভোজী অপর জীব খাইতে হয়। জীবদেহে ক্লোরোফিল নাই বলিয়াই জীবকে প্রাণধারণের জন্য উদ্ভিদ জগতের উপর নির্ভর করিতে হয়।

সুতরাং গ্রাণ্ট এলেন (Grant Allen) প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মতে আদি প্রাণ উদ্ভিদে বিকশিত হইয়াছিল। ভানুকিরণের উপরই প্রাণীর দেহের পুষ্টি নির্ভর করে। ভানুকিরণ ক্লোরোফিলের উপর পড়িলেই তবে জীবনীশক্তির পরিপোষক উদঙ্গারের সৃষ্টি হয়। তাই ক্লোরোফিল না থাকিলে প্রাণ থাকিতে

পারে না। উদ্ভিদেই কেবল ক্লোরোফিল আছে, আদি প্রাণী উদ্ভিদ ছিল। প্রফেসার সাকস্ (Sacks) এ মতের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক।

কিন্তু প্রফেসার Ray Lankester দেখাইয়াছেন যে নিম্নশ্রেণীর অনেক জীবের দেহের মধ্যে ক্লোরোফিল বিদ্যমান আছে। কতকগুলি জীবাণুর দেহে, কতক শ্রেণীর স্পঞ্জ জীবের (Sponge) ভিতর তিনি ক্লোরোফিল কোষের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ব্রাণ্ডট্ (Brandt) বুঝাইয়াছেন যে সে ক্লোরোফিল কোষগুলি উপরোক্ত জীবের দেহের অংশ নয়। শরীরের মধ্যে যেমন কৃমি থাকে, আম গাছে যেমন রাস্না জন্মে, ওগুলা তেমনি পরগাছা, ঐসব ক্লোরোফিলের কোষগুলা জীবদেহে গজায় মাত্র। আবশ্যক মত ঐ সকল জীব নিজদেহের সেই ক্লোরোফিল হজম করিয়া কিছুকাল প্রাণধারণও করিতে পারে।

কিন্তু জীবতত্ত্ববিদ্ প্রফেসার রে ল্যাঙ্কাষ্টার এবং উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ প্রফেসার ডায়ার উপরোক্ত সিদ্ধান্তে আত্মবিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহারা বলেন যে ক্লোরোফিল বীজকোষের (protoplasmic cell) একটা বিকার মাত্র। ইহা বীজকোষের অভিব্যক্তির ফল। প্রথম বীজকোষ ক্লোরোফিল বিহীন ছিল। ফাঙ্গয়ড (Fungoid) নামক না-জীব না-উদ্ভিদ একপ্রকার প্রাণী আছে। ইহাঁরা বলেন যে এই ফাঙ্গয়েডের অনুরূপ কোনও পদার্থেই প্রথম প্রাণ স্পন্দিত হইয়াছিল।

রে ল্যাঙ্কাষ্টার সাহেব বলেন যে পৃথিবীর খুব আদিম অবস্থায় রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা albumenoids এর মত কতকগুলি পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। পক্ষীর ডিম্বের মধ্যে যে শ্বেতাংশ থাকে তাহা এক প্রকার আলবুমেন। সেই আলবুমেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমশঃ জীবনীশক্তি লাভ করিয়া প্রটোপ্লাজমরূপে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই আদি প্রাণীর দেহে ক্লোরোফিল বর্ত্তমান ছিল না সুতরাং ইহারা উদঙ্গার ধরিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিতে পারিত না। যে আলবুমানায়ড্ হইতে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই আলবুমেন খাইয়াই ইহারা প্রাণধারণ করিত। অবশ্য আলবুমেনে উদঙ্গার আছে। সুতরাং আদি প্রাণী উদ্ভিদ্ ছিল না জীব ছিল। Mycetozoa মাইসিটিজোয়া নামক এক প্রকার জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে। ল্যাঙ্কেষ্টার সাহেব বলেন যে আদি প্রাণীর ইহাদেরই মত আকার ছিল। তাহার পর মাইসিটোজোয়া হইতে বিবর্ত্তনের দ্বারা এক

দিক দিয়া জীব জগত ক্রমঃ-বিকসিত হইল। অপর দিক দিয়া Flagellate Protozoa নামক এক প্রকার জীবাণুর ভিতর দিয়া উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি হইল। এখন পৃথিবীতে জীব জগত পরিপোষণের জন্ত উদ্ভিদ জগতের উপর নির্ভর করিয়া আছে বটে, কিন্তু প্রথমে উদ্ভিদ জগত জীব জগত হইতে বিকসিত হইয়াছে। *

পণ্ডিতবর হাক্‌স্‌লের মত তদনুরূপ। তিনি বলেন যে পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম বিকাশের কোনও ইতিহাস নাই আর সেরূপ ইতিহাস থাকাও অসম্ভব। বিজ্ঞান-জগতে কোন বিষয় বিশেষ প্রমাণ ব্যতিরেকে বিশ্বাস করাও দোষের কথা। তবে লোকে আশা করিতে পারে—ধারণা করিতে পারে। যখন পৃথিবীর নিজের দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তখন, ধরণীতে নিশ্চয়ই অপ্রাণী জড় হইতে প্রাণের উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি বলেন প্রথমে প্রাণ খুব সরল আকৃতিতে অনুভূত হইয়াছিল। তাহাতে বর্ত্তমান ফাঙ্গয়ডের (fungi) মত আলোকের সাহায্য ব্যতীত এমনিয়ম কার্ব্বনেট, অক্সেলেট, টারট্রেট প্রভৃতি পদার্থ নির্ম্মাণের ক্ষমতা নিহিত ছিল এবং তদ্দ্বারা তাহার প্রাণধারণ হইত ও নূতন প্রটোপ্লাজমের সৃষ্টি হইত। †

বলা বাহুল্য, এ মত সমগ্র পণ্ডিত জগত গ্রাহ্য করেন নাই। পণ্ডিতবর ক্লড (Edward Clodd) বলেন যে আদি-প্রাণীর দেহে ক্লোরোফিল না থাকিলেও তাহার ভিতর ক্লোরোফিল নির্ম্মাণের শক্তি ছিল। সুতরাং আদি প্রাণী সম্ভবতঃ উদ্ভিদই ছিল।

এ বিষয়ে এখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। প্রত্যেক পণ্ডিতই আপনা-পন অভিমতের পোষকতা করিয়া থাকেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

---

* Encyclopaedia Britannica, Ninth Edition p. 832. Protozoa নামক প্রবন্ধে।

† Huxley's Critiques and Addresses p. 238.

নিয়ম মত।

(১)

প্রসন্নবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স একাদশ বৎসর, পুত্রের বয়স নয় বৎসর, কনিষ্ঠা কন্যার বয়স ৭ বৎসর। এরূপ অবস্থায় গৃহস্থ ঘরের প্রৌঢ়া গৃহিণী যে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব থাকিবেন, স্বামী গৃহে আসিলে তাঁহার "ছোট খাট সুখস্বাচ্ছন্দ্যগুলির" তত্ত্বাবধান করিতে ঘরের কার্য্য ফেলিয়া ছুটিয়া আসিবেন, সচরাচর এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু এ পক্ষে প্রসন্নবাবুর অদৃষ্ট তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পাদন করিত। সহধর্ম্মিণীর ত্রিংশতি বর্ষ বয়সেও, ফল্গু নদীর মত অন্তরে যৌবনের ভরাট ভাবটা বেশ সতেজে বহিয়া যাইত। তাই কর্ত্তার আহ্বানে বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে ফলমূলে সজ্জিত রেকাবী হাতে করিয়া গৃহিণী ধীর মন্থরগতিতে উপস্থিত হইলেন।

প্রসন্নবাবু বলিলেন "নীরু! আজ একটা বড় সুখবর আছে"। এক মুখ হাসিয়া নীরদা কহিল "তা তোমার হাসিমুখ দেখেই তা' বুঝ্‌তে পেরেছি"।

"আমাদের নগেন এখন লক্ষপতি! যা' হোক বড় আশ্চর্য্যের কথা বল্‌তে হবে, এতদিন যিনি নাম পর্য্যন্ত করতেন না, বাড়ী ঢুক্‌লে বিরক্ত হতেন, মৃত্যুর সময় যে তিনি নগেনকে উত্তরাধিকারী করে যাবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। পরিবারকে কেবল মাসহারার বন্দোবস্ত করে গেছেন। নগেনের মা যে এত অনাদর ভুলে মৃত্যুর সময়ে ভাইএর যেরূপ পরিচর্য্যা করেছিলেন তার উপযুক্ত পুরস্কার ভগবান দিয়েছেন।"

নীরদা বলিল "শুনতুম্ নগেনের মাসীমা তাঁহাকে আদৌ যত্ন করতেন না। বুঝ্‌তে পারি না স্ত্রীলোক স্বামীকে যত্ন কেমন করে না করে"।

গোঁফে চাড়া দিয়া প্রসন্নবাবু বলিলেন "আমি যদি বুড়ো হতুম আর তুমি যদি দ্বিতীয়পক্ষের পরিবার হ'তে, তা হলে বুঝ্‌তে পারতে কেমন করে স্বামীকে অনাদর কর্‌তে হয়!"

উত্তরে নীরদা অকৃতজ্ঞ স্বামীকে নয়নের দ্বারা একটু ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "সুকুমারী অসুখে পড়ে নগেনকে খাটিয়ে খাটিয়ে সার্‌লে। সকাল

থেকে একটু জ্বরও হয়েছে আজ স্কুলে একজামিনের নম্বরটা জান্‌তে পারা যাবে, কে তাকে এনে দেয়! যখন দেখ্‌লে নগেন এসেছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঘর থেকে বোনকে এই মস্ত বিপদের কথাটা জানান হচ্ছিল। বেচারী ছুটে স্কুলে গেল!"

"দেখো নীরদা! হবু জামাই এখন বড়লোক, যা তা ফরমাস করে ফেল না।" "যা' হোক এখন দু হাত এক হয়ে গেলেই বাঁচি। তুমি আর দেরি কোরোনা, বিয়েটা যাতে একটু শীগ্‌গির হয়ে যায় দেখ। তুমি মুখ হাত ধোও, সুকুমারী ঔষধ খেলে কি না একবার দেখে আসি।"

(২)

নগেন্দ্রনাথের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের পর মাতা ও পুত্রের কতকগুলি নূতন ঝঞ্ঝাট এসে উপস্থিত হলো। পূর্ব্বেকার মতন আহারাদির পর নগেনের মাতার সুকুমারীদের বাড়ী গিয়ে খোসগল্প করে অবসর সময়টুকু অতিবাহিত করা, আর নগেন্দ্রের কলেজের পড়া করা, সুকুমারীদের বাটীর ছোট খাট তত্ত্বাবধান করা মাত্র কার্য্য রহিল না। বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুদিগের ঘন ঘন সমাগম হইতে লাগিল। নানাস্থানে ধারাবাহিক নিমন্ত্রণে তাহাদিগকে বিব্রত ও আনন্দিত করিয়া তুলিতে লাগিল। একদিন নগেন্দ্র হক্‌ সাহেবের বাজার থেকে সুকুমারীর ফরমাস মত কতকগুলি উল কিনে নিয়ে এসে দেখিল তার টেবিলের উপর একখানি পত্র রয়েছে। পত্রখানি পাড়ার প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার রায় বাহাদুর রামকমলবাবুর স্বহস্ত লিখিত। তিনি লিখিয়াছেন:—

প্রিয় নগেন!

নানা প্রকার কার্য্যে বিব্রত থাকায় তোমাদের সংবাদাদি নিতে পারি নাই আশা করি তোমরা আমার এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে। তুমি আমাদের কত আপনার তাহা জান না! বোধ হয় তোমার স্মরণ থাকিতে পারে তোমার বাবা আমাদের বাটীতে যে দিন না আসিতেন সে দিনটা যেন আমাদের অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। বলিতে কি গৃহিণী তোমাকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিয়া থাকেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা যে তুমি অদ্য রাত্রে এখানে আহারাদি কর। আশা করি, তুমি তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরামকমল রায়।

বিষয় প্রাপ্তিরূপ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের ফলে যে এই আপ্যায়ন এ কথা নগেন্দ্রনাথ বুঝিল তথাপি রায়বাহাদুর রামকমলবাবুর ন্যায় লোকের স্বহস্ত লিখিত এইরূপ পত্রপ্রাপ্তে সে অতিরিক্ত আনন্দিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার সাজসজ্জায় আপনাকে নিয়োজিত করিল। সুকুমারীর জন্য আনীত উলগুলি টেবিলের উপর পড়িয়া রহিল। নূতন ভাবের উন্মাদনায় নগেন্দ্রনাথ ভুলিয়া গেল যে সুকুমারী তাহাকে বলিয়াছিল আজ উলগুলি না পাইলে রাত্রে বাকি বোনাটুকু শেষ করিয়া প্রাইজে দিবার জন্য মোজা জোড়াটী স্কুলে দিতে পারিবে না।

যাহা হউক নগেন্দ্রনাথ নিয়ম-বহির্ভূত কাজ কিছুই করে নাই, বড়লোকে যে ওজন বুঝিয়া ভালবাসা ও যত্ন দিয়া থাকে এ কথা বুঝিয়াও সংসারে কয়জন তাহাদের আপ্যায়নে আনন্দিত ও মোহিত না হয়।

(৩)

রামকমলবাবুর মর্ম্মর-নির্ম্মিত গৃহতলে সুন্দর আসনোপরি নগেন্দ্র আহার করিতেছিল। গৃহিণী পুত্রাধিক যত্নের সহিত তাহার ভোজনের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তাঁহার "গঙ্গাজল" অর্থাৎ নগেনের মাতার সহিত তাহার ছেলেবেলার কত খেলার গল্প করিতেছিলেন। তাঁহার আদর ও আপ্যায়নের মধ্যে নগেন্দ্র অনুভব করিল এ সংসার যেন তাহাদের কত আপনার তবে কেন যে এতদিন এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে ছিল বর্ত্তমান উপভোগ করিতে করিতে নগেন্দ্রের সে চিন্তা করিবার অবসর বা প্রবৃত্তি হয় নাই। বামুন ঠাকুরুণকে ঘন ঘন আহ্বান, "এটা খাও, ওটা খাও" প্রভৃতি নানারূপ ব্যতিব্যস্তের পর নগেন্দ্রের যখন আহার শেষ হইল তখন গৃহিণী ডাকিলেন "সুধা!" সুধা রেকাবীতে পান আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইল। গৃহিণী বলিলেন "নগেনবাবুকে প্রণাম করিয়া পান দাও তো মা!"

নগেন্দ্র প্রণাম করিতে আনতা কিশোরীকে দেখিল এবং কোনরূপ সম্ভাষণ করা উচিত বিবেচনা করিয়াও কি বলিবে স্থির করিতে পারিল না। গৃহিণী সেই সময় নগেন্দ্রকে হাসিয়া বলিলেন "বাছা! তোমাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে। উঁহাকে তো অনেকদিন ধরিয়া বলিয়া কহিয়া পারিলাম না। ছুটি হইলে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ-আহ্লাদে বেহুঁস থাকেন। সুধা একবার আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিবার জন্য অনেক দিন ধরিয়া বলিতেছে, উহাকে লইয়া শুক্রবার তোমাকে একবার যাইতে হইবে।" তাহার আবদারের কথা নগেন্দ্রকে বলিতে শুনিয়া সুধা লজ্জাবনতা হইয়া রহিল। নগেন্দ্রের বাটী

ফিরিবার সময় গৃহিণী তাহাকে অনেক করিয়া বলিয়াছিলেন "পরশু সুধার ব্রত-উদ্যাপনে কয়েকটী ব্রাহ্মণ খাওয়ান হইবে গঙ্গাজল যেন একবার আসেন। তিনি না আসিলে তাঁহার কার্য্য আদৌ সুসম্পন্ন হইবে না।"

(৪)

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে নগেন্দ্রের মনে অনেক কথার আন্দোলন চলিতেছিল। রামকমলবাবুর সংসারের সহিত তাহার এই অভিনব আত্মীয়তা যেন একটা নূতন রকম ভাবিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়া দিয়াছিল। নগেন্দ্র ভাবিতেছিল গৃহিণীর এই স্নেহ ও আত্মীয়তা কত মধুর আর সুধা মেয়েটী কি সুন্দর! অবশ্য প্রসন্নবাবুর কন্যা সুকুমারীর গৌরবর্ণ, সুগঠিত নাসিকা ও আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু সমালোচনা হিসাবে সুধার অপেক্ষা সুন্দর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই পরন্তু সুধার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে ও লজ্জানম্র স্নিগ্ধ মধুর মুখশ্রীতে যে রমণীয়তা তাহা সুকুমারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুধাকে কোনরূপ সম্ভাষণ করিতে না পারায় নগেন্দ্র মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়াছিল সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল সুধাকে শুক্রবার জুগার্ডেন দেখাইতে লইয়া যাইবার সময় সে এই ত্রুটী যেমন করিয়াই হউক সংশোধন করিয়া লইবে।

প্রত্যাগমন-পথে বহির্গৃহে উপবিষ্ট প্রসন্নবাবু নগেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া সে কোথায় গিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। নগেন্দ্র রামকমলবাবুর বাটী নিমন্ত্রণের কথা বলিল। এই সংবাদে প্রসন্নবাবু মনে করিলেন এখন নগেন্দ্রের সময় ভাল হইয়াছে আত্মীয় বন্ধু ও কুটুম্ব তো অনেক প্রকার হইবেই। তাহাদের দুর্দ্দিন সময় যে তিনিই একমাত্র তাহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুভাবে ছিলেন এবং ইদানীন্তন স্বজনবর্গের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার মূলে যে একটা বিশেষত্ব আছে একথাও তিনি ইহার সহিত ভাবিয়া লইয়াছিলেন।

সুকুমারীর উলের কথাগুলি মনে পড়াতে নগেন্দ্রনাথ এখন আর প্রসন্নবাবুর বাটীর ভিতর যাইল না। পরদিন প্রাতে উলগুলি লইয়া আসিবে স্থির করিল।

(৫)

ব্রত-উদ্যাপনের দিন সুধার মাতা "গঙ্গাজলকে" আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটী করেন নাই এবং আয়ত্তাধীনা করিতে অসমর্থা হন নাই। অবশ্য ইহার যথেষ্ট কারণ ছিল একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুত্রবধূর জড়োয়া গহনার সুট, রামকমল বাবুর ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির সহিত

আত্মীয়তা, তদুপরি গৃহিণীর প্রমুখাৎ নগেন্দ্রের তত্ত্বাবধানের ভার কর্ত্তার উপর এই প্রতিশ্রুতি প্রভৃতির প্রলোভন তো তুচ্ছ নহে। এ সমস্ত ক্ষয় করিয়া পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতির সম্মান রাখা সাধারণ চরিত্রের পক্ষে সম্ভবপর নহে। নগেন্দ্রের মাতা ভাবিলেন তিনি সুকুমারীর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহদানে বাগ্দত্তা সত্য বটে কিন্তু এ পক্ষে নগেন্দ্রের এতটা শুভই বা তিনি কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারেন। উপস্থিত ভগবানের কৃপায় নগেন্দ্রের বিষয় সম্পত্তি হইয়াছে। এ সমুদায়ের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা তো অগ্রেই করিতে হইবে। প্রসন্নবাবু চাকুরে লোক তাহার বিষয় বুদ্ধি আদৌ নাই বলিলেই হয়। রামকমলবাবুর বৈষয়িক বুদ্ধির কথা তিনি বরাবর শুনিয়া আসিতেছেন এ স্থলে এ সুবিধা তো কোনমতেই পরিত্যাগ করা সঙ্গত নয়। এই প্রকার শত যুক্তি আনয়ন করিলেও কার্য্যটা যে অন্যায় হইতেছে এ কথা তাহার মন এক একবার স্বীকার করিয়া ফেলিতেছিল। যাহা হউক অবশেষে তিনি একরকম স্থির করিলেন বিবাহ ঈশ্বরাধীন কার্য্য, ইহাতে আর মানুষের হাত নাই। কত বিবাহ তো "হাতে সূতা বাঁধিয়া" হইতেছে না। অবশেষে প্রসন্নবাবুকে এই কথা কেমন করিয়া জ্ঞাপন করা যায় ভাবিতে ভাবিতে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(৬)

নগেন্দ্রনাথ যখন সুধাকে "জুগার্ডেন" দেখাইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার জীবনে এক মস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। তাহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল প্রণয়ের প্রকৃত আস্বাদ সে এখন পাইয়াছে সে উন্মাদনায় সুকুমারী প্রসন্নবাবুর সংসার, এত দিনের ঘনিষ্ঠতা, সমস্তই ভাসিয়া গেল। সুধাকে না পাইলে যে তাহার জীবন বৃথা ইহাই মাতাকে আজ জানাইতে হইবে নগেন্দ্রনাথ স্থির সঙ্কল্প করিল। হায় প্রসন্নকুমার! তুমি এতদিন ধরিয়া যে আশালতা রোপন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছ তাহা যে সমূলে উৎপাটিত হইতে চলিয়াছে তাহা জানিতে পারিতেছ না। সত্য বটে একমাত্র তুমিই দুঃখের দিনে নগেন্দ্রনাথকে আপনার করিয়াছিলে, তাহার সম্পত্তি দেখিয়া তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ কর নাই তত্রাপি তুমি পরাজিত হইবে তোমাকেই দূরে যাইতে হইবে ইহাই জগতের নিয়ম। এখন এ সত্যের কঠোরতা তোমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

(৭)

সুধার সহিত নগেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আত্মীয়-স্বজনে তাহার বাটী পূর্ণ। যাহাদের নগেন্দ্র কখনও দেখে নাই শ্রবণে জানিত মাত্র তাহারাও আসিয়া আজ মহা উৎসাহে শুভকার্য্যে মাতিয়াছে। আত্মীয়ের দ্বারা নগেন্দ্রের মাতা প্রসন্নবাবুকে যথাবিহিত নিমন্ত্রণাদি করিয়াছিলেন বটে কিন্তু প্রসন্নবাবু আসিতে পারেন নাই। প্রত্যুষে সুমধুর নহবৎ নগেন্দ্রের বাটীর শুভকার্য্য বিঘোষিত করিতেছিল প্রসন্নবাবুর বাটী হইতে তাহা সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছিল। নিদ্রাভঙ্গে প্রসন্নবাবুর বদনমণ্ডলে একটী অন্তঃযাতনার ভাব প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছিল। আজ তিনি আর আপনাকে সংযত করিতে পারিতেছিলেন না যাতনারুদ্ধকণ্ঠে গৃহিণীকে বলিলেন "নীরু ও মেয়েটার আর পূর্ব্ব হইতে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিব না; উঃ এ যে বড় কষ্ট!"

বিষণ্ণমুখী নীরদা সান্ত্বনার স্বরে স্বামীকে বলিল "তুমি কেন এত দুঃখ কচ্ছ? বিবাহ ঈশ্বরাধীন কার্য্য ইহাতে কাহারও হাত নাই। সুকুমারীর যদি অদৃষ্টে থাকে তবে আবার এম্নি গুণবান ধনবান পাত্রে পড়্‌বে তার জন্যে মিছা ভেবে কি ফল?" দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রসন্নবাবু বলিলেন "তুমি ভুল কচ্চো—আমি ধনের জন্য দুঃখ করিনি, গুণের জন্যও দুঃখ করিনি আর বিবাহের জন্যও দুঃখ করিনি। নগেনকে এতকাল ধরে বড় আপনার করেছিলাম এখন হতে পর ভাব্‌তে হ'বে এ যে বড় কষ্ট নীরদা!" পার্শ্বের গৃহের নহবতের বাজনা শুনিয়া সুকুমারীর ছোট বোন অমলা বলিয়া উঠিল "দিদি! নগেন দাদাদের বাটী কেমন বাজনা বাজছে আমায় কাপড় পড়িয়ে দাও আমি শীগ্‌গির যাই।" সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া বলিল—"ছি বোন! আমাদের যেতে নেই আমি তোকে পুতুলের কত কাপড় দিচ্ছি লক্ষ্মী বোনটী আমার এইখানে বসে খেলা কর।" সুকুমারীর মুখমণ্ডলেও যেন একটী বিষাদের ভাব দেখা যাইতেছিল। এই একাদশবর্ষীয়া সুকুমারীর অন্তরেও কি একটা আপন ও পরের রেখা পড়িয়াছিল? কে জানে!

শ্রীউমাচরণ ধর।

রাজগৃহ।

রাজগৃহের উৎপত্তি।—প্রাচীন মগধরাজ্যের রাজধানী রাজগৃহের নামান্তর রাজগীর। এই রাজগৃহ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল এবং এই স্থানেই বসুবংশ হইতে বিম্বিসার পর্য্যন্ত যাবতীয় ক্ষত্রিয় রাজগণ প্রাচীন ভারত শাসন করিতেন। গঙ্গা ও শোননদীর সঙ্গমস্থলে কুসাত্মজ এই নগর সর্ব্বপ্রথমে স্থাপন করেন, মহাগোবিন্দ এই নগরের নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শন করেন। গিরিব্রজ ও কুশগড়পুর রাজগৃহের অপর দুই নাম। কথিত আছে, প্রচুর পরিমাণে কুশ ঘাসের উৎপত্তি হয় বলিয়া মগধের প্রাচীন রাজধানীর নাম 'কুশ-গড়পুর' হইয়াছে। প্রাচীন রাজগৃহ পাঁচটি পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত ছিল বলিয়া "গিরিব্রজ" নাম যেন ইহার পক্ষে উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু গিরিব্রজ হইতে বৈভর ও বিপুল পর্ব্বতের উত্তর এবং সরস্বতী নদীর পূর্ব্বস্থিত রাজগীরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তদবধি গিরিব্রজ মগধের রাজধানীত্ব-গৌরবে বঞ্চিত হয়। এই রাজগীর ৫৬০ খৃঃ পূঃ অব্দে বিম্বিসার কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হয়। তখন রাজগীর দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তিন মাইলেরও অনধিক আয়তন ছিল, আর ইহাই ধনৈশ্বর্য্যও অপরিমেয় হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ অশোক ব্রাহ্মণগণকে এই সমূহ দান করেন এবং পাটলিপুত্রে নিজের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ৬৩৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজগীর ব্রাহ্মণ প্রধান নগর ছিল, বলা বাহুল্য এখনও সেখানে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য বিদ্যমান। কথিত আছে, প্রাচীনকালে মহারাজ অশোক রাজগৃহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি ৭৫০ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে মহারাজ অশোক কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ রাজগৃহের শাসনাধিকার প্রদান করেন।

মহাভারতে রাজগৃহ।—মহাভারতে রাজগৃহের বর্ণনা আছে। বসুদেব রাজগৃহের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—"হে পার্থ! সর্ব্বসৌন্দর্য্যমণ্ডিত, নানাজাতীয় বিহঙ্গম-পশ্বাদি পরিসঙ্কুলিত, বিচিত্রবর্ণের পাদপরাজি সমাবেষ্টিত, অম্বুরম্ভ সলিল সিঞ্চিত, মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যমালা পরিশোভিত, মগধের প্রাচীন

রাজধানী দর্শন কর। ঐ দেখ, বিহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্য পর্ব্বত শ্রেণী কেমন পরস্পর পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া গিরিব্রজ রক্ষা করিতেছে। হে অর্জ্জুন। এই গিরিব্রজেই অঙ্গ ও বঙ্গের মহাপরাক্রমশালী রাজন্যবর্গ আসিয়া গৌতামাবাসে আনন্দে দিনাতিপাত করিতেন। হে পার্থ! ঐ দেখ, গৌতামাবাসের নিকটে নয়নরঞ্জন বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান রহিয়াছে।”

বৈশাম্পায়ন রাজগৃহের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—“কৃষ্ণ ও পাণ্ডববংশীয় ভ্রাতৃগণ এইরূপ বলিতে বলিতে মগধরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মগধ হইতে তাঁহারা সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন অধিবাসী সেবিত, সদা আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত গিরিব্রজাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। হে ভারত! সেই ভ্রাতৃগণ জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করণাভিলাষে স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে নিরস্ত্রভাবে গিরিব্রজ সহরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা নানাবিধ ভক্ষ্য পদার্থ-সুসজ্জিত বিপণি সকল দর্শন করিয়া বিপুল আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন এই প্রকারে নয়নের তৃপ্তিকর পদার্থপুঞ্জ দর্শন করিতে করিতে রাজপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন।”

২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে রাজগৃহ অম্বর-চুম্বি রাজপ্রাসাদাবলী সমাচ্ছন্ন, আনন্দ-রবে মুখরিত মহানগরী ছিল, অধুনা তাহা পরিত্যক্ত বিজন মহাশ্মশান!

৪০০ খৃঃ অব্দে চীন-পরিব্রাজক ফাহিয়ান রাজগৃহ দর্শন করেন। সে সময়ে তিনি রাজগৃহের প্রাসাদ ও দুর্গের কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি রাজগৃহ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—“প্রাকারের ন্যায় পাঁচটী পর্ব্বত সহরটীকে বেষ্টন করিয়াছে। এই সহর সম্রাট বিম্বিসারের প্রাচীন রাজধানী। এই খানেই সরিপুত্র ও মাধ্যায়নের সহিত অশ্বজিতের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাত হয়। এই খানেই নিগ্রন্থ বুদ্ধদেবের খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়াছিলেন। এই খানেই অজাতশত্রু একটি হস্তীকে মদান্ধ করিয়া বুদ্ধদেবকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সহরের উত্তরে বৈদ্য জীবক, অম্বপালী উদ্যানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধদেব ও তদীয় ১২৫০ শিষ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এখন সমস্তই নির্জ্জন—অধিবাসীবিহীন!”

এই সহর হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের নিকট পবিত্র। এই সহরে এক এক সময়ে এক এক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। নিম্নে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

জৈন-প্রাধান্য।—তীর্থঙ্করের পরমভক্ত বিম্বিসারের সময়ে রাজগৃহে জৈন-প্রাধান্যের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হয়। এইখানে মহাবীরের অভ্যুদয় হওয়ায় জৈনদিগের নিকট এই স্থান অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। পার্শ্বনাথ মূর্ত্তির পদতলে বক্র খোদিতাংশ হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজগৃহে জৈন-প্রাধান্য বিশেষভাবে ছিল। অবশেষে ব্রাহ্মণ্য-শক্তির অভ্যুত্থান ও মুসলমানের নিষ্পীড়ন নিবন্ধন জৈনেরা রাজগৃহ হইতে অন্তর্হিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজগৃহে জৈন-প্রাধান্য আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পরে যখন মুসলমানেরা তাহাদের শক্তি হারাইল তখন আবার দলে দলে জৈন আসিয়া রাজগৃহে বাস করিতে লাগিল এবং মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

বৌদ্ধ-প্রাধান্য।—জৈন-প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গেই রাজগৃহে বৌদ্ধ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। রাজা বিম্বিসার ও সন্নিকটবর্ত্তী অধিবাসীবর্গ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ-মানসে প্রায়ই বৈভব পর্ব্বতোপরি সমাসীন বুদ্ধদেবের দর্শন-লাভ করিতেন। সম্রাট্ অশোক ব্রাহ্মণগণকে প্রাচীন রাজগৃহ প্রদান করায়, কিছু দিন যাবৎ তথায় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রবল থাকে; কিন্তু সম্রাট্ অশোক স্বয়ং যখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন তখন ব্রাহ্মণ্য-প্রাদুর্ভাব বিলুপ্ত হয়। কয়েক শতাব্দী পরে সুঙ্গ ও মিত্রবংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। এই সময় হইতে বৌদ্ধ মন্দিরাদি ভূমিশায়ী হয় এবং হিন্দুতীর্থ সমূহে রাজগৃহ প্রপূরিত হয়। পরে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবার ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য লোপ হয় ও বৌদ্ধ-প্রাধান্য প্রবল হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজগৃহে কোন দেবালয় দৃষ্টিগোচর হইত না। ৬০০ শত খৃষ্টাব্দে কনৌজে যশোবর্ম্মা ও গৌড়ে আদিশূরের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণেরা আপন প্রভুত্ব পুনঃপ্রাপ্ত হন। * বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণ তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের সহিত মৈত্র্য ব্যবহার করায় দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি রাজগৃহে বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে হিন্দুদের পবিত্র স্থান ও দেবদেবী বৌদ্ধ ও জৈনদের নিকট পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল এবং হিন্দুরাও বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরাদি শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

---

* বিশ্বকোষে এই মত দৃষ্ট হয়। কোনও ইতিহাসে একথা দেখিতে পাওয়া যায় না। —লেখক।

মুসলমান-প্রাধান্য :—মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজী কর্তৃক বেহার বিজয়ের পর রাজগৃহের স্বাস্থ্যোন্নতিকর জলবায়ু ও নৈসর্গিক শোভা সৌন্দর্য্যের জন্য অনেক মুসলমান রাজগৃহে বাস করিতে আগমন করেন। এই সমস্ত মুসলমানদিগের মধ্যে পীর মক্‌দাম শাহ্ ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ডে বাস করিতেন এবং তিনি অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্তির জন্য তত্রত্য সর্ব্বসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভাজন ছিলেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ড বিপুলা পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত ছিল এবং পীর মুক্‌দাম শাহের নামানুসারে ইহার নাম "মুক্‌দাম্ কুণ্ড" হয়। মুক্‌দাম অধুনা মুসলমানদের নিকট একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। অনেক বৌদ্ধ-বিহার মুসলমান কবরের দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছে।

বৈভর, বিপুলগিরি, রত্নগিরি, উদয়গিরি এবং সোণাগিরি এই পাঁচটী পর্ব্বত দ্বারা গিরিব্রজ পরিবেষ্টিত। বৈভর পর্ব্বতে সত্তপাণি গহ্বর অবস্থিত। এই গহ্বরের সম্মুখে ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধ-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই সম্মিলনে বিনয় ও অভিধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। এই গহ্বরের ঠিক্ অবস্থিতি স্থান কোথায় তাহা লইয়া এযাবৎ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে। ক্যানিংহাম সাহেব এই গহ্বরের সোণাভাণ্ডার বা স্বর্ণভাণ্ডার নাম দিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন সত্তপাণি ও সোণাভাণ্ডার একই গহ্বর নহে, দুইটি স্বতন্ত্র গহ্বর। এই সোণাভাণ্ডার গহ্বরে বুদ্ধদেব তদীয় মাধ্যাহ্নিক ভোজনের পর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এই স্থান স্বচক্ষে দর্শন না করিলে ইহার সম্বন্ধে কোনই স্থির মত প্রকাশ করিতে পারা যায় না। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা এস্থলে বিশেষ প্রয়োজন।

ফাহিয়ান ৪০০ শত খৃষ্টাব্দে এই দেশ দর্শন করেন। তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"দক্ষিণদিগের পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কিছুদূরে পিপ্পলো নামে একটি গহ্বর আছে। বুদ্ধদেব এই গহ্বরে মাধ্যাহ্নিক ভোজনের পর ধ্যানস্থ হইতেন। এই গহ্বরের আরও কিছু পশ্চিমে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত গহ্বর আছে।

হুয়েন সাং ৬০২ খৃঃ অব্দে ভারত-ভ্রমণ করেন। তিনি সত্তপাণিকে একটি প্রস্তর বাটিকা (Stone house) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বেগ্‌লর বলেন যে সত্তপাণি বৌদ্ধ গহ্বর নহে।

সপ্তপাণি গহ্বরের ৪৫০০ ফিট্ দূরে, বৈভর পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্বাংশে জরাসন্ধের বৈঠক অবস্থিত ছিল।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পূর্ব্বে সপ্তপাণি গহ্বর "ন্যগ্রোধ" বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইহাতেই বুঝা যায় নিশ্চয়ই এখানে একটি না একটি বটবৃক্ষ ছিল।

কালের পরিবর্ত্তন-প্রভাবে এখন আর সে রাজগৃহ নাই; অতীত স্মৃতিরাশি বুকে ধারণ করিয়া আজ অশ্রুনীরে ভাসিতেছে। *

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

জমীর মালিক।

(১)

অগ্রহায়ণ মাস হিমার্দ্র শীতের প্রথম স্পর্শে ধরণী কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির বিশাল বক্ষে মুমূর্ষুর মৃত্যুর মত, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিরা-উপশিরা কেমন এক জড়তাময় সঙ্কুচিত ভাবে ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিতেছে!

আজিকার প্রভাত জননীর সেই সুখচ্ছায়াতেই যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। এমাম মণ্ডলের ক্ষুদ্র কুটীরখানির ভাঙা মট্‌কা দিয়া শীতের সূর্য্যালোক তার স্ত্রী সুন্দরী জেলেখার রোগ-পাণ্ডু যন্ত্রণাশীর্ণ মুখখানির উপর পড়িয়া ঝিল্ ঝিল্ করিতেছে! আলোক-স্পর্শে এমামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে বুঝিয়া গাত্রের ছিন্নকন্থার প্রান্তখানি জেলেখার গায়ে চাপাইয়া দিয়া সে উঠিয়া পড়িল। প্রভাতের অমল সূর্য্যালোক জেলেখার বদনমণ্ডল কি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে!—কিন্তু এমাম বুঝিল ইহা অপেক্ষা কঠিন শুভ্র পদার্থ-খণ্ড না হইলে এমন করিয়া জেলেখাকে সে আর একটী দিনও বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। তাড়াতাড়ি গৃহের বাহির হইয়া মুখে চোখে জল দিয়া এমাম বাগানের দিকে চলিয়া গেল—জেলেখা তখনও ঘুমাইতেছিল!

(২)

স্বল্প ভূমির উপর গোটা কয়েক খেজুর গাছ এমামের হতাশ জীবনে মৃদু আশা-ধারার ন্যায়, মাটীর ভাঁড় গুলায় কিঞ্চিৎ রস ঢালিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

---

* ১৯০৭ সালের Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত Rajagriha নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

এমাম ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলা ঢালিয়া লইয়া একটা উনান জালিয়া গুড় চড়াইয়া দিল। আগের দিন সে একটা ভাঁড়ের প্রায় অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয়া গুড় তুলিয়াছে, অদ্য সেই টুকু পূর্ণ করিয়া দিলে তবে তার পূর্ব্বদিনের খরিদ্দার এখনি তার হাতে টাকা দুইটী দিয়া গুড় লইয়া যাইবে। তাহা হইতেই সে ডাক্তারের ভিজিট এবং ঔষধ ও পথ্য-খরচ করিয়া জেলেখাকে বাঁচাইবার উপায় পাইবে।

এমাম নিষ্পাপ চরিত্রের আত্মনির্ভরযুক্ত বলিষ্ঠ যুবক। বৎসরের মধ্যে প্রায় একটা দিনও সে বিনা পরিশ্রমে কাটায় না এবং জেলেখাও বুদ্ধিমতী, স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে স্নেহময়ী গৃহিণী। তথাপি তাহাদের অর্থকষ্ট একদিনের জন্যও কমে নাই! লোকে বলিত—"এমামটা লক্ষ্মীছাড়া, চালে খড় নেই, পেটে ভাত নেই—আছে কেবল এক সুন্দরী স্ত্রী!" কিন্তু তাহারা জানিত না যে এই সুপ্রসন্না সুন্দরী স্ত্রীতেই তার জগতের, তার জীবনের, তার সংসারের আর সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিত।

এমামের গুড় তোলা হইয়া গেল, খরিদ্দার আসিয়া তার সম্মুখে টাকা দুইটী রাখিয়া তামাক খাইতে বসিয়াছে। এমাম সতৃষ্ণ নয়নে টাকা দুইটীর পানে চাহিতে চাহিতে বাগানের কার্য্য শেষ করিয়া লইতেছে—তার অন্তরে আজ অসীম বল, জীবন-সমুদ্রে তাহাকে এখনি সাঁতার দিতে হইবে!

সহসা তার জমিদার স্বয়ং আসিয়া তাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এমাম! "ওই নূতন গুড়খানা খাজনার বাবদ আমায় দে, আজ আমার মেয়ের বিয়ে!" ক্ষণিক এমামের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না কারণ সে অত্যন্ত গরীব বলিয়া তার জমিদার অনেকটা সুলভ করিয়া তার খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তাহাকেও তাঁর কাচে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ও বাধ্য থাকিতে হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে যখন সম্পূর্ণ বুঝিয়া লইল আজ ওই টাকা দুইটীর উপর জেলেখার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, চিকিৎসা করাইতে আর একটা দিনও নষ্ট করিলে জেলেখা বাঁচিবে না, তখন সে বেশ পরিষ্কার কণ্ঠে অতি কাতর অনুনয়ে তাঁহাকে নিজের অবস্থা বুঝাইয়া বলিল। আজিকার গুড়খানি কিম্বা তার মূল্য জমীদারের কাছে ভিক্ষাস্বরূপ চাহিল।

"ওরে আমার মেয়ের বিয়েতে বড় খরচ হয়ে যাচ্ছে, তুই আর একখানা গুড় করিয়া বেচে নে" জমিদার স্থিরহাস্য ও দৃঢ়স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—তাঁর ইঙ্গিতে ভৃত্যও তাঁর পিছনে পিছনে গুড় লইয়া চলিয়া গেল। তামাক বন্ধ দিয়া খরিদ্দারও সঙ্গে সঙ্গে টাকা দুইটী তুলিয়া লইয়া

নীরব বিষন্ন মুখে প্রস্থান করিল। এমাম দুই হস্তে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল, তার সর্ব্বাঙ্গে এমন এক অবসন্নতা আসিল যে,—বহু চেষ্টা সত্বেও, জেলেখার উপস্থিত অবস্থা স্মরণ করিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিলেও—সে নিজেকে এক আঙ্গুল সরাইয়া বাড়ীর দিকে যাইতে সাহস করিতে পারিল না। যখন পারিল, তখন বেলা অপরাহ্ন এবং ধরণী ভয়ানক নিরুদ্যম এবং কঠোর।

(৩)

এমাম ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল, জেলেখা তখনও ঘুমাইতেছে! কাছে আসিয়া দেখিল জেলেখা ঘুমাইতেছে, বড় ঘুম গভীর ঘুম, চির অজাগ্রত ঘুম! সে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল! উন্মত্তের মত জেলেখার মৃত অঙ্গের উপর আছড়াইয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল; কাছেই শূন্য জল পাত্র পড়িয়াছিল, জেলেখার মৃত অসার হস্তখানি সেই দিকে প্রসারিত! তার চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইবার মত হইল। অনুশোচনায় সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ঔষধ-পথ্য ত দূরের কথা, তার শেষ তৃষ্ণ-জিহ্বায় এক বিন্দু জলও সে দিতে পারিল না! উঃ কি ভীষণ ভুল! হা খোদা! এমন ভীষণ ভুল করিয়া কি মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে? জীবনের সমস্ত সঙ্গী হারাইয়া একমাত্র এই ভুলকে সঙ্গী করিয়া? অপরাহ্ন ধীরে ধীরে তমসাময়ী প্রদোষের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল; তার প্রান্ত নিঃশ্বাসে এমামের বক্ষ পিঞ্জরে কিসের একটা দুরন্ত কল্পনা জাগিয়া উঠিয়া ঝট্‌পট্ করিতে লাগিল। সে উঠিয়া নীরবে মাতালের মত টলিতে টলিতে জমিদারের প্রাসাদে গিয়া প্রবেশ করিল। রাত্রে একমাত্র কন্যার রাজপুত্রতুল্য পাত্রে বিবাহ, জমিদার তাহারই তত্ত্বাবধান ও সুব্যবস্থায় ব্যস্ত; এমন সময়ে এমাম আসিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল; মলিন বস্ত্র পরিহিত রুক্ষ চুল, শুষ্ক মুখ—সে মূর্ত্তি জমিদারের চোখে নিতান্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল, নিজেকে সম্বরণ করিয়া কি মনে করিয়া তিনি বলেন—"কি এমাম কি চাও?"

কম্পিতকণ্ঠে এমাম উত্তর করিল—"দু গণ্ডা পয়সা হুজুর! জমীর মালেক! সকাল বেলা গুড়খানা দিয়েছি তার বহনি করিব।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জমিদার বলিলেন—"এই নাও।"

এমাম পয়সা ক'টী কুড়াইয়া লইয়া একটা আফিমের দোকানে ঢুকিল। দোকানদার বলিল "আফিম কি করিবে?" "আমার স্ত্রীর পেটে ব্যথা ধরেছে, খেলে কমিবে" তীব্রতায় এমামের চক্ষু রক্তবর্ণ।

(৪)

অন্ধকার রাত্রের অদৃশ্য কল্পনায় এমামের বিষ-দিগ্ধ অঙ্গ ভরিয়া জেলেখার হিম-শীতল অঙ্গখানি অদ্ভূত বিহ্বলতা দিতে লাগিল! স্বীয় ক্ষুদ্র কুটীরে রজনীর স্নিগ্ধ তিমিরে পড়িয়া এমাম ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আবার প্রভাতোদয় হইয়া গেল, আবার সেই ভাঙা মট্‌কা দিয়া সূর্য্যের খলিত-জ্যোতিঃ আসিয়া সৃষ্টির বিচিত্র রঙ্গ রূপের মিলন-কুটীরখানি দৃশ্যময় করিয়া তুলিল! অলসাপ্লুত কণ্ঠে এমাম বলিয়া উঠিল "খোদা খোদা! একি ভুল করাইলে প্রভু! কেন আমি পার্থিব শুভ্রতা দিয়া দারিদ্র্য-মালিন্য দূর করিতে গিয়াছিলাম? প্রভু আমার! তোমার অপার্থিব ওই জ্যোতিঃ দিয়া আজ আমার জীবনের সে মহা-কালিমা দূর করিয়া দাও!"

সহসা বাহিরে কিসের একটা গোলযোগ শ্রুত হইল, কি এক অজানা আকাঙ্ক্ষার কম্পিত চরণে আসিয়া এমাম ক্ষুদ্র দাওয়ায় বসিয়া পড়িল! সম্মুখের পথ দিয়া জমীদারের নব বিবাহিতা কন্যা যথোপযুক্ত উৎসব-সহকারে শ্বশুর বাড়ী যাইতেছে। চতুর্দ্দোলাসীনা জমীদার-কন্যার পার্শ্ববক্র চক্ষু এমামের গৃহের দিকে রক্ষিত! জমিদার-কন্যা এমামকে চিনিত এবং এমামের দুরবস্থাপন্ন গৃহস্থালি সে বিশেষ একটা কৌতুক ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়াই দেখিত—তাই আজও তার বালিকাচিত্ত এই এক চঞ্চল সুখে মুগ্ধ হইতে-ছিল। সাভরণা সুখপুষ্টা সৌন্দর্য্যময়ী জমীদার-কন্যার মধ্যে এমাম দেখিতে পাইল যেন তার অঙ্গভেদ করিয়া, বস্ত্রালঙ্কার ভেদ করিয়া জেলেখার অস্থিমজ্জা রক্ত কান্তি ফুটিয়া ফুটিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে! এমামের চক্ষু জড়াইয়া আসিল; দূরে খর্জ্জুরকুঞ্জের মধ্য হইতে প্রভাতের পাখিকুল স্বর্গের আবাহনের মত তাহার রুদ্ধপ্রায় শ্রবণযুগলে স্বপ্নের বীণা-তারের মত আঘাত করিয়া গাহিয়া উঠিল। কি এক অনন্ত স্মৃতি-দীপ্তিতে সেই ক্ষুদ্র দাওয়ার উপরে এমামের প্রেম-তৃষ্ণ-জীবনাকুল বিষ-বিজীর্ণ দেহখানি মৃত্যু-সমুদ্রে ভাসমান হইল, আঁখি তারা দু'টী চিরদিনের মত বুজিয়া গেল। মহেশ্বর গ্রামের ক্ষুদ্র অংশ-ভিক্ষু এমাম আজ অনন্ত রাজ্যে আশ্রয় পাইল। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে স্থান পাইল! জননীর বুক ভরিয়া উঠিল!

শ্রীসরোজবাসিনী দেবী (গুপ্ত)।

গান।

(বেহাগ, কাওয়ালী)

(কিবা) মধুরা নারী!
তদধিক সুমধুর, হৃদি তাহারি!
না জানি মধুর কত,
সে হৃদি বাসনা যত!
দরশে বদন নত, নয়নে বারি॥
পূর্ণিমায় ফুলবনে
দাঁড়ায়ে বিহ্বল মনে,
ভুলিয়ে গিয়েছি প্রেম—পূজা তাহারি!
যেবা চাহে ভালবাসা,
পূরুক তাহার আশা,
আমি যেন আঁখি ভরে হেরিতে পারি!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

রামেশ্বরী-মন্দির

(১)

যশোহরের অতীত গৌরবচিহ্ন সকল কালস্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে একে একে মুছিয়া গিয়াছে। কালের শত সহস্র অত্যাচার নীরবে বহন করিয়া যশোহর এক মহা শ্মশানের মাঝে বিরাজ করিতেছে। যে দিকে নয়ন প্রসারিত করি সেই দিকেই দেখিতে পাই একটা মরণোন্মুখ গৌরব জ্যোতিঃ স্থানটিকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। শ্মশান-ভূমির নিষ্ঠুর অস্তিত্ব চতুর্দ্দিকে বিভীষিকা বিস্তৃত করিয়াছে।

আমরা যশোহরের বিলীয়মান গৌরব-চিহ্ন-সমূহ অবলোকন করিয়া অশ্রু-

বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। আজ সহৃদয় পাঠকগণকে সেইরূপ একটি স্থানের কাহিনী শুনাইব।

যশোহর নগরের দশক্রোশ উত্তরে ক্ষীণস্রোতা বেগবতী-নদীতটে নলডাঙ্গা অবস্থিত। এখন ইহা একটী সামান্য গ্রাম মাত্র, কিন্তু একদিন এই স্থানের বিশেষত্বের অভাব ছিল না। মোগল রাজত্বের ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠাপিত হইবার প্রাক্কালে বিষ্ণুদাস হাজরা নামে এক ব্যক্তি বাদসাহসেনার রসদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া পুরস্কারস্বরূপ নলডাঙ্গা প্রভৃতি পাঁচখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাহা হইতেই নলডাঙ্গা রাজবংশের ভাবী জমিদারীর সূত্রপাত হয়। *

বিষ্ণুদাসের পুত্র শ্রীমন্তদেবরায় কালক্রমে সমগ্র মামুদশাহী পরগণার অধীশ্বর হন। একদিন এই নলডাঙ্গার বৈভবরাশি সমগ্র বঙ্গবাসীর আখ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিস্মৃতির তুলিকায় তাহার সে গরিমাময় কাহিনী মুছিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভগ্ন প্রাসাদরাজির অবশেষ মন্দিরাদির চূর্ণ বিধ্বস্ত অংশ সমূহ সে সকল কথার প্রতিধ্বনি করিতেছে।

নলডাঙ্গার উপকণ্ঠবর্ত্তী মটবাড়ী নামক স্থানে নলডাঙ্গার রাজবংশের কীর্ত্তি—কতিপয় দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে রামেশ্বরী-মন্দিরের কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

(২)

মটবাড়ীর রামেশ্বরী-মন্দিরের সন্নিকট 'বেগবতী' নদী বহিয়া গিয়াছে। যে নদী একদিন তাহার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে তীরোপান্ত প্লাবিত করিয়া কলকল নিনাদে বহিয়া যাইত আজ তাহার আর সে মহিমা নাই; তাহার 'বেগবতী' নাম ডুবিতে বসিয়াছে। বর্ষাকালে প্রচুর বারিপাতে নদীটি সুখসুপ্তা সুন্দরীর মত স্পন্দিত হইয়া উঠে; কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে তাহা বিশুষ্কপ্রায় হইয়া যায়।

রামেশ্বরী মন্দিরে চতুর্ভুজা দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। মন্দিরের সম্মুখে পূর্ব্বে ভোগগৃহাদি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, এক্ষণে তাহার ধ্বংসাবশেষ ইষ্টক সমূহ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মন্দিরটী আমূল ইষ্টকে নির্ম্মিত; ইষ্টকের আকার প্রাচীন হর্ম্ম্যাদির ইষ্টকের ন্যায় ক্ষুদ্র। ইষ্টকগুলি এমনভাবে এবং সুকৌশলে বিন্যস্ত রহিয়াছে যে, কালের অত্যাচারেও তাহারা স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে নাই। দেবালয়ের শীর্ষ প্রদেশ এক্ষণে ঘনজঙ্গলে আচ্ছন্ন; মন্দিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়, স্থানে স্থানে বেতসাদি বন্যলতা পাদপ

* Hunter's Statistical Accounts of Bengal Vol. II.

এমন ঘনীভূত হইয়া আছে যে, দূর হইতে দৃষ্টি চলে না। বর্ত্তমান গুঞ্জননগরের রাজবাটী হইতে নলডাঙ্গার মঠবাড়ীতে আসিতে হইলে একটি বংশনির্ম্মিত সেতু পার হইতে হয়। এই সেতু আসিয়া এ পারে যে স্থানে শেষ হইয়াছে সেই স্থান হইতে একটি সঙ্কীর্ণ বক্রপথ বরাবর মঠবাড়ী পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এই পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেই রামেশ্বরী-মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দর্শক প্রথমে এই মন্দিরের পুরোভাগে উপনীত হইয়া মন্দির গাত্রস্থ মনোরম কারুকার্য্য দর্শনে বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া যান। বঙ্গে একদিন যে শিল্পকলার প্রভূত অনুশীলন হইত, যাহার ফলে বঙ্গভূমি কলাবিদ্যায় জগতের আদর্শস্থানীয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিয়া অধুনা একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। রামেশ্বরী-মন্দিরের উপরিভাগস্থ ইষ্টকগাত্রে বঙ্গের সেই সুপ্রাচীন কারুময় কলাবিত্তার শেষ নিদর্শন দেখিলাম। কোনও ইষ্টকের উপর মনোহর কুসুমমাল্য অঙ্কিত হইয়াছে, কোথায়ও বা নরনারীর রমণীয় খোদিত মূর্ত্তি শিল্পীর শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে। যে শিল্পীর নিপুণ করস্পর্শে এই সকল চিত্র এত মনোজ্ঞ ও জীবন্তের স্থায় প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহার বংশধরগণ আজ শিল্পকলা ভুলিয়াছেন !

রামেশ্বরী-মন্দিরের একস্থানে রাম-রাবণের যুদ্ধচিত্র সুকৌশলে অঙ্কিত হইয়াছে। মন্দিরের ইষ্টকের উপরিভাগস্থ খোদিত চিত্রাবলী দেখিলে বোধ হয় যেন সেগুলি সজীব ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হায়! এমন সুন্দর দেবালয়ের সমুন্নত শিল্পকলার ললিত বিকাশ উপভোগ করিবার এখানে কেহও নাই! যশোহরের এক প্রচ্ছায়-শীতল শান্ত বন বীথিকার নীরব অন্তঃপুরে আতাম্র বন কিসলয়ের অমল সুষমারি মাঝে এই মনোরম স্থানটি আপনার সকল সৌন্দর্য্য লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

(৩)

রামেশ্বরী-মন্দিরের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি করা যায়, যে নলডাঙ্গা রাজবংশে বামদেব নামে একজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন; এই দেবায়তন তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে রামেশ্বরী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বামদেবের জীবনকাহিনী সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে আলোচিত হইল।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে বামদেব দেবরায় নলডাঙ্গার রাজগদীতে উপবিষ্ট হন। রাজা হইবার কিয়ৎকাল পরে তিনি স্বীয় নামানুসারে মঠবাড়ীতে দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহা উৎসবে এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল (১) উত্তরকালে

(১) The Naldanga Raj family PP. 70.

বামদেব দানশীলতার জন্ত প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। (১) তাঁহার ঔদার্য্য ও মহানুভবতার কাহিনী এখনও নলডাঙ্গার লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। বামদেবের সমকালে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার শাসনদণ্ডের কঠোরতায় দেশমধ্যে অরাজকতার সূচনা হইল, জমীদারগণ নিরন্তর নবাব কর্ত্তৃক পীড়িত ও নিগৃহীত হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। নবাবেরা প্রাপ্য কর যথাসময়ে অর্পণ করিতে না পারিলে নিগ্রহের সীমা ছিল না। "একটা বিস্তৃত গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা নানাবিধ দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জ্জনা দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইত। পরে অপরাধী জমিদারগণকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থানের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইত! হিন্দুগণকে উপহাস করিবার জন্য তাহার নাম 'বৈকুণ্ঠ' দেওয়া হইয়াছিল। (২)

রাজা বামদেব কয়েক বৎসর যাবৎ সম্রাটের কর দিয়া উঠিতে পারেন নাই। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ইহাতে বামদেবের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত এক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রামদেব তদীয় সমুহ-বিপদের বিষয় অবগত হইয়া এবং 'বৈকুণ্ঠে' নিক্ষিপ্ত হইবার ভয়ে,নলডাঙ্গার সন্নিহিত এক গ্রামে গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। নবাব প্রেরিত সেনা কিয়দ্দিবস নলডাঙ্গায় অবস্থানের পর হতাশচিত্তে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বামদেবের পলায়নের কথা মুর্শিদসকাশে নিবেদন করিল।

(৪)

মুর্শিদ প্রেরিত সেনাপতি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার অব্যবহিত পরেই বামদেব মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 'বৈকুণ্ঠে'র ভয়ে জমিদারী পরিত্যাগ করিবার বাসনা জানাইলেন। নবাব স্বীকৃত হইলে বামদেব সেই মর্ম্মে একখানি দলিল লিখিয়া দিলেন। রাজার আমমোক্তার শ্রীকৃষ্ণ দাস সে সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। পর দিবস মুর্শিদাবাদে আসিয়াই প্রথমে এই কথা শ্রবণ করিলেন। প্রভুর বিষয়রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে নবাব সমীপে গমন পূর্ব্বক উক্ত দলিল দেখিবার প্রার্থনা করিলেন। নবাব শ্রীকৃষ্ণকে দলিল দেখিতে দিলেন।

---

(১) J, Westland's Report on the District of Jessore.

(২) মুর্শিদাবাদ কাহিনী ১৭ পৃষ্ঠা, গ্রাণ্ট, ষ্টুয়াট প্রভৃতি খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

প্রভুভক্ত কৃষ্ণদাস ভাবিলেন দলিলখানি কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিলে রামদেবের জমিদারি রক্ষা হইলেও হইতে পারে। এই মনে করিয়া তিনি নবাবের অত্যাচারের চিন্তায় বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া সেই দলিলখানি গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিলেন। নবাবের লোক তাঁহাকে ভীষণ প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া মৃতবোধে ভাগীরথী-স্রোতে ভাসাইয়া দিল। রামদেব তখনও মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে প্রভাতকালীন স্নানাদিকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন কাহার মৃতদেহ সলিল-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুচরগণ কর্ত্তৃক মৃত দেহটি তটদেশে আনীত হইল এবং পরীক্ষার পর উহা আপনারই প্রিয়তম কর্ম্মচারী শ্রীকৃষ্ণ দাসের মৃতকল্প দেহ বলিয়া স্থির কারলেন। কিয়ৎক্ষণের শুশ্রূষার ফলে তাঁহার চৈতন্য হইল। এবং কয়েক দিবসের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণদাসের নিকট সকল কথা শ্রবণ করিয়া রামদেব তাঁহার অসামান্য প্রভুভক্তি দর্শনে অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে এক সুবিস্তৃত জায়গীর অর্পণ করিলেন। মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত নান্দোয়ালীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ "ইস্তকা গেলাদাস" এই আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

(৫)

রামদেবের সময় হিন্দুকুল গৌরব সীতারাম রায় ভূষণায় রাজত্ব করিতেছিলেন। সীতারামের সহিত কোনও কারণে রামদেবের কিয়ৎকাল বিপক্ষভাব ক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বহুদিন স্থায়ী হয় নাই।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করিয়া সেই গুলিকে ২৫টি জমিদারী ও ১৩টি জায়গীরে বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার এই বন্দোবস্তের কাগজের প্রসিদ্ধ নাম "জমা কামেল তুমারী"।(৫) উল্লিখিত পঁচিশটি জমিদারীর মধ্যে মহম্মদ শাহী অন্যতম। রাজা সীতারাম রায়ের পতনের পর ভূষণার নলদি পরগণা রাজসাহী জমিদারী অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট অংশ রামদেবের সহিত বন্দোবস্ত হয়। সীতারামের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার পরিবারবর্গের দৈন্য দশা উপস্থিত হয়। এই দুঃসময়ে রামদেব সীতারামের এক পুত্র প্রেমনারায়ণের ভরণ-পোষণ ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করেন।

"দেবদ্বিজে" রামদেবের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, এবং সেই ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তিনি দেবতার ও ব্রাহ্মণের ভোগের নিমিত্ত প্রভূত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। নলডাঙ্গার রামেশ্বরী-মন্দির তাঁহার পবিত্র স্মৃতি অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।

---

(৫) নবাবী আমলে বাঙ্গলার ইতিহাস—৪৮৬ পৃষ্ঠা।

(৬)

নলডাঙ্গার এই স্থানের নাম মঠবাড়ী কেন হইল তাহা জানা যায় না। পুরাকালে এই স্থানে কোনও বৌদ্ধমঠের অস্তিত্ব বর্ত্তমান ছিল কি না তাহা বিশেষজ্ঞের বিচার সাপেক্ষ। মঠবাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ এবং জন বিরল হইলেও প্রাণে গভীর পবিত্রভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। এই পবিত্র ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন কত মহাত্মার পূতপদরেণু এই স্থানের প্রতি ধূলিকণার সহিত সম্পৃক্ত রহিয়াছে। কত মহাপুরুষের পবিত্র নিঃশ্বাস এখানকার বায়ু মণ্ডলকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের প্রদীপ্ত মুখ-কমল যেন কল্পনা চক্ষে দৃষ্ট হইতেছে; যেন তাঁহাদের গম্ভীর উদাত্ত-বাণী এই সকল মন্দিরের গুপ্ত নির্জ্জন কক্ষমধ্যে এখনও ধ্বনিত হইয়া ফিরিতেছে! এখানে আসিলেই হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে বৈরাগ্যবাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। শান্তির পীযূষধারা হৃদয়ে প্রবাহিত হয়।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

ক্ষুব্ধ।

আজি নিদাঘের শেষ, পড়ি দিখি, ম্লানবেশ
শুষ্ক নেত্রজল।
বাজে বুকে কি বেদনা, চেয়ে আছে অন্তমনা,
দীর্ণ অন্তস্তল।
নাহি তা'র হেন কেহ, দেয় এককণা স্নেহ
শুনে দুটো কথা।
নীরবে আপন মনে ধরণীর এক কোণে
বহে কত ব্যথা!
বুকের উপরে হায়! কাক চিল ডেকে যায়
তা'রাও ধরায়—
জলিছে হৃদয় ধূ ধূ— বিশ্বে সে যে একা শুধু
অদৃষ্ট তাহার!

খরস্রোতা নদী পারা ভাঙ্গি সীমা, মৃৎ-কারা
অসীমেরে চায়,
টুটেনা ধরার পাশ, জীবনের চির আশ
ক্ষোভে মরে যায়!
আমার হৃদয় আজ, চাহে জগতের মাঝ
মিশিতে তেমনি!
জীবন-প্রদীপ নিভে, কে আর জ্বালিয়া দিবে
তমিস্রা রজনী।
বিফল উদ্বেগ আশ, বিফল এ দীর্ঘশ্বাস
স্নেহ ভালবাসা—
এবার জগতে এসে, কেঁদে কেঁদে ফিরি শেষে
বৃথা যাওয়া আসা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

অনুতপ্ত।

(১)

নবী সেখ ও তাহার পত্নী কামিনী বিবি তাহাদের একমাত্র পুত্র পাঁচুকে কলিকাতায় চাকুরি করিতে পাঠাইয়া অবধি সকাল সন্ধ্যা তাহার মঙ্গল কামনা করিত, তাহার নামে 'দোয়া' প্রার্থনা করিত, কৃষ্ণনগরের প্রত্যেক পীরের দরগায় কয়তা দিয়া আসিত আর ফকীরদের সাধ্যমত তণ্ডুল বিতরণ করিত। ভগবান যে তাহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইতেন সে কথা তাহারা বেশ বুঝিতে পারিত। পাঁচু মাসের মধ্যে দুই একবার বাড়ী আসিত এবং প্রত্যেক বারে অন্ততঃ পনর কুড়ি টাকা পিতার হস্তে অর্পণ করিত। তাহার চুল ছাঁটিবার নূতন চটকে, তাহার পরিহিত পিরাণের রামধনুর মত বর্ণে, সে তাহার সমবয়স্ক বালকদিগের মনে তাহার প্রতি একটা শ্রদ্ধাভাব জাগাইয়া তুলিত। কিনু সেখের কন্যা কুসুম ওরফে কুলসমের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। কিনু তাহাকে দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইত। সে ভাবিত গরীব দুঃখীর ঘরে এমন বাবুর মত জামাই বোধ হয় নিন্দার কথা হইবে।

পাঁচু কলিকাতায় কোন সাহেবের খানসামা হইয়াছিল, সকলে তাহাই জানিত। তাহাদের কৃষ্ণনগরের কলেক্টর সাহেবের বড় খানসামাও 'উপরি' সমেত মাসিক কুড়ি বাইশ টাকার অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত না, কৃষ্ণনগরের দরিদ্র মুসলমান-সমাজ সে কথা বিদিত ছিল। তবে তাহারা জানিত যে কলিকাতার সাহেবেরা ধনকুবের। তাহাদের পক্ষে ছোকরা বেহারাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন দেওয়া অসম্ভব নহে। নবী মনে মনে সাহেবেরও মঙ্গল কামনা করিত। না করিবে কেন? তাঁহারই কৃপায় তো তাহার বন্ধকী জমিটুকু উদ্ধার হইয়াছিল, চালে নূতন খড় পড়িয়াছিল, বিবির কোমরে রূপার গোট, হাতে রূপার বাউটি ও কানে সোণার বালি উঠিয়াছিল। আট মাসে যখন পুত্র এত রকম কাণ্ড করিয়াছে তখন ভবিষ্যতে যে তাহার অদৃষ্টে 'কোটায়' বাস করা ঘটিবে সে বিষয়ে নবীর আদৌ সন্দেহ ছিল না। কেবল যদি খোদা তাহার মাণিককে মেহের বাণি করিয়া 'বাহাল তবিয়াতে' রাখিয়া দেন।

(২)

নবী শরৎবাবু উকিলের বাড়ীর গোয়ালঘর ছাইতে ছাইতে শুনিল যে বাবুরা কলিকাতায় যাইবার পরামর্শ করিতেছেন। নবীর মনে একটা বড় নূতন সাধ

হইল। সে ভাবিল যে চুপি চুপি বাবুদের সহিত কলিকাতায় গিয়া পাঁচুকে বিস্মিত করিবে। ধীরে ধীরে চালের উপর হইতে নামিয়া নবী তামাক সাজিয়া শরৎবাবুর বৈটকখানায় উপস্থিত হইল। উকিল বাবুর ভয় হইল। বুঝিবা বাঁশ কি দড়ি কম পড়িয়াছে, আবার অর্থব্যয় হইবে! তিনি বলিলেন—"আবার কি খবর রে?"

"আজ্ঞে দাদা ঠাকুর তামাক ইচ্ছে করুন।"

শরৎ বাবু হাসিলেন। নবী বিছানার নিচে কলিকাটি রাখিল, তিনি তুলিয়া লইয়া স্বয়ং হুকায় বসাইলেন। নবী মুসলমান, সে তো হুকা ছুঁইতে পারে না। নবী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—"আজ্ঞে বলছিলেম কি কলকাতায় যাবা কেডা?"

শরৎ বাবু বলিলেন—"কেন, তুমি যাবা নাকি? তুমি মোছলমান, তুমি তো আর গঙ্গায় ছান করবানা।"

নবী একমুখ হাসিয়া তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিল। শরৎ বাবু শুনিয়াছিলেন যে তাহার পুত্র কলিকাতায় চাকুরি করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিত। খানসামার চাকুরি করিয়া এত অর্থ উপার্জ্জন করা অসম্ভব। বালক কলিকাতায় কি করে তাহা জানিবার জন্য তাঁহারও কৌতূহল জন্মিল। অথচ সরল প্রকৃতি নবীর নিকট তাহার পুত্রের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলে বেচারা দুঃখিত হইবে। পাঁচুর প্রকৃত অবস্থাটা জানিবার এ অবসরটি তিনিও ছাড়িলেন না। তিনি নবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

কিন্তু গোল হইল পাঁচুর ঠিকানা লইয়া। নবী সাহেবের বাড়ীর নম্বর জানিত না। রাস্তার নাম জানিত 'কিট্ রাস্তা'। শরৎ বাবু অনুমান করিয়া লইলেন যে পাঁচুর সাহেবের বাসস্থান কিড্ ষ্ট্রীটে।

তিনি বলিলেন—তাত হ'ল। সাহেবের নাম জানিস?

"আজ্ঞা হাঁ। জানি বই কি দাদা ঠাকুর। ব্যাং সাহেব।"

শরৎ বাবু খুব হাসিলেন। 'ব্যাং সাহেব' ব্যাঙ্ক সাহেব হওয়াই সম্ভব। তিনি স্থির করিলেন কিড্ ষ্ট্রীটে ব্যাঙ্ক সাহেবের সন্ধান পাওয়া তত দুরূহ কার্য্য হইবে না।

(৩)

নবী তিন দিন কলিকাতার পথে পথে ঘুরিল কিন্তু 'ছাওয়ালডার' সন্ধান পাইল না। এত বড় বৃহৎ সহরে হাজার হাজার লোকের ভিতর হইতে

আপনার স্নেহের পুত্রকে বাছিয়া বাহির করা যে দুঃসাধ্য তাহা বুঝিয়াও সরলমতি নবী সেখ যুবক দেখিলেই তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। যাদুঘরের বড় বড় কক্ষে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে চাহিয়া দেখিল যদি কৌতূহল-পরবশ হইয়া সন্তান তথায় কৌতুক দেখিতে আসিয়া থাকে। আলিপুরের পশুশালায় সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বানর দেখিয়া নবীর যে পরিমাণে আনন্দ হইল, সেখানে নিজের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কুমারকে না দেখিয়া তাহার প্রাণে ততোধিক বিষাদ জন্মিল। শরৎ বাবু স্বয়ং অনুসন্ধান করিবার পরও নবী কিড্ ষ্ট্রীটে পাঁচ বার ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু পাঁচুর কোনও সন্ধান পাইল না। শেষে সে ভাবিল পাঁচুর জন্য কলিকাতা হইতে একটা উপঢৌকন কিনিয়া লইয়া যাইবে। পাঁচু এবার গোয়াড়ি যাইলে সে তাহাকে কলিকাতার টুপি প্রদান করিয়া বিস্মিত করিবে। যে কোন উপায়ে হউক পুত্রকে বিস্মিত করিয়া তাহার মুখে হাসি দেখিতে পাইলে সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে।

শীতকালের বেলা ৫টার সময়ই এক রকম সন্ধ্যা হয়। রাত্রি দশটার সময় তো অর্দ্ধরাত্র। নবী কলিকাতা হইতে স্ত্রীর জন্য খুব চটকদার সাড়ি কিনিয়াছিল, পুত্রের জন্য ফৌজদারী বালাখানা হইতে তের আনা মূল্যের নানাবর্ণের একটি টুপি ক্রয় করিয়াছিল, এবং সংসারের জন্য চিনাবাজার হইতে তিন খানি সান্‌কি এবং বড়বাজার হইতে একটি কলাই করা বদনা কিনিয়াছিল। সেগুলি সমস্ত নবী একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়াছিল। পুত্র প্রদত্ত একটি পীতবর্ণের পশমের গলাবন্ধে মুখ কাণ গলা প্রভৃতি উত্তমরূপে আবৃত করিয়া, হস্তে পুটুলিটি ঝুলাইয়া ঘুম-বিজড়িত চক্ষে নবী শিয়ালদহ ষ্টেসনে ঢুকিতেছিল। বাহিরে গাড়ি বারান্দার কাছে একটু ভিড় হইয়াছিল। হটাৎ যেন তাহার মনে হইল কে তাহার পকেটে হাত দিল। নবীর বাম হস্তে পুঁটুলি ছিল। সে দক্ষিণ হস্ত দিয়া চোরের হাত ধরিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দশ বারো জন লোক চোরকে ধরিয়া ফেলিল। চোরের চারিদিকে একটা ভিড় হইল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নবী সে জনতার বাহিরে পড়িল। একটা পুলিসের লোকও ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

শরৎ বাবু নবীর ঈষৎ অগ্রে ছিলেন। তিনি বলিলেন—কি হয়েছে রে—নবী?

নবী বলিল—পকেট মারি হ'য়েছে দাদা ঠাকুর।

কি দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে শরৎ বাবু তাহা অনুসন্ধান করিলেন। একটি

দেশালাইয়ের খোলের ভিতর সার্দ্ধ সাতটি পয়সা এক টুকরা কাপড়ে বাঁধা ছিল চোরটা তাহাই চুরি করিয়াছে। শরৎ বাবু বুঝিলেন এই সামান্য অর্থের জন্য পুলিস হাঙ্গামায় পড়িলে সে রাত্রে স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনে বাধা পড়িতে পারে। সুতরাং নবীকে লইয়া তাড়াতাড়ি তিনি গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। গাড়ি ছাড়িবার তখনও নয় মিনিট বিলম্ব ছিল।

গাড়ীর দ্বিতীয় ঘণ্টার পর একজন দারোগা কতকগুলি লোক লইয়া গাড়ীর কামরায় কামরায় ফরিয়াদির অনুসন্ধান করিতেছিলেন। একজন নবীকে দেখিয়াছিল সে তাহাকে দেখাইয়া দিল। নবী শঙ্কাকম্পিত পদে পার্শ্বের গাড়ীতে দাদা ঠাকুরের নিকট ছুটিয়া গেল। দারোগা বাবু ছাড়িলেন না। তিনি হাসিতে হাসিতে উকিল বাবুর প্রকোষ্ঠে গেলেন। পকেট হইতে বস্ত্রখণ্ড বাহির করিয়া নবীকে দেখাইয়া বলিলেন—এ রুমাল তোমার?

নবীকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইল সে সেই সম্পত্তির মালিক। দারোগা বাবু পকেট বহি বাহির করিয়া তাহার এজাহার লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহার কৃষ্ণনগরের ঠিকানা লিখিয়া লইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি চোরটাকে সনাক্ত করতে পারবে?

নবী বলিল—বাবু কি বলেন?

দারোগা বাবু হাসিয়া বলিলেন—তুমি চোরটাকে চিন?

নবী এবার রাগিল। তাহার কলিকাতা যাত্রাটা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছিল। একে পুত্রকে খুঁজিয়া পায় নাই, তাহার উপর প্রায় দুই গণ্ডা পয়সা লোকসান, পুলিস হাঙ্গামা, শেষে দারোগা বাবুর সন্দেহ যে সে তস্করের সহিত পরিচিত। সে বলিল "তোবা! তোবা! আমি ভালমানুষের পুত চোরটারে চিনি কেমন ক'রে? ইঃ আল্লা!"

শরৎ বাবু তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে দারোগা বাবু তাহাকে অপমানিত করিবার জন্য সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি জানিতে চাহেন, যে লোকটা তাহার পকেট হইতে চুরি করিয়াছিল, নবী তাহার মুখ দেখিয়াছিল কি না। বাস্তবিক গোলমালে নবী তাহার মুখ দেখে নাই। দারোগা বাবু বলিলেন—আচ্ছা চোরকে সনাক্ত করবার অনেক লোক আছে।

নবী ট্রেণে গিয়া বসিবামাত্র ট্রেণ ছাড়িল। নবী মনে মনে বলিল—আল্লা! মালিক! ঝুটমুট তিনটে রোজ মারা গেল, গাড়ি ভাড়া খরচ হ'ল। ছাওয়ালটারে খোস্ মেজাজে রেখো খোদা।

(৪)

গৃহে ফিরিবার সাত দিন পরেও যখন সে পুত্রকে দেখিতে পাইল না তখন নবী বড় বিচলিত হইল। কামিনী বিবির তো ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার বাসনা হইল। কি বিড়ম্বনা! পূর্ণ এক পক্ষ কাটিয়া গেল, তবু পুত্র গৃহে ফিরিল না। এরূপ দুর্ঘটনা তো কখনও ঘটে নাই। তাহার নসিবে কেন খোদা এত কষ্ট লিখিয়াছিলেন সরলা কামিনী তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে এই কয়দিন স্বামীর নিকট হইতে কলিকাতার বিশালতার গল্প শুনিতেছিল। পথে দিন রাত অসংখ্য গাড়ী ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় শুনিয়া তাহার বড় ভয় হইল। তাহার পর সেই শয়তানি মটর গাড়ীগুলার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া তাহার হৃদ্‌কম্প হইল। 'ওমা! কি জাহান্নমের সহর গো। ছাওয়ালডারে এবার পেলে ঘরামির কাজে দ'ব আর সে জাহান্নমে যেতে দিব না'—কামিনী মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিল। হটাৎ ট্রামগাড়ীর বর্ণনাটা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। পুত্রের অশুভ আশঙ্কা করিয়া তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। সে স্বামীকে বলিল—"হাঃ রে সহর কল্‌কেতা! হাঃ রে দুনিয়ার জাহান্নম"!

বাহিরে নবীকে কে ডাকিল। নবী বাহিরে গেল। একজন পেয়াদা তাহাকে একখানা সমন দিয়া গেল। মঙ্গলবার তাহাকে শিয়ালদহ পুলিসকোর্টে ভারতেশ্বর বনাম রহিম সেখের মামলার সাক্ষ্য দিতে হইবে। এবার বলবান নবীরও চক্ষে জল আসিল। সে দাদা ঠাকুরের নিকট সমন লইয়া চলিল।

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে মঙ্গলবারের মধ্যে পাঁচু বাটী না আসিলে নবী কলিকাতায় যাইবে না। আবার নূতন সমন আসিবে। মোকদ্দমা কোন্ না দশ বারো দিন পিছাইয়া যাইবে। তাহার মধ্যে পাঁচু নিশ্চয় গৃহে আসিবে। তখন পুত্র সমভিব্যাহারে নবী কলিকাতায় যাইতে পারিবে। সুবিধা হইলে কামিনীও তাহার সহগামিনী হইতে পারে।

মঙ্গলবারের মধ্যে পাঁচু গোয়াড়ি আসিল না। আবার সমন আসিল। মোকদ্দমা শুনানির দিন আসিল। তবু পাঁচুর কোনও সংবাদ নাই। মর্ম্ম-যাতনায় তাহার পিতামাতা দগ্ধ হইতে লাগিল। নবী স্থির করিল প্রভাতে কলিকাতায় গিয়া সাক্ষ্য দিবার পর পুত্রের অনুসন্ধান করিবে। যদি লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর হইতে সে তাহার ক্ষুদ্রকায় পুত্রকে খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারে তবে তাহার প্রাণে স্নেহ কোথায়?

(৫)

হলফ্ লইয়া, নাম, ধাম, বলিয়া পিতৃ-পরিচয় প্রদান করিয়া যুক্তপাণি নবী শিয়ালদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সাক্ষ্য দিতেছিল। কোর্ট বাবু প্রশ্ন করিয়া একে একে তাহার নিকট হইতে মোকদ্দমার সকল কথা বাহির করিতেছিল। তাহার সরল উত্তরে, তাহার ভয়বিহ্বল হাবভাবে কলিকাতার সভ্যতা-দর্প-দুষ্ট দর্শকবৃন্দ কৌতুক উপভোগ করিতেছিল। আসামীটা বালক, কয়দিনের হাজতবাসে সে বেশ অনুতপ্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইতেছিল। নবী সেখকে সাক্ষীর কাটগড়ায় দেখিয়া সে কাঁপিতেছিল। কোন রকমে রেলিং ধরিয়া সে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিয়াছিল। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হইতেছিল যেন শত বৃশ্চিক এককালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিতেছিল, যেন নির্জ্জন বনপথে নিঝুম মধ্যরাত্রে তারার আলোকে সে একটা ভীমকায় দীর্ঘদর্শন ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াছিল।

কোর্ট বাবু সাক্ষীকে বলিলেন—দেখ দেখি আসামীর দিকে।

নবী পশ্চাতে চাহিল। কোর্ট বাবু বলিলেন—ওদিকে নয়, বাঁয়ে দেখ, দেওয়ালের দিকে।

আসামী দুইখানি কম্পিত হস্তে মুখ ঢাকিল। তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। বিচারগৃহে একটা অস্ফুট রোদনধ্বনি উঠিল। প্রহরী জোর করিয়া আসামীর মুখ হইতে হাত নামাইয়া দিল।

সর্ব্বনাশ! এ যে পাঁচু! নবী একবার দেখিল—পাঁচু। আবার দেখিল—না, এ ঠিক পাঁচু কেবল একটু শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। পিতা কি পুত্র চিনিতে পারে না? সে যে কয় দিন কেবল ধ্যানেতে তাহারই চাঁদ মুখটি দেখিয়াছে। এ মুখ তো দুনিয়ায় আর কাহারও নাই।

তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মস্তিষ্কে প্রকৃত ব্যাপারটা প্রবেশ করিল। পাঁচু চোর, সে ফরিয়াদি। সামান্য পকেট মার চোর। তাই পাঁচু এত উপার্জ্জন করিত। পাঁচু নিঃসহায় অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়াছিল। বদমায়েসের দল প্রলোভিত করিয়া তাহাকে এ ব্যবসায় শিখাইয়াছিল। তাহাকে অর্থ দিত, সুখে থাকিতে দিত—ভাল কাপড় দিত, মনোরম আহার্য্য দিত, পাঁচু পকেট মারিয়া চৌর্য্যলব্ধ সম্পত্তি তাহাদিগকে অর্পণ করিত।

নির্ব্বাক নবীর চোখের সামনে রামধনু বর্ণের পিরাণ পরিহিত হাস্যমুখ পাঁচু উদিত হইল। ধীরে ধীরে সে বুঝিল যে চুরির টাকায় তাহার বন্ধকী জমিটুকু

উদ্ধার হইয়াছে, চালে নূতন খড় পড়িয়াছে, বিবির কোমরে রূপার গোট, হাতে রূপার বাউটি, কানে সোণার বালি উঠিয়াছে। হাঃ আল্লা! সে যে জীবনে কখনও পরের একটা মুলো, বেগুন এমন কি একদানা সরিষাও চুরি করে নাই। তাহার মরণ হইল না কেন? সে আদালতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শিরে করাঘাত করিল। প্রহরীর নিষেধ মানিল না। বিচারককে ভয় করিল না। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল, বড় অভিমান ভরে ভগবানকে বলিল—"খোদা, মালিক, ছাওয়ালডারে চোর বানালে!" তাহার ভাগ্যহীন পুত্র কম্পিত করে মুখ লুকাইয়া অনুতাপাশ্রুতে চোর জুয়াচোরের স্পর্শ-কলুষিত কাঠগড়াকে পবিত্র করিতেছিল।

* * * * * *

হাকিমের অনুগ্রহে জামিন দিয়া পুত্রকে ঘরে লইয়া গিয়া নবী তাহাকে চাল ছাইতে শিখাইল। স্ত্রীর গোট বাউটি বালি ফকিরদের দান করিল। তাহার পর পিতা বা পুত্র জীবনে আর কলিকাতায় পদার্পণ করে নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শিক্ষা বিজ্ঞান।—শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্-এ প্রণীত। বাঙ্গালা দেশের আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী যে আদর্শ নহে সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। সমাজের ইষ্টসাধনে যাঁহারই মতি আছে তিনিই শিক্ষা-সংস্কার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। অনেকে আপনাপন উদ্ভাবিত প্রণালী সম্বন্ধে বৈঠকখানায় বাদানুবাদ করিয়াই মনে করিয়াছেন যে তিনি স্বদেশের, স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিলেন। সমালোচনার ভয়ে আপনার আবিষ্কৃত পন্থাটী স্বজাতির সম্মুখে ধরিবার সাহস অনেকের জুগায় না। তাঁহারা কেবল আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির নিন্দা করিয়া, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়-লব্ধ শিক্ষাকে বিদ্রূপ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

বিনয়কুমার বাবুও এ বিষয়ে মনোভিনিবেশ করিয়াছেন এবং আপনার প্রতিভাবলে একটি শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তাঁহার সৎসাহস আছে, তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি বিজ্ঞানাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।

শিক্ষা সংস্কার বড় জটিল কর্ম্ম। কোন্ পথে চলিলে কি ফল পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চয়-রূপে অনুমান করা কঠিন। তবে যুক্তিতর্কের দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে আমাদের মনে হয় যে বিনয়বাবুর শিক্ষা-প্রণালী সুফল প্রসব করিবে। কেন করিবে তাহা বলিতেছি।

বিনয়বাবু স্বাভাবিক নিয়মগুলিকে লক্ষ্য করিয়া স্বভাবের নিয়মে বালক বালিকার শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশৈশব ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিয়া ভাষা শিক্ষার তিনি বিরোধী। শিশু যেমন স্বাভাবিক উপায়ে মাতৃভাষা আয়ত্ত করে ছাত্র সেইরূপ উপায়ে সংস্কৃত, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় অধিকার লাভ করিবে, ইহাই বিনয়বাবুর শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রধান শিক্ষা। কিরূপে এ কার্য্য সম্পাদিত করিতে পারা যায় গ্রন্থকার তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বলা বাহুল্য কথাটা সরল হইলেও ইহাতে বুঝিবার বিষয় অনেক আছে। যখন দেখি নিরক্ষর কাবুলি পাঠান লোহারাম শিরোমণির ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ না করিয়া বেশ বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিতে পারে, কলিকাতার সাধারণ ইহুদির পঞ্চদশ বৎসরের ছেলেমেয়ে প্রায় সকলেই আরবী, উর্দু, বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় মনোভাব বুঝাইতে পারে, তখন বেশ মনে হয় যে বিনয়বাবু আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর ঠিক রোগ ধরিয়াছেন এবং বেশ বিজ্ঞের মত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুক্তির দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিলে শিক্ষক মহাশয়েরা অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন।

বিনয় বাবুর বিশাল গ্রন্থের পূর্ণ পরিচয় দিবার স্থান আমাদিগের নাই। তিনি প্রথমে শিক্ষা বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রীসের শিক্ষা পদ্ধতির ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রীসের কাব্যকলার কেন্দ্রস্থল এথেন্সের শিক্ষা-প্রণালী আলোচনা করিয়া তিনি স্পার্টার শিক্ষা প্রণালীর পরিচয় দিয়াছেন। এ বর্ণনা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি শিক্ষাপ্রদ! ইতিবৃত্ত পাঠে যাঁহারা সুখ অনুভব করেন তাঁহাদের পক্ষে এ অধ্যায়টি বড়ই মূল্যবান।

কিরূপে ছাত্রকে ভাষা শিক্ষা দিতে হয় সে বিষয় আলোচনা করিয়া লেখক ক্ষান্ত হন নাই। কিরূপে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় পদযোজনা শিক্ষা দিতে হয়, কিরূপে স্বাভাবিক উপায়ে ক্রমে ক্রমে ছাত্রের মস্তিষ্কে ভাষাজ্ঞান প্রবিষ্ট করিতে হয় তিনি উদাহরণ দ্বারা তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় তিনি এ গ্রন্থ শিক্ষকদিগের জন্য লিখিয়াছেন। শিক্ষকগণ তাঁহার প্রণালী আয়ত্ত করিয়া শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিলে যে সুফল পাইবেন ইহা বেশ আশা করিতে পারা যায়।

শিক্ষা-বিজ্ঞানে লেখক যথেষ্ট শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। শিক্ষা বিজ্ঞানের আরও অনেক খণ্ড বাহির হইবে। ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই লেখক সরল শিক্ষার পদ্ধতি দেখাইবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর প্রসার কামনা করি।

আদ্যের গম্ভীরা।—শ্রীহরিদাস পালিত কর্ত্তৃক বিরচিত। আমাদের দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহে "আদ্যের গম্ভীরা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই মালদহের হরিদাস বাবু তাঁহার পুস্তকের নামকরণ করিয়াছেন "আদ্যের গম্ভীরা"। এই গাজনোৎসব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কিরূপে সম্পাদিত হয় গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের প্রথম বিভাগে বড় হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, প্রভূত কৃতিত্বের সহিত সে কথার পরিচয় দিয়াছেন। কেবল তাঁহার নিজের কথায় পরিচয় নয়—পুরাণ, কিম্বদন্তী প্রভৃতি হইতে শ্লোক ও ছড়া সংগ্রহ করিয়া তিনি এ অধ্যায়ে তাঁহার মনীষা

দেখাইয়াছেন। গম্ভীরার গান হইতে রাজনীতি, সমাজনীতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়া এই উৎসব হইতে বাঙ্গালা দেশের সামাজিকতা, ধর্ম্ম, সাহিত্য ও কলাবিদ্যার কিরূপ উপকার সাধিত হইত তাহাও বুঝাইয়াছেন।

আমাদের গাজনোৎসব যে বহুদিনের জাতীয় উৎসব, পালিত মহাশয় তাহা দেখাইতে ভুলেন নাই। বৈদিক সাহিত্যে, মহাভারতে, এমন কি চীন দেশীয় পর্য্যটকের বিবরণে এই উৎসবের অঙ্কুরের পরিচয় পাওয়া যায়। গম্ভীরা হরিবংশ, ধর্ম্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রানুমোদিত। গ্রন্থকার প্রমাণ করিয়াছেন যে গম্ভীরা শিবোৎসব অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান এবং গম্ভীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্দুসমাজ বহুকাল হইতে পরিচিত।

দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি গম্ভীরার ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন। ইহাতে তিনি আধুনিক গম্ভীরার ক্রমঃ বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্বে গম্ভীরার কোন্ উপকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবকালে কিরূপে গাজনের অঙ্কুরোদ্গম হইল, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতিতে এবং তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাবে কিরূপে গম্ভীরার ক্রমঃবিকাশ হইয়া পালরাজগণের শাসনকালে এবং সেন বংশীয় ভূপতিগণের আমলে আধুনিক গম্ভীরার জন্ম হইল, গ্রন্থকার তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি গম্ভীরার প্রত্যেক অঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচনা করিয়াছেন।

গম্ভীরায় এত তথ্য আছে, গবেষণা আছে, প্রত্নতত্ত্ব আছে কিন্তু হরিদাসবাবুর লিখন ভঙ্গীতে গ্রন্থখানি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য হইয়াছে। আধুনিক সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অনুষ্ঠিত গাজনের নামে যাঁহারা নাসিকা-কুঞ্চন করেন, কৃতী লেখক পালিত মহাশয় তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন। হরিদাসবাবুর মত কৃতবিদ্য ইতিবৃত্তকারের অধ্যবসায়ের ফলে বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশের প্রত্যেক অনুষ্ঠানই প্রাচীন, তবে শিক্ষা-গর্ব্বিত সমাজের সহৃদয়তা নাই, জ্ঞান পিপাসা নাই, অনুসন্ধিৎসা নাই, তাই তাঁহারা প্রাচীন অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন, এই প্রাচীন উৎসবে সাধারণ লোকের সহিত মিলিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু এখন সেই শিক্ষিত সমাজেরই একজন সুসন্তান প্রভূত পরিশ্রমে, বিশেষ কৃতিত্বের সহিত আপনার বিশাল ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে এ প্রাচীন উৎসবে মাতিলে দেশের কলাবিদ্যার প্রসার হইবে। এখনও কি শিক্ষিত সমাজ ঘৃণা করিয়া গাজনোৎসবে যোগদান করিবেন না? চৈত্র সংক্রান্তিতে জেলায় জেলায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনী করিতে পারা যায়। ভদ্রগণ সমাগত 'ইতর' ও অশিক্ষিতগণকে শিক্ষাদান করিতে পারেন, সে সময় তাঁহারা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইতে পারেন যে 'ইতর' ও 'ভদ্র' সমাজের দুই শাখা। একের সাহচর্য্য ব্যতীত অপরের উন্নতি অসম্ভব।

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় এ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। আমরা সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তাঁহার 'আদ্যের গম্ভীরা' পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বিল্বদল ;—শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। বিল্বদলে তিন পর্ণ থাকে বলিয়া এই কবিতার পুস্তকখানিও তিন পর্ণে বিভক্ত। একটি পর্ণে কতকগুলি করিয়া কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

লেখকের প্রাণে কবিতা নাই বা তাঁহার কবিতা লিখিবার শক্তি নাই, একথা আমরা বলিতে পারি না। প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি অন্ধ উপাসক তাঁহার কবিতার বাহ্যাড়ম্বর অনুকরণ করিয়া এক নূতন শ্রেণীর অদ্ভুত কবিতার (?) সৃষ্টি করিতেছেন। কুমুদনাথবাবুর পুস্তকে আমরা সেই দলের 'গন্ধ' পাই, কারণ এ পুস্তকে 'সরবস্ব ধন' 'ডগমগ' 'আকুল হরষ' 'পাশবিথার' প্রভৃতি অপূর্ব্ব ভাষার ও ভাবের বিকাশ আছে। ডগমগে, ঝগরগে প্রভৃতি ভাষা থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে যেরূপ কার্য্যকরী হয় কবিতার পুস্তকে ঠিক সেরূপ শ্রুতিমধুর হয় না বা উচ্চভাব প্রকটিত করে না। প্রখ্যাতনাম কবিগণ ভাষা লইয়া খেলা করেন কিন্তু নবীন কবির দল সেরূপ ভাবে ভাষাকে ডিগবাজী খাওয়াইতে গিয়া হাস্যাস্পদ হয়েন মাত্র। একটি কবিতায় লেখক লিখিয়াছেন—

'তাম্বু তুলে স্বপন রাশি
ভাগিল এইবার।'

এক স্থলে তিনি 'আকাশ-সাগরে' 'জ্যোৎস্না তরী' 'বেয়ে' আসিতে দেখিয়াছেন আরও দেখিয়াছেন

'তারি তোলো ঢেউ মাণিকের দাম
চলেছে মাথায় করি।'

এ কবিতাটির নাম 'রজনী'। কবিকে আদর করিয়া পাগল বলা যায়। কিন্তু এ রকম কল্পনা কবি-পাগলের কি না তাহা ভাবিবার কথা। পুস্তকে ঐরূপ কল্পনা-শক্তির আরও নমুনা আছে। যথা—

'দ্যুলোকভূলোকক্রণ হ'তে আজ
জনম লভিতে দিন,
শশী চলে গেছে দাঁড় টেনে হেসে
দেখে গেছে কত চিন্।'

শেষের 'চিন্' কথাটির ঠিক অর্থ বুঝিলাম না। যদি 'চিন্' অর্থে চীনবাসী হয় তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে শশীকে দাঁড় টানিতে দেখা অসম্ভব নয়। আমরা কিন্তু কোনও সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গালা বা পারস্য কবিতায় এরূপ কার্য্যের প্রমাণ পাই নাই।

কুমুদনাথবাবুর একটু শক্তি আছে একথা অস্বীকার করি না তবে তিনি যদি একটু সংযত হইয়া লেখনী পরিচালনা করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে যশস্বী হইতে পারিবেন। বোধ হয় তিনি কুসংসর্গে পড়িয়াছেন, তাই ভয় হয়।
